গল্প-সংগ্রহ

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

ভূমিকা
শিবনারায়ণ রায়

প্রজ্ঞাভারতী

প্রকাশক
সুশান্ত দে
প্রজ্ঞাভারতী
১, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৪

প্রথম মুদ্রণ ঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

প্রচ্ছদ
কৃষ্ণেন্দু চাকী

মুদ্রক
মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৪

সূচীপত্র

গল্প

পরাজয়

মেসের বাসা খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ হইয়া কমল শেষে এক দুঃসাহসিক কাজ করিয়া বসিল। গোকুল মিত্রের গলির তেরো নম্বরের বাড়ীর তেতলার ঘরখানিই সে ভাড়া করিল। বাড়ীখানি একটি বিধবার। তিনি তাঁর একমাত্র সন্তান কন্যা বাসন্তীকে লইয়া দোতলায় থাকেন। একতলায় একটি ক্ষুদ্র ভদ্র পরিবার ভাড়া লইয়াছেন। বাড়ীর অংশ ভাড়া দিয়া যাহা কিছু আয় হয় তাহাতেই বিধবার স্বচ্ছন্দে দিনপাত হয়।

এই তেতলার ঘরখানির সঙ্গে অবশিষ্ট বাড়ীটার প্রকৃত কোন সম্পর্ক ছিল না। তেতলা হইতে কাঠের সিঁড়ি বরাবর নামিয়া একেবারে একতলায় বাহিরে সিঁড়ির সঙ্গে গিয়া মিশিয়াছে। কাজেই তেতলার ঘরখানি একটি অপরিচিত পুরুষকে ভাড়া দিতে বিধবার বিশেষ কোন আপত্তি হয় নাই। বাসন্তী প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল কিন্তু মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করা তাহার কোনদিন অভ্যাস ছিল না, তাই আর বিশেষ গোলযোগ করিল না। তবুও একবার মাকে বলিল—"তোমার ভাড়াটেকে বোলো, তিনি যেন তাঁর বন্ধুদের নিয়ে দিনরাত সোরগোল না করেন।"

মা কহিলেন, "তোমাব বাছা সব অনাচিষ্টি, ভদ্রলোকের লেখাপড়া জানা ছেলে—"

"ভদ্রলোকের ছেলে দেখতে বাকী নেই মা। আট নম্বরের মেসের বাড়ী দেখলেই পার। স্কুলে যাবার সময় দেখি, ছেলেগুলো হাঁ করে গাড়ীর দিকে তাকিয়ে থাকে, আর শিস দেয়।"

এই প্রত্যক্ষ যুক্তির বিরুদ্ধে জননী আর কোন কথা কহিলেন না।

বাসন্তী চৌদ্দ বছরের মেয়ে। সুন্দরী বলিয়া পাড়ার মেয়েমহলে তাহার খ্যাতি ছিল। বাঙ্গালীর ঘরে এত বড় মেয়ে অনূঢ়া থাকা একটু আশ্চর্য্যের কথা। বিধবার আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা বেশী ছিল না, কাজেই মেয়ে বড় হইয়া উঠিতেছে বলিয়া দিবারাত্র তাঁহাকে অনুযোগ শুনিতে হইত না। তা ছাড়া তাঁহার স্বর্গীয় স্বামী একজন গোঁড়া সমাজ সংস্কারক ছিলেন। অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া তাঁহার মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ছিল। বিধবা নিজে নিরক্ষর হইলেও শিক্ষিত স্বামীর এই মতকে পরম সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন। যদি কথা প্রসঙ্গে কেহ কোনদিন মেয়ের বিবাহের কথা তুলিত, তিনি বলিতেন, "তিনি আমাকে মেয়ের সতেরো বছর বয়সে বিয়ে দিতে বলেছেন, তাঁর অবাধ্য কেমন করে হব?" সেইজন্য

সহজে কেহ মেয়ের বিবাহের কথা তাঁহার নিকটে তুলিত না। কাজেই সে বিষয়ে তাঁহারও বিশেষ কিছু উদ্বেগ ছিল না। বাসন্তী পড়াশুনা করিত; স্কুলে যাইত। বিধবা গৃহকর্ম করিতেন, সন্ধ্যাকালে মেয়ে স্কুল হইতে ফিরিলে উভয়ে গল্প করিতেন। এই ছিল তাঁহাদের দৈনন্দিন কাজ।

২

সন্ধ্যাকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কমল দেখিল, শিবু ছাদের উপর লম্বমান হইয়া শুইয়া আছে। শিবু তাহার চাকর। চাকর বলিলে তাহার ঠিক মর্য্যাদা হয় না; সে কমলের খেলার সঙ্গী, সুখ দুঃখের সহচর। দুর্ভিক্ষের সময় কমলের পিতা উড়িষ্যায় শিবুকে পথে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। সেই হইতে শিবু তাহার আশ্রয়েই বর্দ্ধিত। শিবু কমলকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। তাই কমলের কলিকাতা আসিবার সময় বাধ্য হইয়া শিবুকেও তাহার সঙ্গে কলিকাতা পাঠাইতে হইত। কমলের জননীও শিবুকে পুত্রের সঙ্গে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

শিবুকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া কমল জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে তোর?"

"হবে আবার কি! আজ রাত্রে খাওয়া হবে কেমন করে তাই ভাবছি।"

"তাইতো! এখানে হোটেল নেই?"

"থাকবে না কেন? তবে সে হিঁদুর হোটেল নয়। সেখানে সব গাড়োয়ানেরা খায়।"

"হোটেল আছে নিশ্চয়। কলেজের কাছে এখানে হোটেল না থাকলে চলে?"

"চলবে না কেন? সবাইত তোমার মত না দেখে শুনে ঘরভাড়া করে বসে না। তাদের বুদ্ধি শুদ্ধি আছে। আর কলেজ কাছে তো খুব! তোমার কলেজ তো এখান থেকে ক্রোশ দেড়েক হবে।"

"তবে উপায়?"

"আর কি! বাদাম তেলের লুচি খেয়ে থাকা।"

"সেটি আমার দ্বারা হবে না শিবু। তুই এক কাজ কর্, বাড়ীওয়ালীকে একবার ডাক দিয়ে নিয়ে আয় তো।"

মিনিট দুই পরেই যেখানে বাসন্তীর মাতা বসিয়া বালিশ সেলাই করিতে-ছিলেন, ক্ষুধার্ত্ত শিবু সেইখানে গিয়া উপস্থিত। বাসন্তী দূরে জানালার কাছে চেয়ারে বসিয়া ইতিহাসে মনঃসংযোগ করিয়াছিল। শিবুকে হঠাৎ দেখিয়া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাও?"

"বাবু বাড়ীওয়ালীকে ডাকছেন।"

"বাড়ীওয়ালী ! বাড়ীওয়ালী এখানে কেউ নেই, এটা ভদ্রলোকের বাড়ী ।" —সে আরো কি বলিতে যাইতেছিল, জননী বাধা দিয়া কহিলেন, "তার কি দরকার ?"

শিবু বাসন্তীর রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছিল ; কহিল, "জানি না ।"

বাসন্তীর মাতা কহিলেন, "কি দরকার তাঁর জেনে এস ।"

বাসন্তী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, "না মা আমিই তার কাছে যাচ্ছি ! ভদ্রলোকের মেয়েকে কি ব'লে ডাকতে হয়, আমি শিখিয়ে দিয়ে আসছি"—বলিয়া আর মায়ের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল ।

ছাদে ইজিচেয়ারের উপর লম্বমান হইয়া শ্রান্ত কমল বাড়ীওয়ালীর প্রতীক্ষা করিতেছিল । সহসা দ্রুত পদক্ষেপ শব্দে চমকিত হইয়া সে চাহিয়া দেখিল, প্রবীণা বাড়ীওয়ালীর পরিবর্ত্তে এক সুন্দরী কিশোরী মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে । তাহার পশ্চাতে জড়সড় শিবু । ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া কমল কহিল, 'আপনি কাকে চান ?"

তীব্রকণ্ঠে বাসন্তী কহিল, "আপনাকে ।"

'কেন ?"

"আপনি কাকে ডেকেছেন ?"

"বাড়ীওয়ালীকে !"

বাড়ীওয়ালীর বদলে আমি এসেছি । অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে বেরুবার তাঁর অভ্যাস নেই, আর বাড়ীভাড়া দেওয়া আমাদের ব্যবসা নয় । এত বড় বাড়ী আমাদের দরকার নেই বলেই আমরা বাড়ী ভাড়া দিয়ে থাকি ।"

"আমার বুঝতে ভুল হয়েছিল, ক্ষমা করবেন । আমার খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা—"

"তার জন্যে আমরা দায়ী নই । এ বাড়ী হোটেল নয় । আপনি যা মনে করেছেন—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বাসন্তী সহসা থামিয়া গেল । কমলের মুখের দিকে চাহিয়া সে দেখিল, দুইটি প্রশান্ত চক্ষু নির্নিমেষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে । তাহাতে ক্রোধ বা বিরক্তির চিহ্ন মাত্র নাই ।

কমল ধীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আমি কি করব ?"

এই প্রশ্নের মধ্যে কতখানি নির্ভরের ভাব ছিল, মেজাজ ঠিক থাকিলে বাসন্তী তাহা বুঝিতে পারিত । কিন্তু অকারণ ক্রোধে তাহার চিত্ত বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল । সে তীব্রকণ্ঠে কহিল, "যা খুসী ! শুধু 'বাড়ীওয়ালী' 'বাড়ীওয়ালী' বলে আমার মাকে অপমান করবেন না ।"—এই বলিয়া বাসন্তী দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল ।

কিশোরী কে তাহা বুঝিতে কমলের বিলম্ব হয় নাই । তাহার এই

ক্রোধের সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া সে অন্তরে বেশ একটু কৌতুক বোধ করিতেছিল।

বাসন্তী চলিয়া গেলে কমল শিবুকে কহিল "শিবু, দেখ্‌লি তো মেজাজ?"

শিবু কহিল, "বাপরে! এখনই এই! বয়স হ'লে নদের মাকে ছাড়িয়ে উঠবে দেখ্‌ছি।"

নদের মা কমলের বাসপল্লীর একজন খ্যাত্যাপন্না কলহপরায়ণা বিধবা। শিবু তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে ভয় করিত।

এক শ্রেণীর লোক থাকে, যাহারা বিপদেও সহসা বিমূঢ় হয় না। কমল এই প্রকৃতির লোক। বাসন্তীর রূঢ় কথাগুলি শুনিয়া প্রথমে সে একটু দমিয়া গিয়াছিল কিন্তু পর মুহূর্তেই সে আপনার পথ ঠিক করিয়া লইল। পরদিন প্রাতঃকালে প্রভু-ভৃত্যে পরামর্শ করিয়া একটা ষ্টোভ, রন্ধনের জন্য আবশ্যক পাত্র ও আহারের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিল। কমল নিজ হাতে ষ্টোভ ধরাইয়া দিল, শিবু পরম উৎসাহে রন্ধন আরম্ভ করিল। ব্যঞ্জন যাহা প্রস্তুত হইল, সে অতি চমৎকার! তরকারিতে নুন দেওয়া হয় নাই, মাছের ঝোলে হলুদের দুর্গন্ধ, ভাতের অর্দ্ধেক চাল ও অর্দ্ধেক পোড়া। এই অপূর্ব ব্যঞ্জন সহযোগে যখন উভয়ের আহার সমাপ্ত হইল, তখন কমল কহিল, "দ্যাখ্‌ শিবু, আমরা এখনও ভাল রান্না শিখিনি। একখানা পাকপ্রণালী কিনে আনা যাক।"

"সেটা কি?"

"একখানা বই। কেমন করে রান্না করতে হয়, সব সে বইতে লেখা আছে।"

"তা বেশ, তুমি পড়ে মানে করে দেবে, আমি রাঁধব।"

যুক্তি যখন স্থির হইল, তখন আর কার্য্য আরম্ভ হইতে বিলম্ব হইল না। বৈকালে কলেজ হইতে ফিরিবার পথে কমল প্রকাণ্ড একখানা পাক-প্রণালী কিনিয়া আনিল এবং রাত্রে পাকপ্রণালীর লিখিত নীতি অনুসারে রন্ধন আরম্ভ হইয়া গেল! ব্যগ্রতার সহিত আহারে বসিয়া উভয়ে যখন দেখিল যে, মোগলাই চচ্চড়ি বিস্বাদ ও মাছের কাবাব একেবারে অখাদ্য হইয়াছে, তখন কমল বলিল, "একটা বড় ভুল হয়েছে শিবু, নিক্তি কেনা হয়নি। ওজন না ক'রে মশলা দেওয়া হ'য়েছে ব'লে এই রকম হ'য়েছে, নইলে হ'ত ঠিক, কি বলিস?"

আপনার অক্ষমতার দোষ একেবারে নিক্তির উপর গিয়া পড়িল দেখিয়া শিবু আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "তাই হবে। নিক্তির ওজনে মশলা দিলে বোধ হয় রান্নাটা ভাল হ'ত।"

৩

সেদিন সন্ধ্যায় কমলের সহিত সেই অপূর্ব পরিচয়ের পর বাসন্তী একটা কথা ভাবিতেছিল। এতগুলি কটুকথা একটা পুরুষ লোক কেমন করিয়া নীরবে সহ্য করিল! বাসন্তী যখন উপরে কমলের আহ্বানের উত্তর দিতে আসিতেছিল, তখন সে প্রত্যুত্তরের আশাই করিয়াছিল; একটা কলেজের ছেলে যে এরূপ করিয়া নীরবে তাহার উগ্রকথাগুলি শুনিয়া যাইবে, একটা কথা জবাব দিবে না, এ ধারণা সে মোটেই করিতে পারে নাই। নীচের ঘরে আসিয়া এই কথাটাই তাহার বারবার মনে জাগিতে লাগিল। নূতন ভাড়াটিয়ার যে চিত্র সে মনে মনে আঁকিয়াছিল, কমলের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর সে প্রত্যক্ষ ও কল্পনাতে তাহার কোনরূপ সাদৃশ্য দেখিতে পাইল না।

কাল রাত্রে জননীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে যখন বাসন্তী কমলের আহারাদির কথা তুলিল, তখন জননী বলিলেন, "বেচারা যখন আমাদের বাড়ীতে এসেছে, তখন তার সুবিধা অসুবিধা আমাদের দেখা উচিত। আমরা নিজে কিছু না করতে পারি, উপদেশটা তো দিতে পারি। ভদ্রলোকের ছেলে আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও কিছু করেনি, তার খোঁজখবর না নেওয়া আমাদের পক্ষে অন্যায় হবে বাসি।"

বাসন্তী মায়ের কথার যৌক্তিকতা অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। আজ তাই সকালে সে সিঁড়ি দিয়া উপরে নূতন ভাড়াটিয়ার তত্ত্বাবধান করিতে যাইতেছিল, পথে দেখিল শিবু নামিয়া আসিতেছে। এদিক দিয়া তাহাদের যাতায়াতের পথ নয় একথা শিবু বেশ জানিত—তবুও এপথে সে কোথায় যাইতেছে জানিতে কৌতূহলী হইয়া বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিল, "এপথে কোথায়?"

শিবু বাসন্তীর সেদিনকার মূর্তি ভুলিতে পারে নাই—থতমত খাইয়া কহিল, "মা ঠাকরুণের কাছে যাচ্ছি।"

বাসন্তী একবার শিবুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "এস আমার সঙ্গে।"

নীচে যেখানে বাসন্তীর মাতা রন্ধনের আয়োজন করিতেছিলেন, বাসন্তী শিবুকে সঙ্গে করিয়া সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। বাসন্তীর মাতা শিবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা কিছু হচ্ছে না তো?"

শিবু কহিল, "একটু অসুবিধা হচ্ছে। তাই আপনার কাছে এসেছি।"

"কিসের অসুবিধা?"

"এই রান্নাটা ভাল হচ্ছে না। সেই জন্যে একটা নিক্তি চাইতে এসেছি।"

মাতাপুত্রী এই নিক্তির সহিত রন্ধনের কোন সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া শিবুর মুখের দিকে চাহিলেন।

সে কহিল; "দাদাবাবু একখানা বই কিনে এনেছেন, আমি সেই বই দেখে

রাঁধি। দাদাবাবু বললেন, নিক্তির ওজন মত মশলা দেওয়া হচ্ছে না ব'লে রান্না ভাল হচ্ছে না। তাই বোধ হয় সকালে উঠে তিনি নিক্তি কিনতে বেরিয়ে গেছেন, তাঁর আসতে দেরী হলে কলেজের দেরী হবে ব'লে আমি নিক্তি খুঁজতে এসেছি। আপনার নিক্তিটা যদি—"

বাসন্তী বহুকষ্টে এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, কিন্তু আর থাকিতে না পারিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। বাসন্তীর মাতা কন্যার এই উদ্দাম হাসি লক্ষ্য না করিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, "নিক্তির ওজনে কি রান্না ভাল হয় বাবা রান্না শিখতে হয়। তোমরা বুঝি কেউ রাঁধতে জান না?"

বাসন্তীর হাসি দেখিয়া শিবু একটু দমিয়া গিয়াছিল, তাহার মায়ের স্নেহস্বর শুনিয়া সে আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "আমি জানি, দাদাবাবু কিছুই জানেন না।"

বাসন্তী আবার হাসিয়া উঠিল। রন্ধনবিদ্যায় যাহার নিক্তির প্রয়োজন হয়, তাহার জানার দৌড় যে কতদূর, তাহা বাসন্তীর বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তবুও তাহার জ্ঞানের অভিমান দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা বাসন্তীর পক্ষে শক্ত হইয়া উঠিল।

বাসন্তীর মাতা শিবুর বিব্রত মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দেখ, তোমরা যদি কিছু মনে না কর, তা হ'লে আমি একদিন রেঁধে তোমাদের দেখিয়ে দিই।"

পরম উৎসাহে শিবু কহিল, "আজ্ঞে মাঠাকরুণ, তা হ'লে খেয়ে বাঁচি। দাদাবাবু—"

সহসা বাসন্তী ধীরকণ্ঠে কহিল, "না মা থাক্, তার দরকার নেই। আমি নিক্তি এনে দিচ্ছি।"—বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। এই অপরিচিত ভাড়াটিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার ইচ্ছা বাসন্তীর আদৌ ছিল না। তাহার মা যে উপযাচিকা হইয়া একজনকে রাঁধিয়া দিবেন, এ তাহার সহ্য হইতেছিল না। কমল যদি নিজে বলিত, সে কথা স্বতন্ত্র কিন্তু একটা চাকরের কথা শুনিয়া—ছিঃ!

একদিকে ভ্রান্ত আত্মমর্য্যাদা, অন্যদিকে বাৎসল্য, স্নেহ ও করুণা উভয়ে স্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। বাসন্তীর স্কুল কয়েক দিন বন্ধ। দ্বিপ্রহরে সেলাইয়ের কল সম্মুখে করিয়া বাসন্তীর মাতা মেয়েকে বলিলেন, "ওদের রেঁধে দিলে তোর কি ক্ষতি হ'ত বাসি?"

"ক্ষতি আবার কি? তুমি যাকে-তাকে কেন রেঁধে দিতে যাবে শুনি? সে কি তোমার কাছে খাবার চেয়েছে?"

"ভদ্রলোকের ছেলে, সে কি মুখ ফুটে তোর কাছে চাইতে আসবে? তার চাকর বলেছে সেই ঢের। কি রকম খাবার কষ্টটা তারা পাচ্ছে ভাব্ তো! রান্নার কিছু জানে না, নিক্তির মাপে রাঁধতে চায়। কি ছাই ভস্ম

বেচারা খাচ্ছে কে জানে?"—বলিয়া মাতা একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বাসন্তী চুপ করিয়া রহিল, আজ যতবার নিন্তির কথা মনে হইয়াছে, ততবারই সে হাসি রোধ করিতে পারে নাই। মায়ের কথা শুনিয়া তাহার আর হাসি আসিল না। সে খোঁপা ঠিক করিতে করিতে অন্য ঘরে উঠিয়া গেল।

বেলা বারোটার সময় যখন কমল ফিরিয়া আসিল, তখন শিবু দেখিল, কমলের হাতে নিন্তির পরিবর্তে একটা টেরিয়ার কুকুর। ছোট সাদা কুকুরটি; ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লোম, দু'টি চক্ষু নীল। কমল বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল, পথে কুকুরটি ৫০ টাকা দিয়া কিনিয়া আনিয়াছে। কুকুর জাতিটাকে কমল অত্যন্ত ভালবাসিত, বাড়ীতে তাহার একপাল কুকুর। কুকুরের ছানা দেখিয়া শিবু অত্যন্ত খুসী হইল। একবার তাহার মুখে চুমা খায়, একবার কুকুরটিকে কোলে করিয়া বসে, এইরূপে সে কুকুরছানাকে আদর করিতে লাগিল। নিন্তি দেখিয়া কমল কহিল, "শিবু নিন্তি কোথায় পেলি?"

"সেই ঠাকরুণেরর কাছ থেকে নিয়ে এসেছি।"

কমল এই ঠাকুরাণীটি কে বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার কথা বলছিস্ শিবু?"

"এরি মধ্যে ভুলে গেছ, সেই যিনি সেদিন তোমাকে ধমকে গেলেন।"

"ওঃ! সেখানে কেন গেছলি তুই। সে মেয়েটা আমাকে একেবারে দু'চক্ষের বিষ দেখে। আমি যে কি ক'রেছি তার বুঝতে পারিনে।"

একথাটা বলিবার বিশেষ কোন হেতু কমলের ছিল না; নিতান্ত উত্তেজনার মুখেই সে এই কথা বলিয়া ফেলিল, কিন্তু ইহা আর একজনের অন্তরে যে বিপ্লব উপস্থিত করিল, কমলের তাহা জানিবার উপায় রহিল না। মায়ের কথায় অনুতপ্ত হইয়া বাসন্তী নূতন ভাড়াটিয়ার আহারের বন্দোবস্ত দেখিতে উপরের দিকে আসিতেছিল। সহসা সিঁড়ির মধ্যপথে এই কথা শুনিয়াই সে চমকিয়া উঠিল। এতখানি সে কল্পনা করিতে পারে নাই। সে দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে চলিয়া গেল।

চক্ষুঃশূল। এই কথাটাই সে ভুলিতে পারিতেছিল না। কেন? এমন কি দুর্ব্যবহার তার সঙ্গে করিয়াছে? সেই দিনকার সেই ঘটনা—তাহাতে অন্যায় কি হইয়াছে? সে তো সত্য কথা বলিয়াছে। বেশ, যদি তিনি এইরূপ মনে করিয়াই থাকেন ভালই। সে দেখাইবে যে সত্যই তিনি তাহার চক্ষুশূল—সে তাহাকে দেখিতে পারে না। এখন হইতে তাহাকে বিশেষ করিয়া অবহেলা করিবে।

কমলকে বিশেষ করিয়া তুচ্ছ করিবার অভিপ্রায়েই বাসন্তী সেদিন সন্ধ্যাকালে ছাদে বেড়াইতে গেল। তেতলায় ভাড়াটিয়া আসিবার পর সে আর

কোন দিন ছাদে যায় নাই। আজ সে আপনাকে অত্যন্ত দৃঢ় করিয়া ছাদের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল। ছাদে কেহ ছিল না। ঘরের জানালা খোলা, কমল শয্যায় বসিয়া এস্রাজ বাজাইতেছিল, পৃথিবীর সকল বাদ্যযন্ত্রকে অবহেলা করিয়া সে আশৈশব এই যন্ত্রটিকেই অভ্যাস করিয়া আসিয়াছে, এস্রাজ বাজিতেছিল চমৎকার! বাসন্তী চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া সহসা থামিয়া গেল। পূরবীর অন্তরটা না শুনিয়া যাওয়া চলে না। সে যেন কিছুই শুনিতেছে না এইরূপভাবে রাস্তার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এস্রাজ আর থামে না, এরূপভাবে দাঁড়াইয়া থাকাও কষ্টকর। সহসা পায়ে একটা কোমল স্পর্শ অনুভব করিয়া সে মুখ ফিরাইল। দেখিল কুকুরের ছানাটা তাহার পা চাটিতেছে। অজ্ঞাতসারে কুকুরটাকে সে বুকে তুলিয়া লইল। সুন্দর কুকুর! কেমন চোখ! ছোট মুখখানি, পরিষ্কার দাঁতগুলি! হঠাৎ পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, কমল তাহার সম্মুখে পাঁচ ছয় হাত দূরে দাঁড়াইয়া। বাসন্তীর মুখ লজ্জায় ও ক্ষোভে লাল হইয়া উঠিল। সে কমলের কুকুরছানাকে আদর করিতেছে। তেতলার ভাড়াটিয়াকে অবহেলা করিতে আসিয়া তাহারই কুকুরকে আদর করা চোখে কেমন ঠেকে। বাসন্তী কুকুরছানাকে কোল হইতে ছাদে ফেলিয়া দিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। বেচারা আর্তনাদ করিয়া উঠিল, বাসন্তী ফিরিয়াও চাহিল না। এই কুকুরটাই যত অনর্থের মূল। সেই তাহার এই দুর্বলতা ধরাইয়া দিয়াছে। তাহার যত ক্রোধ যাইয়া পড়িল নিরীহ পশুটার উপর।

কুকুরের আর্তনাদ শুনিয়া কমল তাহাকে তুলিয়া লইল না। সে বাসন্তীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সহসা বাসন্তী চলিয়া গেলে কুকুরটাকে তুলিয়া লইয়া সে ঘরে চলিয়া গেল।

৪

কমল সহসা অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে। আজ কলেজ কামাই করিয়া সে চেয়ারে বসিয়া কি ভাবিতেছিল। শিবু ঘরের কোণে মাদুর বিছাইয়া নাসিকা ধ্বনি করিতেছিল। জো (কুকুরটির নূতন নাম) ঘরে নাই। স্তব্ধ দ্বিপ্রহর! দূরে হর্ম্যরাজি মূর্তিমান গাম্ভীর্যের মত দাঁড়াইয়াছে। আকাশের কোলে ফাল্গুনের মেঘখণ্ড চঞ্চল শিশুর মত ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কমল সেইদিকে চাহিয়া ছিল।

"আপনারা কি আমাদের বাড়ীতে টিকতে দেবেন না?"

ক্ষতস্থানে আঘাত করিলে আহত ব্যক্তি যেরূপ চমকাইয়া উঠে, বাসন্তীর এই কথা শুনিয়া কমল তেমনি করিয়া উঠিল—"আমাকে বলছেন?"

"হাঁ, আপনি জানেন না?"

কমল স্তম্ভিত হইয়া গেল। কি হইয়াছে? কমলকে জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ না দিয়াই বাসন্তী তীব্রস্বরে কহিল, "কাল মার একাদশী গেছে, আজ এখন দু'টি খেতে বসেছিলেন, আপনার কুকুর গিয়ে ছুঁয়ে তাঁর খাওয়া নষ্ট করে দিলে। যদি কুকুরকে ঠিক না রাখতে পারেন তবে তাকে পুষে পাড়া-শুদ্ধ লোকজনকে জ্বালাতন করবার কি দরকার?"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া বাসন্তী ফিরিয়া চলিল। খানিকটা গিয়াই কি মনে করিয়া আবার ফিরিল, কিন্তু এবার আর কিছু বলা হইল না, দেখিল, কমল একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, তাহার চক্ষু দুটি ছলছল করিতেছে। বাসন্তী সহসা চমকাইয়া উঠিয়া টলিতে টলিতে চলিয়া গেল। এ কি বলিল সে! এমন শক্ত কথা বলিবার তো তার অভিপ্রায় ছিল না। সে শুধু ব্যাপারটা জানাইয়া কুকুরস্বামীকে সাবধান করিতে আসিয়াছিল। এমন কথা কেন সে বলিল? তাঁর কি অপরাধ? তিনি ত কুকুরকে শিখাইয়া দেন নাই—ভাবিতে ভাবিতে তাহার নিজের উপর ঘৃণা জন্মিয়া গেল! ক্ষমা চাওয়া—সে বড় লজ্জার কথা। যাক্ যাহা হইবার হইয়াছে। এখন হইতে সাবধান হইয়া চলিলেই হইবে।

কিছুকাল পরে শিবু আসিয়া বাসন্তীর মাতাকে জানাইল যে, কমল তাহার সহিত দেখা করিতে চায়।

"চল, যাচ্ছি"—বলিয়া তিনি হাতের কাজ ছাড়িয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই শিবু কহিল, "বাবু নিজেই আসবেন। আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে পাঠিয়েছেন।"

এতবড় গুরুতর কি কাজ যে কমল স্বয়ং তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বৃদ্ধা কহিলেন, "তা এখানে আসতে তাঁর আবার জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন? তিনি আমার ছেলের মত। যখন ইচ্ছা হবে, তখনই আসবেন।"

কমল আসিতেই তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া কহিলেন, "বস, বাবা বস।" তাঁহার স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বরে বিরক্তির লেশ মাত্র ছিল না।

কমল চৌকিতে বসিয়া চুপ করিয়া রহিল। যে কথা সে বলিতে আসিয়াছিল, বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা বলিবার মত করিয়া গুছাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

বৃদ্ধা কমলের এই ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তোমার খাওয়া দাওয়া কেমন হ'চ্ছে বাবা?"

কমল শুধু সংক্ষেপে কহিল, "ভালই।"

বৃদ্ধা আবার কহিলেন, "তোমার কোন অসুবিধা হ'চ্ছে না তো?"

কমল সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, "আমার কুকুরটার—"

"হাঁ দিব্যি কুকুরটি—কোথায় পেলে বাবা?"

"কিনে এনেছি। কুকুরটা আপনার খাওয়া নষ্ট করেছে শুনে আমার বড় কষ্ট হয়েছে।"

"একথা কে বললে? বাসি বুঝি? তুচ্ছ কথা, তাই তুমি ভাবছ? আমার শরীরটা ভাল ছিল না। তাই যাইনি। এই কথা বলতে এসেছ?"

কমল যতক্ষণ উত্তর খুঁজিতেছিল, বৃদ্ধা ততক্ষণে কমলের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। কমল ধীরে ধীরে কহিল, "আমি তবে এখন আসি।"

"মাঝে মাঝে এস বাবা। এ তোমার নিজের বাড়ী মনে ক'র। হ্যাঁ বাবা, তোমার মা আছেন?"

"আছেন।"

মাতৃক্রোড়বিচ্যুত প্রবাসী কমলের কাণে এ প্রশ্ন ঠিক মায়ের কথার মতই শুনাইল। সে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর জানাইল।

বৃদ্ধা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তিনি বোধ হয় আমাদের বয়সী?"

বৃদ্ধার সহসা এরূপ অনুমানের কারণ কি কমল বুঝিতে পারিল না; কহিল "হ্যাঁ! আমি এখন যাই আবার আসব।"

৫

অত্যন্ত আঘাত পাইলে সদানন্দ ব্যক্তিও যেরূপ সহসা বিমর্ষ ও গম্ভীর হইয়া যায়, বাসন্তীও সহসা সেইরূপ গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক দিন হইতে মাতা তাহার এই ভাবটা লক্ষ্য করিতেছিলেন। একদিন কহিলেন, "তোর আর ইস্কুলে যেয়ে কাজ নেই বাসি, ঘরে ব'সে পড়াশুনা কর্।"

কথাটা শুনিয়া বাসন্তী যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়া মা'কে কতকগুলি শক্ত কথা শুনাইয়া দিল। সেই হইতে জননী তাহার পড়াশুনা সম্বন্ধে কোনরূপ কথা বলা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার মেজাজ এরূপ ছিল না। আজকাল সকল কথাতেই সে উগ্র হইয়া উঠে কেন—না বুঝিতে পারিয়া জননী বিশেষ ভীত হইয়া পড়িলেন।

সেদিন সে গাড়ী হইতে নামিয়া সিঁড়িতে পা দিতেই জো তাহার কাপড় কামড়াইয়া ধরিল। সেইদিন সেই ছাদে সাক্ষাৎ হইবার পর আর সে কুকুরটাকে দেখে নাই। নানা কারণে কুকুরটার উপর সে মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। আজ তাহাকে দেখিয়া ক্রোধের বেগ সম্বরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল; সহসা হাতের মোটা ইতিহাসের বহিখানি কুকুরের মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। আদরের পরিবর্তে দারুণ প্রহার লাভ করিয়া বেচারা আর্তনাদ করিতে করিতে তেতলার দিকে ছুটিল। মাতা সিঁড়ির উপর হইতে কন্যার এই অপূর্ব আচরণ লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "ওকে মারলি কেন?"

"বেশ করেছি! আমার খুসী।"

এত উচ্চকণ্ঠে মায়ের কথার উত্তর দিল যে, সে কথা তেতলার ভাড়াটিয়ার শ্রবণ পর্য্যন্ত এড়াইল না। কমল কলেজের ছুটীর পর বাসায় আসিয়া ছাদে বেড়াইতেছিল। সহসা জো'র কাতর আর্তনাদ শুনিয়া রেলিংএর উপর দিয়া নীচের দিকে চাহিতেই বাসন্তীর কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইল। কথা বলিয়াই কেহ শুনিল কিনা দেখিবার জন্য উপরে চাহিতেই দেখিল, কমলের বিষন্ন চক্ষু তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে মুখ ফিরাইয়া পূর্ব্বৎ উচ্চকণ্ঠে কহিল, "যেমন পাজি কুকুর, তেমনি মুগুর হওয়া চাইতো।" যাহাকে শুনাইবার জন্য এই কথা বলা, সে শুনিল কিন্তু কোন জবাব দিল না।

বাসন্তীর অদ্ভুত ব্যবহারে কমল ক্রমেই বিরক্ত ও বিব্রত হইয়া উঠিতেছিল। কুকুরটাকে সে অতিমাত্রায় ভালবাসিত। তাহার এই অন্যায় শাস্তি তাহাকে অত্যন্ত আঘাত করিল। কাহারও সহিত বাদানুবাদ করা তাহার স্বভাব ছিল না বলিয়া সে কিছু বলিল না। কি ভাবিয়া সে সহসা কুকুরটার উপরেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

শিবু আসিয়া দেখিল, কমল জো'কে প্রহার করিতেছে।

"ওকে মারছ কেন দাদাবাবু?"

"ও নীচে যায় কেন?"

নীচে যাওয়াতে তাহার কি অপরাধ হইয়াছে, শিবু স্থির করিতে পারিল না।

সেদিনকার এই ঘটনার পর হইতে কমল এত গম্ভীর হইয়া পড়িল যে, তাহা বাসন্তীরও চক্ষু এড়াইল না। গাম্ভীর্য্য তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে—এ কথাটা অল্পদিনের পরিচয়েই সকলে বুঝিতে পারিয়াছিল।

৬

সেদিন কমল খবরের কাগজখানা শেষ করিয়া রাখিয়া দিতেই শিবু কহিল, "দাদাবাবু, চল একবার তীর্থ করে আসি।"

কমল হাসিয়া কহিল, "সে কিরে? এই শীত, এখন যাব কোথায়?"

"এই কাছেই গঙ্গাসাগর।"

তখন শিবু সকল কথা খুলিয়া বলিল। তার পুরাতন বন্ধু শ্রীদাম মুদি গঙ্গাসাগর যাইবার অভিপ্রায়ে কলিকাতা আসিয়াছে। সে শিবুকে সঙ্গে লইতে চাহে। শিবুরও অত্যন্ত ইচ্ছা, সে গঙ্গাসাগরে স্নান করিয়া আসে। কিন্তু দাদাবাবুর অসুবিধা হইবে বলিয়া সে যাইতে নারাজ। যদি দাদাবাবু সঙ্গে যায়, তবে সে যাইতে পারে। কমল শিবুর সকল কথা চুপ করিয়া

শুনিল, তারপর কহিল, 'আমার যাওয়া হয় না শিবু, পরীক্ষার ফিস্ দিতে হবে, তুই যা।''

"সে হয় না দাদাবাবু, তোমাকে একলা রেখে।"

"আমার জন্যে তোর ভাবতে হবে না শিবু, দিন সাতেক আমি নিজেই চালিয়ে নিতে পারব।"

শিবুর অনেক আপত্তি সত্ত্বেও কমল টলিল না। অগত্যা শিবু কহিল, "আমি তবে জেলেপাড়ার রাম ঠাকুরকে বলে আসি, সে তোমাকে রোজ দু' বেলা রেঁধে দিয়ে যাবে। আর মুখি ঝি বাসন মেজে ঘর সাফ ক'রে দিয়ে যাবে।"

কমল কহিল, "আচ্ছা।"

সন্ধ্যাকালে শিবু কমলের ঝি ও ঠাকুর ঠিক করিয়া আসিল।

যাত্রার পূর্বে শিবু কমলকে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া কহিল, "এ ক'টা দিন আর রাত জেগে পড়াশুনা কোরো না, অসুখ বিসুখ হ'য়ে পড়বে। আমি শিগ্‌গীর ফিরে আসব। আর কুকুরটাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখ, নইলে বাড়ীময় সে আমাকে খুঁজে বেড়াবে।"

যাইবার সময় প্রণাম করিতেই কমল কহিল, "সাবধানে থাকিস শিবু, সেখানে বড় কলেরা হয়। আর টাকাকড়ি কিছু বেশী নিয়ে যাস্।"

শিবু কহিল, "তোমার কিছু ভাবতে হবে না, আমি সোমবারেই ফিরে আসব। আর দেখ, গয়লাকে টাকা দিও না, আমি এসে দেব। এবার বেটা কেবল জল দিয়েছে, দুধ দেয়নি।"

পরদিন রাম ঠাকুরের প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন মুখে দিয়াই কমল আসন ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, "তোমার আর আসবার দরকার হবে না ঠাকুর। আমি নিজেই দু'টি রেঁধে নেব। শিবু এলে তোমার একদিনের মাইনে নিয়ে যেও।"

৭

আজ এক সপ্তাহ পরে বাসন্তী ছাদে বেড়াইতে আসিয়াছে। কুকুরকে মারিবার পর হইতে আর বাসন্তীর সহিত কমলের সাক্ষাৎ হয় নাই। কুকুরকে মারিয়া বাসন্তী অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছিল। ততোধিক অনুতপ্ত হইয়াছিল কমলের উদ্দেশে সেই কটু কথাগুলি বলিয়া। ইচ্ছা করিয়া সে কমলকে তিরস্কার করে নাই। কমলের সহিত তাহার কোন শত্রুতা নাই অথচ শক্ত কথা বলিবার অভিপ্রায় না থাকিলেও কথাগুলি যেন আপনিই বাহির হইয়া পড়ে। একজনকে অনবরত আঘাত করিলেও সে যদি আঘাত না করে, তবে আর তাহাকে আঘাত করিবার প্রবৃত্তি থাকে না, প্রথমে বাসন্তী কমলের প্রতি এই আক্রমণের যে কোনরূপ একটি উত্তরের প্রত্যাশা করিয়াছিল।

কিন্তু যখন দেখিল, সপ্তাহ অতীত হয় এবং কমল সম্পূর্ণ উদাসীন তখন কতকটা কৌতূহলে, কতকটা বা মনের তাড়নায় সে ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। কমলের প্রতি কটূক্তি করিয়া অবধি একটা দিন তাহার কিরূপে কাটিয়াছে, তাহা অন্তর্যামী জানেন। কমল যদি পাল্টা জবাব দিত, তাহা হইলে দুঃখের কোন কারণ ছিল না। কিন্তু এ অদ্ভুত লোকটা কেবল আহত হইয়া দূরে সরিয়া যায়, আক্রমণ করে না। ইহার সহিত তো যুদ্ধ চলে না।

ছাদে কেহ নাই। ঘর অন্ধকার। ছাদের এককোণে একটা ক্ষুদ্র শুভ্র বস্ত্রস্তূপের মত জো কুণ্ডলী করিয়া শুইয়া আছে। কমল গেল কোথায়? বাসন্তীর ইচ্ছা হইতে লাগিল, একবার এই নির্বোধ পশুটাকে ডাকিয়া সে তাহার প্রভুর কথা জিজ্ঞাসা করে। এই কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আপনার দুর্বলতা অনুমান করিয়া তাহার চিত্ত আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। একবার ইচ্ছা হইল কুকুরটাকে কাছে ডাকিয়া আদর করে। আজ তো কুকুরটা সেই প্রথম দিনকার মত তাহার কাছে আসিতেছে না। বাসন্তী বুঝিল, সেই দিন তাহার নিকট হইতে প্রহার লাভ করিয়া অবধি আর নীচে নামে নাই। এই পশুগুলা—এরাও ভাল মন্দ বোঝে। সন্ধ্যার এই নির্জনতা ক্রমে তাহার দুর্বহ হইয়া উঠিতেছিল। কমলের ঘরখানা যেন তাহার প্রতি অভিমানে নীরব হইয়া আছে। কুকুরটা অভিমান করিয়া এক কোণে পড়িয়া আছে; ক্রমে মনে হইল, সমস্ত বাড়ীটা যেন তাহার অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বসিয়া আছে।

বাসন্তী অধৈর্য্য হইয়া একবার ডাকিল "জো"? জো লেজ নাড়িতে নাড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইল। পুলকিত হইয়া বাসন্তী আবার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। জো দু'পা অগ্রসর হইতেই ঘরের ভিতর একটি কণ্ঠ হইতে শব্দ উঠিল "জো, এদিকে আয়।"

কুকুর একলম্ফ প্রদান করিয়া চলিল। বাসন্তী নির্বাক। কমল যে এমন করিয়া আঘাত করিতে পারে, তাহা সে ধারণা করিতে পারে নাই। এ আঘাতের বেদনা সহ্য করিবার শক্তি তাহার ছিল না; তাহার দু'টি চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

"কেন, আমি কি করেছি?"—প্রাণপণ শক্তিতে এই কথা কয়টি বলিতে চেষ্টা করিয়াই সে চলিয়া গেল। মরণোন্মুখ ব্যক্তির অস্ফুট আর্তনাদের মত জড়িতকণ্ঠের কথাগুলির ভাব কমল গ্রহণ করিতে পারিল না।

৮

সন্ধ্যার এই সামান্য ঘটনাটা বাসন্তীর ব্যবহারের এমন পরিবর্তন আনিয়া দিল যে, তাহা বন্ধুরও চক্ষু এড়াইল না। সকাল হইতে সে বিমর্ষ হইয়া বসিয়া আছে, স্কুলের গাড়ী আসিয়া ফিরিয়া গেল, বেলফুল শ্বশুরবাড়ী

যাইবে, দেখা করিতে আসিয়াছিল ; বাসন্তী তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না। মাসিকপত্রের টাকা আদায় করিতে আসিয়া চাপরাসী ধমক খাইয়া গেল। চক্ষের জলও যে একটু না পড়িয়াছিল এমন নহে। কাল কমলের দুটি কথাতেই সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে তাহার অভিমান কতখানি। সেই দুইটি কথাতেই সে কমলের ব্যথাতুর হৃদয়টাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছে।

এতদিন কমলকে সে ক্রমাগত যে আঘাত করিয়া আসিয়াছে, তাহার অসহ্য বেদনা কমল দু'টি কথাতেই তাহাকে জানাইয়া দিয়াছে। আত্মগ্লানিতে বাসন্তীর সমস্ত অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছিল, ক্ষমা চাহিলে বোধ হয় এ জ্বালার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু সে অতি লজ্জার কথা। ছি!—আবার হঠাৎ মনে হইল, এত ভাবনা কিসের—কোথাকার কে ঠিক নাই, ঘর ভাড়া করিয়া আছে মাত্র, তাহার জন্য দিন রাত এ কি চিন্তা ? দূর হোক্ ছাই, আর না ভাবিলেই হইবে। তেতলায় যে কেহ আছে, এ কথা আর এখন হইতে মনে করা হইবে না। কিন্তু মনও যেন শত্রুতা করিয়া বসিয়া আছে, সে তাহাকে কিছুতেই ভুলিবে না।

মুখি ঝি নীচে নামিয়া আসিতেছিল, গৃহিণী এই নূতন স্ত্রীলোকটাকে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কে গা ?"

"আমি তেতলার ঝি।"

অপরিচিতা নারীকণ্ঠের আভাস পাইয়া বাসন্তী বাহিরে আসিয়া মায়ের পার্শ্বে দাঁড়াইল।

"সে চাকরটা গেল কোথায় ?"

"তিনি তীর্থ করতে গঙ্গাসাগরে গেছে।"

"তোমাদের বাবুর রাঁধে বাড়ে কে ?"

"সে দুঃখের কথা আর ব'লো না মা। এক পোড়ামুখো ঠাকুর এসেছিল ; তার একদিনের রান্না খেয়ে বাবু তাকে বিদায় ক'রে দিলেন। এখন একবেলা নিজে রেঁধে দু'বেলা খাচ্ছেন। আর সে কি রান্না মা-ঠাক্‌রুণ। মাছের ঝোল জলের মত, ভাত আধসিদ্ধ, নিজে একমুঠো কোন দিন খেলেন তো ভাল, তা নইলে ঐ হতভাগা কুকুরটা খায়। কোন্ ভাগ্যমানীর ছেলে মা, হাত পুড়িয়ে তো কোন দিন এ সব শিখতে হয়নি, জানবেন কোত্থেকে ? আর দিন রাত পড়া। আর বলো তো মা, সইবে কেমন করে—ওই তো শরীর। কাল মাথা ধ'রে পড়েছিলেন ; রাত্রে কিছু খান নি। আজ সকালে শুধু একটু দুধ খাবেন বললেন, কত মাথার দিব্যি দিলাম, তবু সেই কথা, 'একটু দুধ খাব, আর কিছু খাব না।' তাই কুকুরের জন্যে হোটেল থেকে ভাত আনতে যাচ্ছি। এ বাড়ী বুঝি তোমাদের, না ?"

বাসন্তী এতক্ষণ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ঝি'র কথা শুনিতেছিল, নিঃশ্বাস

ফেলিলে যদি কেহ শুনিতে পায়। বৃদ্ধা কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "শুনলি বাসি? এখন আমি কি করব বলে দে। আমার চোখের উপর ছেলেটা না খেয়ে মরবে, তাই কি আমাকে দেখতে হবে? বল্, আমার সহ্য হয় না, জবাব দে।"

জবাব দেবার মত তাহার কিছু ছিল না, শুধু কহিল, "জানিনে মা, যা ভাল হয় কর।" কথাটা বলিয়া একটু চুপ করিয়াই সে কহিল "না মা, দরকার নেই, তুমি কখখনো ভাত রেঁধে দিতে পারবে না। তা যদি কর, তাহ'লে—"

বৃদ্ধা জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তাহ'লে—কি?"

'তাহ'লে—না মা—তুমি কোরো না বলছি—কিছুতে না।"

"বেশ তাহ'লে তুমি এ বাড়ী-ঘর নিয়ে থাক, আমি বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাই।"—বলিয়া বৃদ্ধা ক্রোধভরে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

বাসন্তী বিমূঢ় হইয়া দেয়াল ধরিয়া তেতলার সিঁড়ির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইতেছিল দু'হাতে এই উদ্ধত মনটাকে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। এ অদৃশ্য বস্তুটি মুহূর্তে কোমল এবং পরমুহূর্তে কঠোর হইয়া উঠে কেন, তাহা বাসন্তী নিজেই বুঝিতে না পারিয়া নিষ্ফল ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল।

৯

সেদিন দ্বিপ্রহরে মাতা-পুত্রীতে যে কথা হইল, তাহাতে বৃদ্ধা একটু শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। মাতা কর গুণিয়া একাদশীর দিন ঠিক করিতে-ছিলেন, বাসন্তী ধীরে ধীরে তাঁহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মা তুমি রাগ করেছ?"

সকল কাজেই বাধা পাইয়া মায়ের অন্তর তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কন্যার এই মৃদু কোমল কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহার সকল অভিমান মুহূর্তে দূর হইয়া গেল; কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "রাগ করব কেন মা?"

মায়ের আদরে বাসন্তী কাঁদিয়া ফেলিল। এতদিন ধরিয়া যে অশ্রু ক্রমে ক্রমে অন্তর ভরিয়া উঠিতেছিল, আজ জননীর এই স্নেহের কথায় সে আর বাধা মানিল না।

জননী অশ্রুপাতের কারণ বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, "কেন কাঁদছিস মা?"

"আমার কিছু ভাল লাগে না মা, আমাকে সইয়ের বাড়ীতে রেখে এস।"

"কেন রে? তোর সই চিঠি লিখেছে?"

"না মা। আমি তাকে চিঠি দিয়েছি।"

"তার জবাব আসুক। তার পরে যাস। নিজে যেচে তাদের বাড়ীতে গেলে লোকে বলবে কি?"

মায়ের এই কথায় তাহার সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। সে দ্রুত প্রশ্ন করিল, "তবে তুমি যেচে উপরে গিয়েছিলে কেন?"—তাড়াতাড়ি সে প্রশ্নটি শেষ করিল, পাছে কণ্ঠের কম্পন মায়ের কাণে ধরা পড়ে।

কিন্তু প্রশ্ন করিবার এই কৃত্রিম ভঙ্গীটা মায়ের চক্ষু এড়াইল না। মুহূর্ত নীরব থাকিয়া মাতা কহিলেন, "তাতে কি কোন দোষ হয়েছে বাসি? আমার বাড়ীতে ভদ্রলোকের ছেলে অসুখে পড়ে, তাকে একবার চোখের দেখা দেখাও কি দোষ? ভাত রেঁধে দেওয়া না হয় মস্ত অপরাধ!"

শেষের কথাটির শ্লেষের তীক্ষ্নতা বাসন্তীকে অত্যন্ত বিঁধিল। মায়ের মুখের দিকে না চাহিয়া বাসন্তী উগ্রস্বরে কহিল, "বারে বাবে আমাকে কেন খোঁচা দিচ্ছ। তোমার ইচ্ছা হয় রেঁধে বেড়ে খাওয়াওগে, আমি কালই সইয়ের বাড়ী চলে যাব।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাসন্তী আপনার ঘরে গিয়া বসিল।

মনস্তত্ত্ব নারীজাতির অধীত বিদ্যার মত। কন্যার এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধার পূর্বের সন্দেহ অনেকটা বিশ্বাসে পরিণত হইল, অজ্ঞাত ভয়ের আশঙ্কায় মাতা অধীর হইয়া উঠিলেন।

১০

সাতদিন পরে শিবুর ফিরিবার কথা, আজ বারো দিন হইয়া গেল তাহার উদ্দেশ নাই, কমল অধীর হইয়া গঙ্গাসাগর তীর্থের সকল সেবাশ্রমে শিবুর বর্ণনা দিয়া পত্র দিয়াছে, এ পর্যন্ত একখানিরও জবাব আসে নাই। সম্মুখে পরীক্ষা, সে এক নরমেধ যজ্ঞ। তার পর নিত্য স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করা ক্রমে ক্রমে তাহার সাধ্যের অতীত হইয়া পড়িতেছিল। আজ বিছানায় শুইয়া সে অনেক কথা ভাবিতেছিল। সহসা খোলা জানালা দিয়া ছাদে চাহিতেই সে দেখিতে পাইল, বাসন্তী এলোচুলে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল, একাকী থাকিলেই মন কল্পনাপ্রবণ হইয়া উঠে। এই কয় দিনের নির্জন বাস তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। যাহার সহিত এত দিন কেবলই তাহার মূক সংগ্রাম চলিয়াছে, আজ তাহার সহিত কোনরূপে সন্ধি করিতে পারিলেও সে যেন এই নির্জনতার অত্যাচার হইতে রক্ষা পায় ভাবিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া বাসন্তীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "দেখুন—",

স্বর শুনিয়া বাসন্তী কাঁপিয়া উঠিল। মনের রূপটা পাছে ধরা পড়িয়া যায় ভাবিয়া সে অত্যন্ত শক্ত হইয়া কহিল, "আমাকে বলছেন ?" জিজ্ঞাসা করিল বটে কিন্তু কমলের মুখের দিকে চাহিল না, মুখে যে রক্ত আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেটাও যে গোপন করিবার প্রয়োজন।

"হাঁ! আমার কোন চিঠি এসেছে বলতে পারেন? শিবু অনেক দিন—"

কমলের কথা শেষ না হইতেই বাসন্তী কহিল, "চিঠির খোঁজ আমি রাখিনে, চিঠির বাক্স দেখে আসতে পারেন।"—বলিয়া এত দ্রুত সে চলিয়া গেল যে, কমল আর জবাব দিবার অবকাশ পাইল না।

এতদিন পরে বাসন্তীর ব্যবহার কমলের প্রথম অপমান বলিয়া বোধ হইল ; আজিকার মত সাধিয়া সে কোন দিন এই উগ্র প্রকৃতির মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে নাই। আজ তাহার প্রথম চেষ্টা। আশা ছিল উভয়ের এত দিনকার বিরোধ আজ শেষ হইবে। বাসন্তীর জবাব শুনিয়া কমল দুঃখে স্তম্ভিত হইয়া গেল। শিবুর জন্য তাহার অন্তরে ক্রমে ক্রমে যে উদ্বেগের সৃষ্টি হইতেছিল, সে আশঙ্কার কথা শোনে, এমন লোক তাহার কেহ নাই।

১১

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বাসন্তী কাঁদিয়া ফেলিল। নিত্য এই অন্তর বাহিরের সংগ্রামে চিত্ত তাহার ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িয়াছিল। কোমল নারী-চিত্তে সে ক্ষতের বেদনা সহ্য করিবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু উপায় নাই, চেষ্টার ত্রুটি সে করে নাই, যতবার সে কমলের সহিত সাধারণভাবে কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছে ততবারই তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। মিষ্টকথা বলিলে পাছে কমল ভাবে যে মেয়েটা সাধিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে চাহে, তাই জোর করিয়া সে শক্ত কথা বলিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছে।

বাসন্তীর মাতা সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া চিঠি পড়িতেছিলেন ; বাসন্তী ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তেতলার চিঠি আছে ?"—কথাটা শেষ করিয়াই সে কাঁপিয়া উঠিল।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বললি ?"

বাসন্তী হাঁফ ছাড়িয়া কহিল, "কিছু না মা, কার চিঠি পড়ছ, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।"

"তোর মামার চিঠি। তোকে গিরিডি যেতে লিখেছেন, কবে তোর যাবার সুবিধে হ'বে জানতে চেয়েছেন, এসে নিয়ে যাবেন।"

"তুমি লিখে দাও, আমি কোথাও যেতে পারব না। আমার শরীর ভাল নেই।"

"তোর খেয়াল বুঝবার যো নেই বাসি। সেদিন সইয়ের বাড়ী যাবার জন্যে এত ঝোঁক, আর আজ মামার বাড়ী যেতে সাধাসাধি—"

মায়ের কথা শেষ না হইতেই বাসন্তী রুখিয়া উঠিয়া কহিল, "আমার খুসী, আমি যাব না।"

জননী যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন সহসা বাইরে মূর্চ্ছাতুরের আর্ত-নাদের মত একটা শব্দ শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলেন। "ওকি! বাসি—দ্যাখ্ কে বুঝি পড়ে গেছে!"

বাসন্তী ছুটিয়া গেল, পরক্ষণেই পাংশুমুখে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "একবার বাইরে যাও মা; শিগ্‌গির যাও, দেখ কি হ'ল।"

মূর্চ্ছিত কমল সিঁড়ির উপর পড়িয়া ছিল। চিঠির বাক্স দেখিতে আসিয়া সে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। অনাহার অনিদ্রায় শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি ছিল না, তারপর মায়ের মাথার অসুখটা পত্রে আসিয়া বর্তিয়াছিল। শিবুর জন্য দুশ্চিন্তা, তাহার পর একজামিন, এই সব বিচিত্র কারণ মিলিয়া সহসা মূর্চ্ছা ঘটাইয়াছে। বৃদ্ধা কমলের এই অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া কন্যাকে কহিলেন, "জল নিয়ে আয় রে বাসি, বাঁচল না বুঝি আর"—বাসন্তী জল আনিয়া কমলের পায়ের কাছে রাখিতেই বৃদ্ধা কহিলেন, "মূর্চ্ছা গেছে, মাথায় জল দে।" বাসন্তী কলের পুতুলের মত মূর্চ্ছিতের মাথায় জল ঢালিতে লাগিল।

চোখ মেলিয়া বাসন্তীর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই কমল আবার চোখ বুজিল। এতক্ষণে বিমূঢ়ের মত বাসন্তী কেবল কমলের মাথায় জলই ঢালিতেছিল, আর কিছু তাহার ভাবিবার অবকাশ ছিল না। সহসা কমলের এই চক্ষু বোজার প্রয়াস তাহাদের উভয়ের এই মৌন দ্বন্দ্বের আনুপূর্বিক ইতিহাসটা তাহার মনে জাগাইয়া দিল। নির্দয় উপেক্ষা ও আঘাত আর তাহার বেদনা যে কতখানি, কমলের এই ব্যবহারটাকে বাসন্তী বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল।

১২

ডাক্তার আসিয়া নাড়ী ও বুক পরীক্ষা করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন "টাই-ফয়েড, এর আত্মীয়স্বজন যদি কেউ থাকে—খবর দিন।"

বৃদ্ধা কহিলেন—"বাড়ী-ঘর কোথায় তা তো জানি না ডাক্তারবাবু।"

"চিঠিপত্র খুঁজে বাড়ীতে একটা তার করে দিন। বিশেষ সুবিধে মনে হচ্ছে না কেসটা।"

"বাঁচবে তো ?"

"কেমন ক'রে বলি ? অনেক দিন থেকে ভেতরে ভেতরে রোগ হ'য়েছে, খাওয়া দাওয়ার অনিয়মে—"

বাসন্তী এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ডাক্তারের শেষের কথাটা শুনিয়া তাহার বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল। খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম। এর জন্য যদি কেউ দায়ী থাকে, তবে সে নিজে! এতখানি—এ সবই তার জন্য। মাথা টলিতেছিল কোন মতে রেলিং ধরিয়া যখন ঘরে গিয়া পেঁাছিল, তখন আর চোখের জল বাধা মানিল না। আত্মগ্লানি, উৎকণ্ঠা ও বেদনার অশ্রু আজ তাহার মিথ্যা মর্য্যাদার অভিমানকে ভাসাইয়া দিল। কমল যদি একবার আজ ডাকিয়া কথা কহিত, তাহা হইলে ক্ষমা চাহিতেও আর তার আপত্তি ছিল না।

আশা ও আশঙ্কায় দু'দিন কাটিল, কমলের মাঝে মাঝে দু' একবার জ্ঞান হইয়াছে। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ডাকিয়াছে "মা"।

"এই যে বাবা আমি আছি"—বলিয়া বৃদ্ধা পাশে আসিয়া বসিয়াছেন।

কমল দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিয়াছে "শিবু কই ?"

"সে আসবে বাবা, চিঠি পেয়েছি, শীগ্‌গিরই আসবে।"

"সে ভাল আছে তো ?"—এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াই চুপ করিয়াছে।

বাসন্তীও তাহার মায়ের সঙ্গে সারা দিনমান রোগীর পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। কিন্তু তাহার পরিচর্য্যায় কোন জীবন ছিল না। কলের পুতুলের মত মা যাহা বলেন তাহাই করে, আর মাঝে মাঝে কমলের রোগপাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, চোখ যখন জলে ভরিয়া আসে, তখন মুখ ফিরাইয়া লয়। মাতা দেখেন, আর ছুতা করিয়া বাসন্তীকে নীচে পাঠাইয়া দেন।

তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে নীচের দরজায় কড়া অকস্মাৎ বিকট শব্দ করিয়া উঠিল। বাসন্তীর মাতা দরজা খুলিয়া দিলেন। গাড়ীর ছাতের উপর হইতে ভোজপুরী দরোয়ান কমলবাবু আছে কিনা প্রশ্ন করিল। বৃদ্ধা বুঝিলেন, কমলের মা আসিয়াছেন। গাড়ীর মধ্য হইতে একজন প্রৌঢ়া নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় সে ? ভাল আছে তো ?"

বৃদ্ধা কহিলেন, "তোকে মুখ দেখাই কেমন করে সই, তাই ভাবছিলাম ; তোর ছেলে আমার বাড়ীতে না খেয়ে দেয়ে এই ক'রে বসল।"

"সই! তুমি! তবে তো সে তার মায়ের কাছেই ছিল।"

"আর লজ্জা দিসনে ভাই, আমি মা!—আমি ডাইনি! আমার ঘরে তোর ছেলে অযত্নে—তার এই অবস্থা, আর তুই আমাকে বলিস মা ? চল্‌ তোর ছেলে তুই নিয়ে আমাকে রেহাই দে। তার মুখের দিকে চাইতেও আমার লজ্জা করে।"

পুরাতন সখী দু'টির মিলন সম্ভাষণ শেষ হইয়া গেলে বাসন্তী নিভৃতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে এ মা ?"

পুরাতন কথাগুলি জননী কন্যার নিকট কহিতে বসিলেন। প্রথম যৌবনের স্নেহের প্রেমের রঙ্গীণ চিত্রগুলি কথায় একটি একটি করিয়া তিনি আঁকিতে লাগিলেন; বাসন্তী নির্বাক হইয়া শুনিতে লাগিল। কাশীর দশাশ্বমেধের ঘাটে দুই বালিকার প্রথম পরিচয়। সখীত্বে সে পরিচয়ের পরিণাম। বিবাহের পর উভয়ের বিচ্ছেদ। বাসন্তী যখন কোলে তখন রেলগাড়ীতে পুনরায় সাক্ষাৎ ঘণ্টাকয়েকের জন্য মাত্র। তারপর দীর্ঘ পনর বৎসর পরে আবার দুই সখীর মিলন। এমন সময় নারীকণ্ঠের মৃদু ধ্বনিতে চকিত হইয়া বাসন্তী আসন ছাড়িয়া উঠিবার উপক্রম করিল। কমলের মাতা তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "আমার মা লক্ষ্মী বুঝি। এস মা বুকে এস।"

এই পরম স্নেহের সম্ভাষণ বাসন্তীর মনে নিতান্ত কঠোর ভর্ৎসনার মত। এ স্নেহের উপযুক্ত সে নয়। তাই ভাবিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল।

"কাঁদছিস মা লক্ষ্মী! কেন কি হয়েছে? ভয় কি মা, সেরে উঠবে। তোরা কোন দিন তো দেখিসনি ওকে? ও বরাবরই ওই রকম। একটু অসুখেই এলিয়ে পড়ে। ভগবানকে ডাক্ শীগ্‌গীর সেরে উঠুক।"—বলিয়া আঁচলে নিজের চক্ষু মুছিলেন। অশ্রুপাতের অবকাশেও এই কথাগুলি শুনিয়া বাসন্তী লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

সে যে কেন কাঁদিতেছে, তাহা তো বলিবার উপায় নাই। কাজেই নীরব থাকিয়া এই কারণটাই স্বীকার করিয়া লইতে হইল; কিন্তু কি লজ্জার কথা এ! একটি অপরিচিত পুরুষ—পরিচয়ের সূত্রপাত হইতেই যাহার সহিত তাহার নিত্য দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, তাহার জন্য আশঙ্কায় সে কাঁদিতেছে! এ কেমন কথা! উপায় নাই! উপায় নাই! এমন কোন কথা আজ তাহার নাই যাহা বলিয়া এ বিপদ হইতে সে উদ্ধার পায়।

এমন সময় নিতান্ত অপরাধীর মত শিবনাথ ঘরে ঢুকিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রভু-পত্নীকে প্রণাম করিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। কমলের মাতা যতই তাহাকে সান্ত্বনা করেন, সে ততই কাঁদে। পরে অশ্রুজলের সঙ্গে সে কোন প্রকারে নিজের কাহিনী শেষ করিল। গঙ্গাসাগরে পৌঁছিয়াই তাহার ওলাউঠা হয়—মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় সে রক্ষা পাইয়াছে। এখন দাদাবাবু সারিয়া উঠিলেই বাঁচে। নগদ পাঁচসিকা মায়ের বাড়ীতে পূজা দিবে মানত করিয়াছে—বলিয়াই সে চলিবার উপক্রম করিল।

"চললি কোথায় রে শিবু?"

"দাদাবাবুর জন্যে ডাক্তার আনতে যাচ্ছি মা।"

"ডাক্তার যে এই দেখে গেল, বললে শীগ্‌গির ভাল হয়ে যাবে।"

"ও কালা কবরেজকে আমি বিশ্বেস করি না, হাসপাতালের পাদ্রী ডাক্তারকে নিয়ে আসছি।"—বলিয়াই অপেক্ষা না করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

তেতলার ঘরটিতে কমল একা শুইয়া ছিল। শিবু, সাহেব ডাক্তারের আশ্বাস-বাণীতে নিশ্চিন্ত হইয়া দরজার পাশে খাটিয়ার উপরে অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছিল। নীচে রাজপথের জনস্রোতের অতি অস্পষ্ট কলশব্দ শুনিতে শুনিতে কমল ভাবিতেছিল, চিন্তার সূত্র অবিচ্ছিন্ন ছিল না। নানা কথার মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী মনে হইতেছিল বাসন্তীর কথা। আজ প্রাতঃকালেই তাহার শয্যাপার্শ্বে সে বাসন্তীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছে। তাহার শুষ্ক মুখ আর অতি কাতর চক্ষুর দিকে চাহিয়া বার বার সে বিস্ময় বোধ করিয়াছে। এই কঠোর প্রকৃতির মেয়েটা সহসা কেমন করিয়া অপরাধিনীর মত শঙ্কিত ও কাতর হইয়া পড়িল, সেই অতি জটিল মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণেই তাহার আজ অনেকখানি সময় কাটিয়াছে। স্ত্রীচরিত্রে যতখানি অভিজ্ঞতা জন্মিলে এই বিষয়গুলির দ্রুত মীমাংসা হয়, কমলের তাহা ছিল না; তাহা বুদ্ধিমান পাঠকের বুঝিতে বাকী নাই। অতি কোমলই রুদ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে, ঋষভ গান্ধার ধৈবত নিষাদের কোমল মিলিয়া ভৈরবী রাগিণীর সৃষ্টি হয়—এ তথ্য তাহার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। কাজেই বাসন্তীর সহসা পরিবর্তনের এ জটিল সমস্যার সমাধান করা তাহার পক্ষে সাধ্য হইল না। সমস্যা প্রাতঃকালে যেমন জটিল ছিল, এই সায়াহ্নেও তেমনই রহিয়া গেল। এমন সময় তাঁহার এই মূর্তিমতী সমস্যার কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল এবং দ্বারের কাছে তাহাকে দেখিয়াই পাছে মনের চিন্তাগুলি চোখে ধরা পড়ে এই ভয়ে চক্ষু বুজিল।

"শিবু ওঠ, নীচে যাও, মা ডাকছেন"—বলিয়া শিবুকে নীচে পাঠাইয়া দিয়া বাসন্তী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কমল যে ভাণ করিয়া চক্ষু বুজিয়া আছে, বাসন্তী তাহা লক্ষ্য করে নাই। সে শয্যাপার্শ্বে আসিয়া কমলের মাথায় হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিল, তারপর পাখা লইয়া বাতাস করিতে বসিল, তাহার দৃষ্টি ছিল কমলের মুখের দিকে। সে দৃষ্টি স্নেহার্দ্র, কিন্তু শঙ্কারও আভাস তাহাতে ছিল। কমল চক্ষু মেলিলেই হাতের পাখা যথাস্থানে রাখিয়া দূরে সরিয়া চেয়ারখানিতে বসিবে—অভিপ্রায় ছিল এইরূপ। কমল ভাবিয়াছিল বাসন্তী আসিয়াই চলিয়া যাইবে। কারণ পূর্বে বাসন্তীর সেবা পাইয়াছে বলিয়া তাহার মনে হয় না। কিন্তু যখন বাসন্তীর গৃহত্যাগ করিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না এবং দেহের উপর বাসন্তীর হাতপাখা অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল, তখন সে প্রমাদ গণিল। ঘুমাইয়া বারঘণ্টা চক্ষু বুজিয়া থাকা যায় কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় দশ মিনিট থাকা শক্ত, বিশেষতঃ রোগীর পক্ষে। অথচ চক্ষু মেলিলেই বিপদ আছে। বাসন্তীর সঙ্গে চোখাচোখি হইবার ভয় ছিল। তাহার পর চোখাচোখি হইলেই কিছু না

কিছু বলিতেই হইবে, না হইলে নিতান্ত অভদ্রতা করা হয়, অথচ উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ যেমন জটিল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে কোন্ কথাটি বলিলে শোভন হইবে, আকাশ পাতাল ভাবিয়াও কমল তাহা স্থির করিতে পারিল না। এদিকে চক্ষু বুজিয়া থাকা ক্রমে ক্রমে তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। তখন এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় চোখ না মেলিয়াই শুধু বলিল, "মাকে একবার ডেকে দিন।"

কথা শুনিয়াই বাসন্তীর হাতপাখা পড়িয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি কমলের শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া একেবারে ঘরের বাহির হইয়া গেল। কমল নিদ্রিতের ভাণ করিয়াছিল, বাসন্তী বুঝিল। এমন করিয়া যে সহসা ধরা পড়িয়া যাইবে, একথা সে মনে করে নাই। সিঁড়িতে আসিয়া মিনিট পাঁচেক ধরিয়া সে নিজের এই অপ্রত্যাশিত-পূর্ব পরাজয়ের কথা ভাবিতে লাগিল। লজ্জায় তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। কমল ভাবিবে মেয়েটা সাধিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে চাহে। সে যে শুদ্ধ সেবা করিবার জন্যই আসিয়াছিল, আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না—এই কথাটি কমলকে কোনও ক্রমে বুঝাইয়া দিতে পারিলে পরাজয়ের লজ্জা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, কিন্তু বলিবার কোনও উপায় স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। তখন একটা দারুণ সংকল্প করিয়া সে নীচে নামিয়া আসিল। দুই সখী উপরে উঠিতেছিলেন। কমলের মা বাসন্তীর মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া কহিলেন, "রোদে দাঁড়িয়েছিলি না কি মা, মুখ চোখ যে লাল হ'য়ে গেছে?"

"বড্ড মাথা ধরেছে।"—শুধু এই কথাটি বলিয়াই সে নীচে চলিয়া গেল এবং শুনিতে পাইল কমলের মা বলিতেছেন, "সারা দিনরাত রোগীর সেবা করার মেহনৎ তো কম নয়।"

১৪

না ডাকিলে তেতলার ঘরে যাইবে না, গেলেও এরূপ ব্যবহার করিবে যাহাতে কমলের কাছে খাটো না হইতে হয়। বাসন্তীর সঙ্কল্প হইল এরূপ। দুই দিন মাথা ধরার ভাণ করিয়া সে বিছানায় পড়িয়া থাকিল। মধ্যে ধধ্যে জননীদ্বয়ের মধ্যে কথাবার্তা হইলে কাণ পাতিয়া শুনিত। কমলের সংবাদ জানিবার জন্য যে দারুণ উদ্বেগ ও কৌতূহল মধ্যে মধ্যে মনে জাগিত, তাহা চরিতার্থ করিতে ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় পন্থা ছিল না।

কেন জানি না কমলও এই দুই দিন ধরিয়া বাসন্তীর কথাই ভাবিতেছিল। যে দিন সহসা তাহার ঘর ছাড়িয়া গেল তাহার পর আর সে আসে নাই। যে প্রশ্ন সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সেটা কোনও মতে অপরাধজনক হইতে পারে কি না বুঝিবার জন্য নানা ভঙ্গীতে মনে আনিবার চেষ্টা

করিতেছিল। বার বার বাসন্তীর কথা মনে হইবার আরও কারণ ছিল। বাসন্তীর যে রূপটি তাহার কাছে অপ্রীতিকর ছিল, আজ কয়েক দিন সে মূর্তি কমল দেখে নাই, তাহার বিষণ্ণ মুখখানাই দেখিয়াছে। আর সে-দিনকার সেবার কথাটি তাহার চিত্তকে মধুসিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সে সেবার যে একটি আন্তরিক আগ্রহ ছিল, কমল তাহা বুঝিয়াছিল। এইরূপ সেবা পুনরায় পাইবার আশায় সে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিলে মাঝে মাঝে চকিত হইয়া উঠিত এবং চক্ষু বুজিত, ভরসা ছিল তাহাকে নিদ্রিত দেখিলে বাসন্তী ঘরে আসিবে। কিন্তু প্রত্যাশার পরিবর্তে আসিত—শিবু কিম্বা অন্য কেহ। মাঝে মাঝে শিবুর কাছে বাসন্তীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া তাহার বাধিয়া যাইত! পূর্বে এরূপ কোন দিন হয় নাই। বাসন্তীর ব্যবহার সম্বন্ধে নিতান্ত নির্বিকারের মতই এত দিন সে শিবুর সহিত আলোচনা করিয়াছে।

সেদিন দ্বিপ্রহরের দক্ষিণের বাতাস কমলের ঘরের রুদ্ধ জানালার কপাটটি বার বার প্রতিহত হইয়া মৃদু গুঞ্জনে ফিরিয়া যাইতেছিল। মাথার দিকের জানালার একটা খড়খড়ি খোলা ছিল তাহার মধ্য দিয়া রাজপথের কৃষ্ণচূড়া গাছের রক্তরূপ দেখা যাইতেছিল। ললাটের উপর একখানি হাত রাখিয়া আর একখানি হাত বুকের উপর—খোলা একখানি কাব্যগ্রন্থের উপর চোখ রাখিয়া কমল ভাবিতেছিল, এমন সময় শিবু আসিয়া ডাকিল "দাদাবাবু ঘুমুচ্ছ?"

"না—কেন?" বলিয়া সে চক্ষু মেলিল।

"মা ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি গালাগাল দিয়েছ কি না?"

"গালাগাল! কাকে? বলছিস কি?"

"এই তোমার সেই দোতলার দিদিমণিকে।" কমলের মাতার সহিত গৃহস্বামিনীর সম্বন্ধ প্রকাশ হইবার পর হইতে শিবু বাসন্তীকে দিদিমণি বলিত।

কমল শিবুর প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া বলিল "কিছুই বুঝলাম না, শিবু খোলসা করে বল।"

"শুনবে? আমি যাচ্ছিলুম দিদিমণির কাছে টাকা চাইতে, মা ঠাকরুণের সব টাকাকড়ি দিদিমণির কাছে কিনা। গিয়ে দেখলাম, দিদিমণি টেবিলের উপর মুখ রেখে খুব কাঁদছে। মা ঠাকরুণকে বলতেই তিনি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, শিবু তোর দাদাবাবু বুঝি বকেছে। সে আজ দু'দিন উপরে যায়নি; ব্যাপার কি জেনে আয় তো?"

জননী এইরূপ অনুমান করিয়াছেন মনে করিয়া কমল বড় লজ্জাবোধ করিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "মাকে বলিস, আমি কিছু

বলিনি। আর—" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আর তাকে একবার ডেকে আনতে পারিস শিবু, খুব চুপচাপ—বুঝলি।"

"তা পারি, আজকাল তাঁর মেজাজ আর সে রকম নেই, বুঝলে দাদাবাবু, খুব ঠাণ্ডা। ঐটের মত।" বলিয়া কুকুরটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নীচে গিয়া দেখিল, যেখানে দুই সখী কথা কহিতেছেন, তাহার কাছে বাসন্তী একটি আঙ্গুরের বাক্স হাতে করিয়া বসিয়া আছে। শিবু আসিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু প্রভুপত্নীও যখন কিছু জিজ্ঞাসা করিল না এবং বাসন্তীও উঠিল না তখন কহিল, "দাদাবাবু তোমাকে উপরে ডাকছেন দিদিমণি।"

শুনিয়াই বাসন্তী লাল হইয়া উঠিল। কমলের মাতা মুখ নীচু করিয়া একটু মৃদু হাস্য করিলেন। বাসন্তী উঠিতে দেরী করিতেছে দেখিয়া শিবনাথ পুনরায় কহিল "এক্ষুণি।" না গেলে প্রচ্ছন্ন কলহ সকলের চোখে ধরা পড়িয়া যাইবে অথচ লজ্জায় বাসন্তীর পা উঠিতেছিল না।

কমলের মাতা বাসন্তীর এ অবস্থাটা কতক বুঝিলেন, কহিলেন, "রাগ করতে আছে মা? যা ওঠ্—দুটো আঙ্গুর খাইয়ে দিয়ে আয়।" অগত্যা বাসন্তী উঠিল।

বাসন্তী চলিয়া গেলে সখীর দিকে চাহিয়া কমলের মা কহিলেন, "তখনই তো তোকে বলেছি, ও মাথা ধরা কিছু না, দু'জনে ঝগড়া করেছে, কেমন রে শিবু?"

দাদাবাবুর গোপনীয় আদেশ এইরূপে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া শিবনাথ ছিদাম মুদির দোকানে যাইতেছিল, কিছু না ভাবিয়াই "হুঁ তাই" বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

১৫

বাসন্তীকে ডাকিয়া পাঠাইবার বিশেষ কারণ ছিল। রোগমুক্তির ফলে কমলের চিত্ত অত্যন্ত লঘু হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার উপর মাতার সাহচর্য্যে আর শিবনাথের অপ্রত্যাশিত আগমনে সমস্ত চিত্ত মধুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত দিনের পরিপূর্ণ আনন্দে বাসন্তীর সসঙ্কোচ আচরণ মাঝে মাঝে বাধা জন্মাইত। এই বাধা দূর করিবার একমাত্র উপায় ছিল বাসন্তীর সহিত একান্ত সহজভাবে খোলা-খুলি আলাপ করা। কিন্তু বার বার চেষ্টা করিয়াও সে তাহা করিয়া উঠিতে পারে নাই। আজ এই বাধা দূর করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া সে বাসন্তীকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। কিন্তু শিবু চলিয়া গেলেই সে আকাশ পাতাল ভাবিতে বসিল। সন্ধির প্রস্তাবটা কিরূপ ভাষায়

করা যাইতে পারে অনেক ভাবিয়াও তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। এমন সময় দরজার পাশে খস্‌খস্‌ শব্দ শুনিয়া সে বিমূঢ় হইয়া চক্ষু বুজিল। সর্বপ্রকার জটিল অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার এইমাত্র উপায় সে আয়ত্ত করিয়াছিল। সময় সময় তিক্ত ঔষধ সেবন হইতে অব্যাহতি লাভের ভরসায় সে মাঝে মাঝে মায়ের পদশব্দ পাইলেই চক্ষু বুজিত। চক্ষু বুজিয়া সে একটি অতি সাধারণ প্রশ্ন মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে বাসন্তী দরজার পাশে দাঁড়াইয়া, ঘরে ঢুকিতে তাহার পা উঠিতেছিল না। অভিপ্রায় ছিল, কমল ডাকিলেই কোনও মতে নিতান্ত সহজভাবে ঘরে ঢুকিবে কিন্তু কমলের যখন কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না ও নীচের বারান্দায় উপবিষ্ট কমলের মাতার সহিত বার দুই চোখাচোখি হইল, তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে ঘরে ঢুকিতে হইল। বাসন্তী যখন ঘরে ঢুকিল কমল তখনও তাহাকে বলিবার মত কোনও কথা জোগাইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু মনের মধ্যে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। এদিকে জানালার কাছে বাসন্তী নতনেত্রে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এই নিস্তব্ধ মুহূর্তগুলি তাহার মনে হইতেছিল এক একটি যুগের মত। শেষে অতিষ্ঠ হইয়া কমলের মুখের ভাব লক্ষ্য করিবার জন্য মুখখানি ঈষৎ তুলিতেই সে দেখিল যে, কমল চোখের উপর ডান হাতখানা রাখিয়া আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া তাহার দিকে মিটিমিটি চাহিতেছে। কমলের বিব্রত মুখভাব ও সশঙ্ক চাহিবার ভঙ্গী দেখিয়া হঠাৎ বাসন্তী মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া উঠিল। বাসন্তীর হাসি দেখিয়া কমলও হাসিয়া ফেলিল। বাসন্তী প্রথমে হাসি চাপিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কমলের সরল সকৌতুক হাসি দেখিয়া পারিল না। সে পুনরায় হাসিয়া উঠিল। এতদিনের মিথ্যা দ্বন্দ্ব, অসার বিরোধ, অন্তরের লুকোচুরি এই সহজ হাসির স্রোতে ভাসিয়া গেল।

তারপর সহসা দারুণ চেষ্টা করিয়া বাসন্তী গম্ভীর হইয়া কহিল, "এই আঙ্গুর রইল আমি যাচ্ছি।"

বাসন্তীর এই মিথ্যে গাম্ভীর্যে কমল কৌতুক অনুভব করিয়া কহিল, "চলে গেলে আঙ্গুর যেখানে আছে সেখানেই থাক্‌বে।"

অগত্যা বাসন্তী আঙ্গুরের বাক্সটি হাতে লইয়া কমলের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেই কমল কি ভাবিয়া সহসা হাতখানি ধরিয়া ফেলিল। বাসন্তী লজ্জায় মরিয়া গেল, কিন্তু হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল না। পর মুহূর্তেই লজ্জিত হইয়া কমল বাসন্তীর হাত ছাড়িয়া দিল। কিন্তু কোথা হইতে তখন দুর্জয় সাহস তাহার মনকে আশ্রয় করিয়াছিল, গমনোদ্যত বাসন্তীকে ডাকিয়া কহিল, "অন্যায় হ'ল, কিন্তু আর যেন ঝগড়া না হয়।" বাসন্তী কমলের দিকে একটি স্নিগ্ধ মধুর কটাক্ষপাত করিয়া চলিয়া গেল।

নীচে বসিয়া সখীদ্বয় তেতলার এই সংসারানভিজ্ঞ জীবযুগলের হাস্যলীলা

পরম আনন্দে উপভোগ করিতেছিলেন। কারণ কমল সুস্থ হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই উভয় সখীর মধ্যে একটি গুরুতর পারিবারিক সমস্যা মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল।

বাসন্তীকে নামিয়া আসিতে দেখিয়া উভয়েই তাহার দিকে চাহিলেন; বাসন্তী মুখ ফিরাইয়া অপরাধীর মত সংকুচিত পদক্ষেপে আপনার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘরে গিয়া বাসন্তী কাঁদিল, কিন্তু এবার আর পরাজয়ের বেদনায় নহে, জয়ের আনন্দে, অন্তরের নিত্য সংগ্রাম হইতে অপ্রত্যাশিত মুক্তিলাভের স্বস্তিতে। অশ্রু যখন শেষ হইয়া গেল, তখন বাসন্তী দেখিল যে, তাহার সমস্ত মন ক্ষ্যান্তবর্ষণ শরতের আকাশের মত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

মেরুদণ্ডের ইতিহাস

একটি অর্ধদগ্ধ বিড়ি সাহেবী ধরণে দাঁতে চাপিয়া নকুলেশ্বর চট্টরাজ উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে গোলদীঘিতে পদচারণা করিতেছেন। তাঁহার মন ছিন্নসূত্র চিলে ঘুড়ির মত মেঘলোকে ঊনপঞ্চাশ পবন তাড়িত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিচিত্র দুশ্চিন্তা মগজের মধ্যে তাল ঠোকাঠুকি করিতেছে। গৃহিণীর তাগিদ, কাবুলীওয়ালার তাগিদ ও বাড়ীওয়ালীর তাগিদ—সমস্ত তাগিদ একত্র মিলিয়া এসেম্বলীর নূতন ট্যাক্সেশন বিলের মত ভয়ঙ্কর মূর্তিতে ক্রমাগত মানস-চক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছে। পলাইবার পথ নাই। বাড়ীওয়ালীর তাগিদে গদাই পালের গলির খোলার ঘরখানিতে দিন সাতেক হইল তালা বন্ধ করিয়াছেন, বিছানাপত্র সেখানেই রহিয়াছে। বাড়ীতে যাইবার উপায় নাই, তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যা ক্ষেন্তীর জননী সেখানে রহিয়াছেন; এক আশ্রয় স্থান ছিল 'ক্যালকাটা ইভিনিং লাইজ' পত্রিকার কম্পোজিং রুমের অন্ধকার কোণ, কাল হইতে সেমুখো আর হইবার উপায় নাই। রামেশ্বর ওঝাকে কিঞ্চিৎ মূলধন দিয়া ফুটবলের মরশুমে গড়ের মাঠে চানাচুরের যে কারবারটি করিতেন, তাহাও ফেল পড়িয়াছে—অর্থাৎ গত পরশু রাত্রিকালে মূলধন সাতাশ টাকা এবং সেইদিনকার চানাচুর বিক্রয়লব্ধ দুই টাকা বার আনা—একুনে উনত্রিশ টাকা বার আনা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার ওয়ার্কিং পার্টনার শ্রীযুত রামেশ্বর ওঝা ছাতুবাবুর বস্তির লছমন চামারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীমতী লখিয়া চামারিণীকে সহযাত্রিণী করিয়া তাঁহার জন্মভূমি আরা জেলা অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন। থানায় সংবাদ দিতে পারেন নাই, যেহেতু

সন্ধান লইয়া জানিয়াছেন যে, রামেশ্বর ওঝা নামক কোনও ব্যক্তি ছাতুবাবুর বস্তিতে বাস করিত না। যে লোকটা চানাচুর বিক্রয় করিত তাহার নাম ছিল রাম অওতার কাহার। বাড়ী কোন্ জেলায় বস্তির লোক তাহা জানে না। এ হেন ঘটনা-বিপ্লবে পড়িয়া দি ক্যালকাটা ইভিনিং লাইজ পত্রিকার বিজ্ঞাপনের ত্রিশ টাকা বেতনভোগী কর্মচ্যুত কম্পোজিটার শ্রীনকুলেশ্বর চট্টরাজ গোলদীঘিতে সান্ধ্যভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার বন্ধু ট্রাম-কণ্ডাক্টর বিপিন মুন্সীর কৃপায় কাল সমস্ত দিন ট্রামে ঘুরিয়া প্রায় শ'খানেক ছাপাখানায় সন্ধান লইয়াছেন—নো ভেকান্সী। বাঙ্গলার যাবতীয় ভদ্রসন্তান আফিস হইতে কম্যুনাল পলিসির কৃপায় তাড়া খাইয়া য়ুনিভার্সিটির ডিপ্লোমা গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়া ছাপাখানায় সীসার টাইপ চিনিতে বসিয়া গিয়াছে, নকুলেশ্বরবাবুর মনে হইতেছিল, জগৎটা যেন নিরেট হইয়া গিয়াছে, কোথাও মাথা গলাইবার কোনও ফাঁক নাই। ভাবিতে ভাবিতে শ্রান্ত ক্লান্ত উদ্‌ভ্রান্ত নকুলেশ্বরবাবু একটা বেঞ্চে বসিয়া পড়িলেন। মনে ভাবিলেন আত্মহত্যা করিবেন কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল তাহাতে অনেক হাঙ্গামা। আফিংএ তাঁহার কিছুই হইবার ভরসা নাই, কারণ অতি বাল্য হইতে বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি সমানে চণ্ডু এবং গঞ্জিকা সেবন করিয়াছেন, এখন সে অভ্যাস নাই বটে, কিন্তু তাঁহার দেহের প্রতি রক্তকণিকা বিষাক্ত হইয়া আছে; গত বৎসর তাঁহাকে সাপে কামড়াইয়াছিল তাঁহার একটু নেশা বোধ হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু সাপটি তাঁহার বিষাক্ত রক্তের বিন্দুমাত্র উদরসাৎ করিয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছিল। তবে পতিতপাবনী মা গঙ্গা আছেন—কিন্তু এই দারুণ শীতে জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করা অত্যন্ত কণ্টকর ব্যাপার। অতএব—

ভাবিতে ভাবিতে কি শুনিয়া নকুলবাবু চমকিয়া উঠিলেন। একি দৈববাণী—!

শুনিলেন তাঁহার বেঞ্চের পশ্চাতে ঝোপের অন্তরালে কথোপকথন হইতেছে।

একজন বলিতেছে, 'কংগ্রেসওয়ালারা' চালাক হ'য়ে গেছে এখন আর যাকে তাকে নেয় না!"

"তবে একখানা দু'ফর্মা সাপ্তাহিক কাগজ বের ক'রে ফেলি। কংগ্রেসকে গালাগালি দিলেই ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে অঢেল বিজ্ঞাপন যোগাড় হ'য়ে যাবে।"

"সে বুদ্ধি ভালো। তারপর ওঁদের কাছ থেকেও—"

সেই সঙ্গে সঙ্গে গুটিকয়েক নামও নকুলবাবু শুনিলেন। তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এই দু'টি অজ্ঞাত প্রাণীর বাক্যগুলি তাঁহার ম্রিয়মান চিত্তে মকরধ্বজবৎ ক্রিয়া করিল। তিনি ক্রমাগত গোলদীঘি পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাত্রি বারটার সময় যখন চৌকীদার আসিয়া তাঁহাকে ধমক দিল, তখন নকুলবাবুর সংকল্প স্থির হইয়া গিয়াছে। তিনি

বিনাবাক্যে ফুটপাথে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পরেই বাসে আরোহণ করিয়া একেবারে কালীঘাট ট্রাম ডিপো।

বিপিন মুন্সী সমস্ত শুনিয়া বুঝিলেন যে, একটা ব্যবসার মত প্ল্যান বটে। টাকায় টাকা লাভ। তারপর খাতির! তারপরেই চাকুরীতে ইস্তফা এবং দৈনিক সংবাদপত্র, তাহার পর লেজিসলেটিভ কাউন্সিল! বিপিন মুন্সী তেরো বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এখন বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সেও সেই স্বপ্নই আবার নূতন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। নকুলবাবু কিঞ্চিৎ নিদ্রা উপভোগের অভিপ্রায়ে মায়ের মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

২

দিনদশেক পর শ্রীনকুলেশ্বর চট্টরাজ কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া যে দুই ফর্মা 'জাতীয় সাপ্তাহিক পত্র' বাহির হইল, তাহার নাম 'সাপ্তাহিক মেরুদণ্ড'। কিন্তু যে মতলব হইতে নকুলবাবু সংবাদপত্র বাহির করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন প্রথম সংখ্যায় তার ইঙ্গিত মাত্রও পাওয়া গেল না। অত্যন্ত গরম সম্পাদকীয় প্রবন্ধ শোভিত হইয়া 'সাপ্তাহিক মেরুদণ্ড' আত্মপ্রকাশ করিল। সন্ধ্যাকালে ট্রামের পোষাক পরিয়াই বিপিন ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া পাংশু মুখে কহিল—"এটা কি হয়েছে নকুল? এই না তুমি কংগ্রেসকে গালাগাল করবে? তা না উল্টে কি সব লিখেছ! সবশুদ্ধ মারা যাব। আমি ছা-পোষা মানুষ—"

নকুলবাবু সম্পাদকীয় লোহার চেয়ারে বসিয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন—"যার যা কাজ। তুমি খবরের কাগজের কি জান? যাও কালীঘাট—এস্‌প্ল্যানেড—ড্যালহাউসী—খিদিরপুর করগে!"

বিপিন অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া কহিল—"সেই ভাল ভাই। আমার টাকা ক'টা ফেলে দাও।"

নকুলবাবু গম্ভীর মুখে কহিলেন—"পাবে, মাসকাবারে।"

বিপিন অগত্যা ফিরিয়া গেল, কিন্তু টাকা পাইবার ভরসা করিল না। মনে মনে কহিল —"মাসকাবার! মাসকাবার নাগাৎ তুমিই কাবার হবে নকুল!"

সন্ধ্যার সময় নকুলবাবু ঢুলিতেছিলেন। টেলিফোঁ ক্রিং ক্রিং করিয়া বাজিয়া উঠিল।

নকুলবাবু টেলিফোঁ ধরিয়া কহিলেন—"হ্যালো!" তাহার পরেই প্রসন্ন মুখে কহিলেন—"ইয়েস্‌ এখুনি ইয়ে—ইমিডিয়েট্‌লি—গুড মর্ণিং!" টেলিফোঁ

রাখিয়া আলমারী হইতে একগাদা 'মেরুদণ্ডের ক্রোড়পত্র' বাহির করিলেন—এবং তাহার পর চাদরখানি গায়ে ফেলিয়া সম্পাদকীয় কক্ষে তালাবন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক আসিয়াছিল ক্লাইভ ষ্ট্রীটের এক সওদাগরী আফিস হইতে। নকুলবাবু সেখানে পৌঁছিয়াই দারোয়ানকে এক কার্ড দিলেন। গুর্খা দারোয়ান সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার নকুলবাবুর দিকে চাহিল; তাহার পর তাঁহাকে ফুটপাথে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া কার্ড লইয়া চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পর আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল—"আইয়ে!"

লিফটে উঠিয়া তেতলার এক ঘরে নকুলবাবু প্রবেশ করিলেন। কয়েকজন সাহেব একখানি টেবিলকে কেন্দ্র করিয়া বসিয়া ছিলেন। নকুলবাবু আসিয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন—"গুড মর্ণিং"!

একজন সাহেব পরিষ্কার বাঙ্গলায় কহিলেন,—গুড্ ইভিনিং বাবু. বসুন আপনি! আপনি নকুলেশ্বর চটুরাজ? এডিটার, 'দি মেরুডাণ্ডা'?"

বাঙ্গলা বলিতে পাইয়া নকুলবাবু বাঁচিয়া গেলেন, কহিলেন—"ইয়েস হ্যাঁ, সার।"

সাহেব কহিলেন, "বেশ। আপনার কাগজ উট্রম, যে হেটু আপনি এট খারাপ কঠা কেন লিখিয়াছেন?"

নকুলবাবু আরও গম্ভীর হইয়া কহিলেন—"কি খারাপ কথা লিখেছি স্যার?"

সাহেব ডাকিলেন—"বাবু?"

দক্ষিণ দিকের পর্দা তুলিয়া একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। সাহেব কহিলেন—"মেরুডাণ্ডার লীডার পাঠ করুন!"

ভদ্রলোকটি তাঁহার বগলের ফ্ল্যাট ফাইল হইতে একখানি মেরুদণ্ড বাহির করিয়া সুর করিয়া পড়িতে লাগিলেন—"রক্ত চাই! দেশের আজ আর কোনও অভাব নাই, অভাব শুধু রক্তের। তাজা টাট্কা আনকোরা রক্তের। চাই শুধু রক্ত। আলতার মত লাল, সদ্যঃ ভাজা চানাচুরের মত গরম ও লবণাক্ত রক্ত। ইত্যাদি।"

সাহেব কহিলেন—"এ সব কি লিখিয়াছেন?"

নকুলবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন "—ঠিক কথা লিখেছি স্যার! ও লেখার আরও খানিকটা আছে, দেখুন"—বলিয়াই নকুলবাবু মেরুদণ্ডের ক্রোড়পত্র একখানি সাহেবের হাতে দিলেন। সাহেব একবার চোখ বুলাইয়া বাঙ্গালী ভদ্রলোকটিকে কহিলেন—"পাঠ করুন বাবু।" তিনি পড়িতে লাগিলেন মেরুদণ্ডের ক্রোড়পত্র। সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উপসংহার। চাই রক্ত। এই রক্ত প্রচুর পরিমাণে পাইতে হইলে নিত্য সেবন করুন—সেবন

করুন নকুল কবিরাজের রক্তকণা বটী, প্রাতে দুই বটী ও সন্ধ্যায় দুই বটী, প্রতি কোটা দশ আনা।

সাহেব বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন,—"হোয়াট ?"

নকুলবাবু কহিলেন—"রক্তকণা বটী। ব্লড্ গ্রোয়িং পিল্স।"

সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন—"বাই জোভ! ইউ আর এ জিনিয়াস! কিন্তু বাবু আমি ডেখ্‌বে—স্যাল রিমেমবার!"

নকুলবাবু সেলাম করিয়া কহিলেন—"ইউ আর অলমাইটি স্যার! গুড্ মর্ণিং।"

বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নীচে পেঁছাইয়া দিলেন ও কহিলেন—"আপনার যাতে সুবিধে হয় তা দেখব।"

পরের সপ্তাহে সতর্ক দৃষ্টিপাতে চারিদিকে বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বিপিন একখানি মেরুদণ্ড কিনিল। পাতা উল্‌টাইয়াই তাহার চক্ষুস্থির! কলিকাতার যাবতীয় সাহেব কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে নামাবলী সাজিয়া মেরুদণ্ড বাহির হইয়াছে।

ইতিমধ্যে ক্ষেন্তীর মার হাতে আট গাছা দেশবন্ধু প্যাটার্নের চুড়ী উঠিয়াছে। মেরুদণ্ড অফিসে লোহায় চেয়ারের বদলে গদী-আঁটা কোচ বসিয়াছে, ইংরাজী বিজ্ঞাপন বাঙ্গলায় তর্জমা করিবার জন্য দুইজন সহকারীও নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ভগবান নকুলবাবুর অদৃষ্টে আরও অনেক কিছু লিখিয়াছিলেন, কাজেই ইতিমধ্যে অর্ডিন্যান্স জারী হইয়া গেল। নকুলবাবুর বিজ্ঞাপনদাতাগণ তাঁহাকে এক গোপন বৈঠকে তলব করিলেন। পরের সপ্তাহে 'মেরুদণ্ডে' ভাবে ও ভাষায় অপূর্ব 'বাজেয়াপ্ত' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বাহির হইল। এই প্রবন্ধ বাহির হইবার পর সপ্তাহখানেকের মধ্যে এক অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটিল।

আলীপুরে এক ভীষণ রোমাঞ্চকর মামলা উপস্থিত হইল। ফ্রী প্রেস সংবাদ দিলেন যে, সদর গড়াইহাটি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট কেরামৎ আলী মিঞার নামে উক্ত গ্রামবাসী মহবুব সেখ এই মর্মে অভিযোগ আনিয়াছে যে বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, তাহার ছাগল গরু অন্যায়ভাবে বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। অতএব তাহার জিনিষ তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়।

আসামী পক্ষের উকীল শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোর্টকে জানাইলেন যে, ইহাতে তাঁহার মক্কেলের কোনও দোষ নাই। ফরিয়াদী মহবুব সেখ তার দোস্ত আলীজানকে হাটের মধ্যে জোর গলায় হল্যাণ্ডে প্রস্তুত লুঙ্গী না কিনিয়া পাবনাই লুঙ্গী কিনিবার উপদেশ দিতেছিল। প্রেসিডেণ্ট সাহেব নিষেধ করাতেও সে নিবৃত্ত হয় নাই। অতএব প্রেসিডেণ্ট সাহেব তাহার

গরু, বাছুর, ছাগল, বোর্ড সরকারে বাজেয়াপ্ত করিবার হুকুম দিয়াছেন। আর এ বিষয় কলিকাতার বিখ্যাত সংবাদপত্র 'মেরুদণ্ডের' ইঙ্গিত অনুসারেই হইয়াছে। হাকিম প্রশ্ন করিলেন—"মেরুদণ্ডে কি আছে?" আসামীর উকীল মেরুদণ্ডে প্রকাশিত 'বাজেয়াপ্ত' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির কতকাংশ পাঠ করিলেন,—

বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে। যাহারা অবাধ্য হইবে, তাহাদের ছাগল ভেড়া গরু মহিষ বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে, তবেই দেশে শান্তি আসিবে। হাকিম হাসিলেন এবং এররু অব জাজমেণ্ট বলিয়া কেরামৎ আলী মিঞাকে খালাস দিলেন। মহবুব সেখ কেরামৎ আলী মিঞার প্রদত্ত দশটি টাকা খেসারৎ স্বরূপ কোমরে গুঁজিয়া প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার পর মেরুদণ্ডের প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। নকুলবাবুর পেট্রনরা তাঁহাকে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন। এবং তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া জানাইলেন যে মেরুদণ্ড public opinion create করিতেছে।

ইহার পর কোথা হইতে কি হইল তাহা আর জানি না। তবে দিন পনেরোর মধ্যে 'মেরুদণ্ড' সাপ্তাহিক হইতে দৈনিকে পরিণত হইয়া গেল।

আরও এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

আজকাল প্রতি সন্ধ্যায় দৈনিক মেরুদণ্ড সম্পাদক রায় বাহাদুর নকুলেশ্বর চট্টরাজের বেগুনী রংএর ডজ গাড়ীখানা চৌরঙ্গী দিয়া ছোটাছুটি করে, আর তাহার দিকে চাহিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিপিন মুন্সী হাঁকিতে থাকে "—এস্প্লানেড্ কালীঘাট!"

সমাধান

বহরমপুর কলেজ হইতে ইংরাজীতে ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার্স লইয়া নিত্যানন্দ-প্রভু-বংশীয় স্বর্গীয় শ্যামলাল গোস্বামীর পুত্র মতিলাল বুকের ছাতি ফুলাইয়া কলিকাতা আসিল। ত্রিসংসারে কেহ নাই, এক বৃদ্ধ মাতুল পড়ার খরচ যোগাইতেন, তাহার পরীক্ষার পরই তিনি স্বর্গীয় হইয়াছেন, অতএব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিদ্যা অধিক দূর অগ্রসর করা অসম্ভব। কাজেই উদরান্নের সংস্থান করা আবশ্যক। কলিকাতায় কাহারও সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। তাহার জন্য সে মোটেই ভীত হইল না, ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার্স লইয়া পাশ করিয়াছে—ভাবিল, কলিকাতা সহর তো ছার, জগৎই তাহার জন্য হাঁ করিয়া

চাহিয়া আছে। শেয়ালদায় নামিয়া সোজা বৈঠকখানা রোড ধরিয়া আসিয়া সম্মুখের এক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেলের খোলার ঘরের একটি কক্ষ ভাড়া লইয়া মতিলাল জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হইল।

প্রথম দিন দুই বিশ্রাম করিয়া শ্যামবাজার হইতে ভবানীপুর পর্য্যন্ত সমস্ত কলেজগুলি ঘুরিয়া দেখিল, টিউটরের পদ কোথাও খালি নাই। তখন বুকের ছাতি এক ইঞ্চি পরিমাণ কমিল। পরে দিনকয়েক ক্লাইভ স্ট্রীটে ঘোরা-ফেরা করিয়া দুই একটি হৌসের বড় সাহেবের সঙ্গেও দেখা হইল, প্রায় সকলেই বিনাবাক্যে বৃষভগর্জনে 'নো ভেকেন্সী' বলিয়া হাঁকাইয়া দিলেন; দুই এক জন কিঞ্চিৎ দয়াপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হিন্দু?"

মতিলাল সবিনয়ে কহিল, "হ্যাঁ সার।"

"ন্যাশনালিষ্ট?"

মতি জীবনে মিথ্যা কথা কহে নাই, মিথ্যা কথা বলিয়া জীবিকা উপার্জন করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; কহিল "ইয়েস।" হৌসের মালিকরা 'গুড-বাই' করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

পরের কয়দিন বড়বাজারে মাড়োয়ারীদের গদীতে ঘুরিয়া মতিলাল দেখিল যে একে বাজার মন্দা এবং তাহার উপর সে বাঙ্গালী, কাজেই সুবিধা হইবার ভরসা বিশেষ নাই। তখন তাহার বুকের আটত্রিশ ইঞ্চি ছাতি কমিতে কমিতে ত্রিশে আসিয়া ঠেকিয়াছে। মতিলাল বিপদ গণিল। দিন তিন চার পর খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে চোখে পড়িল, সরকারী রেকর্ড ডিপার্টমেণ্টের জন্য একজন গ্র্যাজুয়েট আবশ্যক। তাহার মত গ্র্যাজুয়েট সংখ্যায় বেশী নাই—আত্মবিশ্বাস মতিলালের ছিল; সে উল্লসিত হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল যে এ চাকুরী হাতছাড়া হইবার যো নাই! যোগ্যতায় তাহার মত গ্র্যাজুয়েট সংসারে মিলিবে না। কথাটা অবশ্য সত্যই, কিন্তু সরকারী দফতরখানার দরজায় পেঁছিয়াই তাহার গায়ের রক্ত জল হইবার উপক্রম হইল। প্রায় সাড়ে সাত গণ্ডা প্রার্থী দরখাস্ত হাতে লইয়া ঘুরিতেছে। সকলেই কার্ড পাঠাইয়াছে, মতিও কার্ড দিল। ঘণ্টা তিনেক পর "ইণ্টারভিউ"-এর জন্য ভিতরে ঢুকিলেই সাহেব তাহাকে প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি মুসলমান?"

মতি কহিল—"না।"

সাহেব পেন্সিল তুলিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে যাইতে আদেশ দিয়া কহিলেন—"নো চান্স, যাও বাবু!"

মতির মাথা খারাপের মত হইল। ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার্স লইয়া পাশ করিল, তবু 'নো চান্স' কেন? কহিল "—স্যার কোয়ালিফিকেশন আমার" —সাহেব একটু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন "ধর্ম-ই কোয়ালিফিকেশন! গুড-বাই।"

রাগে গজ গজ করিতে করিতে মতি বাহিরে আসিল। তাহার পর এদিক সেদিক ঘুরিয়া বাসায় ফিরিতেছে, এমন সময় তাহার বাল্যবন্ধু মফিজের সহিত দেখা হইল। মফিজ হাসিতে হাসিতে কহিল "—মতি যে?"

মতি কহিল "—হাঁ। কলকাতায় কি মনে করে মফি?"

মফিজ কহিল, "একটা চাকুরী নিলুম ভাই। বাপজান আর খরচ দিতে চান না। সাতবার বি এ ফেল করেছি, আর চাওয়াও মুসকিল।"

"কি চাকুরী নিলে?" মতি জিজ্ঞাসা করিল।

"রেকর্ড ডিপার্টমেন্টের কেরাণীগিরিটা হ'য়ে গেল। তা মাইনে একশ' আর এলাউয়্যান্স পঁচিশ, চ'লে যাবে এক রকম, কি বল?"—বলিয়া মফিজ হাসিল।

মতি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে মফিজের দিকে চাহিয়া কহিল—"তুমি পেয়েছ! খুসী হ'লাম। আমিও দরখাস্ত করেছিলাম!"

মফিজ কহিল—"ভুল করেছিলে ভাই, মুসলমান ছাড়া ও হবার যো নেই। এই দেখ না মাথায় ফেজ ছিল না ব'লে কাল তো আমলই দিলে না। আজ চাপকান আচকান প'রে এসে তবে জুটেছে।"

মতি কি যেন ভাবিল, তারপর কহিল "—আচ্ছা, তবে আসি। চাকুরী পেয়ে ভুলো না ভাই, আমার জন্যেও একটা কিছু দেখো!"

মফিজ 'আচ্ছা' বলিয়া ট্রাম ধরিল।

বাসায় আসিয়া মতি যখন পেঁছিল, তখন তাহার বুকের ছাতি আরও খানিকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে।

ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্সে বি, এ পাশ মতিলাল গোস্বামী—বিছানায় উবু হইয়া খবরের কাগজের কর্মখালির বিজ্ঞাপন পাঠে নিবিষ্ট ছিল, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হোটেলের অধিকারী গুণনিধি মিশ্র টাকার তাগিদ করিতেছিল। মতির জবাব দিবার উপায় নাই, কারণ সমস্ত সম্বল ফুরাইয়া মাত্র পাঁচ আনা পয়সায় গিয়া ঠেকিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া বকিয়া বকিয়া গুণনিধি ঠাকুর কহিল—"দুদিনের মধ্যে সব শোধ ক'রে দেবেন বলছি, নইলে পুলিশে খবর দেব।"

মতির চোখ বিজ্ঞাপন পাঠ করিতে করিতে ক্রমেই বিস্ফারিত হইয়া উঠিতেছিল—একটা লোভনীয় চাকুরীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—কাজেই গুণনিধি ঠাকুরের এই মারাত্মক ভয় প্রদর্শন তাহার কাণে ঢুকিল না। গুণনিধি রোষকষায়িত নেত্রে এই নির্বিকার বেকার মানুষটির দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল। চাকুরী লবণ বিভাগের জন্য তিনজন শিক্ষানবীশের। মতি অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া উঠিল, তাহার পর ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা দশটায় সরকারী আফিসে গিয়া গোপনে দুই একটি কেরাণীর নিকট হইতে সন্ধান লইয়া জানিল যে

চাকুরীর জন্য সকলেই প্রার্থী হইতে পারে বটে, কিন্তু সেক্রেটারীর গোপন উপদেশ আছে মুসলমান উপযুক্ত প্রার্থী পাইলে আর অন্য কোনও প্রার্থীকে লওয়া হইবে না। মতির মুখ শুকাইয়া গেল—ইচ্ছা হইল ইউনিভার্সিটির যত সার্টিফিকেট আছে সমস্ত ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া লালদীঘিতে ফেলিয়া দেয়। ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছে, এমন সময় কে পিছন হইতে ডাকিল—"গোঁসাইদা নাকি? আদাব!"

মতি মুখ ফিরাইয়া যাহাকে দেখিল তাহাকে এই বেশে কলিকাতায় দেখিবে সে কথা সে কল্পনাও করে নাই। প্রশ্নকর্তা তাহার মাতুলের ভূতপূর্ব গোমস্তার পুত্র রমজান আলী। সে দিব্য চোখে সুরমা আঁকিয়া জরির তাজ মাথায় দিয়া বুটিদার পায়জামা পরিয়া দাঁড়াইয়া! দেহটাও বেশ নধর হইয়াছে—দেখিলে সহসা চেনা যায় না। মতি আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "—তুমি এখানে?"

রমজান আলী জানাইল যে, গত তিন বৎসর যাবত এখানেই সে আছে, চিৎপুরে বিড়ির দোকান করিয়াছে। 'স্বদেশী'র কল্যাণে বিড়ি বেচিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগারও হইতেছে। এখন চলিয়াছে শেয়ালদার মোড়ে—সেখানে একখানি দোকান করিবার ইচ্ছা। এই সময় ট্রাম আসিয়া পড়িল। রমজান কহিল "—উঠে পড় গোঁসাইদা।"

মতি কহিল—"তুমি যাও, আমি হেঁটেই যাব। পয়সা নেই সঙ্গে।"

রমজান বিস্মিত হইল, কহিল—"পয়সা নেই! এত লেখাপড়া শিখে—যাক্ সে হবে 'খন। উঠে পড়।"

অগত্যা মতি ট্রামে উঠিল। ট্রামে বসিয়া মতি তাহার মাতুলের মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতার চাকুরী খুঁজিবার যাবতীয় বিবরণ রমজানকে জানাইল, কিছুই গোপন করিল না।

রমজান হাসিয়া কহিল "সে কথা বলতে হয়! একটু বুদ্ধি নেই তোমার গোঁসাইদা"—বলিয়া মতির কাণে কাণে রমজান কি কহিল।

মতি কহিল "—অনেক হাঙ্গামা সে, ধরা পড়ে যাই যদি?"

রমজান তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল,—"কোনও চিন্তা নাই। আমি সব ঠিক করে দেব। তুমি এসো আজ আমার ওখানে সন্ধ্যেবেলা। আমি রমজান আলী—" বলিয়া রমজান এতদিন কলিকাতা থাকিয়া যে সব কাজে বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় দিয়াছে তাহার একটা তালিকা দিয়া গেল। মতি শুনিয়া বুঝিল যে রামজানের বুদ্ধিমত চলিলে সুবিধা হইবার সম্ভাবনা, ধরা পড়িবার ভয়ও নাই।

পরদিন চুড়ীদার আচকান ধপধপে পায়জামা ও মাথায় লাল ফেজ পরিয়া যে ব্যক্তি বেলা দশটার সময় ফিটন গাড়ীতে চাপিয়া 'ভারত মাতা' মার্কা

বিড়ির আবিষ্কারক সেখ রমজান আলীর সহিত নুণের আপিসে আসিয়া উপস্থিত হইল, সে মতিলাল গোস্বামী নহে—মতিয়ার রহমান। যথাসময়ে কার্ড দিয়া মতিয়ার রহমান অপেক্ষা করিতে লাগিল—ডাকও আসিল, মতির একটু ভয় হইল। যাইবে কি, যাইবে না। ইতস্ততঃ করিতেছে এমন সময় কাণে কাণে রমজান আলী কহিল "—কুছ পরোয়া নাই—চ'লে যাও—দাড়ি গোঁফ না থাকল তো কি? জিজ্ঞাসা করলে বলবে আমাদের রেওয়াজ নেই।"

অগত্যা মতিয়ার রহমান দুর্গানাম জপিতে জপিতে লবণ বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের খাস কামরায় প্রবেশ করিল।

ব্যবস্থা পরিষদের নাগরদোলায় তখন ইণ্ডিয়ান সল্ট বিল দোল খাইতেছে। খবরের কাগজে দিনকয়েক হইতে লবণ লইয়া মাতামাতি চলিয়াছে। মতি খবরের কাগজ পড়িত। লবণ সম্পর্কিত বিতর্কে পড়িয়া সরকার ও বিরোধী পক্ষ উভয় পক্ষের যুক্তিই তাহার বেশ অধিগত হইয়াছিল। কাজেই সেক্রেটারী সাহেব গবর্ণমেণ্টের সল্ট পলিসি বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই মতি ঝর্ ঝর্ করিয়া সাহেবী উচ্চারণ করিয়া কমার্স মেম্বারের বক্তৃতার খানিক অংশই আবৃত্তি করিয়া গেল। সাহেব চুরুট টানিতে টানিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শুনিতে লাগিলেন, দূরে চেয়ারে বসিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খাঁ বাহাদুর ময়েনুদ্দিন প্রশংসমান দৃষ্টিতে মতির মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার কৃষ্ণপক্ক শ্মশ্রুগুচ্ছের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। 'ইণ্টারভিউ' হইয়া গেল, আসিবার সময় খাঁ বাহাদুর মতিকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন,—"আমি তোমার জন্যে চেষ্টা করব।"

মতি 'আচ্ছা' বলিয়া সেলাম ঠুকিয়া বাহিরে আসিল।

রমজান কহিল, "কি খবর?"

মতি কহিল—"লাগবে বোধ হচ্ছে।"

রমজান হাসিয়া কহিল, "লাগবে না আবার! রমজান আলীর বুদ্ধি!"

মতি কহিল—"লাগে যদি তবে কেরামতি তোমাদেরই। এখন একবার হাইকোর্টের ট্রাম ধর। গঙ্গাস্নানটা সেরে নিয়ে যাই।"

তিন দিন পর হুকুম আসিল, মতিয়ার রহমানের চাকুরী হইয়াছে—তাহাকে মেদিনীপুর জেলায় লবণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী খাঁ সাহেব মঞ্জুর আলী মিঞার সহকারীরূপে কাজ করিতে হইবে। নিয়োগপত্রে অবিলম্বে যাত্রা করিবার আদেশ ছিল; মতি রমজানের নিকট হইতে চোগা-চাপকান আচকান পায়জামা ও এক শিশি সুরমা লইয়া কর্মস্থানে যাত্রা করিল।

খাঁ সাহেব মঞ্জুর আলী মিঞার বয়স হইয়াছিল। মাথাজোড়া টাক ও দীর্ঘ শ্মশ্রু। শ্মশ্রু দিবারাত্র মেহেদী পত্ররসে রঞ্জিত থাকিত বলিয়া তাহা

কাঁচা কি পাকা বোঝা যাইত না। বছর পনেরো পূর্বে খাঁ সাহেবের স্ত্রী-বিয়োগ হইবার পরই স্বেচ্ছায় খাঁ সাহেব মেদিনীপুর জেলায় এই গভীরতম অরণ্যসঙ্কুল স্থানে বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন। সংসারের বন্ধনের মধ্যে কন্যা জাহানারা—সে ডায়োশেসনে বি-এ পড়িত। ইচ্ছা ছিল কন্যা এম-এ পাশ করিলে তাহার বিবাহ দিয়া কর্ম হইতে অবসর লইবেন।

মতিকে খাঁ সাহেবের ভাল লাগিত। প্রথম সাক্ষাতের দিনই তিনি তাঁহার নিজের বজরায় মতিকে একটা ছোটখাট তদন্তের কাজে অন্যত্র পাঠাইলেন। নিজের শরীরটা ভাল ছিল না।

সমুদ্র হইতে মাইল তিনেক দূরে একটি জঙ্গলের ধারে একটি ছোটখাট বাড়ী সম্মুখে বাগান, তাহাতে নানাপ্রকার ফুলের গাছ। কয়েক ডজন মুর্গী গাছগুলির তলে চরিয়া বেড়াইতেছিল। তখন সন্ধ্যার প্রাক্কাল। খাঁ সাহেব বারান্দায় বসিয়া আলবোলা টানিতেছিলেন, এমন সময় মতি আসিয়া উপস্থিত হইয়া সেলাম করিল। খাঁ সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "কাজ কেমন লাগছে মতি মিঞা ?"

মতি কহিল, "ভালই। আপনি রয়েছেন মুরুব্বি, খারাপ লাগবার তো কথা নয় !"

খাঁ সাহেব বলিলেন, "আমি আপনার একটা ব্যবস্থা করবই জানবেন। যাক আপনার খানা পাকান'র আর এ বেলা কাজ নেই। হএরাণ হ'য়ে আছেন—এ বেলা এখানেই।" বলিয়া ডাকিলেন, "মজিদ"—

ডাক শুনিয়া শ্বেত-শ্মশ্রু খর্ব্বকায় বেয়ারা মজিদ বক্স কাঁধে রঙীন গামছা ফেলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "—মুর্গী বানিয়েছ ?"

মতির মুখ শুখাইল। মনে মনে তাহাদের আদিপুরুষ নিত্যানন্দ প্রভুকে স্মরণ করিয়া তাড়াতাড়ি কহিল "—না থাক, কাজ নেই। বাসাতেই ষ্টোভে দু'টো—"

কিন্তু খাঁ সাহেব কিছুতেই ছাড়িবেন না, দুহাতা পোলাও আর এক হাতা মুর্গীর দোপেয়াজা মতিকে কবুল করিতে হইবেই। শেষে অনেক অনুরোধ করিয়া মাথা ধরার দোহাই দিয়া মতি সেদিনকার মত অব্যাহিত পাইল।

মতির বাসা খাঁ সাহেবের কুঠী হইতে দেখা যায়। পরদিন প্রাতে একজন বেয়ারা সঙ্গে লইয়া খাঁ সাহেব মতির বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মতি ষ্টোভ জ্বালিয়া চা তৈয়ার করিতেছিল, খাঁ সাহেবকে দেখিয়াই অস্ফুট স্বরে কাতরোক্তি উঠিল—"হা মহাপ্রভু !"

খাঁ সাহেব আসন লইয়াই কহিলেন "—আপনার চা পানি খাওয়া অভ্যাস আছে বলেন নি তো। আমার ওখানে দুবেলা হয়।"

মতি কহিল রোজ খাইনে। কোনও কোনও দিন দরকার হ'লে একটু—"

"এখন থেকে দরকার হ'লে আমার ওখানেই যাবেন। হাত পুড়িয়ে এসব ঝঞ্ঝাট করবার দরকার নেই। বুঝলেন?"

মতি বুঝিল এবং আরও বুঝিল যে, খাঁ সাহেব তাহার প্রতি এইরূপ নেকনজর নিক্ষেপ করিতে থাকিলে বেশীদিন আর নিত্যানন্দ বংশের গৌরব করা চলিবে না। খাঁ সাহেব মতির রান্নাঘর ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলেন এবং যাইবার সময় সঙ্গের বেয়ারাকে মতির বাবুর্চির কাজে বহাল করিয়া এবং তাঁহার বাড়ী হইতে সেবেলার জন্য একটা মুর্গী ও গুটিকয়েক আণ্ডা আনিবার জন্য আদেশ দিয়া গেলেন। মতি প্রমাদ গণিল কিন্তু প্রতিবাদ করিল না; তারপর চায়ের ফুটন্ত জলে গুটিদুই শুষ্ক তুলসীপত্র ফেলিয়া দিয়া চা পান শেষ করিল।

মাসখানেক বৈষ্ণব ধর্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই মতি চলিল। তাহার বাবুর্চি এলাহি বক্সকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত ছিল না। খাবার রান্নাঘরে ঢাকিয়া রাখিবার হুকুম দিয়া সে পুঁথিপত্র লইয়া বসিত এবং এলাহি বক্স অফিসে গেলে সেগুলি বাসার পিছনের জঙ্গলে শৃগালদিগের ভোগের জন্য ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া স্নান সারিয়া ষ্টোভে আলুভাতে ভাত রাঁধিয়া জাতি রক্ষা করিত।

কিন্তু বিপদ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আসিল। পূজার ছুটিতে খাঁ সাহেবের কন্যা জাহানারা বার্ণস বায়রণ শেলী কীটস লংফেলো ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ ও সেক্সপীয়র প্রভৃতি কবিকুল তিনটি সুটকেশে ভর্তি করিয়া একদিন প্রাতঃকালে মূর্তিমতী ঊষার মত খাঁ সাহেবের আবাস বাটীতে উদয় হইলেন।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে মতির কথা শোনা খাঁ সাহেবের নেশার সামিল হইয়া পড়িয়াছিল! খাঁ সাহেবের কন্যা আসিয়াছেন শুনিয়া সঙ্কোচে সেদিন আর মতি খাঁ সাহেবের কুঠিতে যায় নাই। বেলা আটটার সময় খাঁ সাহেবের আহ্বান আসিল। মতি উপস্থিত হইয়া দেখিল বারান্দায় বেতের চেয়ারে খাঁ সাহেব ও তাঁহার সম্মুখে মেঝের উপর গালিচায় বসিয়া একটি অষ্টাদশী গৌরাঙ্গী হাসিতে হাসিতে তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে। মতি সিঁড়িতে দাঁড়াইল। খাঁ সাহেব মতিকে ডাকিলেন—"লজ্জা কিসের? উঠে এস—আমার মা জাহানারা।" তাহার পর মতির সহিত কন্যার পরিচয় করিয়া দিলেন। মতি অতি সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া ছিল কিন্তু জাহানারা নিঃসঙ্কোচে অথচ অলক্ষ্যে তাহাকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছিল। কিছুকাল কথাবার্তার পর মতি জাহানারাকে অভিবাদন করিয়া বিদায় লইল। জাহানারা

কহিল—"আসবেন বিকেলে। বাপজানের কাছে শুনেছি ইংরেজীতে আপনার খুব দখল। একসঙ্গে পড়াশুনা করব।"

মতি ভয় পাইল, কিন্তু মুখে কহিল—"ফুরসৎ পেলেই আসব।"

ফুরসৎ যথেষ্টই ছিল, কিন্তু মতি আসিল না। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মতি আপিসের মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সহসা কাহার প্রশ্ন শুনিল—"ফুরসৎ হয়নি আপনার ?"

মুখ ফিরাইয়া মতি দেখিল, বসিয়া জাহানারা—তাহার কোলের উপর খোলা একখানি বহি।

মতি বিব্রত হইয়া জবাব দিল—"আজ বেজায় ভিড় ছিল। তা' ওটা কি বই ?"

"পড়ুন না একটু।" জাহানারা বইখানি মতির হাতে তুলিয়া দিল।

মতি দেখিল, বার্ণসের কবিতা ! পড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল খুবই কিন্তু মুখে কহিল, "পড়িনি কোন দিন, পারব না।"

জাহানারা মুচকিয়া হাসিল, মতি তাহা লক্ষ্য করিল না। তারপর জাহানারা নিজেই হাইল্যাণ্ড মেরী সুর করিয়া পড়িল; মতি শুনিয়া মুগ্ধ হইল। বুঝিল, মেয়েটি কেবল মাত্র শাড়ী সেমিজ ও চুড়ী ব্রেসলেটের সমষ্টি নহে। সেদিন মতি আত্মগোপন করিয়া গেল বটে কিন্তু বেশীদিন এই কৌতুকময়ী ক্ষুরবুদ্ধি তরুণীর দৃষ্টি এড়াইয়া চলা সম্ভব হইল না।

খাঁ সাহেব মতি এবং জাহানারা একটি টেবিলকে কেন্দ্র করিয়া প্রাতঃকালে বসিয়া ছিল। জাহানারা রোমিও-জুলিয়েট পড়িতেছিল, তাহার পড়িবার ভঙ্গী, উচ্চারণ কৌশল দেখিয়া মতি নিতান্তই আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। জাহানারা পড়িতে পড়িতে এক স্থানে থামিয়া—"এখানে তিন রকম মানে" বলিয়া সে কয়েক ছত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গেল। সে যে মতিলাল গোস্বামী নহে—ম্যাট্রিকুলেশন পাশ মতিয়ার রহমান, মুহূর্ত কালের জন্য মতি সে কথা ভুলিয়া গিয়া কহিয়া উঠিল, "—না এ মানে ঠিক নয়।" তারপর রোমিও-জুলিয়েটের দুই একজন প্রসিদ্ধ সমালোচকের উক্তি উদ্ধৃত করিতে গিয়াই চমকিয়া উঠিল। করিতেছে কি ! চাহিয়া দেখিল সম্মুখে চেয়ারে জাহানারা কৌতুকের হাসি হাসিতেছে। তাহার হাসি দেখিয়া মতি একেবারেই সংকুচিত হইয়া পড়িল। জাহানারা ছাড়িল না, প্রশ্ন করিল—"আপনি এসব জানলেন কোত্থেকে ?"

মতি আম্‌তা আম্‌তা করিল—"হেড মাষ্টার পড়িয়েছিলেন।"

"ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশে এমন ক'রে সেক্সপীয়র পড়ানো হয় তা' জানতুম না তো !" জাহানারা আবার হাসিল।

মতি চাহিয়া দেখিল যে খাঁ সাহেব ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া জাহানারাকে কি একটা অর্থহীন কথা কহিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। জাহানারা আবার হাসিল।

জাহানারার কৌতুক হাস্য মতিকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেও তাহার সহজ সরল সদয় ব্যবহারে মতি তাহার প্রতি স্নেহসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। উভয়ে প্রায় সমান বয়সী। জনবিরল অরণ্য পল্লীতে সখ্যের জন্মলাভ হয় অতি সহজে। দু'টি প্রাণীর মধ্যে দিন পনেরোর মধ্যে প্রগাঢ় সখ্য বন্ধনের সৃষ্টি হইল। যতক্ষণ অবকাশ পাইত মতি খাঁ সাহেবের বাড়ীতেই কাটাইত। খাঁ সাহেব ঘুমাইতেন, জাহানারা কাব্য পড়িত, মতি শ্রোতা। মাঝে মাঝে জাহানারা হাসিয়া প্রশ্ন করিত—"ভুল হচ্ছে না তো ?" মতি অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া কহিত—"সে কি ক'রে বলব ?"

জাহানারা আবার হাসিয়া পড়া আরম্ভ করিয়া দিত।

দিন কুড়ি এই রকম লুকোচুরি খেলিয়াই চলিতেছিল। মতি বুঝিতেছিল যে, বিপদ আসন্ন। ভবিষ্যতে কি হইতে পারে তাহা কল্পনা করিয়া লইয়া সে একখানি পত্রে তাহার চাকুরীর সমস্ত বিবরণ লিখিয়া প্রস্তুত হইয়াই ছিল। প্রয়োজন হইলেই চিঠিখানি খাঁ সাহেবের কাছে পাঠাইয়া দিবে।

সেদিন প্রাতঃকালে খানকয়েক বহি হাতে করিয়া জাহানারা মতির বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মতি ষ্টোভে চায়ের জল চাপাইয়া বসিয়াছিল। জাহানারা বিনা বাক্য-ব্যয়ে ষ্টোভের কাছে আসিয়া জল নামাইয়া তাহাতে চা ভিজাইয়া চা তৈয়ারী করিতে বসিল। মতি বিব্রত হইয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "করছ কি ষ্টোভটা খারাপ, 'বার্ষ্ট' করতে পারে।"

জাহানারা তথাপি উঠিল না, হাসিয়া কহিল "বাবল্স্ উইল বার্ষ্ট।" মতি তাহার হাসি দেখিয়া ও কথা শুনিয়া দমিয়া গিয়া টেবিলের ধারে চেয়ারে নীরবে বসিয়া রহিল।

দুই পেয়ালা চা তৈয়ারী করিয়া আনিয়া জাহানারা কহিল, "—নিন্ হেল্প্ করুন এক কাপ।"

মতি কহিল "—তুমি খাও জাহান, আমি একটু পরে—"

জাহানারা হাসিয়া কহিল "খেতেই হবে আজ আপনাকে।"

মতির সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল, মনে হইল জাহানারাকে সমস্ত কথা বলিয়া তাহার পর খাঁ সাহেবের নিকট হইতে বিদায় লয়। এরূপ ছদ্মবেশে জীবন যাপন করা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। কথাটি বলিবার অভিপ্রায়ে মতি কহিল "—দেখ জাহান তুমি আমার ছোট বোনের মত।"

জাহানারা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া কহিল "—তা জানি। তবু আমার হাতে চা খেতে আপনার আপত্তি !"

মতির মুখ শুকাইল, কথা কহিতে পারিল না।

পর মুহূর্ত্তেই জাহানারা প্রশ্ন করিল "কীট্স পড়েছেন আপনি ?"

জাহানারার আজিকার কথাগুলি শুনিয়া মতির মনে হইতে লাগিল সে যেন পাহাড়ের খাদের ধারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেখান হইতে পা'

পিছলাইলেই একেবারে ছাতু। জাহানারার এ প্রশ্নের জবাব দিতে মতির সাহসে কুলাইল না।

জাহানারা কলহাস্য করিয়া একখানি কলেজ এ্যানুয়্যাল খুলিয়া কহিল, '—বাস্তবিক মতি মিঞা আপনার চেহারার সাথে এ ভদ্রলোকের চেহারার কি আশ্চর্য্য মিল!"

মতি বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া দেখিল যে মাসকয়েক পূর্ব্বে সে কিট্‌সের কাব্যাদর্শ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছিল—তাহার ফটোগ্রাফ সম্বলিত সেই প্রবন্ধটি জাহানারা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।

মতি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় পেলে?"

জাহানারা কহিল, "সঙ্গেই এনেছিলাম। প্রোফেসর বলেছিলেন যে কীটস সম্বন্ধে অল্পদিনের মধ্যে এ রকম আলোচনা আর কেউ করেনি। প্রথম দিনই আপনাকে আবিষ্কার করেছি—কিন্তু বলিনি কিছু।"

মতি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কহিল,—"জাহান তুমি আমার বোন, একটা কাজ করবে?"

মতির মুখের ভাব দেখিয়া জাহানারার হাসি নিভিয়া গেল। সে কহিল—"বলুন।"

"আমার এই চিঠিটা খাঁ সাহেবকে দেবে।"—বলিয়া তাহার চাকুরী লাভের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সম্বলিত চিঠিখানি জাহানারার হাতে দিয়া সে পুনরায় চা প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে জল আনিতে চলিয়া গেল।

যখন ফিরিল তখন দেখিল চিঠিখানা হাতে করিয়া জাহানারা হো হো করিয়া হাসিতেছে।

মতি কহিল—"হাসছ যে!"

"আপনার বুদ্ধি দেখে। এই বুদ্ধির জন্যেই আপনার চাকুরী পাওয়া উচিত—বিদ্যে না থাকলেও। তবে যাবেন না আপনি। আমার মাথায় মৎলব আছে—বলব। প্রতারণায় চাকুরী মোটেই এ নয় আপনার। আপনি যোগ্যতায় ত' কারো চেয়ে কম নন।" জাহানারা কহিল।

মতি কহিল "খাঁ সাহেবকে আমি শ্রদ্ধা করি—তাঁকে প্রতারণা করতে আমার কষ্ট হয়।"

জাহানারা কহিল "দু' দশদিন আর থাকুন না, আমিই বাপজানকে সব বলব।"—বলিয়া জাহানারা উঠিল এবং যাইবার সময় কহিল "আর লুকোচুরি খেলে কাজ নেই বরং এক দিন আমায় ইংরেজীটা একটু পড়িয়ে দেবেন—সেটা সত্যিকারের ভাইয়ের কাজই করা হবে।"

মতি হাসিয়া কহিল, "কবুল!"

কয়েকদিন জাহানারা ও মতি কি পরামর্শ করিল কেহ জানিল না। জাহানারার ছুটি ফুরাইলে সে কলিকাতায় চলিয়া গেল। তাহার দিন দুই

পর মতিও এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিল। তাহার দিন তিনেক পর কলিকাতার সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রচারিত হইল—"মৌলবী মতিয়ার রহমান লবণ বিভাগের একজন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী। তিনি গত শুক্রবার গোলতলা শুদ্ধি সভায় স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার বর্তমান নাম হইয়াছে মতিলাল গোস্বামী। ভগবান নবদীক্ষিত ভ্রাতার জীবন মধুময় করুন!"

খাঁ বাহাদুর ময়নুদ্দীন আপিসে বসিয়া লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া তাঁহার কেরাণী কর্তৃক প্রেরিত এই সংবাদ দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ মেদিনীপুরে খাঁ সাহেব মঞ্জুর আলী মিঞার নিকট আধা-সরকারী পত্র রওনা হইয়া গেল।

মতি কর্মস্থানে পৌঁছিবার পূর্বেই খাঁ সাহেবের নিকট জাহানারার পত্র গিয়া পৌঁছিয়াছিল। চন্দনচর্চিত ললাট মতিকে দেখিয়াই তিনি কহিলেন—"তুমি বাহাদুর, আমার চোখে শুদ্ধ ধূলি দিয়েছ!"

মতি মুখ নীচু করিয়া কহিল, "আপনি রাগ করেন নি?"

খাঁ সাহেব কহিলেন, "রাগ করব! জাহান এমন ক'রে লিখেছে যে পড়ে হাসতে হাসতে আমি চেয়ার থেকে পড়েই গিয়েছিলুম আর কি! সাবাস! তুমি বাহাদুর।" বলিয়া পরম উল্লাসে খাঁ সাহেব মতির পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন।

মতি চাকুরী করিতেছে। কিন্তু এখনও ধর্মত্যাগ করিলে চাকুরী ত্যাগ করিতে হইবে কি না এ বিষয়ে সুস্পষ্ট মীমাংসার জন্য খাঁ বাহাদুর ময়নুদ্দিনের সহিত চীফ সেক্রেটারীর ঘন ঘন চিঠিপত্র লেখা চলিতেছে।

জলপানি

একটা অতি সহজ গুণ-অঙ্ক বার বার ভুল করিতেছে দেখিয়া রামহরিবাবু পুত্র প্রাণহরির পৃষ্ঠে গুম করিয়া একটা কিল বসাইয়া দিয়া কহিলেন, "হতভাগা! গোল্লায় গিয়েছ একেবারে। এবার যদি জলপানি না পাও তাহ'লে নিতাই মুদীর দোকানে কাজে লাগিয়ে দেব। বোঝা টানতে আর পারব না।"

প্রাণহরি মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। বেদনায় পিঠের ঠিক মাঝখানটা টন্‌টন্ করিতেছিল, পিতার ভয়ে সেখানে হাত দিতেও সাহসে কুলাইল

না। এই সময় গোলপাতার নীচু ছাউনীর মধ্য হইতে মুখ বাহির করিয়া প্রাণহরির মা কহিল, "অমন করে ছেলেকে কেউ মারে সকালবেলা ?"

রামহরি দাঁত খিঁচাইয়া কহিয়া উঠিলেন, "নাঃ, মারে না! যে গুণের ছেলে তোমার! আজ বাদে কাল পরীক্ষে—একটা আঁক কষতে পারে না! ব'লে দিচ্ছি তোমাকে পরাণের মা, এবার যদি ছেলে তোমার জলপানি না পায়, তবে নিতাই মুদীর দোকানে লাগিয়ে দেব। কুপুষ্যি আর পুষতে পারব না! হাঃ?"—বলিয়া রামহরিবাবু চারখানার চাদরখানা ঘাড়ের উপর ফেলিয়া হন্ হন্ করিয়া একেবারে ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গেলেন।

মাতঙ্গিনী অর্থাৎ পরাণের মা ঘাড় উঁচু করিয়া নলের বেড়ার উপর দিয়া একবার পথের দিকে চাহিয়াই কহিলেন, "ঐ রে! না খেয়েই চলে গেলেন বুঝি! ডাক্ পরাণ, তোর বাবাকে! বল্ ভাত নেমেছে।" প্রাণহরি উঠিল না, মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। মাতঙ্গিনীর রাগ হইল,—তাড়াতাড়ি আসিয়া প্র্যাণহরির ঝাঁকড়া চুল মুঠা করিয়া ধরিয়া কহিলেন, "হতভাগা ছেলে! বাপ না খেয়ে চ'লে গেল তবু ওঁর অভিমান গেল না! কাজ নেই পড়াশুনো ক'রে,—যা, বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে।"

প্রাণহরি শেলটখানি উল্টাইয়া রাখিয়া বিনা বাক্যে উঠিয়া পড়িল। তাহার পর বাঁ হাতের তালুতে চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

পুত্র প্রাণহরির প্রতি রামহরিবাবুর এ অকারণ ক্রোধের হেতু ছিল। গ্রামের রামকৃষ্ণ মাইনর স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা রামকৃষ্ণবাবু প্রত্যেক ক্লাশের প্রথম ছাত্রের জন্য দুই টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম ভাগ শিক্ষার ক্লাশ হইতে গত বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ তিন বৎসর প্রাণহরি বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু গত বৎসর অকস্মাৎ রামকৃষ্ণবাবুর পৌত্র প্রাণকৃষ্ণ প্রথম হইয়া বৃত্তিটি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ফলে রামহরিবাবুর মাসিক কুড়ি টাকা আঠারো টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এবার যাহাতে পুত্র বৃত্তি পাইতে পারে তাহার জন্য রামহরিবাবু এক প্রহর বেলায় শয্যা ত্যাগের অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। আজকাল ভোরে উঠিয়াই প্রাণহরিকে পড়াইতে বসিতেন; কিন্তু অনেক করিয়াও তাহাকে অঙ্কে পাকা করিতে পারিলেন না। কাজেই প্রহার করিয়া পুত্রকে অঙ্ক-শাস্ত্রে পারদর্শী করিবার সহজ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রহারে প্রাণহরিরও কোনও আপত্তি ছিল না। সে অঙ্গে বেদনা বোধ করিত বটে, কিন্তু অভিমান কোনও দিন করে নাই। মাতঙ্গিনী ভুল বুঝিয়াছিলেন—আজও প্রাণহরি অভিমান করে নাই—তাহার হইয়াছিল ভয়। বৃত্তি না পাইলে নিতাই মুদীর দোকানে কাজে লাগিতে হইবে পিতার এই কথা শুনিয়াই সে বিভীষিকা দেখিল। স্পষ্ট চোখে পড়িল নিতাই মুদীর রক্ত চক্ষু, দোকানের ছোক্‌রা .চাকর মধুর প্রাত্যহিক নির্য্যাতন, ঝোলা গুড়ের হাঁড়ির চারি পাশে আবাল্যের ভীতির হেতু

ভীমরুলের ঝাঁক। সে বার বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল এবং মায়ের আদেশে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বাজারের পথের কুলগাছে অজস্র টোপাকুল দেখিয়াও নিতাই মুদীর দোকানের কথা ভুলিতে পারিল না। মনে হইল বৃত্তি সে পাইবে না, যেহেতু, রামকৃষ্ণবাবু সহর হইতে ইংরাজী স্কুলের মাষ্টার আনাইয়া দুইবেলা তাহাদের ক্লাশের প্রাণকৃষ্ণকে পড়াইতেছেন, সে আজকাল মোটা ইংরাজী বই হইতে অঙ্ক কষিতেছে। কাজেই আর উপায় নাই! তিন মাসের মধ্যেই তাহাকে নিতাই মুদীর দোকানের ভীমরুলের ঝাঁকের মধ্যে গিয়া বসিয়া মিছরী ওজন করিতে হইবে এবং পয়সা গণিতে ভুল হইলে মধুর মত দুইবেলা কাণমলা খাইতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে প্রাণহরির মাথায় এক বুদ্ধি খেলিল—তখন হইতে নিতাইয়ের তামাক সাজিয়া ফরমাস খাটিয়া, যদি তাহাকে কিঞ্চিৎ নরম করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে হয়তো নিতাই তাহাকে মুদীখানার দোকানে না রাখিয়া আড়তের ফরাসের চাদর ঝাড়িবার কাজে লাগাইতে পারে। সে কাজ ভাল—আড়তে ভীমরুল অথবা বোল্‌তার উপদ্রব নাই। ভাবিতে ভাবিতে প্রাণহরি দুটি টোপাকুল কুড়াইয়া লইয়া চিবাইতে চিবাইতে অন্যমনস্কভাবে বাজারের দিকে চলিয়া গেল।

২

নিতাই ময়রাকে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিয়া তাহার অনুমতিক্রমে প্রাণহরি ডাল-চালের ঝাঁকার সম্মুখে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে মধুর নিকট হইতে ওজন দেওয়া শিক্ষা করিতেছিল। বাঁ হাতের বুড়া আঙ্গুল কায়দা মাফিক পাল্লাতে ছোঁওয়াইতে পারিলে কেমন করিয়া সেরকে এক ছটাক মাল কম দেওয়া যায় মধু তাহাকে তাহাই শিখাইতেছিল। কিন্তু প্রাণহরি কৌশলটি আয়ত্ত করিতে পারিতেছিল না। শেষে বিব্রত হইয়া প্রাণহরি প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, কম না দিলে কি হয় মধুদা?"

নিতাই সদ্যঃ বঙ্কু মোহান্তের আখড়া হইতে গাঁজা টানিয়া আসিয়াছে, দাঁত খিঁচাইয়া কহিয়া উঠিল, "হয় তোর বাপের মুণ্ডু! কি হয় দে তো মোধো ওর কাণ ধ'রে বুঝিয়ে! দোকানদারী শিখতে এসেছে—যা গরু চরাগে যা।" প্রাণহরি ভয়ে মধুর নিকট হইতে দুই হাত সরিয়া বসিল। কিন্তু উঠিল না।

প্রাণহরি ভবিষ্যতের কথাই ভাবিতেছিল, এমন সময় কে ডাকিল, "তুই সকালবেলা দোকানে বসে কেন মিতে?"

প্রাণহরি মুখ তুলিয়া দেখিল প্রাণকৃষ্ণ। প্রাণহরি কথা বলিবার পূর্বেই প্রাণকৃষ্ণ পকেট হইতে কাগজে মোড়া একটি পদার্থ বাহির করিয়া কহিল, "আয়, পাটালী খাবি। মা দিয়েছে।"

প্রাণহরি ধীরে ধীরে মাচান হইতে নামিয়া আসিয়া প্রাণকৃষ্ণের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। পাটালীখানা ঠিক সমান দুই ভাগে ভাঙ্গিয়া এক ভাগ প্রাণহরির হাতে দিয়া প্রাণকৃষ্ণ কহিল, "খা! খুব ভাল পাটালী, কাল আমাদের জমিদারী থেকে এসেছে।"

প্রাণহরি পাটালী হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, খাইল না। প্রাণকৃষ্ণ কহিল, "খাচ্ছিসনে যে মিতে! কি হ'য়েছে তোর আজ?"

উত্তরের জন্য প্রাণকৃষ্ণ প্রাণহরির মুখের দিকে চাহিয়াই দেখিল প্রাণহরির চোখ ছল্ ছল্ করিতেছে। প্রাণকৃষ্ণ নিজের ভাগের পাটালীখানা মুখের কাছ হইতে নামাইয়া পকেটে পুরিয়া প্রাণহরির দুই হাত ধরিয়া কহিল, "বল্ মিতে, কি হয়েছে? নিতাই গেঁজেলটা মেরেছে বুঝি? কেন এলি ওর দোকানে?"

এত প্রশ্নের জবাব প্রাণহরি দিল না, কহিল, "দোকানদারী শিখছিলাম।"

প্রাণকৃষ্ণ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "দোকানদারী! আজ বাদে কাল পরীক্ষা, এখন দোকানদারী কিরে? পড়বিনে আর?"

প্রাণহরি কহিল, "বাবা আর পড়াবে না বলেছে!"

প্রাণকৃষ্ণ প্রশ্ন করিল, "কেন?"

প্রাণহরি বন্ধুর কাছে প্রাতঃকালের ঘটনা বিন্দুবিসর্গও গোপন করিল না। অকপটে সমস্তই কহিয়া গেল।

শুনিয়া প্রাণকৃষ্ণ কহিল, "তুই বৃত্তি পাবি মিতে! সত্যি বলছি!"

প্রাণহরি কহিল, "কেমন ক'রে? আমি যে তোর মত অঙ্ক জানিনে।"

"না জানলিই বা। আমি ফাস্ আর তুই সেকেন্ হবি।" প্রাণকৃষ্ণ কহিল।

প্রাণহরি হতাশ হইয়া কহিল, "তাতে তো আর জলপানি পাব না।"

প্রাণকৃষ্ণ কহিল, "সেকেন্ হ'লেই জলপানি পাবি। আমি দাদাবাবুকে বলব যে এবার থেকে ফাস্ আর সেকেন্, দুটো বৃত্তি দিতে হবে।"

প্রাণহরির মুখ উজ্জ্বল হইল, হাসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "পারবি?"

প্রাণকৃষ্ণ বাঁ হাতে প্রাণহরির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "বাঃ রে! পারব না আবার! আমার দাদাবাবু আমার কথা শুনবে না মিতে?"

প্রাণকৃষ্ণের কথা শুনিয়া প্রাণহরি হাসিয়া ফেলিল। তাহার পরই উভয় বন্ধু গলা জড়াজড়ি করিয়া পূর্ব্বোক্ত টোপা কুলের গাছের দিকে প্রস্থান করিল।

৩

তাহাদের ক্লাসে দুইটি বৃত্তিদানের প্রস্তাব শুনিয়া রামকৃষ্ণবাবু হাসিয়া কহিলেন, "কেন দাদু, ভয় হয়েছে, ফাষ্ট হ'তে পারবে না বুঝি ? তা হবে না কিন্তু, ফাষ্ট হওয়া চাই-ই।"

প্রাণকৃষ্ণের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগিল। ভয়ে নহে, বন্ধুর উপকারের জন্যই সে প্রস্তাব করিয়াছে, সে কথাটি সদম্ভে বলিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু সাহস হইল না, কেন না বলিতে গেলেই প্রাণহরির কথা বলিতে হইবে। এদিকে প্রজার ছেলে প্রাণহরির সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা করিতে জননী এবং পিতামহ উভয়েরই নিষেধ ছিল। কাজেই উভয়-সংকটে পড়িয়া দাদামহাশয়ের শ্লেষটি বিনাবাক্যে প্রাণকৃষ্ণ স্বীকার করিয়া লইল এবং খানিকক্ষণ ধরিয়া রামকৃষ্ণবাবুর মহাভারতখানা নাড়চাড়া করিয়া প্রস্থান করিল।

রাত্রি ন'টায় প্যাসেঞ্জার গাড়ী হুস্‌হুস্ করিয়া চলিয়া গেল, তবু আজ প্রাণকৃষ্ণের ঘুম আসিল না। বারবার প্রাণহরির কথাই মনে পড়িতে লাগিল। বৃত্তি যদি সে না পায় তাহা হইলে গাঁজাখোর নিতাই ময়রার দোকানে সে বাতাসা ওজন করিবে, আর প্রাণকৃষ্ণ তাহারই সম্মুখ দিয়া স্কুলে যাতায়াত করিবে তাহা কেমন করিয়া সম্ভব ? ভাবিতে ভাবিতে প্রাণকৃষ্ণ উঠিয়া খোলা জানালা দিয়া বাহিরে চাহিল। বাজারের সেই অশ্বত্থ গাছটা আবছায়া দেখা যাইতেছে। গত বৎসর কালীপুজোর রাত্রিতে বারোয়ারীতলায় 'দুইবন্ধু' নাটকের অভিনয় হইতেছিল। প্রাণকৃষ্ণ ও প্রাণহরি পাশাপাশি বসিয়া যাত্রা শুনিতেছিল। শেষের দিকে ভাবাবিষ্ট হইয়া দুইজনেই কাঁদিয়া ফেলিল। প্রাণকৃষ্ণ বুঝিল, জগতে যার বন্ধু নাই তাহার কেহ নাই। প্রাণহরি কি বুঝিল তাহা সে জানে না ; কিন্তু দুইজনেই একসঙ্গে ফিরিবার পথে ওই অশ্বত্থতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাণহরি ভয় পাইয়া কহিল, "এইখানটায় এলেই গা ছমছম্ করে।"

প্রাণকৃষ্ণ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ভয় কি ভাই ? আমরা দু'জনেই তো 'প্রাণ', আয়, দু'জনা বন্ধু হই !" প্রাণহরি তৎক্ষণাৎ রাজী হইল এবং দু'জনেই যাত্রার পালার বন্ধুদ্বয়ের বক্তৃতার যতগুলি কথা মনে ছিল উচ্চারণ করিয়া বন্ধু হইল। কেবল রাত্রিকাল এবং অমাবস্যা বলিয়া আকাশের সূর্য্যচন্দ্রকে সাক্ষী করিতে পারিল না। অতএব বুড়ো অশ্বত্থ গাছটাকে সাক্ষী রাখিল। সমস্ত কাহিনী ভাবিতে ভাবিতে অতি স্পষ্ট করিয়াই প্রাণকৃষ্ণের মনে হইল। তাহার চোখে জল আসিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ভাগ অঙ্কের প্রণালী ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য কেবল রামহরিবাবু প্রাণহরির পৃষ্ঠে লক্ষ্য করিয়া মুষ্টি উদ্যত করিয়াছেন, আঙ্গিনায় প্রাণকৃষ্ণ প্রবেশ করিল। রামহরিবাবু উদ্যত মুষ্টি সম্বরণ

করিলেন ; কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা প্রাণকৃষ্ণ দেখিয়া লইল। সহসা প্রভাতের সূর্য্যালোক তাহার কাছে অত্যন্ত ম্লান বলিয়া বোধ হইল। সে একবার অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে অঙ্কের খাতায় বদ্ধদৃষ্টি প্রাণহরির দিকে চাহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল এবং মার্ব্বেলের থলিতে লুকাইয়া প্রাণহরির মাতার জন্য যে নূতন আলু আনিয়াছিল, সেগুলি চৌমাথার ডোবার জলে ঢালিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিল।

স্কুলে পৌঁছিয়াই প্রাণহরি দেখিল বেঞ্চের এক কোণে প্রাণকৃষ্ণ চুপ করিয়া বসিয়া ভুগোল পড়িতেছে। প্রাণহরি কহিল, "আজ আমাদের বাড়ী সকালবেলা তুই গেছিলি মিতে ?"

প্রাণকৃষ্ণ কহিল, "হ্যাঁ।"

প্রাণহরি প্রশ্ন করিল, "কেন ?"

দাদামহাশয়ের সহিত গত সন্ধ্যায় যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহাই বন্ধুকে জানাইয়া, বন্ধুর বৃত্তিলাভের একটি সুবিধাজনক উপায় উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিবে, এই অভিপ্রায়েই প্রাণকৃষ্ণ বন্ধুর বাড়ীতে গিয়াছিল। কিন্তু প্রাতঃকালে বন্ধুর যে নির্য্যাতন সে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তাহার পর আর নিদারুণ সংবাদ সে প্রাণহরিকে দিতে পারিল না, সংক্ষেপে কহিল, "তোকে দেখতে।"

প্রাণহরি কহিল, "আর সকালবেলা যাসনি মিতে। তোদের গণশা চাকর খেজুর রস পাড়তে আমাদের বাড়ীর দিকে চেয়ে দেখছিল, তোর দাদুকে ব'লে দেবে।"

প্রাণকৃষ্ণ শুদ্ধ কহিল, "ব'য়ে গেল!" এই সময় মাস্টার আসিয়া পড়িলেন, কথাবার্ত্তা আর অগ্রসর হইল না।

ছুটির পর অকস্মাৎ প্রাণকৃষ্ণ প্রাণহরিকে বারান্দার এক কোণে ডাকিয়া নিয়া মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, "তোর বাবা তোকে মারে মিতে ?"

প্রাণহরি কহিল, "হুঁ।"

প্রাণকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

প্রাণহরি কহিল, "বৃত্তি পাইনি তাই।"

প্রাণকৃষ্ণ বলিল, "বলিস তোর বাবাকে আর তোকে মারে না যেন! বাবা জমিদারী থেকে ফিরলে তাকে বলে তোকে জলপানি দেওয়াব।"

কাল দাদামহাশয়কে বলিয়া বৃত্তিদানের প্রস্তাব ছিল, আজ আবার বাবার জন্য প্রতীক্ষা করিবার কি প্রয়োজন আছে, সে প্রশ্ন আর প্রাণহরির মনে উঠিল না। সে খুশী হইয়া কহিল, "বলব।"

সপ্তাহ পরে যখন প্রাণকৃষ্ণের পিতার চিঠি আসিল যে তিনি দুই মাসের মধ্যে ফিরিতে পারিবেন না, তখন প্রাণকৃষ্ণ একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। বন্ধুকে বৃত্তিদানের আর কোনও উপায় সে চিন্তা করিয়া উঠিতে পারিল

না। এদিকে পরীক্ষারও আর দিনসাতেক মাত্র বাকী আছে। এক রাত্রে অঙ্ক যদি সমস্ত ভুলিয়া যাইতে পারিত, তাহা হইলে বেশ হইত। কিন্তু তাহাতেও বিপদ আছে। প্রাণহরির নীচে হইলে বাড়ীর মাষ্টার গোপালবাবু তাহার কাণ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। পর্দ্দার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার মাতাও বিধু ঝির মারফতে গোপাল মাষ্টারের এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়াছেন। এখন যদি জ্বর হইয়া পড়ে তাহা হইলে সকল দিক রক্ষা হয়। কিন্তু জ্বর হয় কি করিয়া? অনেক ভাবিয়া স্থির করিল এখন দেবতা ছাড়া আর উপায় নাই।

কলুপাড়ার মা মঙ্গলচণ্ডী জাগ্রত দেবতা। মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম ও সেই সঙ্গে পাঁচ সিকা প্রণামী মানসিক করিয়া সাত দিনের জন্য অসুখের প্রার্থনা জানাইয়া প্রাণকৃষ্ণ সেদিন কিঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করিল। রাত্রে মনে হইল শীত যেন একটু বেশী বোধ হইতেছে। জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ ভাবিয়া সে দু'টি করতল কপালে ঠেকাইয়া মা মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করিল। কিন্তু সকালে কপালে হাত দিয়া দেখিল কপাল ঠাণ্ডা। বুঝিল যে বন্ধুর অদৃষ্ট মন্দ, মঙ্গলচণ্ডীর তাহার উপর দয়া নাই। তখন মঙ্গলচণ্ডী ছাড়িয়া সে বাজারের বুড়াশিবের উদ্দেশে যথেষ্ট পরিমাণ সিদ্ধি এবং কাঁচা দুধ মানৎ করিল। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। হতভাগ্য প্রাণহরির প্রতি কোনও দেবতাই প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া প্রাণকৃষ্ণের আর চিন্তার অবধি রহিল না। সমস্ত দিন প্রাণহরির শুষ্ক মুখ, রামহরিবাবুর বদ্ধ মুষ্টি, নিতাই ময়রার রক্তচক্ষু পর্য্যায়ক্রমে প্রাণকৃষ্ণের মনে পড়িতে লাগিল। পরশু পরীক্ষা, প্রাণহরি নিশ্চয়ই তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছে। বৃত্তিলাভের কোনও ভরসা নাই, এ কথা শুনিলে বন্ধুর কি অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিতেও প্রাণকৃষ্ণের গা কাঁটা দিয়া উঠিল।

সন্ধ্যায় নিতান্ত অস্থির হইয়া প্রাণকৃষ্ণ লেভেল ক্রশিং-এর রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এমন সময় দেখিল, তাহাদের বাড়ীর গরুর রাখাল বাগ্দীদের ছেলে গুপী রেললাইনের ধারে বসিয়া বাঁশের আড়বাঁশী বাজাইতেছে। গুপীকে দেখিয়াই প্রাণকৃষ্ণের মনে আশু বিপন্মুক্তির একটু ক্ষীণ আশা জাগিয়া উঠিল। গুপী জ্বরের অছিলায় মাসে আট দশ দিন কাজ কামাই করে,—জ্বর হইবার উপায় তাহার জানা সম্ভব। প্রাণকৃষ্ণ ডাকিল, "গুপী?"

গুপী মুখ ফিরিয়া প্রাণকৃষ্ণকে দেখিল। তারপর তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, "কি দাদাবাবু?"

প্রাণকৃষ্ণ কহিল, "কাউকে বলবিনে বল্? মা কালীর দিব্যি!"

গুপী তৎক্ষণাৎ শপথ করিল। প্রাণকৃষ্ণ প্রশ্ন করিল, "তুই জ্বর করিস কি ক'রে?"

গুপী ভয় পাইল। পাছে দাদাবাবু কর্ত্তাবাবুকে বলিয়া দেয় সেই ভয়ে কহিল, "জ্বর এমনি হয়!"

প্রাণকৃষ্ণ রাগিয়া উঠিল, "এমনি জ্বর কক্ষনো হয় না। সত্যি কথা বলু। কাউকে বলব না আমি।"

গুপী আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "মুন্সীদের এঁদো পুকুরে গুণে গণ্ডা আষ্টেক ডুব দিলেই জ্বর আসে দাদাবাবু। দু' বগলে পেঁয়াজ রাখলেও গা তাতে, কিন্তু পহরখানেকের বেশী থাকে না।" প্রাণকৃষ্ণ 'আচ্ছা' বলিয়া চলিয়া গেল।

সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিক দেখিয়া মুন্সীদের এঁদো পুকুরের বাঁশঝাড়ের মধ্য হইতে যখন প্রাণকৃষ্ণ বাহির হইল তখন সূর্য্য ডুবিয়াছে। পথে আসিয়া তাহার মনে হইল যে গুপী সত্য কথাই কহিয়াছে,—সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত শীত বোধ হইতেছে ও মাথাও টন্ টন্ করিতেছে। প্রভাতে গুপীকে একটা সিকি বখশিস দিবে স্থির করিয়া প্রাণকৃষ্ণ বাড়ী ফিরিল।

দুই দিন প্রাণকৃষ্ণের সঙ্গে প্রাণহরির সাক্ষাৎ হয় নাই। পরীক্ষার দিন আসিয়া প্রাণহরি তাহার বন্ধুর সন্ধান করিয়া শুনিল যে সে পরীক্ষা দিবে না। কারণ কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

স্কুল হইতে ফিরিবার পথে প্রাণকৃষ্ণের পড়িবার নীচের ঘরখানির রুদ্ধ জানালায় মুখ লাগাইয়া সে সতর্ক মৃদুস্বরে ডাকিল, "মিতে?" প্রথম আহ্বানের কোনও জবাব আসিল না। দ্বিতীয়বার ডাকিতেই পাশের একটি জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বিধু ঝি কহিল, "তেনার অসুখ গো অসুখ! বের হবেক্‌নি!"

প্রাণহরির মুখখানি ছোট হইয়া গেল। শঙ্কিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "খুব অসুখ ঝি মাসী?"

বিধু ঝি কহিল, "খুব ব'লে খুব! আকাশ পাতাল জ্বর!"

বন্ধুকে একবার দেখিবার প্রার্থনা জানাইবার পূর্ব্বেই বিধু ঝি জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

অঙ্কের পরীক্ষার দিন স্কুলের পথে প্রাণহরি সংবাদ পাইল যে প্রাণকৃষ্ণ জ্বরের ঘোরে 'জলপানি' 'জলপানি' বলিয়া চেঁচাইতেছে। সংবাদ শুনিয়াই সে বন্ধুর বাড়ীর দিকে চলিল। বাড়ীর সদর দরজার রাস্তায় সারি সারি মোটরকার দেখিয়া ভয়ে আর বাড়ীতে ঢুকিতে তাহার সাহসে কুলাইল না।

পরের কাহিনী অত্যন্ত সাধারণ।

মাসখানেক পর একদিন প্রাতঃকালে স্কুলের নোটিশ বোর্ডে পরীক্ষার

ফল টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল। প্রাণহরি প্রথম হইয়া জলপানি পাইয়াছে। প্রাণহরি সংবাদটি দেখিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও হাসিতে পারিল না। স্কুলের দরজার গায়ে লাগানো পুরাতন ছিন্নপ্রায় নোটিশের দিকে বারবার চাহিতে চাহিতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

নোটিশে লেখা ছিল,—

"অত্র স্কুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র শ্রীমান্ প্রাণকৃষ্ণ তালুকদারের জ্বর-বিকার রোগে পরলোক গমন উপলক্ষে অত্র স্কুল অদ্য তারিখ হইতে সাত দিন বন্ধ রহিল!"

ধাপ্পাবাজী

ছেলেবেলায় একটা কথা বেশ মনে আছে—খুব জব্দ হ'য়েছিলাম। হঠাৎ একদিন স্কুলের নোটিশ বোর্ডে একটা কাগজ আঁটা দেখলাম, তাতে লাল কালীতে লেখা—

"বৃন্দাবন হইতে সমস্ত বানর তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা দল বাঁধিয়া বাঙ্গলায় আসিতেছে, আগামী সোমবার স্কুলের নদীর ঘাটে প্রায় এক হাজার বানর আসিবে।"

স্কুল শুদ্ধ ছেলে চঞ্চল হ'য়ে উঠল। কেউ কেউ বানর পুষবার জন্য লোহার শিকল শুদ্ধ তৈরী করিয়া নিল। বানরের খাবার জন্য আমরা সকলে কলার খোঁজ করতে লাগলাম। গ্রামে প্রকাণ্ড কলার বাগান ছিল কামারদের, তাদের বাড়ীর এক ছেলে গোষ্ঠ পড়ত আমাদের সঙ্গে—সে বললে যে সে-ই কলা যোগাবে। প্রত্যেকটি কলার দাম তিন পয়সা। তাতেই রাজী হ'য়ে এলাম।

কিন্তু সোমবার আর আসে না! তিন চারদিন পড়াশোনা বন্ধ। রবিবার সারারাত জেগে ব'সে। সোমবার ভোর হ'তেই সবাই—প্রায় শ'দেড়েক ছেলে স্কুলের ঘাটে গিয়ে উপস্থিত। গোষ্ঠ কলার দোকান খুলে ব'সে আছে! তাড়াতাড়ি কেউ দু'টো কেউ তিনটে কলা কিনে বালুচরের উপর বসে রইলাম। বেলা এক প্রহর হ'য়ে গেল, বানরদের দেখা নেই। প্রায় দশটা যখন বাজে তখন থার্ডমাস্টার মশাই এসে সবাইকে ধমকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। বানরের খাবার নিজেরা খেতে খেতে বাড়ী ফিরে এলাম!

তখন খোঁজ পড়ল নোটীশ দিলে কে তার। শেষে অনেক কষ্টে রহস্যের উদ্ধার হ'ল। কাজটি করেছিল গোষ্ঠ নিজেই। তার একটা ফুটবল

কেনার দরকার ছিল, অনেক চেষ্টা ক'রেও সুবিধে করতে পারেনি। শেষে মাথায় এক বুদ্ধি এল। ছ' সাত কাঁদি কলা কেটে নিয়ে এক বন্ধুর বাড়ীতে লুকিয়ে রেখে সে অনেক ভেবে কলা বিক্রির এই উপায় স্থির করল। তারপরেই যা ঘটল তা বলেছি। গোষ্ঠর অবশ্য কলা বিক্রি হ'ল, ফুটবল কেনাও হ'ল, কিন্তু যে উপায়ে সে এ কাজটি করল সেটি হচ্ছে ধাপ্পাবাজী।

কাজটি ভাল নয় তবু এ কাজটি বারবার সব দেশে চলে আসছে। 'এপ্রিল ফুল' কথাটা সম্ভবতঃ সবাই শুনেছ। এপ্রিল মাসের প্রথম দিনটাই লোক ঠকানোর দিন। আমাদের দেশে খুব বেশী হয় না বটে কিন্তু বিলাত এবং অন্যান্য অনেক দেশে পহেলা এপ্রিল তারিখে একজন আর একজনকে ধাপ্পা দিয়ে বোকা বানানোর চেষ্টা করে। এই ধাপ্পাবাজীতে যারা ঠকে তাদিকে বলে 'এপ্রিল ফুল'।

এ দিন ছাড়া অন্য দিনে যে কেউ কাউকে ধাপ্পা দেয় না এমন নয়। সময়ে অসময়ে নিজের সুবিধে অথবা নিঃস্বার্থভাবে একজন আর একজনকে ঠকাবার জন্যেই অনেক ধাপ্পা দেয়। কোনও কোনও সময়ে এমনও ঘটেছে এক ধাপ্পায় এক আধজন লোক নয় সহর শুদ্ধ লোক জব্দ হ'য়েছে। এর গল্পও আছে অনেক।

নেপোলিয়নের নাম নিশ্চয় শুনেছ। তিনি যখন বন্দী হ'য়ে সেণ্ট হেলেনায় যান সে সময় বিলাতের এক সহরে হঠাৎ একদিন এক বিজ্ঞাপন বিলি হ'ল। তাতে ছাপা—বিড়াল আবশ্যক। সেণ্ট হেলেনায় অত্যন্ত ইঁদুরের উৎপাত হওয়াতে সরকার সেখানে বিড়াল পাঠাবেন স্থির করেছেন। বিজ্ঞাপনদাতার প্রতি বিড়াল কিনবার ভার দেওয়া হ'য়েছে। যাঁদের বিড়াল আছে অমুখ তারিখে তাঁরা যেন নিয়ে আসেন, প্রত্যেক বিড়ালের জন্যে ষোল শিলিং অর্থাৎ প্রায় বারো টাকা দেওয়া হবে। বিজ্ঞাপনের নীচে নাম ও ঠিকানা দেওয়া ছিল।

বিড়াল কিনবার যে তারিখ দেওয়া ছিল সে দিন সে কি ভিড়! সকাল থেকে ক্রমাগত ঝোলা কাঁধে নিয়ে লোক আসছে সকলের ঝোলাতেই একটি দু'টি বিড়াল। সহরে কেবলই মিঁউ মিঁউ শব্দ! শেষে এমন অবস্থা হ'ল যে লোক সরাবার জন্য পুলিশ শুদ্ধ এসে উপস্থিত। বিড়ালের মালিকরা অধীর হ'য়ে বিজ্ঞাপনদাতাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল, কিন্তু তাঁর কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। ঠিকানা দেওয়া ছিল একটা পোড়ো বাড়ীর। শেষে সে বাড়ীর দরজা জানলা ভেঙ্গে বিড়াল-ওয়ালারা বিড়াল সেখানে ছেড়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। হাসির কথা বটে, কিন্তু এ ঘটনার শেষটা বড় দুঃখের। পরদিন দেখা গেল হাজারখানেক বিড়ালের মৃতদেহ সেই সহরের ধারের নদীতে ভাসছে—তারা সব নদী সাঁতরিয়ে ফিরে যাবার মৎলব করছিল কিন্তু জল ছিল অত্যন্ত ঠাণ্ডা, নদী পার হ'তে পারেনি।

আর একবার হুক নামে একটি ভদ্রলোক বাজী রেখে এক কাণ্ড ক'রে বসেন তাতে লণ্ডন সহর শুদ্ধ তোলপাড় হ'য়ে যায়। এমন ধাপ্পার কথা বিশ্বাস করা মুস্কিল, কিন্তু না ক'রে উপায় নেই, কারণ যাঁরা এ ব্যাপারে জব্দ হ'য়েছিলেন তাঁরা অনেকেই খুব বড়লোক এবং তাঁরাই ঘটনাটির কথা সবিস্তারে লিখে গেছেন। এই ধাপ্পার নাম দিয়েছিল লোকে 'বার্ণার্স ষ্ট্রীটের ধাপ্পা'। ইংরাজী ১৮০৯ সালের ঘটনা হ'লেও লোকের মুখে মুখে আজ পর্য্যন্ত এর গল্প চলে আসছে। ব্যাপারটা কেমন ক'রে ঘটল, বলছি।

থিওডোর হুক নামে একটি ভদ্রলোক একদিন তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে বার্ণার্স ষ্ট্রীট দিয়ে আসছেন এমন সময় বন্ধুটি একখানা বাড়ীর দিকে চেয়ে বললেন, "দেখছ হুক বাড়ীটার অবস্থা! সেদিন মালিক মারা গেছেন, বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করছে!"

হুকের মাথায় কি খেয়াল ঢুকল, বললেন "আজ খাঁ খাঁ করছে বটে, বল যদি তবে দিনকয়েকের মধ্যেই বড়ীতে লোকজন জম্‌জম্‌ করবে এমন ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি।"

বন্ধুটি তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, "বটে! দেখি তোমার কেরামতিটা একবার! ক'রে দেখাও।"

হুক বললেন, "আচ্ছা, দেখাব।"

এক সপ্তাহ আর হুক ঘর থেকে বের হ'লেন না। কি করলেন তিনিই জানেন। সপ্তাহ পর একদিন হুক তাঁর বন্ধুকে ডেকে বললেন, "বন্ধু এস তো মজা দেখাই।"

তারপর তাঁর বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বার্ণার্স ষ্ট্রীটের সেই বাড়ীটার সামনের এক বাড়ীতে এক জানালার ধারে দু'জনা এসে বসলেন।

একটু বেলা হ'তেই বিচিত্র রকমের লোক এসে বাড়ীর সামনে জড় হ'তে লাগল। গাড়ী বোঝাই হ'য়ে ভাল ভাল লেপ তোষক, ফুলের মালা, পিয়ানো, খাট পালঙ্ক সব আসতে লাগল। মুটের মাথায় কেক রুটী মাখন পনীর প্রভৃতি খাবার সরঞ্জাম এল, কশাইরা দলে দলে মাংস নিয়ে আসতে লাগল—সে এক অদ্ভুত কাণ্ড! বাড়ীর মালিকের স্ত্রী ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে ভয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। লোক জন সব চীৎকার সুরু করে দিল। এই সময় বড় বড় ডাক্তার, উকীল সব গাড়ী ক'রে আসতে লাগলেন, বাড়ীর সামনে রীতিমত হাট ব'সে গেল। ব্যাপার চরমে উঠল যখন নিমন্ত্রণের চিঠি পেয়ে স্বয়ং প্রধান সেনাপতি আর সহরের লর্ড মেয়র শুদ্ধ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে উপস্থিত হ'লেন! তাঁরা অবস্থা দেখেই বুঝলেন ব্যাপারটি নিছক ধাপ্পা। সে কথা লোকজনকে বলতেই তারা ইঁট আর লাঠির ঘায়ে বাড়ীর দরজা জানালা ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। কিন্তু পুলিশ

এসে পড়াতে আর ব্যাপার বেশী দূর গড়াল না। কি হয়েছিল তোমরা তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। হুক এক সপ্তাহ ধ'রে দোকানদারদের কাছে ওই বাড়ীখানার ঠিকানা দিয়ে নানা রকম জিনিষের অর্ডার দিয়েছিলেন এবং সহর শুদ্ধ বড় লোকদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। উকীলের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য আর ডাক্তাররা রোগী দেখবার ডাক পেয়েছিলেন। এমন ক'রেই সব চিঠি লেখা হ'য়েছিল যে কেউ অবিশ্বাস করতে পারেনি। এই ঘটনায় সহর এরকম তোলপাড় হ'য়ে উঠেছিল যে হুক কিছু দিনের মত অসুখের অছিলায় সহর ছেড়ে যেতে বাধ্য হ'য়েছিলেন।

'টাইমস্' নামে বিলাতের একখানা খুব বড় কাগজ আছে। যখনকার কথা বলছি তখন তাঁর সম্পাদক ছিলেন মিঃ বার্ণেস। তাঁর সঙ্গে লর্ড ব্রুহাম নামে একটি ভদ্রলোকের কিছু মনোমালিন্য ছিল। লর্ড ব্রুহাম ছিলেন আইনজীবি মানুষ—খুব তীক্ষ্মবুদ্ধি আর বিচক্ষণ; তিনি অনেকদিন থেকেই বার্ণেসকে বোকা বানাবার চেষ্টায় ছিলেন। বার্ণেস সে কথা না জানতেন এমন নয় কিন্তু শেষকালে ব্রুহামের বুদ্ধির কাছে তাঁকে হারতে হ'ল। হঠাৎ একদিন লর্ড ব্রুহামের বাড়ী থেকে লণ্ডনে তাঁর এক বন্ধুর কাছে চিঠি এল যে লর্ড ব্রুহাম মারা গেছেন। ২১শে অক্টোবর লণ্ডনে খবর এল আর ২৬শে তারিখে সমস্ত খবরের কাগজে লর্ড ব্রুহামের মৃত্যুসংবাদ আর জীবন-চরিত ছাপা হ'য়ে গেল। বার্ণেসের যেন কথাটা কেমন লাগল, তিনি আর কিছু লিখলেন না। মতের মিল না থাক তবু অত বড় লোকের মৃত্যুসংবাদ পেয়েও বার্ণেস কিছু লিখলেন না দেখে অনেক কাগজে তাঁকে ধিক্কার দিতে লাগল। বার্ণেস তবু আর একদিন অপেক্ষা করলেন। শেষে ২৮শে তারিখের কাগজে লর্ড ব্রুহামের মৃত্যুবার্ত্তা ছেপে তিনি অত্যন্ত তীব্র ভাষায় তাঁর জীবনের সমস্ত কাজের সমালোচনা করলেন। যেদিন টাইমসে এই খবর আর আলোচনা বেরুল তার পরদিনই লর্ড ব্রুহাম সশরীরে এসে লণ্ডনে উপস্থিত। বার্ণেসের তো চক্ষু স্থির! এই ঘটনার পর কিছুদিন লোকের টিট্‌কারীর ভয়ে বার্ণেস গা ঢাকা দিয়েছিলেন।

ডীন সুইফট্ ছিলেন খুব বড় একজন লেখক। তাঁর সব বই না হোক্, 'গালিভারস্ ট্র্যাভেলস্'খানা সম্ভবতঃ তোমাদের অনেক পড়ে থাকবে। ইনি একবার এক ধাপ্পা দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর ফল হ'য়েছিল খুব ভালো।

তখন বিলাতে রাস্তাঘাটে রাত্রে একা চলাফেরা করা ছিল মহা বিপদের কথা। খুন, জখম, রাহাজানি প্রায় প্রতিদিনকার ব্যাপার ছিল। সুইফট্ অনেক দিন থেকেই এর প্রতিকারের উপায় ভাবছিলেন। ভেবে ভেবে সুইফট্ একদিন 'শেষকথা' শিরোনাম দিয়ে একখানা কাগজ ছেপে পথে ঘাটে বিলি ক'রে দিলেন। তার নীচে নাম ছাপা রইল 'এলিস্টোন'। লোকে

বুঝল যে এলিণ্টোন নামে একজন ডাকাত ফাঁসি হবার আগে তার 'শেষকথা' ব'লে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। কাগজে ছাপা ছিল,—"আমি মরিতেছি কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে দশের ও দেশের কিছু উপকার করিয়া গেলাম। আমি যাহাদের সহিত চুরি ডাকাতি করিয়াছি, যারা চোরাই মাল রাখে, যারা আমাদের আশ্রয় দেয় ও সাহায্য করে,—তাদের সকলের নাম এবং তারা এ যাবৎ যত অপকর্ম্ম করিয়াছে তার তালিকা করিয়া আমি কোনও বিশিষ্ট ভদ্রলোকের কাছে রাখিয়া গেলাম। আমার অনুরোধে ভদ্রলোক প্রতিজ্ঞা করিলেন যে চুরী ডাকাতি রাহাজানী অপরাধে অতঃপর যাহারা ধরা পড়িবে তাহাদের নাম তালিকার নামের সঙ্গে মিলাইয়া দেখা হইবে এবং নাম মিলিলে সমস্ত তালিকাটি তিনি পুলিশের কাছে পাঠাইয়া দিবেন।"

আসলে 'এলিণ্টোন আর তার শেষ কথা' ডীন সুইফটের ধাপ্পা। কিন্তু এতে সুফল হ'য়েছিল। 'এলিণ্টোনের শেষ কথা' প্রচার হবার পর অনেক দিন ধ'রে বিলাতের রাস্তাঘাটে আর চোর ডাকাতের উপদ্রবের কথা শোনা যায়নি।

লাউডগা

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী অকস্মাৎ একটি কুকার্য্য করিয়া বসিলেন।

প্রতিবেশী বদন ঘোষের পোষা পাঁঠা কেলোকে ঢেঁকির মুগুর দিয়া এমনই প্রহার করিলেন যে বেচারীকে আর ঘোষের বাড়ী ফিরিতে হইল না, ঠাকুরাণীর খিড়কির পুকুরঘাটেই সে 'ভ্যা' করিয়া জন্মের মত চক্ষু মুদিল। পাড়ায় হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী দাওয়ায় আসন পাতিয়া তাঁহার জপের মালা লইয়া বসিয়া ছিলেন এই সময় স্বয়ং বদন ঘোষ পাড়ার আর দুইজন মাতব্বর সহ ঠাকুরাণীর বাড়ীর আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া ঠাকুরাণীর এই অদ্ভুত আচরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা মাত্র ষষ্ঠী ঠাকুরাণী একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, —"মেরেছি! বেশ করেছি! ধান খায় কলাই খায় কিছু বলিনে তাতে, কিন্তু আমার ওই লাউগাছটা—এসে রোজ তার কচি পাতাগুলো মুড়িয়ে খাবে, আঃ মরণ!

বদন ঘোষ পঞ্চায়েতে ঠাকুরাণীর নামে নালিশ করিবার ভয় দেখাইয়া সঙ্গিদ্বয় সহ প্রস্থান করিল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী জপের মালা রাখিয়া তাঁহার

লাউ-মাচার তলে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট ভাবে লাউগাছটির অবস্থা পুনরায় পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, তাহার পর গোবর-মাটি লইয়া কেলোর চর্ব্বিত স্থানটিতে প্রলেপ দিয়া স্বর্গীয় ছাগশিশুর উদ্দেশে দ্বিতীয় বার অভিসম্পাত বাণী উচ্চারণ করিলেন।

২

ঠাকুরাণী সত্য কথাই কহিয়াছিলেন। তাঁহার কুটীরের আঙ্গিনায় পল্লীর যাবতীয় চতুষ্পদ প্রাণীর অবাধ গতিবিধি ছিল। তাহারা সুবিধা পাইলেই ঠাকুরাণীর ধান চাল মায় বৈকালিক আহারের ফলমূল পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিয়া যাইত, তাহাতে ঠাকুরাণীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে কেহ কোন দিন দেখে নাই কিন্তু ওই লাউগাছটি! লাউ-মাচার নীচে গোবৎস অথবা ছাগবৎস আসিলে তাহার আর রক্ষা ছিল না। ঠাকুরাণী সবেগে তাহার প্রতি ধাবিত হইতেন—তাহারা পলাইয়া যদি বা বাঁচিত কিন্তু তাহাদের মালিকরা এই মারাত্মক অপরাধের জন্য বুড়ী ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর বাক্যযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। সে দিন চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর পাখুরা বাছুর ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর লাউগাছের দু'টি কচিপাতা চর্ব্বণ করিয়াছিল; ঠাকুরাণী তাহাকে তাড়া করিয়া চক্রবর্ত্তী-বাড়ী পর্য্যন্ত আসিলেন এবং অপরাধীকে না পাইয়া চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীকে আধ ঘণ্টা ধরিয়া তিরস্কার করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাড়ীতে ফিরিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন—বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার সেদিন আর মাধ্যাহ্নিক আহার হইল না।

লাউগাছটির উপর ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর এই উৎকট মমতার একটি হেতু ছিল।

বৎসর দুই পূর্ব্বেকার কথা। একদিন ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর 'শিবরাত্রির সলিতা' দৌহিত্র শ্রীমান নিতাই জেলেপাড়ায় তাহার প্রাতঃকালীন ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে দত্তদের ছোট বাড়ীতে দেখিল যে, তাহার বন্ধু শ্রীচরণ তেল লঙ্কা লাউডগা সিদ্ধ ও লাউঘণ্ট সহযোগে একথালা মাড়ভাত উঠানে বসিয়া পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিতেছে। সহসা লাউডগা সিদ্ধ ও লাউঘণ্টের প্রতি নিতাইয়ের দারুণ লোভ জন্মিল। সে দাঁড়াইয়া শ্রীচরণের আহার দেখিতেছে এমন সময় মুখ তুলিয়া শ্রীচরণ নিতাইকে দেখিল। পরক্ষণেই একগ্রাস ভাত শুঁকিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া শ্রীচরণ কহিল—"তুই চোখ দিচ্ছিস নিতাই!"

নিতাই আহত হইল। তারপর তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল—"আমার দিদিমা লাউঘণ্ট রাঁধে না বুঝি?"—বলিয়া নিতাই চলিয়া গেল।

বাড়ীতে গিয়াই নিতাই ষষ্ঠী ঠাকুরাণীকে কহিল—"আমাকে লাউডগা সিদ্ধ আর লাউঘণ্ট দিয়ে মাড়ভাত রেঁধে দে শীগ্‌গির দিদিমা!"

তখন বেলা এক প্রহর। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী অলাবুর সন্ধানে বাহির

হইলেন এবং দশ বাড়ী ঘুরিয়া রিক্ত হস্তে ফিরিলেন। নিতাই ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিল। স্নান সারিয়া বাড়ীতে ফিরিয়াই কহিল—"খিদে পেয়েছে ভাত দে শীগ্‌গির!"

ভাতের থালার সম্মুখে বসিয়া নিতাই দেখিল লাউডগা সিদ্ধ ও লাউঘণ্ট নাই। তখন সে কাঁদিয়া কাটিয়া ভাতের থালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উঠিল।

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন—"এখনও লাউ হয়নি যে দাদু! আমি পাড়াময় খুঁজে এসেছি।"

নিতাই কহিল—"তবে ছিচরণ খাচ্ছিল কি করে?"

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী সে সন্ধান জানিতেন, কহিলেন—"মহকুমার হাট থেকে কাল দত্ত-বাড়ীর বাবু আদালত ফেরতা কিনে এনেছে।"

"তবে তুইও সেখান থেকে কিনে আন্!"—বলিয়া নিতাই হাত ধুইতে বসিল। অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া গুড় অম্বল মাখিয়া সেবেলার মত ষষ্ঠী ঠাকুরাণী ভাত খাওয়াইলেন এবং সন্ধ্যাকালে গণেশ মাঝির হাতে একশ' পৈতা দিয়া পর দিনের মহকুমার হাট হইতে লাউ কিনিয়া আনিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। গণেশ চার পয়সা পুরস্কারের লোভে মহকুমায় যাত্রা করিল।

পরের দিন সন্ধ্যাকালে একশ' পৈতা বেচিয়া গণেশ একটি বৃহদাকার অলাবু লইয়া উপস্থিত হইল। রাত্রে খাইতে বসিয়া নিতাই কহিল—"এই যে লাউঘণ্ট! লাউডগা সিদ্ধ কই দিদিমা?"

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী কহিলেন—"এখনও তো গাছ বড় হয়নি দাদু—এ পুরাণো গাছের লাউ। আসছে বছর বাড়ীতে গাছ ক'রে লাউডগা সিদ্ধ আর ঘণ্ট রেঁধে খাওয়াব, বুঝলি?"

নিতাই খুসী হইয়া আহার সমাপ্ত করিল।

পর বৎসর নিজের হাতে বাঁশের বাখারি করিয়া বেড়া দিয়া ষষ্ঠী ঠাকুরাণী তিন রকম লাউয়ের বিচি পুঁতিলেন। চারা হইল। গাছ তিনটি দাঁড়া আশ্রয় করিয়া মাচার দিকে উঠিয়াছে সেই সময় হঠাৎ একদিন নিতাইয়ের পিতামহের মাসতুত ভাই পাশের গ্রামে জমিদারী পরিদর্শনের অবকাশে আত্মীয়া ষষ্ঠী ঠাকুরাণীকে দেখিতে আসিলেন। নিতাই তখন পাড়ার সকল বাড়ী হইতে লক্ষ্মীপূজার ভুজা সংগ্রহ করিয়া আঙ্গিনার আমতলায় পা ছড়াইয়া বসিয়া নিবিষ্ট মনে চর্ব্বণ করিতেছিল। মাসতুত ভ্রাতার কুল-প্রদীপকে সেই অবস্থায় দেখিয়া আগন্তুক রোহিণীবাবু ষষ্ঠী ঠাকুরাণীকে তাহার সম্বন্ধে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে শ্রীমান নিতাইচরণের

তখনও পুরোপুরি অক্ষর পরিচয় হয় নাই। দরিদ্র আত্মীয়ের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া রোহিণীবাবু তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে নিতাইকে রাখিয়া পড়াইবার প্রস্তাব করিলেন। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন কিন্তু নিতাইয়ের হাকিম হইবার কল্পনায় আর রোহিণীবাবুর প্রস্তাবে বাধা দিলেন না।

কাজেই নিতাই কলিকাতায় গেল। গত বৎসর যখন লাউমাচা সবুজ লতায় আর সাদা ফুলে ভরিয়া গেল তখন ষষ্ঠী ঠাকুরাণী একবার অশ্রু মুছিয়া কহিলেন, "পোড়ারমুখো গাছের কপালে খ্যাংরা মারি—মরেও না ছাই!" কিন্তু বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার অভিসম্পাত সহিয়াও গাছ মরিল না, ফলও হইল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী তখন একদিন আমুল গাছ তিনটিকে ছেদন করিয়া লাউ আর লাউ-ডগাগুলি প্রতিবেশীদের মধ্যে বিলাইয়া কাঁথা বিছাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

গত বৎসর পড়াশুনায় ক্ষতি লইবে বলিয়া রোহিণীবাবু নিতাইকে বাড়ী পাঠান নাই—এবার পৌষে বড়দিনের ছুটিতে নিতাই বাড়ী আসিবে এই কথা ষষ্ঠী ঠাকুরাণীকে জানাইয়াছেন।

এই সংবাদ পাইবামাত্র ষষ্ঠী ঠাকুরাণী কলুবাড়ী হইতে ভাল লাউয়ের বিচি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং নিজহাতে বিচি পুঁতিয়া বেড়া দিয়া পূর্ব্ব বৎসরের মত এক গণ্ডা হাঁড়িতে কালীচুণ মাথাইরা লাউগাছের রক্ষণাবেক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন। পূর্ব্বে ঠাকুরাণী সন্ধ্যায় পল্লীভ্রমণে বাহির হইতেন কিন্তু লাউচারা দাঁড়া বাহিয়া উঠিবার পর হইতেই সে অভ্যাস ত্যাগ করিয়া মাচার নীচে মাদুর বিছাইয়া সন্ধ্যাকালটি পৈতা কাটিবার কাজে সেইখানেই ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রকম একটি দিনে বদন ঘোষের পাঁঠা কেলো এই লাউ গাছে দন্তবেধ করিবার অপরাধে ঠাকুরাণীর লগুড়াহত হইয়া পঞ্চত্ব পাইল।

বদন ঘোষকে তিরস্কার করিয়া ষষ্ঠী ঠাকুরাণী বিদায় করিয়া দিলেন বটে কিন্তু সমস্ত দিন পাঁঠাটির আর্ত্তনাদ তাঁহার কাণে বাজিতে লাগিল। শেষে সন্ধ্যাকালে ছিদাম মুদির দোকানে দুইটি কলসী বাঁধা দিয়া ষষ্ঠী ঠাকুরাণী গুটিতিনেক টাকা সংগ্রহ করিলেন এবং বদনের ছেলের হাতে টাকা তিনটি গুঁজিয়া দিয়া জীবহিংসাজনিত অনুতাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। কেলোর ভবিষ্যৎ উৎপাত হইতে লাউগাছ কয়টি অব্যাহতি লাভ করিল ভাবিয়া একটু আনন্দ না হইল তাহাও নহে।

শেষে গত বৎসরের মত এবারও লাউমাচা সাদা ফুলে ভরিয়া উঠিল—তাহার পর ফল। নিতাই বাড়ী আসিলে যে লাউটি ষষ্ঠী ঠাকুরাণী আগে কাটিবেন তাহাতে একটি চুণের ফোঁটা দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিলেন।

দেড় বৎসর পর নিতাই বাড়ী আসিয়াছে।

খাইতে বসিয়া নিতাই তাহার থালার পার্শ্বে স্তূপীকৃত সিদ্ধ লাউডগার উপর অঙ্গুলি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এগুলো কি রেঁধেছ দিদিমা?"

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী পরম উৎসাহের সঙ্গে হাসিয়া কহিলেন—"তোর লাউডগা সেদ্ধরে দাদু! বাড়ীর গাছের—"

নিতাই বাধা দিয়া কহিল—"তুলে নে, ওসব জঙ্গল আমরা কলকাতায় খাইনে। দু'বেলা আলু পটোলের ডাল্‌না—মুড়িঘণ্ট—"

অকস্মাৎ ষষ্ঠী ঠাকুরাণী উঠিয়া গেলেন দেখিয়া আর নিতাই আহারের পুরা ফর্দটি তাহার দিদিমাকে শুনাইতে পারিল না।

আহারান্তে হাত ধুইতে বসিয়া নিতাই দেখিল ষষ্ঠী ঠাকুরাণী ভোঁতা বঁটিখানা দিয়া লাউমাচার নীচে দাঁড়াইয়া গাছের গোড়ায় ক্রমাগত আঘাত করিতেছেন। পকেট হইতে জাপানী সিল্কের রুমালখানা বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে নিতাই ষষ্ঠী ঠাকুরাণীকে ডাকিয়া কহিল—"ও কি করছিস দিদিমা?"

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী মুখ না ফিরাইয়াই কহিলেন—"জঞ্জাল রে জঞ্জাল! বাড়ীটা একেবারে এঁদো ক'রে দিয়েছে।"

"তাই ভর দুপুরবেলা বাড়ী সাফ করছিস্!" বলিয়া নিতাই হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী ফিরিয়াও চাহিলেন না।

মরণ-চুম্বন

গ্রামের লোকে তাহাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না। নবাবের ফৌজে সে কাজ করিত বলিয়া সকলে তাহাকে নবাবের নফর আখ্যা দিয়াছিল। বৃদ্ধেরা তাহাকে ছুঁইলে স্নান করিত—বিধবারা প্রাতঃকালে তাহার মুখ দেখিলে হাঁড়ি ফেলিয়া দিতেন। এত লাঞ্ছনা, এত বিদ্রূপ সকলই সে হাসিমুখে সহ্য করিয়াছে। সে কাহারও বাড়ীতে যাইত না, প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু আজ সে বড় প্রয়োজনেই লক্ষ্মী দাসের বাড়ীতে আসিয়াছে। লক্ষ্মী দাসকে প্রণাম করিবামাত্রই তিনি পা সরাইয়া লইলেন, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দরকার তোমার?"

দুলাল নম্র কণ্ঠে উত্তর করিল "কিছু টাকা চাই—"

"টাকা! ও সব আমার এখানে হ'বে না।"

দুলালের চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল, আজ বড় প্রয়োজন তার। সংসারে তার একমাত্র আত্মীয় মা। বাল্যাবধি সে মা ছাড়া আর কাউকে চিনে না, কাহারো সহিত তার পরিচয় নাই। পিতা বহুকাল মৃত। মায়ের স্নেহে,

মায়ের আদরেই সে বাড়িয়া উঠিয়াছে, মায়ের ভিক্ষালব্ধ অন্নে তাহার জীবন বাঁচিয়াছে। সেই মা আজ অনাহারে মৃতপ্রায়। অর্থ নাই—বৈদ্যের দর্শনী দিবার সামর্থ্য কোথায়!

দুলাল বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "কিছু ভিক্ষা দিন, মায়ের অসুখ, আজ তিন দিন খায়নি।"

লক্ষ্মীদাস ধনী, মানুষের কথায় তাহার বিশ্বাস ছিল না—তিনি পরুষ-কণ্ঠে উত্তর করিলেন—"তোমার মা তিন দিন খায়নি তা আমার কি, যাও আমার বাড়ী থেকে, নবাবের গোলাম!"

নবাবের গোলাম, তা ঠিক! কিন্তু কেন সে নবাবের দাসত্ব করিয়াছে! উদরের জন্য নয় কি? যখন সে গ্রামের প্রতিগৃহদ্বারে অন্নমুষ্টির জন্য ক্ষুধিত কুক্কুরের মত লালায়িত হইয়া ঘুরিয়াছে তখন কেহ তো তাহাকে এক মুষ্টি অন্ন দেয়নি, তাহার স্নেহময়ী জননীর চরিত্রে মিথ্যা কুৎসা রটনা করিয়া গ্রামবাসী তাহাকে উপহাস করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। যেন সে কত হীন! এক মুহূর্তে সকল কথা হতভাগ্য দুলালের মনে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার কন্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে, সে উত্তর দিল না। লক্ষ্মীদাসের পার্শ্বোপবিষ্ট বৃদ্ধ গণেশ দাস যখন বলিলেন, "মাকে ফৌজদারের কাছে বাঁধা রাখলেই টাকার যোগাড় হ'তে পারে", দুলাল তখন গ্রাম্যপথে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

২

তৈলাভাবে গৃহদীপ নির্বাপিত প্রায়। ঈষদুন্মুক্ত বাতায়নপথে চন্দ্ররশ্মি আসিয়া শয্যায় পড়িয়াছে। সেই ম্লান আলোকে শীর্ণা বৃদ্ধার মূর্তি অতি ভীষণ দেখা যাইতেছিল। শুভ্র কেশরাশি ছিন্ন উপাধানের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; নিঃশ্বাসে বক্ষ কাঁপিতেছে যেন পঞ্জর লোল চর্মের ভিতর দিয়া আপনার মূর্তি প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছে। বৃদ্ধা নিদ্রায় অচেতন। দুলাল নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিয়া মায়ের দিকে চাহিল, এই তার মায়ের অবস্থা! অশ্রুতে তাহার চক্ষু ভরিয়া গেল! পুত্র বাঁচিয়া থাকিতে জননী অনাহারে মৃত্যুর কবলে যাইতে বসিয়াছেন। দুলাল আর উঠিতে পারিল না, পালঙ্কে মায়ের পদতলে বসিয়া পড়িল। বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বাবা দুলাল? টাকা পেলি?"

দুলাল কি উত্তর দিবে! কেমন করিয়া সে জানাইবে সে প্রত্যাখ্যাত হইয়া রিক্ত হস্তে ফিরিয়াছে! তবু বলিতে হইবে! দুলাল কম্পিত-স্বরে কহিল, "না মা পাইনি।"

জননীর অপাঙ্গ বহিয়া অশ্রু ঝরিল। মায়ের অশ্রু! দুলালের আর সহ্য হইল না, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মা আমি নবাবের গোলামী

করি ব'লে কেউ আমাকে টাকা দিলে না, দেখি চুরি করলে টাকা মিলে কি না !"

দুলাল উঠিয়া দাঁড়াইল। সহসা ও কি : সোপানে কার পদশব্দ ! তাহার বাড়ীতে আজ কে আসে ! দ্বার খুলিয়া গেল—কে ও, সাবিত্রী দেবী ? লক্ষ্মীদাসের পুত্রবধূ তাহার গৃহে কেন ? দুলাল জিজ্ঞাসু-নেত্রে তাহার পানে চাহিল। সাবিত্রী দেবী কহিলেন, "দুলাল চুরি করবে কেন ? আমি তোমাকে টাকা ধার দেব !"

দুলাল নির্বাক ! লক্ষ্মীদাসের পুত্রবধূ তাহাকে টাকা ধার দিবে এ যে স্বপ্নের অগোচর ! সাবিত্রী দেবী অঞ্চলপ্রান্ত হইতে টাকা বাহির করিলেন—দুলাল হাত পাতিল। সাবিত্রী দেবী টাকা দিয়া বৃদ্ধার পার্শ্বে বসিলেন, বৃদ্ধা তখন নিদ্রিতা। দুলাল টাকা লইয়া বৈদ্যের গৃহে ছুটিল। পথে যাইতে যাইতে ভাবিল, আমার গৃহে এত রাত্রে সাবিত্রী দেবী কেন আসিলেন ? চারিদিকে লোলুপ ফৌজদারের অসংখ্য অনুচর ঘুরিতেছে ; একবার যদি তাহারা সন্ধান পায় তাহা হইলে সাবিত্রী দেবীর আর নিস্তার নাই।

৩

কোন ফল হইল না, বৃদ্ধা বাঁচিলেন না। জীবনে তিনি যে অপমান ও উপেক্ষায় জর্জরিত হইয়া গিয়াছেন, মরণেও সে উপেক্ষা তাঁহার সঙ্গে চলিল। চিতা ধূ ধূ জ্বলিতেছে, দুলাল একা সে চিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, কেহ তার সঙ্গে আসে নাই। হতভাগ্য একা বোঝা বোঝা কাঠ আনিয়াছে। একা সে তাহার জননীর শব স্কন্ধে করিয়া শ্মশানে আনিয়াছে, একা সে চিতা সাজাইয়াছে। চিতার পার্শ্বে একা দাঁড়াইয়া মাতৃহীন দুলাল—বক্ষে বাহু সংবদ্ধ, চক্ষে অশ্রু।—চিতার অগ্নিতে সেই অশ্রুসজল চক্ষু বহ্নিময় বোধ হইতেছিল। চঞ্চল নদীজলে সে-চিতার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। আজ দুলালের সব শেষ। মায়ের জীবন-সূত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংসারের সকল বন্ধন টুটিয়াছে। জীবনে সে অনেক দুঃখ, অনেক উপেক্ষা, অনাদর পাইয়াছে—কিন্তু সবই সে তার স্নেহময়ী মায়ের মুখ চাহিয়া ভুলিয়া ছিল, তার জীবন-পথের ধ্রুবতারা আজ শ্মশানে। আজ এই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, কেহ ত তাহার জন্য আর অন্ন লইয়া বসিয়া থাকিবে না। হোক সে শাকান্ন কিন্তু সে কত উপাদেয়, কত মধুর। পাখীরা নীড়ে ফিরিয়া চলিয়াছে, সে কোথায় যাইবে, তাহার গৃহ কোথায় ! মাতৃহীন শূন্য কুটীরে সে কেমন করিয়া ফিরিবে।

চিতা নিভিল, বৃদ্ধার অবশেষ ভস্ম হইয়া গেল। দুলাল একবার মা বলিয়া ডাকিল। তারপর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া শেষ অনুষ্ঠানটি

সম্পন্ন করিতে গেল। আজ সব বিসর্জন দিতে হইবে. মায়ের দেহভস্মটুকু পর্য্যন্ত নিঃশেষে ধুইয়া দিতে হইবে। দুলাল জল আনিতেছে, শরীর অবসন্ন, তবু বিশ্রাম নাই—জল আনিতেছে—জল আনিতে হইবে যতক্ষণ শেষ বহ্নিকণা না নিভে, ও কে! কে তাহাকে ডাকে! কি চাও তুমি? রুক্ষকণ্ঠে দুলাল প্রশ্ন করিল। তরুণী উত্তর করিল, "তুমি বিশ্রাম কর, আমি জল আনছি।"

"আন. আমি দেখি"—বলিয়া অবসন্ন দুলাল তৃণশয্যায় বসিয়া পড়িল। গ্রামপ্রান্ত-বাসিনী কমলা বৈষ্ণবী, মাতৃহীনা, সংসারে তাহার আপনার বলিতে একমাত্র বৃদ্ধ পিতা। পিতাপুত্রীতে এক কুটীরে বাস করে। কন্যা সারা দিন ভিক্ষা করিয়া আনিয়া অন্ধ পিতাকে আহার করায়। আজ সে সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছিল। শ্মশানের ঘাটে আসিয়া দেখিল দুলাল একা দাঁড়াইয়া মায়ের সৎকার করিতেছে! গ্রামে সে সমস্ত শুনিয়াছে কেহ বৃদ্ধার শব বহিতে প্রস্তুত হয় নাই, করুণায় তরুণীর হৃদয় কোমল হইয়া উঠিয়াছিল —দুলালকে দেখিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই তো মানুষ! চিতা নিভাইয়া কমলা দুলালের কাছে আসিল, দুলাল নিদ্রিত। তাহার বেদনা-কাতর মুখে চন্দ্রকিরণ লুটিতেছে। কমলা দুলালকে জাগাইতে গিয়া সহসা থামিয়া আবার তাহার মুখপানে চাহিল। তারপর হতভাগ্যকে জাগাইল। দুলাল জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে কেমন করে যাব? মা নেই যে—" কমলার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল সস্নেহে দুলালের হাত ধরিয়া সে কহিল— "আমাদের বাড়ী চল।"

৪

দিন বসিয়া থাকে না। দিন যায়। আজ কুড়ি দিন দুলাল মাতৃহারা। যতক্ষণ পিপাসার শান্তি না হয় পিপাসু ততক্ষণ পানীয়ের আশায় ঘুরিয়া মরে। দুলালেরও তাহাই হইল। মাতৃস্নেহ বিচ্যুত স্নেহপিপাসু দুলাল কমলার স্নেহভাণ্ড নিঃশেষে পান করিল। সতাই কমলা তাহাকে স্নেহ করে। এই মাতৃহীন যুবককে হৃদয়ের যত্নে কমলা আপনার করিয়া লইয়াছে। দুলাল শূন্য গৃহ ছাড়িয়া কমলার কুটীরে আশ্রয় লইয়াছে। প্রেম মৃত্যুজয়ী, যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, চিত্তকে জয় করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য নহে। কমলার অগাধ প্রেম দুলালের চিত্তকে জয় করিয়াছে। কমলা দুলালকে ভালবাসিল। দুলাল সন্ধ্যাকালে কমলার পিতার নিকট বসিয়া দেশের কথা শুনিত—কত কথা কত যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী—বেদনাতুর কৃষকজীবনের ইতিহাস—দেশের কথা শুনিতে শুনিতে গৌরবে উৎসাহে দুলালের চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত আর কর্ম্মনিরতা কমলা প্রশংস নেত্রে সেই পুরুষ

মূর্তির দিকে চাহিয়া থাকিত। দুলাল কখন মুখ ফিরাইত, চারি চক্ষু মিলিত, কমলার মুখ লজ্জারক্ত হইয়া উঠিত। এমন তো তাহার কোন দিন হয় নাই। তাহার এই দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর বয়সে সে এত সঙ্কোচ ত কোন দিন বোধ করে নাই! এ কি প্রেম! সেই প্রেম, যাহার কথা সে পিতার নিকট কত দিন শুনিয়াছে। যে প্রেমে রাধা উন্মাদিনী হইয়াছিলেন। গোপীজন গৃহপরিজন ভুলিয়াছিলেন—সমস্ত ব্রজধাম কৃষ্ণময় হইয়াছিল! কমলা ভাবিত। দুলাল ভাবিত তাহার জননীর কথা, কমলার কথা, দেশের কথা, উপার্জনের কথা। পুরুষ সে, তাহার অলস হইয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই—আর কত দিন সে ভিখারিণীর অন্নে উদর পূর্তি করিবে? কর্মের প্রত্যাশায় সে গ্রামবাসী সকলের গৃহেই পদার্পণ করিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই কেবল রুষ্ট কথা শুনিয়া ফিরিয়াছে। আজ সে কর্মের সন্ধান পাইয়া কমলাকে সেই কথা জানাইতে আসিয়াছে। বহুবার সে বলিতে গিয়া সঙ্কোচে বলিতে পারে নাই। কমলার বিশ্রামের অবকাশ প্রত্যাশা করিয়া আছে। কমলার গৃহকর্ম শেষ হইল। দুলাল নিকটে বসিয়া কহিল, "কমলা একটা কথা বলব।"

কমলা কহিল, "বল কি কথা।"

"কমলা, আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব।"

কমলা সহসা চমকিয়া উঠিল, কহিল, "কেন?"

"পুরুষ মানুষ উপার্জন না করিলে কেমন করিয়া চলিবে?"

"ভগবান চালাইবেন।"

"ভগবান! তিনি তো এতদিন চালাইলেন, আর তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিব না!"

কমলা প্রশ্ন করিল, "কি করিবে?"

"রাজা সীতারাম রায়ের ফৌজে গোলন্দাজ হইব।"

কমলা শিহরিয়া উঠিল, ফৌজ! যাহারা লড়াই করে, মানুষ মারে। দুলাল দেখিল কমলার মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছে। দুলাল ডাকিল, "কমলা!"

কমলা কাঁদিয়া ফেলিল, শুধু জিজ্ঞাসা করিল, "কেন যাইবে?"

দুলাল কি উত্তর দিবে। কমলার অশ্রু তাহার অশ্রুকে অবজ্ঞা করিবে। কমলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আমি একলা কেমন করিয়া থাকিব?"

"কমলা এ কি প্রশ্ন? দুলাল তোমার কে?" দুলাল সবই বুঝিল।

আজ দুলালের বিদায়ের দিন। কাল প্রাতঃকালে রাজার কাছে হাজিরা দিতে হইবে। আজ সমস্ত দিন কমলা ভিক্ষায় বাহির হয় নাই, কেবলই কাঁদিয়াছে। দুলাল কত সান্ত্বনার কথা, ভবিষ্যতের কত আনন্দের কথা কহিয়াছে, কিছুতেই তাহার অশ্রু থামে নাই। সন্ধ্যা তখন নিবিড় হইয়া

আসিয়াছে, ঝিল্লীরবমুখর গৃহপ্রাঙ্গণে দাড়াইয়া দু'টি প্রাণী। দু'জনেই কাঁদিতেছিল। আর বিলম্ব করিবার সময় নাই। দুলাল কাতর দৃষ্টিতে কমলার দিকে চাহিল, কমলা আসিয়া নিতান্ত অসহায়ের মত দুলালের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। দুলালের আনন নত হইল, তারপর দুইটি ওষ্ঠাধর একত্র মিলিল, অশ্রুর অন্তরালে প্রণয়ীযুগলের বিদায়-চুম্বন সমাপ্ত হইয়া গেল।

৫

দীর্ঘ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। পরিবর্ত্তনই কালের প্রকৃতি, এই এক বৎসর সময়েও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সীতারামের উন্মুখ শক্তি নবাবের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে। তাঁহার বিপুল সৈন্যদল, অব্যর্থলক্ষ্য গোলন্দাজ-বাহিনী নবাবের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু নবাবও নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই, এই এক বৎসরে তিনি তিনবার সীতারামের বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণ করিয়াছেন, কোনবারেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হয় নাই, তিনবার পাঠানসেনা লগুড়াহত কুক্কুরের মত সীতারামের রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এই চতুর্থ বার নবাব খাঁ মনসুরের অধীনে বিরাট বাহিনী পাঠাইয়াছেন। শক্তিমান পাঠানবাহিনী এবার সীতারামের বঙ্গভূমি অধিকার করিয়া রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। সীতারামের গোলন্দাজবাহিনী তাহাদের বাধা দিতে আদিষ্ট হইয়াছে। দুলাল আজ বিখ্যাত গোলন্দাজ। সেও এই ফৌজের সঙ্গে আসিয়াছে। আজ শিবিরে সে একাকী বসিয়া ছিল, তাহার কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে আজ সংবাদ পাইয়াছে, কমলার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। একলা সে আর থাকিতে পারে না। দুলালকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে। কত কথা যেন পত্রে লেখা নাই—কত অব্যক্ত বেদনা-ব্যাকুল আহ্বান যেন ছত্রগুলির পশ্চাতে সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুলাল পত্রের দিকে চাহিয়া ছিল। কতবার সে এই ক্ষুদ্র লিপিখানি পড়িয়াছে, কতবার সে ইহাকে বক্ষে ধরিয়া চুম্বন করিয়াছে! আবার পড়িতেছিল, সহসা ও কি শব্দ মেঘগর্জ্জন না তোপ! ত্রস্তপদে দুলাল বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পাঠানের তোপের শব্দ, পাঠান আসিতেছে, "তোপ দাগ", পশ্চাৎ হইতে রাজা সীতারাম গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ দিলেন। দুলাল এক লম্ফে তোপের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্তের অবকাশ! তারপর যুগপৎ এক সঙ্গে শত কামান গর্জ্জিয়া উঠিল, যেন প্রলয়ান্তকালে মহাকালের গর্জন। দুলালের বিশ্রাম নাই; হাত উঠিতেছে নামিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে কামান মৃত্যুবহ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। সীতারাম নির্বাক-বিস্ময়ে এই যুবকের পানে চাহিয়া ছিলেন। সহসা কহিয়া উঠিলেন, "ক্ষান্ত হও, আর প্রয়োজন নাই, তোমার নাম কি যুবক?" "দুলালচাঁদ"—দুলাল ধীর

কণ্ঠে উত্তর করিল। "কি সুন্দর লক্ষ্য তোমার। ঐ আবার পাঠান আসিতেছে, অগ্রসর হও," সেনাদল ছুটিল। পশ্চাতে সীতারাম রায়। সম্মুখে অসংখ্য পাঠান। "এ যুদ্ধ জয় করা চাই, সৈন্যগণ! জন্মভূমির স্বাধীনতা বিপন্ন, বীরের মত যুদ্ধ কর"—এই বলিয়া সীতারাম দুলালের দিকে চাহিলেন, দুলালের হাতে কামান গর্জ্জিল। অবিশ্রান্ত কালানলবর্ষী কামানের সম্মুখে পাঠান সেনাদল ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। "চমৎকার! মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর"—রাজা আদেশ দিলেন। কামান নিস্তব্ধ হইল। ঐ যে ছত্রভঙ্গ পাঠান সেনা ছুটিতেছে। ঐ গ্রামে আশ্রয় লইতে চলিয়াছে। গ্রাম সুরক্ষিত, সেখানে আশ্রয় লইলে তাহারা আমাদের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিবে! দ্রুত গতিতে পাঠান ছুটিতেছে, সহসা পুনরায় রাজার কণ্ঠরব শোনা গেল, "ঐ কুটীর ধ্বংস কর! অবিলম্বে কে ঐ কুটীর ধ্বংস করিতে পারে, কে আছ গোলন্দাজ?" কেউ উত্তর দিল না। দুলাল নীরবে আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, রণক্লান্তিতে দেহ কাঁপিতেছে, মুখ পাংশু। দুলাল জ্বলন্ত পলিতা হস্তে লইল। একবার মনে হইল একখানি পুষ্পিত দেহলতা, দুইটি ব্যাকুল নয়ন, দুইখানি পল্লব-সম তরুণ কোমল ওষ্ঠাধর, চুম্বনে যাহা একদিন আগ্রহে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল, যুগল বাহুর আকুল আলিঙ্গন। হস্ত হইতে পলিতা পড়িয়া গেল, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য, পরক্ষণেই মনে হইল বিপন্ন স্বদেশের দুর্দ্দশার কথা পাঠানের অত্যাচারের কথা। সহসা তাহার চক্ষুতে জাগিয়া উঠিল তাহার জননীর কুটীরের শান্ত, সৌম্য প্রতিচ্ছবি, আর একখানি করুণাময়ী নারী-মূর্ত্তি! পাঠান ভাবিতে দুলালের গায়ের রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল। আবার সীতারামের কণ্ঠরব, "স্বদেশ বিপন্ন—দুলালচাঁদ কাহার অপেক্ষা করিতেছ?" ক্ষিপ্রহস্তে দুলালচাঁদ পলিতা কুড়াইয়া লইল—একবার শুধু চক্ষু মুদ্রিত করিল, "আমার মরণ-চুম্বন গ্রহণ কর"—আর শোনা গেল না, তোপ গর্জ্জিল, গুড়ুম্! মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র কুটীর ভস্মসাৎ হইয়া গেল। কি অব্যর্থ লক্ষ্য! সীতারাম চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ধন্য দুলালচাঁদ!" কে শুনিবে সে স্তুতিবাণী। ধূম পরিষ্কার হইয়া গেল; দুলাল কামানের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে। সীতারাম নিকটে আসিলেন, ডাকিলেন, "দুলাল!" কে উত্তর দিবে, হতভাগ্য অমৃত লোকে প্রস্থান করিয়াছে। সীতারাম কথা কহিলেন না, স্থিরনেত্রে পলায়মান বিধ্বস্ত পাঠান সেনাদলের পানে চাহিয়া রহিলেন।

কুটীরের আঙিনায় পাংশুবিবর্ণ মুখে কমলা বসিয়া ছিল। শুনিয়াছিল পাঠান আসিতেছে—পল্লীর আর সকলেই নিজ নিজ দ্রব্যসম্ভার লইয়া গৃহ ত্যাগ করিবার আয়োজন করিতেছিল, শুধু সহায়বিহীনা কমলা ভবিষ্যতের আশঙ্কায় ব্যাকুল বিহ্বল হইয়া বসিয়াছিল। আজ যদি দুলাল থাকিত! হয় তো সে ঐ দূরে বনশ্রেণীর অন্তরালে মহারাজ সীতারাম রায়ের সৈন্য-

বাহিনীতে শত্রু দলন করিতে কামানের উপর দাঁড়াইয়া আছে! সামান্য ক্রোশমাত্র ব্যবধান! কমলা শুনিয়াছে—দুলাল সীতারামের ফৌজে গোলন্দাজ হইয়াছে। শুনিয়া সে উল্লসিত হইয়াছিল। কবে দুলাল ফিরিবে দীর্ঘ দিন ধরিয়া কমলা কেবল তাহাই ভাবিয়াছে। আজও ভাবিতেছিল। দুলালের সেই মুখ—সেই স্নিগ্ধ মধুর সম্ভাষণ সমস্তই আজ অতি স্পষ্ট কমলার মনে পড়িতেছিল। দুলালের কথা ভাবিতে ভাবিতে বার বার তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময় গ্রামে চীৎকার শোনা গেল—পাঠান! পাঠান! কমলা চমকিয়া চাহিয়া দেখিল সীতারামের বাহিনী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ছিন্নভিন্ন পাঠান সৈনিকেরা পল্লীর অরণ্য পথে আশ্রয় লইতে দ্রুতগতি আসিতেছে। আশঙ্কায় কমলার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। কমলার কুটীর গ্রামপ্রান্তে খর্জুর গুবাকগুচ্ছের অন্তরালে সুরক্ষিত—পাঠানের গুপ্তচর সেইদিকে পলায়মান পাঠানসেনাদলের গতি নির্দেশ করিল। ভয়ে মুহ্যমান হইয়া কমলা শিহরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—"রক্ষা কর! দুলাল। দুলাল!"

মুহূর্তের অবকাশমাত্র। পরক্ষণেই সঞ্চরণমান সূর্য্যের মত একটি অগ্নি-গোলক কমলার কুটীরের বৃক্ষরাজি-শীর্ষে সশব্দে ফাটিয়া গেল। 'দুলাল' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াই ভয়ে কমলা চক্ষু মুদিল। নিমেষের মধ্যেই পর পর দুইটি গোলা কমলার কুটীর-শীর্ষে বহ্নিতাণ্ডব আরম্ভ করিয়া দিল। জ্বলন্ত কুটীরের দিকে মৃত্যুকাতর নেত্র বিস্ফারিত করিয়া কমলা একবার ডাকিল, "দুলাল!" তাহার পরই চিরকালের মত চক্ষু মুদ্রিত করিল।

সন্ধ্যার পূর্বে গ্রামবাসী বিজয়ী রাজার সম্বর্ধনা করিতে আসিল। রাজা তখন সমারোহে দুলালের শবের সৎকার করিতে আদেশ দিতেছেন। লক্ষ্মীদাস প্রমুখ ধনীবৃন্দ মহারাজের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। লক্ষ্মীদাস দুলালকে দেখিয়াই চিনিলেন—তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি একে চেন?"

"হাঁ আমাদেরই প্রতিবেশী।"

সীতারাম সকল শুনিলেন, তারপর প্রশ্ন করিলেন, "ঐ কুটীরের অধিকারী কে? তাহাকে আমি প্রচুর অর্থ দিব।"

লক্ষ্মীদাস কি বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা ভয়ে থামিয়া গেলেন; শুধু কিশোর দাস বলিলেন, "যাহার কুটীর, সে কামানের মুখে প্রাণ দিয়াছে—সে ঐ দুলালেরই প্রণয়িনী বৈষ্ণবী কমলা।"

সীতারামের মুখ সহসা উজ্জ্বল উঠিল, কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর সেই ছিন্ন বাস পরিহিত মলিন রক্তাপ্লুত শবদেহকে মহারাজ সীতারাম স্বয় বক্ষে তুলিয়া লইলেন।

দিদিমা

ভৃত্য হারাধন আসিয়া কহিল, "বাসুবাবু বড্ড কাঁদছেন।"

বাসু কাঁদিতেছে! আজ সাত বৎসর তাহার সহিত আমার পরিচয়, ইহার মধ্যে ক্রন্দন করা দূরে থাক্‌ গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিতে তাহাকে দেখি নাই। গত বৎসর মেসের গুণধর ঠাকুরের পা'খানি মোটর দুর্ঘটনার ফলে কাটিয়া ফেলিতে হয়। আমরা মেডিক্যাল কলেজে ঠাকুরকে দেখিতে গিয়াছিলাম—কি ভয়ানক দৃশ্য। কেহই চোখ মেলিয়া চাহিতে পারে নাই, অথচ বাসু স্বচ্ছন্দে বলিয়া ফেলিল, "গুণধর ঠাকুর যদি পাঁঠা হ'ত তা হ'লে ওই একখানা ঠ্যাঙ্গে মেসের সবার ভরপেট খাওয়া চলত।" এই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন পরিহাসে মর্মাহত হইয়াছিলাম, কেহ কেহ জন্মের মত মাংস খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই বাসু কাঁদিতেছে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

"জানিনে বাবু। আপনি আসুন।"

হারাধন চলিয়া গেল। ফৌজদারী আইনখানা বন্ধ করিয়া বাসুদেবের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বালিশে মুখ গুঁজিয়া বাসু পড়িয়া ছিল আমার পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়া কহিল, "বোস।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাঁদছ কেন?"

বাসু কথা না কহিয়া একখানা পোষ্টকার্ডের চিঠি আমার হাতের কাছে সরাইয়া দিল—পড়িলাম,

বাসুদা,

কাল রাত্রে দিদিমার °প্রাপ্তি হইয়াছে। এইমাত্র দাহ সম্পন্ন করিয়া ফিরিলাম।

তোমার
নিতাই

আরও আশ্চর্য্য হইলাম। বাসুর তিনকুলে কেহ ছিল না, অকস্মাৎ দিদিমা আসিলেন কোথা হইতে?

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কার দিদিমা ইনি?"

বাসু মুখ তুলিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমার।"

"তোমার। তোমার তো কেউ ছিল না জানতাম, আজ হঠাৎ—',

বাসু উঠিয়া বসিল, "সব কথা জানতে না মনুদা, শুনবে?"

যথেষ্ট অবসর ছিল, কহিলাম, "বল।"

বাসু খানিকক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার পর দুই হাতে চোখ মুছিয়া একটা বিড়ি ধরাইয়া কহিতে আরম্ভ করিল,—

"বিপিনকে জানতে? সেই শিবনিবাসের বিপিন। বছর পাঁচেক আগেকার কথা, তার বিয়েতে বরযাত্রী হ'য়ে গিয়েছিলাম। পোড়াদায় নেমে ক'নের গাঁয়ে যখন গিয়ে পৌঁছিলাম তখন সময়টা প্রায় রাত এক প্রহরের কাছাকাছি। বিয়েবাড়ীর বাইরের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়েছি এমন সময় কে পিছন থেকে এসে গলা জড়িয়ে ধরে ডাকলে, "বাসুদা।" মুখ ফিরিয়ে দেখি নিতাই। ছেলেবেলায় এক সঙ্গে পড়তাম, পাশ ক'রে আমি ভর্তি হ'লাম কলেজে সে ভর্তি হ'ল বেলুড় মঠে। আমুদে, খামখেয়ালী, মামার বাড়ী থেকে মানুষ—জগতে আমারই মত কোনও ঝঞ্ঝাট ছিল না—সে সন্ন্যাসী হওয়াতে খুসীই হ'য়েছিলাম। অনেক দিন পর নিতাইকে দেখে বড় আনন্দ হ'ল। শুনলাম সেই গ্রামটাকে কেন্দ্র ক'রে ডজন দুই কিশোর ব্রহ্মচারী জুটিয়ে সে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আর চাল ডাল বিতরণ করছে। কথা হচ্ছে—এমন সময় নিতাই আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "একটা কাজ করতে হবে বাসুদা! পারবে?"

অকরণীয় কাজ কিছুই ছিল না তা তো জান। বললাম, "করব। কি বল তো?"

নিতাই বলল, "বিশেষ কিছু নয়, একটু অভিনয় করতে হবে। তবে থিয়েটারে নয়।"

একে তো আমি, তারপর বরযাত্রী—মনটা কৌতুক করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়েই ছিল, বললাম, "বেশ। কি ব্যাপার!"

নিতাই একরকম আমাকে টেনেই নিয়ে চলল। মিনিট দশেকের মধ্যে বাঁশঝাড়ে ঘেরা একটা প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছের তলায় খড়ের একচালা ঘরের বারান্দায় এসে পৌঁছিলাম। সেটা নিত্যানন্দ স্বামীর আশ্রম। কেরোসিনের ডিবেটা জ্বালিয়ে মাদুর বিছিয়ে নিতাই আমাকে বসিয়ে বলল, "একটু অন্যায় একটু মিথ্যাচার 'লোক হিতায়' করতে হয় বাসুদা। আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু লোক পাইনি, তোমার কথা মনেই ছিল না—নৈলে—"

অসহিষ্ণু হ'য়ে বললাম, "কি করতে হবে তাই বল। তত্ত্বব্যাখ্যা পরে শুনব।"

নিতাই বলল, "ব্যাপারটা এই রকম। বামুনটুলী দেখেছ? ছোট্ট একটি গাঁ—ঘর দশেক লোক। ষ্টেশনের ঠিক বাঁয়ে। সেখানকার কথাই বলছি। সেখানে প্রায় সব বাড়ীতেই চাল দিতে হয় আমাকে। হপ্তায় একবার ক'রে যাই। সব দেখে শুনে আসি। মাস পাঁচেক আগে বামুনটুলী থেকে রাতে ডাকতে এল। গেলাম। গিয়ে দেখি একটা বছর আঠারো বয়েসের বৌয়ের ফিট হচ্ছে। আর কাছে ব'সে সেই বাড়ীর বুড়ী মাটীতে মাথা খুঁড়ছে। বুড়ীকে জানতাম, মাথা একটু বেঠিক—বড় ঘরের মেয়ে—যথাসর্বস্ব আত্মীয়েরা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে—এখন পুঁজি হ'য়েছে ভিক্ষে।

মেয়েটাকে দেখিনি কখনো। বুড়ী কানে শোনে না, চোখের দৃষ্টিও প্রায় নেই। আমি এসেছি শুনে বলল, 'যার বৌ তার কাছে পাঠিয়ে দে, নইলে চিঠি লিখে দে।' মেয়েটার কথা জিজ্ঞেস করব—এমন সময় একটা ছেলে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। গিয়ে বলল তাতে জানলাম বুড়ীর সম্বল ছিল এক নাতি, সে কলকাতায় টুইসনি ক'রে পড়ত। মেয়েটা তারই স্ত্রী। ছেলেটা হঠাৎ আজ ক'দিন আগে মারা গেছে। বৌ ছিল তার ভায়ের বাড়ীতে—তারা শ্রাদ্ধ-শান্তির হাঙ্গামা দেখে আজ বৌকে তার দিদিশাশুড়ীর কাছে পেঁছে দিয়ে গেছে। বুড়ীকে নিয়ে বিপদ হবে দেখে তাকে কিছু বলা হয়নি, এ দিকে বৌটার তো ফিট হচ্ছে। ছেলেটাকে বললাম যে বুড়ীকে কিছু ব'লে কাজ নেই। তার পর ঘরে গিয়ে বুড়ীকে তুলে অন্য ঘরে শুইয়ে রেখে মেয়েটার মাথার কাছে বসলাম। মেয়েটার চৈতন্য হ'লে তাকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে বললাম যে সে বিচলিত হ'লে বুড়ীটা শুদ্ধ মরবে। মেয়েটা বুঝল। গাঁয়ের লোকদের বললাম, তারাও সব কথা গোপন রাখাই সুযুক্তি মনে করল। বুড়ী আর ক'দিন! এই নিয়ে তো সুরু হ'ল। এখন বুড়ী রোজ তাগিদ দিচ্ছে আমাকে—বাসুকে চিঠি লিখে আনতে।"

বললাম—'কে বাসু?"

নিতাই বলল, "তার নাতি। তারও নাম ছিল বাসুদেব।"

বুঝলাম। "আমাকে নাতি সাজাতে চাইছিস?"

নিতাই বলল, "হ'লে ভাল হয়, কারণ বুড়ী যদি বাঁচে তো বড় জোর মাস সাতেক। অন্ততঃ তার নাতি বেঁচে আছে—রোজগার ক'রে খাওয়াবে—আত্মীয়দের হাত থেকে সম্পত্তি উদ্ধার করবে—শেষ বয়সে তার আশার এই শান্তিটুকু আর নষ্ট হ'তে দিতে চাইনে। কি বল?"

বেশ কৌতুক বোধ করলাম, বললাম, "আচ্ছা কাল সকালে।"

নিতাই বলল, "বাঁচালে বাসুদা। আমি আবার আজই বুড়ীকে ব'লে এসেছি যে কলকাতায় চিঠি দিইছি—বাসু এল ব'লে।"

হেসে বললাম, "বেশ করছিস। কালই তো কলকাতা থেকে এসে যাব।"

নিতাই বললে, "নইলে উপায় নেই। বুড়ী আমায় দেখলে যা করে যদি দেখতে!"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বাসু চোখ বুজিল। কহিলাম, "তারপর?"

"দাঁড়াও! বুড়ীর চেহারাটা আগে মনে এনে নিই!" বলিয়া বাসু বলিতে আরম্ভ করিল, "তারপর ভোরে নিতাই আমাকে ডেকে নিয়ে গেল! এক হাঁটু কাদা আর আশশ্যাওড়ার বন ভেঙ্গে বামুনটুলীতে গিয়ে পেঁছিলাম। নিতাই এতক্ষণ বেশ চলছিল হঠাৎ থেমে গেল। বললাম, "কি রে?" নিতাই আঙ্গুল তুলে বলল "ঐ যে!" দেখলাম শ'খানেক হাত দূরে একটা

ভাঙ্গা বেড়ায় হেলান দিয়ে লাঠি হাতে এক বুড়ী ষ্টেশনের পথের দিকে তাকিয়ে আছে। নিতাই বলল, "অমনি রোজ সকাল সন্ধ্যা বুড়ী ঐখানটাই দাঁড়িয়ে থাকে। কলকাতার গাড়ী আসবার সময় কিনা।" আমি একবার বুড়ীকে দেখে নিলাম। বয়স আশী পঁচাশীর কম নয়, মাথার চুল ধবধবে শাদা, গায়ের রং এই বয়সেও যা আছে—থাক্‌গে। মুখ নড়া দেখে বুঝলাম বুড়ী আপন মনেই কথা বলছে। নিতাই বলল, "পারবে তো বাসুদা, বোঝ।" তখন মনে কি হ'য়েছিল জানিনে, নিতাইকে সামনে ঠেলে দিলাম। নিতাই বুঝল, হাত জোড় ক'রে কাকে যেন নমস্কার করল, তারপর বুড়ীর সামনে গিয়ে তাকে এক ঝাঁকানি দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিল। আমি থমকে দাঁড়ালাম। সে যা দেখেছি মনুদা, তা' আর ভোলবার নয়। আমাকে দেখে থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠে বুড়ী ছুটে আসবার চেষ্টা করছে—হাঁপাচ্ছে আর লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকছে, "দাদু আয়!" কি মনে হ'ল দৌড়ে গিয়ে বুড়ীকে জড়িয়ে ধ'রে ডাকলাম, "দিদিমা!"

বাসুর গলার স্বর ভারী হইয়া আসিল, সে চুপ করিল। আমি কথা না কহিয়া বিড়ি টানিতে লাগিলাম।

"খানতিনেক একচালা খড়ের ঘর, ছোট্ট একটা আঙ্গিনা, তাই নিয়ে বাড়ী। একটা ঘরের রোয়াকে বুড়ী আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বসল। বুড়ী আপন মনেই সংসারের কথা বলে যাচ্ছে—আমগাছটা বিক্রী ক'রে ক' টাকা পেয়েছিল, ছাগলটাকে শেয়ালে নিল কেমন ক'রে, সব নির্ব্বিকারভাবে শুনে যাচ্ছি আর মাথা নাড়ছি। মাঝে মাঝে আমার গালে হাত দিয়ে বলছে, 'বড্ড বড় হয়েছিস্ দাদু!' বলছি, 'কলকাতায় লোনা জলে বেড়ে গেছি দিদিমা।' হঠাৎ বুড়ী বলল, 'তোর জন্যে কি রেখেছি বল্‌তো দাদু?' বস্তুটা কি জিজ্ঞাসা করবার আগেই বুড়ী তারস্বরে ডাকতে সুরু ক'রে দিল, "ও দিদি! শীগগির ছুটে আয়। দেখে যা—দাদুমণি এসেছে!"

বুড়ী কাকে ডাকছে বুঝে চমকে উঠলাম। একথা তো মনে হয়নি! নিতাই নিমেষে একেবারে আঙ্গিনা থেকে বাইরে গিয়ে বেড়ার আড়ালে দাঁড়াল। আর সেই সময়ে বাড়ীর পিছনের দিক থেকে ভিজে কাপড়ে শশব্যস্ত ছুটে এসে বৌটা আঙ্গিনায় দাঁড়াল, তারপর আমাকে দেখে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। আমি একেবারে নিভে গেলাম। বুড়ী বলল, "লজ্জা দেখ ছুড়ীর!" এই সময়-বৌটা হাত সরিয়ে আমার দিকে একবার চাইল। চোখ দু'টো ধবক্ ধবক্ ঝ'রে জবলছে। এমন দৃষ্টি আমি কখনও কারো চোখে দেখি নি মনুদা'। বাইরে এসে নিতাইকে ডাকতেই সে হাত জোড় ক'রে বলল, "ক্ষমা কর বাসুদা, একথা মনেই হয়নি।" মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে মনে একটা ব্যবস্থা স্থির ক'রে ফেললাম। বুড়ী তখনও রোয়াকে ব'সে বধূর অকারণ লজ্জা সম্বন্ধে আপন মনেই বক্তৃতা করছে। বৌয়ের খোঁজে ঘরে ঢুকলাম।

মাটিতে উপুড় হ'য়ে বৌটা তখনও কাঁদছিল তার মাথার কাছে ব'সে ডাকলাম, "দিদি!" বৌ চমকে উঠে মাথায় কাপড় টানতে যাবে, আমি তার হাত ধরলাম—বললাম, "আমি তোমার সত্যিকার ভাই হব।" বৌ ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে আমার দিকে চেয়ে রইল! তারপর ঘণ্টাখানেক ধ'রে তাকে বোঝালাম, কেন এখানে এলাম তাও বললাম! বৌ শুনে একবার হাসবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। চোখ মুছে চলে গেল।

তারপর? তারপর আর কি? সেদিন সেখানেই থেকে গেলাম। বুড়ী কায়েত আমি বামুন। অভিনয় পুরো করবার জন্য লুকিয়ে পৈতেটা ছিঁড়ে ফেলে—দিদিমার পাতে প্রসাদ পেলাম। দুপুরে বৌয়ের মুখ থেকে তাদের পারিবারিক জীবনের সব কথা শুনলাম। বুড়ীর নাতি উকীল হয়ে নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করবে এই সংকল্প নিয়ে কলকাতা গিয়েছিল তাও জেনে নিলাম।

পড়ার ক্ষতি হবে ব'লে পরের দিন দিদিমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

কিন্তু মনুদা, বুড়ীকে ভুলতে পারলাম না। কলকাতায় ফিরে ডাক্তারী পড়া ছেড়ে আইন পড়তে শুরু করলাম—সে তো জানই। নিতাইয়ের মারফতে বুড়ীকে চিঠি দিতাম, টাকা পাঠাতাম, ফল পাঠাতাম। মাঝে মাঝে কলকাতা ছেড়ে উধাও হ'তাম—তা নিয়ে অনেকে ঠাট্টাও করছে। তখন বুড়ীর 'দাদু' ডাকটি শুনতে যেতাম। অমন ক'রে জীবনে তো কেউ আমাকে ডাকেনি—বড় ভাল লাগত।

বছরখানেক অভিনয় করবার পর আমি সত্যিই যেন বুড়ীর নাতিই হ'য়ে গেলাম—ছুটি হ'লেই ছুটতাম। প্রায়ই দেখতাম বুড়ী সেই ভাঙ্গা বেড়াটায় হেলান দিয়ে প্রথম দিনকার মত দাঁড়িয়ে আছে। বলত, "আজ তুমি আসবে দাদু, আমার মন বলছিল।" মাঝে মাঝে মুস্কিল হ'ত—অনেক দিন দেখেছি রাত্রে এসে বুড়ী আমার বিছানা হাতড়াচ্ছে আর বিড় বিড় ক'রে বকছে—"ছুঁড়ীর লজ্জা দেখ! আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে দেখে লুকোনে কেন লা?" যাকে উদ্দেশ ক'রে বলা সে তখন আর একটা ঘরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কোনও দিন নিজেই তাকে হাত ধ'রে টেনে আনত, আর সে বেচারী চোখের জল মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াত—কাজটা যে ভাল করিনি তখন বুঝতে পারতাম।

যাক্ পাঁচ বছরের অভিনয় শেষ হ'য়েছে। কিন্তু মনুদা মনে হচ্ছে—সে সত্যিই আমার দিদিমা ছিল—আমার সত্যিই দিদিমাই আজ মরেছে।"

বাসুদেব চোখ মুছিল। আমি কহিলাম, "বুড়ী বেঁচেছে—তুমিও বেঁচেছ।"

বাসু এ কথার কোনও জবাব দিল না, হঠাৎ কহিয়া উঠিল, "আমার ফিসের টাকা ক'টা দিও তো মনুদা?"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

"উকীল হবার আর দরকার নেই।" বলিয়াই বাসু বাহিরে চলিয়া গেল।

অসমাপ্ত-নাটিকা

প্রথম দৃশ্য

উদ্যান

(করিমা, সঙ্গিনীগণ ও ফতেমা)

১ম সঙ্গিনী। আমরা তো গাইলাম এখন তুমি একটা গাও বিবি সাহেব।

করিমা। আমি কি গাইব ভাই? আমি তো গাইতে জানিনে। আর যা জানতাম তা তোমাদের দেশে এসে সব ভুলেছি। মাঝে মাঝে গাইতে যাই, সুর ফোটে না।

১ম। এই তো সেদিন দেখলাম এস্রাজ নিয়ে বসেছ।

করিমা। হ্যাঁ, চেষ্টা করছিলাম তা পারলাম না। পুরবীর কড়ি মধ্যমে যেয়ে আঙ্গুল আর চলে না—সব ভুলে গেছি। রেখাবের কোমল টানতে গিয়ে দেখি আওয়াজ ওঠে না। গমক তুলতে গেলে আঙ্গুল অবশ হ'য়ে পড়ে, সব গুলিয়ে যায়। মনের সুখ থাকলে এসব আসে, মনে দিনরাত জ্বলছে আগুন, গান আসে কোত্থেকে ভাই?

১ম। সবই বুঝি বিবি সাহেব, কিন্তু কি করবে বল? আর তো দিন ফিরবে না। এখন যে অবস্থাতে আছ তাতেই সুখী হতে চেষ্টা কর। অভাব কিসের তোমার? এত গয়নাগাঁঠি, এমন বাড়ীঘর, এমন বাগান, সবই তো তোমার! শুধু গলদ এক উজীর সাহেবের বয়স একটু বেশী।

২য়। তাই বা এমন বেশী কি? তিন কুড়ি চার কুড়ি হবে বইতো নয়? তা ওরকম বয়সে অমন বড় মানুষের হারেম মেয়েমানুষে বোঝাই থাকে।

৩য়। হাতের সোনা পায়ে ঠেলো না বিবি সাহেব, পায়ে ঠেলো না। খোদা এমন ধনদৌলত দিয়েছেন মাথায় ক'রে নাও। সুখে থাকবে।

১ম। আর যদি বয়েসের কথাই ধর, তা ভালোবাসাতেই পুষিয়ে যাবে। তিনি তোমাকে কত ভালোবাসেন বল দেখি!

করিমা। ছাই ভালোবাসা। যাক্ আর তোমাদের কথা কিছু শুনতে চাইনে; এক কথা শুনতে শুনতে অরুচি ধরে গেছে। একটা গান শুনবি, শোন্—

গোরী ধীরে চলো গগরী ছল্‌কি না যায়।
শিরপর গগরী গগরী পর গেড়ুয়া,
পতরী কমর কহুঁ লচ্‌কি না যায় ॥

(গানের সহিত সঙ্গিনীগণের নৃত্য)

১ম স। এ কোন্ দেশী গান বিবি সাহেব?

করিমা। এ হিন্দুস্থানী গান। আমি যখন হিন্দুস্থানে ছিলাম তখন শিখেছি।

২য়। ভারি মিঠে গান, কিন্তু কিছু বোঝা যায় না।

দূরে বাদ্যরব

৩য়। ও আওয়াজ কিসের?

১ম। তাইতো কাউকে বুঝি কোতল করবে তাই নিয়ে যাচ্ছে।

সঙ্গিনীগণ। চল দেখে আসি, বিবি সাহেব।

করিমা। তোমরা যাও তাই। আমি একটু বসি।

(সঙ্গিনীগণের উদ্যানপ্রান্তে গমন)

ফতেমা। করিমা।

করিমা। কেন বোন?

ফতেমা। আর কত দিন এমন ক'রে থাকবে?

করিমা। যতদিন খোদা রাখেন আর যতদিন মনের মানুষ না পাই।

ফতেমা। তোমার মনের মানুষের অভাব কি? যে রূপ! কত বাদ্‌শাজাদা এসে পায়ে লুটিয়ে পড়বে।

করিমা। বাদশাজাদা চাইনে ফতেমা, দুঃখিনী আমি, আমার মত দুঃখী একটা চাই।

ফতেমা। সত্যি করিমা, আমি বুঝতে পারিনে তোমার দুঃখ কি? এরা সবাই বলে কিসের দুঃখ? আমিও তাই ভাবি। উজীর সাহেব কত ভালবাসেন—

করিমা। আমি তো ভালবাসিনে ফতেমা, আর তাঁর ভালবাসা! তিনি কি ভালবাসেন আমাকে? না। তিনি ভালবাসেন আমার এই রূপকে। দু'দিন এই রূপের আদর, তারপর এদের যে দশা আমারও তাই হবে। আমাকে ভালবাসলে তিনি আমার মনে কষ্ট দিয়ে আমাকে সাদি করতে চাইতেন না। দেখছ ফতেমা এই যারা আমার সঙ্গে রয়েছে সবাই উজীরের গোয়েন্দা, সবাই আমাকে তাদের দলে ভর্তি করতে চায়।

ফতেমা। কিন্তু আমি তো চাইনে করিমা।

করিমা। খোদার কৃপায় তোমাকে পেয়েছি তা' নইলে বিষ খেয়ে মরতাম। সত্যি ফতেমা এখন ভাবছি আগে মরিনি কেন? মা কবে মরেছে মনে নেই। বাপের সঙ্গে হিন্দুস্থানে ছিলাম। মক্কার পথে বাবাকে খুন ক'রে যখন বেদুইনরা আমাকে কেড়ে নিয়ে বিক্রি করলে, তখন যদি মরতাম তা' হ'লে আর উজীরের হাতে পড়তাম না। এখানে এই এক বৎসর যে আমার কেমন ক'রে কেটেছে খোদা জানেন। কবে যে এ দিনের শেষ হবে মালিকা জানেন।

ফতেমা। ভয় কোরো না করিমা বিবি! আমি থাকতে উজীর তোমার কিছু করতে পারবে না। এই উজীরের সংসারে আমি ছেলেবেলা থেকে রয়েছি, উজীরের হাত থেকে কত মেয়েকে বাঁচিয়েছি আর তোমাকে বাঁচাতে পারব না?

করিমা। খোদা তোর ভাল করবেন ফতেমা।

(সঙ্গিনীগণের নিকট আগমন)

করিমা। খবর কি?

১ম। বাদ্‌শার হুকুম, যত জোয়ান মরদ আছে সবাইকে হাতিয়ার ধরতে হবে। তারই ইস্তাহার জারী হচ্ছে।

করিমা। এত ফৌজ কেন?

২য়। শোননি বুঝি? বাদ্‌শা লড়াই করবেন ইস্তাম্বুলের বাদ্‌শাজাদার সঙ্গে, তারি আয়োজন হচ্ছে।

করিমা। কেন, লড়াই কেন?

১ম। অনেকে অনেক কথা বলে বিবি সাহেব। কেউ বলে বাদ্‌শার বড় বেগমকে বাদ্‌শাজাদা চুরি করে নিয়েছেন। কেউ বলে বেগমের পোষা চিঁড়িয়ার ঠোঁট কেটে দিয়েছেন ইস্তাম্বুলের বাদ্‌শাজাদা।

২য়। কি আস্পর্দ্ধা! আমাদের বেগমের চিঁড়িয়া, তার ঠোঁট, তাই কিনা কাটলে? কম্‌বক্তের এবার আর নিস্তার নাই।

ফতেমা। তুমি কেমন ক'রে জানলে, তুমি বাদ্‌শাজাদাকে জান?

৩য়। শুনেছি, সে নাকি সয়তানের চেলা। লড়াইয়ে তার সঙ্গে কেউ পারে না।

১ম। কেউ পারে না ব'লে কি ইস্পাহানের বাদশাও পারবে না নাকি? আমাদের বাদশা কি যে সে লোক!

ফতেমা। কে বললে? বাদশা তোমাদের মস্ত লোক! শুধু একটু কুঁজো এই যা, আর একটু খোঁড়া, আর একটু বেকুব।

১ম। তুমি বাদ্‌শার নিন্দা করছ ফতেমা বিবি?

ফতেমা। হ্যাঁ গো করছি! তোমাদের কাজ তোমরা কর, তকরার কোরো না—একটু নাচ গাও।

১ম। কি করব, যা বলবে তাই করতে হবে—বাঁদী আমরা—এসো ভাই—

নৃত্যগীত

ইয়াকুবের প্রবেশ

ইয়াকুব। এ হঠ যাও, হঠ যাও, উজীর সাহেব আসছেন, হঠ যাও।

ফতেমা। আজ যে অসময়ে?

ইয়াকুব। উজীরের আবার সময় অসময় আছে নাকি ফতেমা বিবি? হঠ, হঠ বিবি সাহেব সেলাম। উজীর সাহেব আসছেন, কুর্ণিশ করুন, কুর্ণিশ করুন। এই এই বাঁদী সব কুর্ণিশ কর্, কুর্ণিশ কর্। উজীরের আর্দালী ইয়াকুব আলী এসেছেন কুর্ণিশ কর্, সব—এই ইস্‌মাফিক—(অঙ্গভঙ্গী সহকারে কুর্ণিশ শিক্ষাদান) হ্যাঁ তালিম হয়েছে। হজুর সব তৈরী—

উজীরের প্রবেশ

সকলের কুর্ণিশ

উজীর। মেজাজ সরিফ সব?

১ম। হাঁ জনাবের দৌলতে সব ভাল।

উজীর। বস্, ইয়াকুব এদের সব নিয়ে যাও। করিমা বিবির সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে।

ইয়াকুব। হাঁ, আও সব, জল্‌দি চলে এস—দিব্যি জাজিম পাতা আছে বসবে একটু। তারপর একটু ঝুনো বেদানার সরবৎ খেয়ে বস্ ঠাণ্ডা হ'য়ে—চ'লে এস বিবিজানেরা। (স্বগত) বুড়ো বেটার কি সখ! এবার ম'রে উজীর হব।

[সঙ্গিনীগণকে লইয়া প্রস্থান।

করিমা। ফতেমা তুই থাক্।

ফতেমা। না বিবি সাহেব। (মৃদু স্বরে) ওই ফোয়ারার ধারে থাকব, ভয় নেই।

উজীর। তারপর করিমা বিবি, কি স্থির করলে?

করিমা। কি স্থির করব সাহেব? আমার মনের সব কথা তো আমি খুলেই বলেছি, সেই আমার শেষ কথা, আর নতুন কিছু বলবার নেই।

উজীর। দেখ, ভেবে দেখ, এই ধন দৌলত বান্দা বাঁদী সব তোমার হবে। গোলাপ জলে স্নান করবে। আতর মেখে পালঙ্কে শুয়ে থাকবে, হাজার বাঁদী সেবা করবে। এসব ভেবেছ?

করিমা। সব ভেবেছি হজরৎ। আপনি আমাকে গ্রহণ করবেন এ তো

আপনার করুণা, কিন্তু জনাব সে করুণার যোগ্য আমি নই। আমি দরিদ্রের কন্যা, চিরকাল দরিদ্রই থাকতে চাই। আমার এসব কেন? তার চেয়ে আমাকে মুক্তি দিন চিরকাল আপনার জন্যে খোদার কাছে প্রার্থনা করব. আর বাঁদীগিরি ক'রে আপনার ঋণ শোধের চেষ্টা করব।

উজীর। ঋণ শোধ করবে! হাজার আসরফি দিয়ে তোমায় কিনেছি। তোমায় ফিরে বেচলেও তো দু' আসরফি হবে না। দেখলাম অনাথা তাই কিনলাম, নইলে বকাউল্লা উজীরের স্ত্রীলোকের অভাব কি? দু'শো ওমরার বেগম যার একটা মিষ্টি কথার জন্য হাঁপিয়ে মরছে সে কি একটা বাঁদীর জন্যে লালায়িত? তবে ভেবেছিলাম আমার বেগম হ'লে ভবিষ্যতে তোমার একটা গতি হবে তাই, নইলে আমার আর কোন গরজ নেই। বুড়ো হয়েছি স্ত্রীলোকের প্রতি কোন আসক্তি নেই. তবে কিনা তোমায় দেখলাম অনাথা তাই একটু মমতা হ'ল!

করিমা। হজরৎ পরম দয়ালু!

উজীর। দয়ার জন্যেই আমার সব গেল! তা যাক, সর্ব্বস্ব যেয়েও যদি তুমি খুসী থাক, তা হ'লেই আমি খুসী। ওই দেখছি ফতেমা আসছে—তা, একটু নিরিবিলি কথাবার্ত্তা হবে- এখন একবার দরবারে ঘুরে আসি। কি বল. যাই?

করিমা। আসুন, বন্দেগি।

উজীর। (স্বগত) সয়তানের লেড়্কী! থাকতেও বললে না! জোর জবরদস্তি করলে আবার বাদ্‌শার কানে উঠবে! সব শালা ওম্‌রাও কড়া নজর রেখেছে!

[প্রস্থান।

ফতেমার প্রবেশ

ফতেমা। বুড়ো কি বললে?

করিমা। ওই এক কথা, আর কি বলবে? ফতেমা একটু জহর এনে দিবি?

ফতেমা। জহর কেন বিবি সাহেব?

করিমা। খেয়ে মরি! আর সহ্য হয় না।

ফতেমা। মরবে কেন করিমা? ও রূপ যৌবন কি কেউ স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দেয়?

করিমা। সেও ভাল ফতেমা, শয়তানের ভোগে লাগার চেয়ে মাটিতে মিশিয়ে যায় সেও ভাল।

ফতেমা। অত নিরাশ না হ'য়ে শয়তানকে কেমন করে ভোগে লাগান যায় তাই ভাবিগে চল।

করিমা। চল যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

মালেক ও বাহাদুরের প্রবেশ

বাহাদুর। না মালেক, এ জায়গা বড় সুবিধের নয়। একে তো শত্রুর দেশ তারপর স্ত্রীলোকের যে উৎপাত দেখছি—না চল কাবুল পানে যাওয়া যাক।

মালেক। তোমার যেখানে খুসী যেতে পার, আমি একবার বাদশার অন্দর না দেখে যাচ্ছিনে। অত সাধু হ'তে হয়, ফকিরী নাও গে। পঁচিশ বছরের জোয়ান, আওরৎ দেখে ভয়? তোমার ঠাকুর্দা ষাটবছর বয়সে এক সঙ্গে তিনটি নিকা আর এগারোটা সাদি করেছিলেন খবর রাখ?

বাহাদুর। আর তোমার বাবা যে বেগম সাহেব ম'রে যাবার পর মেয়েমানুষের মুখ দেখেন নি, খবর রাখ?

মালেক। বাবা দেখেন নি কাজেই আমিও দেখব না, যুক্তির বাহাদুরী আছে। শোন বাহাদুর, যে মৎলবে বেরিয়েছি—হাসিল না হওয়া পর্য্যন্ত ইস্পাহান ছেড়ে কোথাও যাওয়া নয়, বুঝলে? ঢেঁড়্‌ড়া দিচ্ছে শুনেছ তো? সব মরদকে ফৌজে টানছে। কেন বুঝতে পারছ?

বাহাদুর। জানিগো জানি। তাতে আমাদের ভারি ভয়।

মালেক। আরে ভয় নেই ব'লেই তো দেশ ছেড়ে বেরিয়েছি। কুছ্ পরোয়া নেই তোমার। কাজটা হাসিল হ'লে, এই বলছি তোমাকে, আমার যত কস্‌বী বাঁদী আছে—সব বিদায় দিয়ে একদম ফকির ফকিরদ্দোলা হ'য়ে বসব। কোন্ শালা আর স্ত্রীলোক নিয়ে কারবার করে। অতি পাজী জাত—অতি পাজী, কেবল ফাঁকি আর মুখে ভালবাসা। দাঁড়াও, আগে ফিরে যাই, তারপর সব বেটিকে তাড়াচ্ছি।

বাহাদুর। বা দোস্ত বড় খুসী হলাম, তবে কি জান যতক্ষণ চোখে না দেখছি ততক্ষণ বিশ্বাস নেই।

মালেক। কেন? কেন?

বাহাদুর। আর তোমাকে তো ছেলেবেলা থেকে দেখছি, বললে "খাব কাবাব," কাবাব তৈরী হ'ল, অমনি বললে "উঁহুঃ ওটা নয় কোর্মা খাব"।

এই তো বরাবর চলছে, ঘর থেকে বরুলে, যাবে মদিনা, রাস্তায় এসে মৎলব বদ্‌লিয়ে ইস্পাহানে এসে হাজির।

মালেক। না বাহাদুর এবারকার মৎলব আমার ঠিক—তুমি দেখে নিও। আচ্ছা বাহাদুর তুমি সাদি কর।

বাহাদুর। আর তুমি?

মালেক। তোমার দেখে করব। দেখি সাদি ক'রে তুমি কেমন থাক, কি জান ওটাকে আমি একটু ভয় করি।

বাহাদুর। পঁচিশ বছরের জোয়ান, আওরৎ দেখে ভয়? আরে ছ্যাঃ।

মালেক। ঠাট্টা করছ! কর। কিন্তু পরের স্ত্রী আর নিজের স্ত্রীতে একটু তফাৎ আছে। তারপর যদি একটু দেখতে ভাল হ'লেন তা হ'লেই আর কি? "ওরে বাঁদী" "ওরে বান্দা" "ফুলের পাখা" "গোলাপ জল" —কি, ওরকম ক'রে তাকাচ্ছ যে! ভয় নেই—ভয় নেই, সাদি করা খুব ভাল, ভারি ফুর্তি—তুমি সাদি কর বাহাদুর সাদি কর। ভারি আরাম পাবে।

বাহাদুর। আচ্ছা ভেবে চিন্তে করা যাবে। আপাততঃ একটা সরাই-টরাই খুঁজে না নিলে তো চলছে না। পেটের নাড়ীসুদ্ধ হজম হ'য়ে যাবার মতন।

মালেক। দাঁড়াও, কতকগুলো স্ত্রীলোক আসছে না? এদের কাছে জিজ্ঞাসা করি।

বাহাদুর। না মালেক, দরকার নেই, দরকার নেই—আমিই খুঁজে নেব— এদের দলে পড়লে—তুমি আহার নিদ্রা ভুলে যাবে।

মালেক। সত্যি বাহাদুর, এরা বড় সুন্দর! হবে না? বেদানা খায় কত?

ওমরাহ বনিতাগণের প্রবেশ

১ম ওমরাহ বনিতা। কে গো তোমরা?

মালেক। দু'টি নির্জীব প্রাণী, ইস্পাহান দেখতে এসে পথ ভুলেছি।

১ম ওমরাহ বনিতা। কোথায় যাবে?

মালেক। সে আর আপন মুখে কেমন ক'রে বলি বিবিসাহেব? মেহেরবানী ক'রে যেখানে নিয়ে যাও।

১ম ওমরাহ বনিতা। রসিক দেখছি যে। আমার ঘরে যাবে? আমি আমীর আলী ওমরার স্ত্রী।

মালেক। তিনি বেঁচে নেই তো?

২য় ওমরাহ বনিতা। না গো সেখানে যেও না। ও দুষমনের ঘর, আজ গেলে কাল আর মাথা নিয়ে বেরুতে পারবে না। এ আমি হলপ ক'রে বলতে পারি।

মালেক। বটে বটে। তবে মাফ কর সুন্দরী, তোমার মত রূপসী মিলবে ঢের, কিন্তু এ মাথা একবার গেলে আর মিলবে না। তুমি বরং আমার এই সঙ্গীটিকে নিয়ে যাও, দিব্যি রসিক লোক—দেখছ না গোঁফ (গুম্ফ টানিলেন)

বাহাদুর। উঃ লাগে! লাগে!

মালেক। আর উঁচুদরের প্রেমিক—কোরাণ সরিফ্ আগাগোড়া মুখস্থ।

১ম ওম্রাহ বনিতা। তাই নাকি সাহেব? তুমি কে?

বাহাদর। এই রে। কেউ নই বিবিজান। কেউ নই—পথে ঘাটে থাকি—কারো বাড়ী যাওয়া নিষেধ।

৩য় ওম্রাহ বনিতা। তবে বন্ধু আমার সাথে চল—আমি গাছতলায় থাকি—দু'টিতে বেশ থাকব—আমার খসমও ঘরে নেই, যাবে বন্ধু?

বাহাদুর। ওরে বাবা! তাকি হয়? তোমার খসম থাকলে যেতাম, আলাপ পরিচয় ক'রে আসতাম। উহুঃ হুঃ পায়ের ব্যথায় গেলাম। উহু।

৩য় ওম্রাহ বনিতা। কি হ'ল জান্?

বাহাদুর। আর বিবিজান, জান্ গেল। স'রে যাও স'রে যাও—কুষ্ঠ-ব্যাধি হ'য়েছে।

১ম ওম্রাহ বনিতা। তাই নাকি, ছিঃ ছিঃ। তবে এস আমরা যাই। (মালেকের হস্তধারণ)

মালেক। মাইরি বিবিজান, তোমার স্পর্শ কি মধুর!

২য় ওম্রাহ বনিতা। আর আমার! (হস্তধারণ) এস জান্ আসবে না?

মালেক। আহা অভিমান কোরো না, যাব, একটু বিলম্ব কর। আচ্ছা দেখ বিবিজানেরা, শিকার ধরা শিখলে কোত্থেকে বল। রাস্তা ঘাটে—বিদেশী মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছি, কথা নেই বার্তা নেই গায়ে প'ড়ে প্রেম করা আরম্ভ করলে? বলি গোড়ার খবর কিছু রাখ?

সকলে। কি? কি?

মালেক। আমরা দু'টি ডাকাত। শুনছ?

১ম ওম্রাহ বনিতা। আর কি ডাকাতি করবে চাঁদ, জান্ তো নিয়েছ ডাকাতি ক'রে—আর কি নেবে?

মালেক। প্রেম কাকে বলে দেখছিস বাহাদুর? কিন্তু পিয়ার সোজা কথা বলে রাখছি—ইউফ্রেতিস্, ঘাঁট্লে দুই এক পাই পেতে পার, কিন্তু তোমার এই পিয়ারের আঙ্গরাখা ঢুঁড়্লে এক কানা কড়িও বেরুবে না। দু'দিন সবুর কর কিছু বাগিয়ে নিই, তারপর তোমরা দল বেঁধে এস কাউকে নিরাশ করবে না, বুঝলে?

২য় ওম্রাহ বনিতা। আমরা কি পয়সার ভিখিরী?

৩য় ওম্‌রাহ বনিতা। তাই গো, এরা আমাদের তাই ভাবছে। চল যাই।

মালেক। তবে চললে চাঁদ? বলি দেখা সাক্ষাত কি আবার হবে?

১ম ওম্‌রাহ বনিতা। হবে বইকি বন্ধু—শোন—(কর্ণে) শুনলে?

মালেক। বস্‌ রাজী। বলি পিয়ার তোমার কিছু আছে নাকি?

২য় ওম্‌রাহ বনিতা। আর তুমি ভাই আমাদের সঙ্গে কথাই কইলে না। আমরা কুৎসিত।

মালেক। কে বল্‌লে বন্ধু, কুৎসিত। বাবা। ইস্পাহানকে তোমরা বেহেস্ত ক'রে রেখেছ—দুনিয়ার লোককে মধু বিলুচ্ছ। কত হাজী ফকির মক্কার পথ ভুলে এখানে এসে হাজির হচ্ছে ঠিকানা নেই, আর তোমরা কুৎসিত!

২য় ওম্‌রাহ বনিতা। তবে অবহেলা করছ না?

মালেক। আরে ছিঃ, সে কি একটা কথা!

২য় ওম্‌রাহ বনিতা। জুম্মাবোজে—(কর্ণে)

৩য় ওম্‌রাহ বনিতা। আমি অত বেহায়া নই' কাউকে অত সাধিনে।

মালেক। ভালই। বিবিজান তবে তোমায় সেলাম?

৩য় ওম্‌রাহ বনিতা। সেলাম আমি চাইনে, যাদের সঙ্গে পীরিত তাদের সেলাম কর, আমি কে?

মালেক। তুমি সব বিবিজান, তুমিই দেখছি সব, বড় শিকারী। এক লহমায় যেমন অভিমান করা আরম্ভ করেছ দশ বছরের সাদির স্ত্রীও তেমন করে না, ব্যবসাটা শিখেছ ভাল। যাক্‌ আর কেন ব'লে ফেল, তোমার আর্জীটাও শুনি, নইলে রাত্তিরে ঘুম হবে না।

৩য় ওম্‌রাহ বনিতা। (কর্ণে) হচ্ছে হয় যেও, আমি কাউকে সাধিনে।

বাহাদুর। (উঠিয়া) মালেক! পালাও, পালাও। আরো আসছে, এবার ঠিক খাবে। (প্রস্থানোদ্যম)

মালেক। আরে ভয় কি? আমি আছি।

বাহাদুর। তোমার জন্যেই তো ভয়—এ দুষ্মণ চেহারার কাছে কেউ ঘেঁসবে না দোস্ত, তোমাকেই খাবে, পালাও।

১ম ওম্‌রাহ বনিতা। ওরে সব চ'লে আয়, চ'লে আয় কঁদুলী ফতেমা আসছে।

২য় ওম্‌রাহ বনিতা। তাই তো! ভুল না বন্ধু—দু'দণ্ড কথা কইতে পারলাম না।

মালেক। ওতেই হ'য়েছে!

১ম ওম্‌রাহ বনিতা। তবে দোস্ত—(ইঙ্গিত)

মালেক। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক, নামাজ ভুলবো তো তোমায় ভুলব না।

৩য় ওম্‌রাহ বনিতা। আমি কাউকে সাধিনে।

মালেক। আমি সেধেই যাই, এস তবে, সেলাম।

[ওম্‌রাহ বনিতাগণের প্রস্থান।

ফতেমার প্রবেশ

বাহাদুর। (ভীতস্বরে) মালেক ?

মালেক। আরে থাম। বিবিজান সেলাম।

ফতেমা। বন্দেগি। আপনারা কোথা থেকে আসছেন ?

মালেক। ভয় নেই বাহাদুর, এ স্ত্রীলোকটা ভাল—হ্যাঁ কি বললে ?

ফতেমা। কোথা থেকে আসছেন আপনারা ?

মালেক। ঐটি জিজ্ঞাসা কোরো না সুন্দরী, বলতে পারব না, বরং কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞাসা করতে পার।

ফতেমা। বলুন।

মালেক। অনেক দূর থেকে আসছি, যাব ইস্পাহান। শুনেছি বাদ্‌শার নূতন ফৌজ তৈয়ার হচ্ছে, দেখি যদি সেখানে ঢুকতে পারি। আমার সঙ্গীটিও সেপাই।

ফতেমা। সেপাই! তা আপনার পিছনে ওরকম জড়সড় হ'য়ে রয়েছেন কেন ?

বাহাদুর। কি জান বিবিজান ? মরদের সঙ্গে লড়াই করাই অভ্যেস, কিন্তু এখানে দেখছি পথে ঘাটে স্ত্রীলোকের সঙ্গে লড়াই করতে হয়।

ফতেমা। এগিয়ে আসুন ভয় কি ? আমি লড়াই করতে আসিনি—হাতিয়ারও নেই।

মালেক। ঐটি বোলো না বিবিজান, তোমার সর্ব্বাঙ্গে হাতিয়ার, চোখে বাণ, মুখে তলোয়ার, বুকে বর্শা, যাকে বিঁধবে তার নির্ঘাত মৃত্যু। তোমাদের চলন দেখলে বুক কাঁপে—সঙ্গে সঙ্গে পাঁয়জরের রুণুঝুনু শুনলে মনে হয় আরব ঘোড়সওয়ার আসছে। তোমাদের যে দেশ দেখছি—তাতে তোমাদের বাদ্‌শার ফৌজের অভাব হবে না, মরদের বদলে গুটিকয়েক তোমাদের দলের নিয়ে যদি ফৌজ গড়া যায়—তা হ'লে স্তাম্বুল তো ভাল চীন সুদ্ধ জয় ক'রে আসবে তার এদিক্ ওদিক্ নেই।

ফতেমা। (স্বগত) বেশ কথাগুলি! (প্রকাশ্যে) হজরৎ, যদি রুষ্ট না হন তবে একটা আর্জ্জী করতে পারি, গরীবখানা নিকটেই, যদি আতিথ্য গ্রহণ করেন তবে কৃতার্থ হই।

বাহাদুর। এ আতিথিতে বিশেষ লাভ হবে না, কেটে টুক্‌রো করলেও তামার টুকরো মিল্‌বে না।

ফতেমা। জনাব ভুল বুঝেছেন, আমরা অতিথিকে অর্থের লোভে স্থান দিইনে।

মালেক। ঠিক্! ঠিক্! কিন্তু সুন্দরী, তোমাদের ওম্‌রাহ স্ত্রীদের দেখে আমার ধারণা উল্‌টে গেছে।

ফতেমা। ওম্‌রার স্ত্রী! যাদের সঙ্গে ওদের কথা বিশ্বাস করেছেন? ওরা তো কস্‌বী সব—এ দেশের ওম্‌রাদের সাদি করবার হুকুম নেই—তাদেরই সব—

মালেক। শুনলে বাহাদুর?

বাহাদুর। ঠক্‌বে। মালেক ঠক্‌বে। বিশ্বাস কোরো না, বিশ্বাস কোরো না।

মালেক। তোমার নিমন্ত্রণ নিতে পারলাম না বিবিজান মাফ কোরো—এইখানেই আবার সাক্ষাৎ হবে।

ফতেমা। ঠিক্ যেন থাকে বিদেশী—ঠিক আসবে?

মালেক। ঠিক আসব।

ফতেমা। (স্বগত) করিমা বিবির নজর আছে বটে! খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু খোঁজ পেলাম না কিন্তু প্রাণের পরিচয় পেলাম। দোহাই খোদা মনের ইচ্ছাটা যেন পূর্ণ হয়।

[প্রস্থান।

উজীর ও ইয়াকুবের প্রবেশ

ইয়াকুব। তারপর জনাবালি, এই পর্য্যন্তই হ'য়ে রইল তাহ'লে!

উজীর। কাজেই আমি তো চেষ্টার ত্রুটি করছিনে। পয়সার লোভ, বান্দা বাঁদির লোভ, কিছুতেই বাগে আসবে না। কি করি?

ইয়াকুব। তাহ'লে ছেড়ে দিন, বেটী পথে গিয়ে দাঁড়াক!

উজীর। ইয়াকুব!

ইয়াকুব। হুজুর?

উজীর। বুকে ছুরি মার্, বুকে ছুরি মার্!

ইয়াকুব। কেন হুজুর?

উজীর। ও কথা মুখ দিয়ে বলতে আছে? জানিস ইয়াকুব, করিমা বিবির বদলে আমি উজীরী ছাড়তে পারি।

ইয়াকুব। না তা জানিনে, তবে আমি আর্দ্দালীগিরি ছাড়তে পারি।

উজীর। ইয়াকুব আর কিছু ফন্দী দেখ।

ইয়াকুব। আজ্ঞে দেখ্‌ছি। আচ্ছা—জোর ক'রে মোল্লা ডেকে সাদি ক'রে ফেললে হয় না?

উজীর। হয়। কিন্তু এ বাদ্‌শা থাকতে তো হবে না। বাদ্‌শার কানে উঠলে জান তো? পুরাণো বাদ্‌শার আমলে কোনও ভাবনা ছিল না। পথ দিয়ে খুবসুরৎ ইরাণী চলেছে, নিমন্ত্রণ ক'রে ঘরে নিয়ে গেলাম, ইসারায় মোল্লা এল, খানা শেষ হ'তে না হ'তেই বস্ সাদি খতম্!

আর এ বেটা যদি শুনলে কেউ কোনও স্ত্রীলোকের অমতে তাকে সাদি করেছে অমনি নাও গর্দ্দান ! গর্দ্দান তো সস্তা নয় ইয়াকুব ।

মনস্কাম

বড়দিনের ছুটিতে পকেটে ষ্টেথস্কোপ ও হাতে ব্যাগ লইয়া চৌবাঘায় মামাবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। মামীমাকে প্রণাম করিয়া কেবল দাঁড়াইয়াছি, এমন সময় একটি ছেলে আসিয়া কহিল, "আপনাকে ডাকছে।"

মামাবাড়ীতে মাঝে মাঝে আসিতাম, দুই-একজন বন্ধুবান্ধবও জুটিয়াছিল, তাহাদেরই কেহ সম্ভাষণ জানাইতে আসিয়াছে ভাবিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলাম। একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন, আমাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ডাক্তার ?"

কহিলাম, "হ্যাঁ, কেন বলুন তো ?"

বৃদ্ধ কহিলেন, "ভালই হয়েছে ! আপনাকে পাল্কী থেকে নামতে দেখেই ছুটে এসেছি। একটু যেতে হবে ! গরীব মানুষ দয়া না করলে—" কোথায় যাইতে হইবে, কাহার অসুখ, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিলাম না, ষ্টেথস্কোপটি পকেটে ফেলিয়া ভদ্রলোকের সঙ্গ ধরিলাম। মিনিট পনেরো পর বাঁশের ঝোপে ঘেরা একখানি একচালা ঘরের আঙ্গিনায় গিয়া দাঁড়াইলাম। ঘরের দরজায় একটি যুবক গামছা কোমরে জড়াইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ডাকিল, "ভিতরে আসুন !" কোমরে গামছা জড়ান মানুষ দেখিয়াই বুঝিলাম যে, সম্ভবতঃ রোগীর আর ডাক্তার দেখাইবার বেশী দিন প্রয়োজন হইবে না।

ঘরে ঢুকিলাম। ঘরের কোণে বাঁশের মাচার উপরে একটি বৃদ্ধা শুইয়া ছিলেন। বুঝিলাম ইঁহারই রোগ আরোগ্য করিবার জন্য আমি আসিয়াছি। রোগিনীর পাশে বসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতেছি, এমন সময় বৃদ্ধা হাত টানিয়া কহিলেন, "ও ছাই দেখে হবে কি ! হাত দেখতে পার ?"—বলিয়া দক্ষিণ করতল প্রসারিত করিয়া আমার হাতের উপর রাখিলেন। আশ্চর্য্য হইয়া যুবকটির দিকে চাহিলাম। সে একটু মুচকি হাসিয়া আমার কানের কাছে মুখ লইয়া ইংরেজীতে কয়েকটি কথা ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিয়া গেল।

ব্যাপারটা কতক বুঝিলাম। মৃত্যুপথযাত্রীর নিকট মিথ্যা কথা বলিবার

প্রবৃত্তি ছিল না, তথাপি পরিহাস করিবার চিরন্তন স্বভাবটি পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না ; কহিলাম, "একটু একটু পারি বইকি !"

বৃদ্ধার চোখ দু'টি অকস্মাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, "তবে দেখ তো ভাই, অদৃষ্টে তীর্থ আছে কি-না ?" বলিয়া কাতর উৎসুক দৃষ্টিতে বৃদ্ধা আমার দিকে চাহিলেন।

কি বলিতে হইবে যুবকটির আঁচে আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম ; বৃদ্ধার করতলের দিকে ক্ষণকাল তীক্ষ্নদৃষ্টিতে বিস্ময়ের ভান করিয়া কহিলাম, "উঃ ! বিস্তর তীর্থ দেখছি !"

বৃদ্ধার মুখখানি প্রসন্ন হইয়া উঠিল, আমার ডান হাতখানি মুঠা করিয়া ধরিয়া তিনি কহিলেন, "মিছে কথা বলছিসনে তো ভাই ?"

অসঙ্কোচে কহিলাম, "মোটেই না, হাতের চারদিকেই তীর্থ, তবে সব দরজা বন্ধ বলে যেতে পারেন নি। এইবার দরজা খুলবে।" মনে মনে কহিলাম, "দক্ষিণ দুয়ার।"

আগ্রহভরে রোগিনী বালিশে ভর দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়া পড়িয়া গেলেন। আমি কহিলাম, "ব্যস্ত হ'লে তো হবে না, সেরে উঠুন আগে।"

বৃদ্ধা চোখ না মেলিয়াই কহিলেন, "ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হও ভাই।" তারপর নীরবে তাঁহার ডান হাতখানি তুলিলেন, বুঝিলাম আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পরিচর্য্যা ও পথ্য সম্বন্ধে যুবকটিকে দুই একটি উপদেশ দিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সহিত বাহির হইয়া আসিলাম।

পথে আসিতে আমার সঙ্গীর কাছে বৃদ্ধার জীবনের কাহিনী শুনিলাম। বৃদ্ধার নাম দাখিঠাকুরাণী। ভাল নাম দক্ষজা, অথবা দাক্ষায়ণী,—যে-কোনটি হইতে পারে। দাখিঠাকুরাণীর বিবাহ হইয়াছিল সাত বৎসর বয়সে এবং বৎসর না ঘুরিতেই বিধবা হইয়াছিলেন। সে বহুদিনের কথা। তারপর এই সত্তর বৎসর কাল দাখিঠাকুরাণী তাঁহার স্বামীর বাস্তুভিটায় একখানা একচালা ঘর ও কাঠা দেড়েক জমির সুপারীর বাগানখানি আশ্রয় করিয়া কাটাইয়াছেন। অনাহূত যৌবন দাখিঠাকুরাণীর দেহকেও আক্রমণ করিয়াছিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে কিশোর যুবক ও প্রৌঢ় নানা-বয়সের নর-সৈনিকেরাও অভিযান সুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু একটি শীর্ষহীন সম্মার্জনীর স্বহায়ে দাখিঠাকুরাণী তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে মাথা নেড়া করিয়া ও স্বহস্তে ভালের কাঁটা দিয়া মুখখানিকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া, কাঁচা তেঁতুল খাইয়া সমস্ত দিন পানা-পুকুরে স্নান করিয়া জ্বর ডাকিয়া আনিয়া যৌবনকেও প্রতিহত করিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দাখিঠাকুরাণীর শেষ অবলম্বন বৃদ্ধ অন্ধ শাশুড়ী একদিন প্রাতঃকালে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন ; তখনও যৌবন সগৌরবে দাখিঠাকুরাণীর দেহে রাজত্ব করিতেছিল। ঠাকুরাণী অত্যন্ত কাঁদিলেন এবং বুড়ো ঘোষাল মহাশয়ের

কাছে গিয়া কাঁদিয়া জানাইলেন যে, তাঁহাকে তীর্থে রাখিয়া আসা হোক্। একক তীর্থবাসের বয়স হয় নাই বলিয়া মাতব্বর ঘোষাল মহাশয় তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। সে আজ পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যহ দাখিঠাকুরাণী তীর্থযাত্রা, তীর্থবাস ও তীর্থমৃত্যু কামনা করিয়া আসিতেছিলেন। শেষে এমন অবস্থা হইয়াছিল যে গ্রামের কেহ তীর্থ করিতে গেলে তাহাকে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছি এবং শ্বশুরবাড়ী না থাকিলে কোন কল্পিত কুটুম্ববাড়ীর নাম করিয়া বাহির হইতে হইত। নতুবা দাখি-ঠাকুরাণীর উপদ্রবের অন্ত থাকিত না। তিনি আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া তীর্থকামীর দরজায় ধর্ণা দিয়া পড়িয়া থাকিতেন। এ জন্য দুর্ভোগও তাঁহাকে কম ভুগিতে হয় নাই। গত বৎসর বৃন্দাবন ঠাকুর চৈত্র মাসে তীর্থে লইয়া যাইবেন আশ্বাস দিলেন। ঠাকুরাণী ত বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র পর্য্যন্ত বৃন্দাবন ঠাকুরের পত্নীব সেবা, গোয়াল পরিষ্কার, কাঁথা সেলাই, নারায়ণেব ভোগ পাক ইত্যাদি বিচিত্র কাজ অম্লানবদনে করিয়া গেলেন। চৈত্র মাসের তেইশে তারিখে বৃন্দাবন ঠাকুর পাঁজি খুলিয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিলেন, "রামঃ! অকাল দেখছি যে, তীর্থ তো নেই এ বছর!" সেই দিন বাড়ী আসিয়া দাখিঠাকুরাণী শয্যা লইলেন এবং মাসখানেকের মধ্যে বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন না। তাহাব পরেই এই ব্যাধি। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বৃদ্ধ হাসিয়া কহিলেন, "তীর্থ ব্যাধি আর কি!" কেন জানি না আমি হাসিতে পারিলাম না।

পরদিন আবার ডাক আসিল। মামীমা কহিলেন, "ওই তেথ্থ-পাগল বুড়ীর কাছে যাচ্ছিস আবাব! জ্বালিয়ে মারবে যে!"

বুড়ীর প্রতি একটু মমতা জন্মিয়াছিল' মামীর কথা কানে তুলিলাম না।

গিয়া দেখিলাম দাখিঠাকুরাণী উঠিয়া বসিয়া বেড়ায় ঠেস্ দিয়া ভিজান সাগু খাইতেছেন। আশ্চর্য্য হইলাম। এ রোগী একদিনে উঠিয়া বসিতে পারে একথা কল্পনাও করি নাই! খুশী হইয়া কহিলাম, "যা হোক্! উঠে বসেছেন!"

দাখিঠাকুরাণী হাসিয়া কহিলেন, "তীথ্থে যেতে হবে তো ভাই। শুয়ে থাকলে কে সঙ্গে নেবে, তাই দুটো—" বলিয়াই সাগুর পাথর রাখিয়া হাত ধুইলেন। বুঝিলাম তীর্থ যাইবার আশাই বুড়ীকে এ যাত্রা বাঁচাইয়াছে। একখানা মাদুর টানিয়া লইয়া দাখিঠাকুরাণীর কাছে বসিয়া তাঁহার জীবনের সমস্ত কাহিনী শুনিলাম। শুনিয়া বুঝিলাম তীর্থভ্রমণ আর গঙ্গাতীরে মৃত্যুর কামনাই বুড়ীকে বিপর্য্যস্ত ভাগ্যের অজস্র আঘাতের মধ্যেও আজ পর্য্যন্ত অটুট রাখিয়াছে।

বিদায় লইবার সময় বুড়ীর পায়ের ধুলা লইলাম, দাখিঠাকুরাণী কহিলেন, "তুই তো ডাক্তার ভাই, দেখিস একটু হাড় ক'খানা যেন গঙ্গায় পড়ে। বিরাট

ভারতবর্ষ, তার অগণ্য তীর্থ, প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর প্রসারিত গঙ্গা, আমার মত লক্ষ লক্ষ ডাক্তার আর দাখিঠাকুরাণীর মত কোটি কোটি তীর্থকামী। এ সব কথা বলিয়া আর বুড়ীকে ব্যাকুল করিবার ইচ্ছা হইল না। অসংকোচে কহিলাম, "সে অবিশ্যি দেখব দিদিমা, তীর্থে যাবার সময় খবর দেবেন।"

"—তা দেব বইকি ভাই—" বলিয়া দাখিঠাকুরাণী আমার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "আমার বুকের পাষাণ নেমে গেল দাদা, এমন কথা আর কেউ বলেনি।"

নীরবে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। প্রাঙ্গণে নামিয়া শুনিলাম দাখি-ঠাকুরাণী কহিতেছেন, "মনস্কাম পূর্ণ কর হরিঠাকুর! নারায়ণ! তারকব্রহ্ম!" তারপর নারায়ণের সমস্ত নামগুলিই আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন, আমি শুনিয়া হাসিলাম। আমি নারায়ণ হইলে এতক্ষণে যে দাখিঠাকুরাণীকে নিশ্চয়ই সর্বতীর্থ দর্শন করাইয়া আনিতাম তাহাতে সন্দেহ ছিল না।

২

যাহা হোক, নারায়ণও দাখিঠাকুরাণীর প্রার্থনা শুনিলেন, বুড়ীর মনস্কাম পূর্ণ হইল। মামীমা লিখিলেন যে, তাঁহার স্বামীর বসতভিটাখানি বাদে আর সমস্ত ঘর দরজা তৈজসপত্র লেপকাঁথা ইত্যাদি সিকি মূল্যে বেচিয়া দাখিঠাকুরাণী একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গ লইয়াছেন। শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম।

তখন প্রয়াগের কাছাকাছি একটা জায়গায় বসন্ত ও বিসূচিকা রোগের প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা করিয়া ফিরিতেছিলাম। প্রয়াগে কুম্ভ মেলা আরম্ভ হইয়াছে, মহামারীর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব; সরকার বাহাদুর অজ্ঞ জনসাধারণকে সতর্ক করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। অবকাশ আদৌ ছিল না। এই সময় দশটি বিভিন্ন পোষ্টাফিসের ছাপ খাইয়া একখানি খামের চিঠি আসিয়া পেঁছিল। পড়িলাম—দাখিঠাকুরাণী প্রয়াগে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে লিখিয়াছেন। শেষের দিকে কোথাও মরিলে হাড় ক'খানি গঙ্গায় দিবার জন্য সেই পুরাতন অনুরোধ, তাহার পরের ছত্রগুলি ধ্যাবড়াইয়া গিয়াছে---কিছু বোঝা গেল না। প্রয়াগ হাট চৌবাঘা নয়, তাহা সম্ভবত দাখিঠাকুরাণী জানিতেন না। বুঝিলাম, ঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াও সম্ভব নয়। তথাপি পূর্ণমনস্কাম বৃদ্ধির উল্লাস দেখিতে বড় আগ্রহ হইল। কোন মতে যদি সন্ধান করিতে পারি ভাবিয়া প্রয়াগে চলিলাম।

সমস্ত দিন ঘুরিয়া নিষ্ফল হইয়া ফিরিতেছি এমন সময় চৌবাঘার সাধন মিস্ত্রির সঙ্গে অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইল। আমাকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সে কহিল, "ভাল হ'ল ডাক্তার দাদা—কয়টা মাল খালাস ক'রে দিতে হবে।" সে কথায় কান না দিয়া বুড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

"আজ্ঞে তেনারাই তো মাল—তিনি তো ওলাউঠো হয়ে—" ক্ষণিকের মধ্যে দাখিঠাকুরাণী যেন চক্ষের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠিলেন, শুনিলাম বেণুবনে প্রচ্ছন্ন একটি কুটীরের ছিন্ন শয্যায় শয়ান এক বৃদ্ধা অশ্রু সজল উৎসুক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া যেন কহিতেছে—"হাড় ক'খান্ গঙ্গায় দিস ভাই !" একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে মরেছেন ? সৎকার করলে কে?"

সাধন সহজ ভাষায় কহিল, "হপ্তাখানেক !" তাহার পর মৃত্যুর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাকে জানাইল। প্রয়াগে আসিয়াই তাঁহার কলেরা হয় এবং সঙ্গের লোকজন হাসপাতালে খবর দিয়া তল্পী-তল্পা লইয়া প্রস্থান করে। হাসপাতালেই বুড়ীর ঈশ্বরপ্রাপ্তি হইয়াছে। সাধন শ্রীদাম মাঝির মুখে খবর শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছিল।

কথা না কহিয়া হাসপাতালে গিয়া সংবাদ লইলাম। কথা যথার্থ। কলেরা হইয়া তিরিশে তারিখে দাখি নামে একটা বাঙালী বুড়ীর মৃত্যু হইয়াছে। কোন্ জাতের স্ত্রীলোক না জানাতে কেহ সৎকার করিতে রাজী হয় নাই; এগার নম্বরের প্লটে মাটি দেওয়া হইয়াছে।

এগার নম্বরের প্লট দেখিতে গেলাম। তখনও জন কুড়ি লোকের মাটি দেওয়া হইতেছিল। ডোমের কাছে প্রশ্ন করিয়া বুঝিলাম যে, দাখিঠাকুরাণীকে উদ্ধার করা অসম্ভব, যেহেতু তাঁহার পরেও প্রায় শ'খানেক তীর্থকামী ওই একই স্থানে বিশ্রাম করিতে আসিয়াছে।

গঙ্গার দিকে চাহিলাম, বহুদূর। তবে ভরসা আছে কোন কালে মাতা জাহ্নবী ভাঙনের আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে এগারো নম্বরের প্লটে আসিয়া পেঁাছিবেন, সেইদিন বৃদ্ধার মনস্কাম পূর্ণ হইবে। সেই ভাঙনের দিনের প্রতীক্ষা করিয়া দাখিঠাকুরাণীর অস্থি কয়খানি বসিয়া থাকিবে তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না।

উপন্যাসের প্লট

কাল প্রাতে পত্র দ্বারা ও সন্ধ্যায় লোক মুখে সম্পাদক মহাশয় সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে দিবসের দ্বিতীয় প্রহরেই তিনি লেখা লইতে আসিবেন। সুতরাং প্রাতঃকালে চিঠিপত্র লেখা শেষ করিয়া বেলা দশটার আগেই বাড়ী হইতে বাহির হইব এবং একা সন্ধ্যা অবধি গঙ্গার ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইব সঙ্কল্প করিয়া এক ডজন পোষ্ট কার্ড লইয়া বসিয়াছিলাম। বেলা ন'টা বাজিতেই দরজার সম্মুখে একটি কম্বলাবৃতমূর্তি দেখিলাম—কম্বলের ঘন

সবুজ বর্ণ দেখিয়াই বুঝিলাম সম্পাদক। কহিলাম, "এখন তো আসবার কথা ছিল না আপনার!"

সম্পাদক কহিলেন—"সেই জন্যেই' তো এলাম। আপনাকে জানি তো, যখনই আসতে চাইব ঠিক সেই সময়টাতেই আপনার বাইরের কাজের তাগিদ পড়বে।"

সম্পাদকের বুদ্ধির কাছে পরাস্ত হইয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিয়াছিলাম। রাগও না হইয়াছিল এমন নহে, একটু রূঢ় স্বরেই বলিলাম—"লেখা দিতে পারব না মশাই! গত বারের লেখার দক্ষিণা বাবদ একশিশি ফাউনটেন পেনের কালি দিতে চেয়েছিলেন, দ্যান নি, আপনাদের সতীশ দত্তের সাপ্তাহিক কাগজটিতে পূজার সময় লিখেছিলাম—কথা ছিল বিড়ি রাখবার কৌটো একটা দেবেন, দিলেন না! আমি আর লিখব না মশাই!"

সম্পাদক মহাশয় কম্বল কোমরে জড়াইতে জড়াইতে কহিলেন—"তাতে ক্ষতি আপনার। আপনার নাম লোকে জানতে পারবে না।"

"লিখে নাম করার চেয়ে পকেট কেটে জোড়াবাগান গেলে নাম বেশী হবে—সব কাগজে একসঙ্গে রিপোর্ট বেরোবে"—বলিয়া একখানি চিঠি তুলিয়া লইলাম।

সম্পাদক মহাশয় কহিলেন, "তাতে হাঙ্গাম অনেক। জোড়াবাগান না গিয়ে লোকের হাতে দু'পাঁচটা ঘুসি খেয়েও ঘরে ফিরতে পারেন। তাতে জাতও যাবে পেটও ভরবে না।"

সম্পাদকীয় যুক্তির সারবত্তা বুঝিয়া নীরব হইয়া রহিলাম। সম্পাদক কহিলেন—"আপনার গত বারের লেখাটা হ'য়েছিল চমৎকার! বৌদি সুধারাণী বলছিলেন যে লেখাটা প'ড়ে—"

চেঁচাইয়া উঠিলাম, "চুপ করুন! চুপ—"

সম্পাদক কহিলেন, "তাইতো। ভুল করে নারী প্রসঙ্গ এনে ফেলেছি! মাফ করবেন।" বলিয়াই তিনি আমার পাশে বসিয়া কহিলেন, "চিঠি লেখা থাক! পাঠিকাদের থুড়ি—পাঠকদের ইচ্ছে এবার আপনি একটা উপন্যাস ফাঁদুন। এই মাস থেকেই প্রথম কিস্তি যাবে। প্রথম কিস্তিটা লিখে ফেলুন তো একবার।"

বললাম, "মশাই মেরে ফেলবেন নাকি আমাকে! এখন লেখার কিস্তি! লাইফ ইনসিওরের কিস্তি দিতে পারিনি দুটো।"

"বাজে কাজ করেই আপনারা মরবেন! পঞ্চাশ তো লাইফ তার আবার ইনসিওর! রাখুন চিঠিপত্র, কাগজের প্যাডটা নিন একবার!"

কহিলাম—"আপনি ছাড়বেন না তা হ'লে?"

হঠাৎ দেখিলাম, সম্পাদকের চক্ষু সজল হইয়া উঠিয়াছে। বিস্ময় প্রকাশ করিবার পূর্বেই সম্পাদক কহিলেন—"বড় নিষ্ঠুর কথাটি ব'লে ফেললেন

সকাল বেলা! আপনাকে ছাড়তে পারি, আপনার লেখা ছাড়তে পারব না। কাগজের ফাঁক ভর্তি করবার জন্য আপনার লেখার মত সুবিধাজনক আর নেই—যতখানি চাই ঠিক ততখানি লিখতে পারেন আপনি—কম বেশী এক লাইনও নয়! তারপর পয়সা দিতে হয় না, কাগজ না দিয়ে ছাপা হ'য়েছে বললেই আপনি খুসী। আপনার লেখার মত—যাকগে নিজের কথাই এক কাহন বলছি! উপন্যাসের কিস্তিটা—"

সম্পাদকীয় অশ্রু দেখিয়া বিগলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিলাম,— "দুঃখ করবেন না কিন্তু উপন্যাস তো দিতে পারব না, তবে প্লটটা লিখে দিই, এবার ছেপে দিন—পর মাস থেকে কিস্তি কিস্তি উপন্যাস দেব। কেমন?"

সম্পাদক মহাশয় নববধূর মত ঘাড় নাড়িয়া একটু কাৎ করিয়া মৃদু হাসিলেন এবং বলিলেন—"আচ্ছা!"

"তাহ'লে একটু বসুন"—বলিয়া কাগজের প্যাড ও কলম লইয়া আমার বসিবার ঘরে চলিয়া গেলাম।

লিখিলাম—

প্রথম পরিচ্ছেদ

(নিম্নোক্ত বাক্যগুলি সংক্ষিপ্ত স্মারক মাত্র! উহা অবলম্বন করিয়া উপন্যাস রচনা কালে প্রাকৃতিক বর্ণনা ও ঘটনাগুলি বিস্তৃত করিয়া লিখিতে হইবে।)

গভীর রাত্রি—অমানিশা। আকাশে তারা, পুরন্দরনগরের রাজপ্রাসাদের অলিন্দে দণ্ডায়মানা রাজপুত্রী ষোড়শী—শতদলবাসিনী। শতদলসন্নিভ মুখপদ্ম তাহাতে শিশিরবিন্দুবৎ অশ্রুকণা। পাতালপুরীর মত নিস্তব্ধ দশদিক। কেবল মাত্র দূরে শত্রুশিবিরে চণক-চর্বণ-নিরত যুদ্ধাশ্বের হ্রেষাধ্বনি। রাজপুত্রী শতদলবাসিনী চিন্তা করিতেছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কি চিন্তা করিতেছিলেন? কেন চিন্তা করিতেছিলেন? চিন্তা করিতে করিতে অশ্রুপাত করিতেছিলেন কেন? এ সকল প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? অগাধ ঐশ্বর্য্য, অনুপম রূপ, পরিপূর্ণ যৌবনশ্রী, তথাপি রাজকুমারীর চিন্তা কিসের? যাঁহার ইঙ্গিত মাত্র যশোনগর, সমুদ্রদেশ, রাষ্ট্রকূটের রাজন্যবর্গ প্রভুর আদেশ সারমেয়বৎ পুরন্দরনগরের রাজতোরণ তলে উপস্থিত হন, তাঁহার চিন্তা কিসের?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তথাপি চিন্তা আছে। সে চিন্তার মূলে অনুসন্ধান করিতে হইলে পাঠককে দশবৎসর পূর্বে—হিমাদ্রিপুরের শিব-মন্দির সন্নিহিত পান্থশালায় উপস্থিত হইতে হইবে। সেই পান্থশালা—একদিন যেখানে শতদ্রুদুর্গবিজয়ী বীরকেশরী ইত্যাদি।

সেই পান্থশালার বাপী-সোপানে ষষ্ঠবর্ষ বয়স্ক রাজকুমারী শতদল-বাসিনী অকস্মাৎ স্খলিত চরণ হইয়া বাপীজলস্থ প্রস্ফুটিত শতদলসহস্র মধ্যে নিমজ্জিত হইলেন। হংসকুল ভয়-ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—মীনগণ উল্লম্ফন করিয়া পুচ্ছ প্রদর্শন করিতে লাগিল। কাহারও পুচ্ছ রক্তাভ, কাহারও নীল, কাহারও বা হরিৎ ইত্যাদি। পান্থশালার রাজকুমারীর সহচর, আত্মীয় পরিচারক ও পরিচারিকাবর্গ এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করতঃ বিলাপ করিতে করিতে বাপীতীরে সমাগত হইল, কিন্তু কেহই নিমজ্জিতা রাজকুমারীকে জলতল মধ্য হইতে উত্তোলন করিতে সমর্থ হইল না। এমন সময় 'মাভৈঃ মাভৈঃ' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে দশমবর্ষীয় একটি রাখাল বালক বাপীতীরে উপস্থিত হইয়া জলে ঝম্প প্রদান করিয়া রাজকুমারীকে উদ্ধার করিল। রাজকুমারী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ইন্দীবরাক্ষি উন্মীলনপূর্বক তাঁহার উদ্ধারকর্তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। চারি চক্ষে দৃষ্টি বিনিময় হইল। সেই মুহূর্তের জন্য মাত্র। পরক্ষণেই রাখাল বালক প্রস্থান করিল। প্রথম দৃষ্টিপাতেই রাজকুমারীর হৃদয়ে প্রণয় জন্মিয়াছিল তিনি ক্রমাগত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাখাল বালকের সন্ধান মিলিল না। অবশেষে পল্লীবাসীর মুখে রাজকুমারীর পিতা শ্রবণ করিলেন যে, উক্ত রাখাল বালকের নাম প্রশান্তকুমার। গান্ধার, কোশল গুর্জর পহ্লব দেশ সর্বত্র রাজা অনুসন্ধানার্থ দূত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু সন্ধান মিলিল না। অনন্তর রাজা সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন। শতদলবাসিনী রাজ-সিংহাসনে সমারূঢ়া হইয়া প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন কার্য্য করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু প্রশান্তকুমারকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না! বহু সন্ধানের পর অদ্য—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অদ্য সন্ধান মিলিয়াছে, কিন্তু বলুন তো পাঠক, প্রশান্তকুমার কোথায়? ঐ যে শত্রু শিবির—সেই শিবিরে যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত হইয়া সেনাপতি প্রশান্তকুমার অশান্ত ভাবে পাদচারণা করিতেছেন। তাঁহার হৃদয়ে দুইটি ভাব অহি-নকুলের মত ক্রীড়া করিতেছে। প্রথম ভাব শতদলবাসিনীর প্রতি অনুরাগ, দ্বিতীয় ভাব দিগ্বিজয় স্পৃহা। প্রশান্তকুমারও শতদলবাসিনীকে

বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। কিন্তু নিতান্ত ক্ষাত্রধর্ম পালনার্থ পুরন্দরনগর আক্রমণ করিয়াছেন। চিন্তা করিতে করিতে প্রশান্তকুমারের হৃদয় হইতে শতদলবাসিনীসংক্রান্ত প্রেমাবেগ বিদূরিত হইল। ক্ষাত্রধর্ম পালন স্পৃহাই বলবতী হইল। তখন প্রশান্তকুমার তূর্য্যধ্বনি করিলেন এবং সেনাপতির তূর্য্যরব শ্রবণ মাত্র জলপ্রপাতবৎ সৈন্যদল পুরন্দরনগর আক্রমণ করিল। অলিন্দে দণ্ডায়মানা শতদলবাসিনীর চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনিও শঙ্খ-নিনাদপূর্ব্বক পুরন্দরনগরের সৈন্যদলকে শত্রু সৈন্য আক্রমণ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৃপাণে কৃপাণে বর্শায় বর্শায় ইত্যাদি।

সে দারুণ ঘনঘটাচ্ছন্ন নিশা প্রভাত হইলে প্রশান্তকুমার দেখিলেন যে তাঁহার সেনাদলের আর কেহই অবশিষ্ট নাই পুরন্দরনগরের সেনাদলও নির্ম্মূল। তখন তিনি ব্যথিত হইয়া অশ্বারোহণে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। পুরন্দরনগরের তোরণদ্বার অতিক্রম করিতেই প্রশান্তকুমারের পশ্চাতে চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া চাহিয়া দেখিলেন আলুলায়িতকুন্তলা এক নারী ভৈরব গর্জ্জন করিতে করিতে অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীনা হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। প্রশান্তকুমার অশ্বে কশাঘাত করিয়া বীর বিক্রমে পলায়নপর হইলেন, নারীও তাঁহার অনুসরণ করিল। পাঠক বলুন তো কে ঐ উন্মাদিনী ভৈরবী মুক্ত করবালপাণি? রাজকুমারী শতদলবাসিনী!

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছি এমন সময় সম্পাদক আসিয়া লেখাটি দেখিতে চাহিলেন। কাগজগুলি তাঁহার হাতে দিয়া বিড়ি ধরাইলাম।

সম্পাদক মহাশয় পড়িয়া কহিলেন, "সর্ব্বনাশ করেছেন! একেবারে মেডিয়েভ্যাল রোমান্স ক'রে বসলেন? এতো কেউ পড়বে না—আপনিই মারলেন আমাকে দেখছি।"

বিড়িতে লম্বা টান দিয়া কহিলাম, 'বলুন কি করব?"

সম্পাদক কহিলেন—"মডার্ণভাবে লিখুন, এটাকে মোড় ফিরিয়ে—"

বাধা দিয়া কহিলাম, "বসুন, চেয়ারটায়, দেখছি।"

বলিয়া লিখিলাম—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সম্মুখে অশ্বপৃষ্ঠে প্রশান্তকুমার পলায়মান, পশ্চাতে ধাবমানা ভৈরবী-বেশিনী শতদলবাসিনী। কত মরু প্রান্তর, কত দেশ, কত উপত্যকা, গিরিমালা উভয়ে পার হইলেন, কেহ কাহারও সমীপবর্ত্তী হইতে পারিলেন না। শেষে ধাবনকাতর অশ্বদ্বয় ইন্দ্রপ্রস্থের অনতিদূরে পঞ্চত্ব পাইল। আর কি সে

রেহাই পেল, কিন্তু জলধরের উপর হুকুম হ'ল কোম্পানীকে তিনশ টাকা চুক্তিভঙ্গের খেসারত দেবার। জলধর হুকুম হবার দিন রাতেই বাঁকুড়ো মুখে পাড়ি। সেখানে তার মাসীর বাড়ী ছিল। শতদল নার্সিং শিখে হ'ল নার্স।

সে দিন সন্ধ্যাকালে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা প্রশান্ত শুয়ে, এমন সময় দুধের বাটি হাতে নিয়ে এল এক নারী—সে মিস শতদলবাসিনী সিংহ সিক্‌নার্স। প্রশান্ত দেখেই ভয়ে শিউরে উঠে বললে—"তুমি এখানে! কিন্তু আমি মরতে যাচ্ছি—এখন তলোয়ার মেরে—"

দুধের বাটি নামিয়ে রেখে, শতদল বললে—"আগে বন্দী করি তোমাকে শাস্তি তারপর!"—ব'লেই দু'হাত দিয়ে প্রশান্তের গলা জড়িয়ে ধরলে শতদল—রাজপুত্রী শতদল অভিনেত্রী শতদল—নার্স শতদল!

সম্পাদক মহাশয় সাগ্রহে কহিলেন—"তারপর?"

"তারপর আবার কি?" গোঁফে চাড়া দিতে দিতে জাপানী সিগারেট মুখে রাম ডাক্তার এসে বললে—"সাকিং! শতদল ধপ্‌ ক'রে প্রশান্তের মাথাটা বালিশের উপর ফেলে দিল!"

সম্পাদক মহাশয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"আচ্ছা আক্কেল হ'য়েছে মশাই আমার! দিন শিল্প ক'খানা! আর আসব না মশাই লেখা চাইতে—"

কহিলাম—"ধন্যবাদ! ভগবান আপনার সুমতি দিন!"

রোষরক্ত মুখে আমার দিকে চাহিয়া ও শিল্প কয়খানি পকেটে ফেলিয়া গজেন্দ্রগমনে সম্পাদক মহাশয় চলিয়া গেলেন।

দুই অঙ্ক

প্রথম অঙ্ক

সহরতলীর ছোট একটা বাড়ী। পিছনে ডোবার আকারের একটা জলাশয়, নাম পুকুর। এই বাড়ীরই সদরের দিকের দুটি কামরা। তাহারই বারান্দার ভাঙ্গা রেলিংয়ে নিখিলনাথ একটি লবঙ্গলতা জড়াইয়া দিতেছিলেন।

নিখিল। আজ এতটুকু কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেই সমস্ত রেলিংটা ঢেকে যাবে।

সতীর প্রবেশ

সতী। আজ কোথায় যাবে বলেছিলে না ?

নিখিল। হুঁ! মনেই ছিল না। কটা বাজল? দশটা। আচ্ছা। লতাটাকে ভালো ক'রে জড়িয়ে দি নইলে পড়ে যাবে।

সতী। এখন ব'সে ব'সে ওই কর। যত অকাজ!

নিখিল। অকাজ বলছ সতী! দিনকয়েকের মধ্যেই দেখবে ভাঙা রেলিংটার উপরে কে যেন একখানা সবুজ গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে। দেখতে কি চমৎকার হবে সে! ছোট ছোট লাল ফুলগুলো—তুমি নিশ্চয় লবঙ্গ ফুল দেখনি! দেখলে—

সতী। দেখতে চাইনে আমি।

নিখিল। সত্যি বলছি সতী, ফুল ফুটলে তুমি খুসী হবে। বোঁটাটি—

সতী। ঘরে এসে ব'লো গে, সব শুনব। রান্নাটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে দি। খেয়ে বেরিয়ে পড়।

নিখিল। (মুখ তুলিয়া) তুমি রাঁধছ আবার! মণি কোথায়?

সতী। সরকার-বাড়ীতে গেছে, কাল তার পরীক্ষে। ও বাড়ীর হাসির সঙ্গে পড়বে।

নিখিল। হুঁ! আচ্ছা চল। কিন্তু ডাক্তার তোমাকে রাঁধতে নিষেধ করেছিল।

সতী। ডাক্তার অমন ব'লেই থাকে। যাক্ এসো তুমি! বিকেলে গয়লা আর মুদী দু'জনেই আসবে আবার!

নিখিল। আজ সাত তারিখ! আচ্ছা থাক্—বিকেলে ভাল করে জড়িয়ে দেব। কি রে মণি ওরকম—

চোখ মুছিতে মুছিতে মণির প্রবেশ

কাঁদছিস, কেন মণি?

মণি। হাসি বই দিলে না বাবা।

নিখিল। আচ্ছা কাঁদিসনে পরশু এনে দেব।

মনি। কাল পরীক্ষা যে! (চোখ মুছিল)

নিখিল। আচ্ছা তবে আজই আনব'খন।

মণি। হ্যাঁ বাবা! তুমি এত বই লেখ, আমার পরীক্ষের বই লিখতে পার না? সবাই তা হ'লে আমাদের বাড়ীতে বই কিনতে আসে।

নিখিল। আচ্ছা লিখব। যা তুই আমার চাদর আর জামাটা নিয়ে আয়তো।

মণির প্রস্থান

না এরকম ক'রে চলতে পারে না। একটা কিছু ব্যবস্থা না করলে—

সতীর প্রবেশ

সতী। চাদর জামা কি হবে? খেয়ে যাবে না!

নিখিল। দেরী হ'য়ে যাবে। তার চেয়ে ঘুরে এসে খাব'খন।

সতী। রোজ রোজ এই অনিয়মে—

নিখিল। নিয়ম পদ্ধতি অনুসারে জীবন কাটানো যদি ভাগ্যে থাকত তা হ'লে ওই লাল তেতলা বাড়ীটাতে জন্মাতাম এবং—

মণি চাদর ও জামা লইয়া আসিল

নিখিল। (জামা পরিতে পরিতে) তুমি খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম কোরো, আমি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ঘুরে আসব। মণি এই লতাটাকে একটু ভাল ক'রে জড়িয়ে দিস্।

মণি। তুমি বই এনো না বাবা।

নিখিল। কেন?

মণি। আমি হাসির কাছ থেকে আনব। তার রুমালে ফুল তুলে দিলে বই দেবে বলেছে।

নিখিল। তোর মা মানা করেছে বুঝি!

মণি। না, এনো না বাবা।

নিখিল। আচ্ছা দেখব'খন।

বাহির হইয়া গেল

সতী। মণি যা, ভাত বেড়ে খেয়ে নে। পান্তা ভাত খাস্নি যেন।

মণি। ফেলা যাবে যে।

সতী। আমি খাব—

মণি। না লক্ষ্মী মা, তুমি খেয়ো না, কাশি হবে তোমার।

সতী। কিচ্ছু হবে না। যা তুই, আমি এখানে বসি একটু।

মণির প্রস্থান

সতী। আমার মত নিষ্ঠুর কেউ নেই। লতাটাকে এই অবস্থায় রেখে গিয়ে মন তার খুঁৎ খুঁৎ করবে। পাঁচ মিনিট আমার তর সইল না।

লতাটিকে জড়াইয়া দিতে লাগিল

বিধু ঠাকুরাণীর প্রবেশ

বিধু। বলি হ্যাঁগা, তোমরা তো বেশ এদিকে গোছগাছ ক'রে নিলে দেখছি। ভাড়ার কথা ভাবছ?

সতী অপ্রতিভ হইয়া চাহিল

বিধু। অমন চেয়ে দেখছ কি?

সতী। না, কিছু না। কি বলছেন?

বিধু। মাস ধ'রে তো একশ' বার বললুম। ভাড়া দিতে হয় দাও, নইলে পথ ক'রে দাও, কর্তা যেমন ক'রে পারেন আদায় ক'রে নেবেন।

সতী। ভাড়া তো দিতে চেয়েছি।

বিধু। দেবে না তো কি তুমি ইষ্টিকুটুম যে অমনি থাকবে!

সতী। আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইনে, উনি টাকা আনতে গেছেন। এলেই পাবেন।

বিধু। আনতে তো রোজই যান। যাক্ আজ তাহ'লে সিন্দুকটা সাফ ক'রে রেখো।

প্রস্থান

সতী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল

২

পথের মোড়। নিখিলনাথ মন্থর গতিতে চলিতেছিল। অকস্মাৎ পিছন হইতে সশব্দে একখানি মোটরকার আসিয়া উপস্থিত হইল।

সোফার। কালা নাকি মশাই!

আরোহী। ফুটপাথ দিয়ে যেতে পার না! আরে কেও? নিখিল যে। এক্ষুণি যে খতম হ'য়ে যেতে।

নিখিল। কে বিনোদ! তোমার গাড়ী বুঝি! চমৎকার নীল রং তো গাড়ীটার—আটলাণ্টিক ব্লু।

আরোহী। থ্যাঙ্কস! এখন থেকে একটু দেখে শুনে পথ চোলো হে।

গাড়ী চলিতে সুরু করিল

নিখিল। চললে?

আরোহী। যেও আমার আপিসে—লায়ন্স রেঞ্জ। নাম ক'রে শেয়ারের দালাল বললেই দেখিয়ে দেবে।

গাড়ী চলিয়া গেল

নিখিল। খেতে পাচ্ছে তা হ'লে। শেয়ারের দালালী করে, মোটরেও চাপে, মানুষকেও চাপা দেয়। কিন্তু গাড়ীখানার কি চমৎকার রং! রংয়ের পছন্দ দেখে মনে হচ্ছে বিনোদ একেবারে পাথর হ'য়ে যায়নি। এক সঙ্গে চার বছর পড়েছি, গড়ের মাঠে পা ছড়িয়ে ব'সে কত গল্প কত গান। পুরাণো সব কথাগুলো আজ মনে পড়ে যাচ্ছে।

জনৈক প্রতিবেশীর প্রবেশ

প্রতি। নিখিলবাবু যে। আপনার টিপ কি?

নিখিল। টিপ কিসের?

প্রতি। ঘোড়া! ঘোড়া! আপনি রেসে যাচ্ছেন তো?

নিখিল। আজ্ঞে না। আমি পাবলিশারের কাছে—

প্রতি। ওঃ হ্যাঁ, আপনি তো বই লেখেন আবার! আজ চলুন না রেসে—

নিখিল। খেলিনি কখনো।

প্রতি। তাতে কি? ওখানে ঢুকলেই খেলা আপনি এসে যাবে। আমিও তো জানতুম না। এক শনিবারে গেলুম একজনের সঙ্গে আর দোসরা শনিবারেই—ধরলুম ব্ল্যাক জুয়েল নিজের বুদ্ধিতেই। একেবারে পাঁচে পঁচিশ। আজ ভাবছি ডন জনকে ধরব। যাবেন?

নিখিল। আজ্ঞে থাক্‌ কাজে যাচ্ছি—

প্রতি। আচ্ছা নমস্কার।

প্রস্থান

নিখিল। যে যার মত একটা ক'রে পথ বেছে নিয়েছে। চলছে, পড়ছে, তবু চলছে। গতির আর অন্ত নেই। এই চঞ্চল গতি-লীলার মাঝে শুধু এক আমিই বুঝি স্থবিরের মত—

ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিল

৩

সতী বারান্দা ধরিয়া পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল

মণি প্রবেশ করিল

মণি। (সতীর হাত ধরিয়া) খেয়ে নাও মা, অসুখ করবে তোমার।

সতী। আমার ক্ষিদে নেই রে।

মণি। ক্ষিদে নিশ্চয় আছে তোমার। মিছিমিছি দু'গ্লাস জল খেলে। খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি। বাবার আসতে দেরী হবে।

সতী। ঘরে পান নেই বুঝি।

মণি। পান খাবে মা? পুকুরপাড় থেকে গাছ পান কুড়িয়ে আনছি।

সতী। ওরা বকবে, যাসনি।

মণি। বাঃ বকবে কেন? আমি ওদের গোয়ালঘর নিকিয়ে দিলুম যে—

প্রস্থান

সতী। আমার পেটে কেন এসেছিলি মা!

চক্ষু মুছিল

নিখিলের প্রবেশ

নিখিল। এই নাও—

একখানি নোট দিল

সতী। দশ টাকা!

নিখিল। অ্যাঁ, আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না, ওই শেষ।

সতী। কুলোবে না তো!

নিখিল। তা জানি ব'লেই তো এই পাঁচ মাইল হেঁটে আসছি। তাঁরা বলেন কবিতা চলে না—তাঁরা ছাপেন না। তবে অনেক দিন ঘোরাঘুরি করছি বলে—ওই—

সতী। একটা কথা বলব—

নিখিল। বল—না আগে এক গ্লাস জল দাও—

সতী জল আনিয়া দিল, জল খাইয়া

নিখিল। এখন বল। আচ্ছা, না—তুমি খাওনি ?

সতী। জল খেয়েছি।

নিখিল। মিছে কথা বলছ। মুখ শুকিয়ে গেছে তোমার। তোমার শরীরে অনিয়ম তো সইবে না সতী, খেয়ে নাও তো।

সতী। তুমি—

নিখিল। আমি খেয়ে—না একেবারে রাত্রে খাব, অবেলায় আর—

সতী। না, না খেয়ে নাও গে।

হাত ধরিল

নিখিল। আচ্ছা, কি বলবে বলছিলে !

সতী। বলব ? রাগ করবে না ?

নিখিল। না।

সতী। বুঝতে তো পারছ সব। তুমিও চেষ্টা করছ কিন্তু কিছুতেই—

নিখিল। বুঝি সতী, সব বুঝি। তুমি আগেও বলেছ শুনেছি। কিন্তু আজন্মের অভ্যস্ত নেশার মত এ আমার ধাতের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এত দুঃখ কষ্ট এত অভাব—মুখে বলিনে বটে কিন্তু আমারও অসহ্য হ'য়ে ওঠে—তখনই মনে করি সব ছেড়ে দেব। পারিনে। অনেক দিন কবিতার খাতাটাকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি—পরক্ষণেই পথ থেকে তাকে তুলে বুকে ক'রে এনেছি। কতদিন মনে করেছি লেখাপড়া ছেড়ে কোনও ব্যবসায় হাত দেব—কল্পনা মাত্রেই মনে হ'য়েছে চিরদিনের বন্ধুর সঙ্গে যেন জন্মের মত বিচ্ছেদ ঘটে যাচ্ছে। বড় সংগ্রাম চলছে—

সতী। আচ্ছা থাক্‌গে সে কথা ! চল খাবে চল !

নিখিল। একেবারে সন্ধ্যায় খাব সতী ! দু'বেলা খাওয়া আমার পক্ষে বিলাস—

সতী। পায়ে পড়ি তোমার ! ওকথা বোলো না। মণি ! মণি—

প্রস্থান

নিখিল। লতাটাকে দেখছি সতী জড়িয়ে দিয়েছে। সামনের মাসেই ফুল দেবে—যদি টবটাতে রীতিমত জল দেয়—এর সঙ্গে যদি একটা

অপরাজিতা জড়িয়ে দেওয়া যায় তবে ভারী চমৎকার হয় কিন্তু। সবুজ জমিনের উপর লাল আর নীল ফুল—

নেপথ্যে ঃ নিখিল বাবু। নিখিল বাবু।

আসুন।

প্রতিবেশী বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন

প্রতি। দেখলেন তো?

নিখিল। কি?

প্রতি। সেই যে বলছিলুম না ডন জন। চোখ বুজে একেবারে থোক্ ধ'রে দিলুম পঞ্চাশ—চোখ মেলেই দেখি হাতে একশ' পঞ্চাশ এসে গিয়েছে।

প্রতি। মিথ্যে বলছি নাকি মশাই? বললুম তো যেতে আমার সঙ্গে। সামনের শনিবারে আবার—

নিখিল। যান চলে যান। চলে যান বলছি—

প্রতিবেশী বিব্রতভাবে প্রস্থান করিলেন

একশ পঞ্চাশ।

অন্ততঃ পেট ভ'রে খাবে একমাস—শুনুন মশাই—শুনুন—

প্রস্থান

সতী। কই গো, এস। কই কোথায় গেলেন আবার।

বিধু ঠাকুরাণীর প্রবেশ

বিধু। তোমার বাবু তো এসেছেন, এইবার আমায় বিদেয় কর।

সতী। হ্যাঁ, এই নিয়ে যান।

টাকা দিল

বিধু। মাত্তর!

সতী। এর বেশী আর হোলো না আজ।

বিধু। মা গো মা! তোমার মত ভাড়াটে যেন [illegible]ম না আসে! তা বাছা, তোমার স্বামী যত বাজে কাজ করেন—একখানা মুদীখানা ক'রে বসলেই তো হয়। ও পাড়ার দিনু মুন্সীর বয়াটে ছেলেটা বেশ দু'পয়সা কামাই করছে—ও ছাই লেখা পড়া—

সতী। আমার স্বামী যা' ইচ্ছে তাই করুন—আপনি কে বলবার?

বিধু। রাগছ কেন বাছা? তুমি নিজেই তো বললে কাল—

সতী। আমি বলেছি ব'লে আপনিও বলবেন নাকি!

বিধু। বুঝিনে বাপু তোমাদের মেজাজ! যা হোক আমার পাওনা গণ্ডা এই হপ্তার মধ্যে চাই—নইলে কর্তা যেমন করে পারেন—এ আমি ব'লে রাখলুম।

প্রস্থান

নিখিল উৎসাহিত হইয়া প্রবেশ করিল

সতী। খাবে না ?

নিখিল। চল যাচ্ছি। একটা পথ পেয়েছি সতী! দুঃখ ঘুচলেও ঘুচতে পারে! বলতে পারিনে—তবে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেখব একবার। আর দেখ—আমার এক বন্ধু বিনোদ দালালী ক'রে বেশ দু'পয়সা আনছে—তার আপিসে গিছলাম, সে বললে—আচ্ছা বলব 'খন, চল।

সতী। ঠাকুর। ওঁর সুমতি দাও।

প্রস্থান

দুই হাত যোড় করিয়া নমস্কার করিল

দ্বিতীয় অংক

১

বারান্দা

সতী মাদুর বিছাইয়া শুইয়া ছিল। নিখিল ছাতা হাতে একখানি খবরের কাগজে কতকগুলি জড়ানো কাগজ লইয়া প্রবেশ করিল।

নিখিল। এখনও শুয়ে আছ ?

সতী। কাছে বোস একটু।

নিখিল। না বসতে পারবো না। এখুনই বেরোতে হবে। কাল শনিবার—রেস—

সতী। দেখ ওসব কোরো না তুমি, তোমার পায়ে পড়ি। ওতে হবে না তোমার—

নিখিল। বিরক্ত কোরো না। ওতে হবে না, এতে হবে না, আর আমি শুনতে পারিনে। ঝাঁপ দিয়েছি। তল দেখব।

সতী। কি হ'ল আজ ?

নিখিল। কিছু না। না হোক, তবু টাকা দেখছি। করকরে টাটকা নোটগুলো টেবিলের উপর পুঞ্জীকৃত হচ্ছে। ঝনঝন করে টাকা পড়ছে। আবার শূন্য হয়ে যাচ্ছে। কারো পকেটে যাচ্ছে তো। কেমন ক'রে নিতে হয় এইটে জানিনে বলেই—

সতী। আজ কিছুই নেই ?

নিখিল। সিকে পাঁচেক হ'তে পারে।

সতী। ওঃ সে তো অনেক। মেয়েটাকে ডেকে বলতো কয়লা চাল আর ডাল কিনে আনুক।

নিখিল। মণি। মণি।

একখানি কাগজ হাতে করিয়া মণি প্রবেশ করিল

হাতে ওটা কি ?

সতী। ফেলে দে।

নিখিল। কি ও ?

মণি। মায়েব ওষুধের ফর্দ।

নিখিল। কে দিলে ?

মণি। ডাক্তারবাবু। ও বাড়ীতে কাকীমার মাথায় টাক পড়ছে, তাই দেখতে এসেছিলেন।

নিখিল। ডেকেছিলে বুঝি ?

সতী। না, মণির সাথে গিয়েছিলাম। তা' তিনি বললেন কিছু নয়।

মণি। কিছু নয়। মা মিছে কথা বলছে বাবা, ডাক্তার বললে—

সতী। চুপ কর্, রাক্ষসী।

নিখিল। নাও থাম। চেঁচামেচি শুনতে পারিনে আর।

মণি। ওষুধটা এনো বাবা। বড় শক্ত ব্যারাম।

নিখিল। দাও দেখব।

প্রস্থান

মণি। মা।

সতী। কি মা।

মণি। বাবা রাগ করল কেন মা ?

সতী। জানিনে। যা তুই উনুনটা জেবলে দে।

মণি প্রস্থান কবিল

সতী। শেষে সব কেড়ে নিলে ভগবান।

চোখ মুছিল

নিখিল প্রবেশ করিল

নিখিল। সব জোচ্চুরি। একটা ওষুধের দাম নাকি বারো টাকা। টাকা অমনি আসে কিনা ? ওকি, তুমি কাঁদছ যে !

সতী। কই। (চোখ মুছিয়া) চোখে রোদ লাগছিল তাই।

নিখিল। বুঝতে পারিনে কিছু ! যাক্—সকাল সকাল দুটো ভাত সিদ্ধ ক'রে দিতে বল শেয়ার মার্কেটে বেরুতে হবে।

প্রস্থান

২

রান্নাঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো বিষ্ণুর পট। তাহার সম্মুখে গলায় আঁচল জড়াইয়া মণি দাঁড়াইয়া।

মণি। ঠাকুর। বাবা যেন আজ মায়ের ওষুধ কিনবার টাকা পায়! তোমার লুট দেব ঠাকুর!

নিখিল প্রবেশ করিল

এই যে বাবা। টাকা পেয়েছ বাবা?

নিখিল। পেয়েছিলাম, গিয়েছে। তোমার মা কোথায়?

মণি। ওই ঘরে। তিনবার বমি করেছে— শুধু রক্ত। বাবা!

কাঁদিতে লাগিল

নিখিল। কাঁদিসনে।

মণি। অল্প ক'রে ওষুধ কেনা যায় না বাবা? এতটুকু? পয়সা হ'লে বেশী ক'রে—

নেপথ্যে সতী—জল দিয়ে যা

মণি। যাই মা।

দ্রুত প্রস্থান

নিখিল। উঃ। মুক্তির সব দুয়ার বন্ধ। এক মৃত্যু ছাড়া।

নেপথ্যে সতী—ওগো কাছে এস একটু

যাচ্ছি। তোমার কাছেই মণি প্রার্থনা করছিল বুঝি। ভালো লোক চিনেছে। (বিষ্ণুর ছবিখানা উল্টাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিলেন)

৩

সতী শুইয়া। মাথার কাছে একটা জল-চৌকির উপর গুটিকয়েক শিশি ও একটা বাটিতে বার্লি। দরজার কাছে ডাক্তার ও নিখিল।

ডাক্তার। আগে তো বলেন নি কিছু?

নিখিল। কি বলব বলুন? সত্যি কথা শুনবেন? খালি হাতে কাউকে ডাকতে ভরসা হয় না। আজ পনেরো দিন ধ'রে বারোটা টাকা যোগাড় ক'রে ওষুধ কিনতে পারিনি। অথচ মৃত্যু তিলি তিলে একজনকে গ্রাস করছে চোখের উপর দেখছি। আজ নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে—

ডাক্তার। থাক্। বুঝেছি আমি।

নিখিল। এখন কি করব?

ডাক্তার। লড়াই করে দেখুন। দু'টো ওষুধ একটা খাবার একটা মালিশের। মালিশটা সাবধানে রাখবেন, বিষ। ভরসা দিতে পারছিনে, তবু দেখুন শেষ চেষ্টা একবার।

মণির প্রবেশ

মণি। ডাক্তারবাবু! (কাঁদিয়া ফেলিল) মাকে ভাল ক'রে দিন—আমি খুব ভালো উলের কাজ জানি—

ডাক্তার। হুঁ।
মণি। আপনার পায়ের পশমের জুতো বুনে দেব। মাকে আমার ভাল ক'রে দিন।
ডাক্তার। আচ্ছা, ভাল হ'য়ে যাবেন।

ডাক্তার ও নিখিল বাহির হইয়া গেলেন

মণি। (সতীর নিকটে গিয়া) মাগো শুনছ? (সতী চাহিলেন) তুমি ভালো হ'য়ে যাবে ডাক্তারবাবু বলেছেন। খুব বড় ডাক্তার মা।
সতী। ভালো? আচ্ছা।

চক্ষু মুদিল

নিখিলের প্রবেশ

মণি। মা ভালো হ'য়ে যাবে বাবা!
নিখিল। হুঁ। তুমি রান্না শেষ ক'রে ফেলগে যাও।

মণি চলিয়া গেল

এখন কেমন লাগছে? (সতীর মাথায় হাত দিল)
সতী। ভালো। তুমি অত কাছে এস না—বড় ছোঁয়াচে ব্যারাম। বুকের ব্যথাটা বড়—
নিখিল। যদি আগে চেষ্টা করতাম—
সতী। কম তো করনি। একটু জল দাও।

জল পান করিয়া

আবার সংসারী হোয়ো। পরিশ্রমী মেয়ে এনো—শুধু রূপ দেখো না।
নিখিল। ওসব বোকো না এখন. শুয়ে থাক।
সতী। বুকের ব্যথাটা যদি না থাকত।

চক্ষু মুদিল। নিখিল নতমুখে বসিয়া রহিল।

৪

গভীর রাত্রি

ঘরের এক কোণে মণি ঘুমাইয়া। তাহার কোলের কাছে পশমের জুতা বুনিবার সরঞ্জাম। অন্য কোণে সতী অচেতন অবস্থায় মাঝে মাঝে আর্তনাদ করিতেছিল। নিখিল জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সতীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

নিখিল। রাখতে পারলাম না তোমাকে। না—এটা মিছে কথা। রাখতে

চেষ্টা করলাম না। না, তাও সত্যি নয়। চেষ্টা করবার সামর্থ্য নেই, কি করব?

নিকটে গিয়া ডাকিল—সতী।

অজ্ঞান। এইটুকুই ওর শান্তি। যন্ত্রণাটা অনুভব করতে পারছে না।

সতী আর্তনাদ করিয়া উঠিল

ওঃ। আর সইতে পারিনে। জন্ম আছে—মৃত্যু আছে—বুঝি। কিন্তু এ আড়ম্বর—আয়োজন কেন? দিনের পর দিন এই যন্ত্রণা, এই দুশ্চিন্তার বোঝা বওয়া—বটে? কেন? মণি—না থাক্, ঘুমুচ্ছে। ওগো জেগেছ? নাঃ। ঘুমোও ঘুমোও। প্রথম যেদিন এসেছিলে—বাড়ীতে উৎসবের হর্ষধ্বনি আর তুমি আমার বুকের কাছে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন আজও তেমনি—বিদায়ের রাত্রে—

সতী আর্তনাদ করিয়া উঠিল, ওগো। একটু ওষুধ দাও—ঘুমের ওষুধ—বড় ব্যথা।

দিচ্ছি।

চৌকী হইতে ঔষধের শিশি তুলিয়া

এটা মালিশের। বিষ। ঠিক হ'য়েছে।

হাসিয়া উঠিল

সতী। কি, ও?

নিখিল। কিছু না। পেয়েছি—খুব ভালো ঘুমের ওষুধ সতী।

সতী। দাও।

নিখিল। দেব। না, গেলাসে ঢেলে রাখছি। এখন না।...আর একটু দেখে নিই।

দূরে গিয়া দাঁড়াইল

বেশী যন্ত্রণা হ'লে...ওই গেলাসে ঢালা রইল।

সতী। ওগো।

নিখিল। হুঁ। হাতের কাছেই ওষুধ। আসছি আমি।

প্রস্থান

সতী। বড় ব্যথা...আর পারিনে। কই?

হাত বাড়াইয়া ওষুধের গ্লাস লইল

নিখিল। (ছুটিয়া আসিয়া) খেও না। খেও না। না—যাচ্ছি।

সতী। কি বকছ পাগলের মত।

নিখিল। না, ঘুমোও। ঘুমোও। আর ভয় নেই।

প্রস্থান

গ্লাসের ঔষধ পান করিয়া সতী—ওঃ বুক গেল! ওঃ বুক গেল!

মণি। (জাগিয়া) কি মা কি? বাবা—

সতী। জল! জল!

জল পান করিল

নিখিল। কি মণি? খেয়েছে?

মণি। একি বাবা! মা—কেমন করছে যে?

নিখিল। হুঃ ওষুধ! ঘুমের ওষুধ। চুপ্। কাঁদিসনে ঘুমোতে দে। আঃ বাঁচলাম। বাঁচলাম।

ছুটিয়া বাহিরে গেল

থার্ডক্লাশ

হলুদ রঙের একখানা গাড়ী। বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কি, ভাঙ্গা রঙময়লা গণ্ডা পাঁচেক ট্রাঙ্ক, দশ বারোটা ঝুড়ি, গোটা বিশেক ক্যাম্বিসের ব্যাগ, থান চব্বিশ দেশী ও বিলাতী কম্বল, পাঁচ সাতখানা ছেঁড়া কাঁথা, অগণ্য হুঁকা-কলকে, পানের ডিবে ও জলের গেলাশ। তার মাঝে মাঝে জুতা—পম্পসু, চটি, ডার্ব্বি, নাগরাই, ক্যাম্বিস্, চীনেবাড়ী, তালতলা, ঠন্‌ঠনে, কটক, আগ্রা সকলেরই নূতন পুরাতন নমুনা একসঙ্গে।

গাড়ীর ভিতরে মাথার কাছে লেখা, "চব্বিশ জন বসিবেক।" চব্বিশ জনের জন্য সাড়ে চারখানা বেঞ্চ। তার আধখানা কালেক্টর সাহেবের আর্দ্দালীর দখলে। বেঞ্চের ভিতরের ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ কোটি ছারপোকা, আর তার উপরের একচল্লিশ জন স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, শিশু ঠাসাঠাসি। পাগ্‌ড়ী, টুপী, তাজ, আলখাল্লা, গেরুয়া, নেংটী, শাড়ী, থান, রসগোল্লাপাড় ও কাশীপাড় কাপড়, পায়জামা ও আচকানের বিচিত্র সমন্বয়।

দুর্গন্ধ। পায়খানার দরজা দড়ি দিয়ে বাঁধা, হুক নেই। একটা বেঞ্চের নীচে একটা মরা ইঁদুর, আর একটা বেঞ্চের নীচে কতকগুলো অনেক দিনের পচা কলার খোসা। তামাক, বিড়ি, সিগারেট, গাঁজা, নারিকেল ও ফুলেল তৈল, ময়লা কম্বল ও কাঁথা, কাবুলীর বোঁচকা ও কালেক্টর সাহেবের আর্দালীর ছিপিখোলা 'রমের' বোতল। সকলের দুর্গন্ধ একসঙ্গে।

ভাদ্রের গ্রীষ্ম। ছোট ছোট ছেলেদের ক্রন্দন। একটু হাওয়ার জন্য একটি জানালা দিয়া একসঙ্গে তিন চারজন যাত্রীর মুখ বাহির করিবার প্রয়াস।

এই অবস্থায় ঘোমটার আবরণে ঘর্মাক্ত যুবতী সতর্ক অঞ্চল বীজনে শীতল হইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। কোণে একটা বুড়ী সমস্ত অঙ্গের সঙ্গে পা দু'টি গুটাইয়া জ্বরের ঘোরে ধুঁকিতেছিল।

টুং! টুং! টুং! ফুঁ!

ষ্টেশন। 'চাই মিঠাই', 'চাই পান-বিড়ি।' 'এই কুলি এধার।'

'এধার কোথায়? দেখছ না ভর্ত্তি? ওধার যাও।'

'গার্ড সাহেব।'

'ইউ ড্যাম্‌।'

'ও টিকিটবাবু, উঠবো কোথায়?'

'ইস্‌মে ওঠনা কেন?'

'উঠতে দেয় না যে।'

'কেন নেহি দেঙ্গে? গাড়ী উস্‌কো বাবার নাকি? উঠ জল্‌দি। হ্যালো গুডমর্ণিং পেদ্রুজ।' টিকিটবাবু গার্ডের গাড়ীর দিকে ছুটিলেন।

'ওঠ্‌ ওঠ্‌ মহেশ, ঝাণ্ডি দেখাচ্ছে ওঠ্‌।'

ঘটাং!

'ওরে বাপু, এর মধ্যে!' 'এই দুটো ষ্টেশন গো—সরাও তো বাবা তোমার গাঁটরীটা। ওঃ বড় গরম!'

'ফুঁ!'

যাত্রী বর্তমানে চুয়াল্লিশ।

ঘটাং! মাথায় টুপী, সাদা কোটপ্যাণ্ট, রক্তমুখ ফ্লাইং চেকার! শঙ্কিত যুবতী সরিয়া গেল। দু'পা সরিয়া তাহার গা ঘেঁসিয়া চেকার দাঁড়াইয়া সম্মুখের বৃদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া হাঁকিল, 'টিকেট ডেখ্‌লাও!'

'দেখাই সাহেব।'

'জ্‌লডি নিকালো—এই হটো ড্যাম্‌!' পায়ের কাছের হিন্দুস্থানী বালক সভয়ে সরিতে গিয়া পড়িয়া গেল।

'টুমকো টিকিট?'

'করতে পারিনি সাহেব, দাসপুর যাব।'

'টিকিট নেহি কিয়া? লে আয় রুপেয়া! জল্‌ডি নিকালো!'

'দিচ্ছি সাহেব, এই সাত আনা।'

'নেহি হোগা ডেও রুপেয়া!'

লোকটি গামছার খুট খুলিয়া আরো চার আনা বাহির করিয়া দিল। এই ছিল তার মোট সম্বল।

'আউর ডেও।'

'আর কোথায় পাব সাহেব? আট আনা টিকিটের দাম, এগারো আনা দিলাম—আর পয়সা নেই।'

'আট আনা মাশুল, আউর আট আনা জরিমানা।'

'এবারের মত মাফ কর সাহেব!'

'বহুট্‌ আচ্ছা, এ্যাসা কবভি মট্‌ করো। এই হটো, যানে দেও। এই মাগি'—বলিয়া ত্রস্ত যুবতীকে কনুই দিয়া ধাক্কা দিয়া বুদ্ধার পা মাড়াইয়া সাহেব বাহির হইয়া গেল।

'বাবা গো মলাম!' বুদ্ধার আর্তনাদ।

'সাহেব, আমার মাশুল নিলে, টিকিট?'

'মট্‌ চীল্লাও।' সাহেব অন্য গাড়ীতে ঢুকিল।

'বলদপুর!' 'বলদপুর!!' ষ্টেশনের পোর্টার হাঁকিল। আবার সেই হট্টগোল। গাড়ীতে উঠিবার জন্য যাত্রীদের সেই দারুণ প্রয়াস! ষ্টেশন মাষ্টারের বিচিত্র হিন্দী, রেলের কুলীর গালাগালি। থার্ডক্লাশের যাত্রীযুথের কোলাহল ও আর্তনাদ।

'এই ঘন্টি দেও!' ষ্টেশন মাষ্টার হাঁকিলেন।

'দাঁড়াও বাবা! ও-সাহেব বাবা, একটু রাখ বাবা!' বলিতে বলিতে পুঁটুলীহাতে এক বুড়ী আসিয়া গাড়ীর কাছে দাঁড়াইল।

'হঠো বুড়ী! ছোড় দিয়া।'

বুড়ী মিনতি করিয়া কহিল, 'আমার বিপিন বাঁচে না বাবা, সকালে এসেছিনু বদ্দিবাড়ী, অষুধ নিয়ে যাচ্ছি।' বলিয়া সে গাড়ীতে উঠতেই টিকিটবাবু তাহাকে ধরিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বুড়ী হাতের পুঁটুলী প্ল্যাটফরমে ছুঁড়িয়া দিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল, 'ওরে বিপিন রে!' গাড়ীর শব্দে বাকী কথাগুলি শোনা গেল না।

গাড়ী চলিতেছে। গাড়ীর জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিলে কতক্ষণে অন্ধকূপ হত্যার পুনরাভিনয় হইতে পারে তাহাই ভাবিতেছি এমন সময় গাড়ী থামিল। তৃষ্ণার্ত যাত্রীর দল সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'পানি-পাঁড়ে, এই পাঁড়ে!' সঙ্গে সঙ্গে আশে-পাশের পঞ্চাশটি জানালার মধ্য দিয়া দেড়শ' শূন্য ঘটি, গেলাস, বাটি ও মগ বাহির হইয়া আসিল।

'এই পানি-পাঁড়ে! এ-ধার!'

কালো বালতি হাতে কৃষ্ণবর্ণ, নগ্নপদে, টুপী মাথায় পানি-পাঁড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁত খিঁচাইয়া কহিল—'এ-ধার! হুকুমসে পানি মিলেগা?' তারপর মৃদুস্বরে কহিল, 'এক লোটা, দো—দো পয়সা।' বাঁ-হাতের মুঠা পয়সায় ভরিয়া, ডান-হাতে শূন্য বালতি লইয়া পানি-পাঁড়ে মহাশয় ফিরিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় কালেক্টর সাহেবের আর্দালী তন্দ্রা ভাঙিয়া হাঁকিলেন, 'এই পাঁড়ে পানি লে আও। রক্তচক্ষু পাঁড়েজী মুখ ফিরাইলেন। তারপর দীর্ঘশ্মশ্রু, উষ্ণীষ-শোভিত আর্দালিসাহেবকে দেখিয়া হাতের বালতি নামাইয়া রাখিলেন ও সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিলেন, 'সেলাম হুজুর। থোড়া

সবুর কিজিয়ে, টাট্‌কা পানি লে আতে হে´।

বীরদর্পে আর্দালী সাহেব স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া গোঁফে তা দিতে লাগিলেন।

দশ মিনিট থাকিবার কথা ; বিশ মিনিট হইয়া গেল গাড়ী ছাড়ে না। গ্রীষ্মের জ্বালায় প্ল্যাট্‌ফর্‌মে নামিলাম। পোর্টার আসিতেছিল।

'ওহে, গাড়ী ছাড়তে এত দেরী হচ্ছে কেন বলতে পার ?

'নেহি জান্‌তা।' পোর্টার চলিয়া গেল।

টিকিট চেকার আসিতেছেন।

'চেকারবাবু, গাড়ীর দেরী হচ্ছে কেন ?'

'কেডী সাহেবের লেডি (!) খানা খেতে গেছেন।'

'কেডী সাহেব কে ?'

'হোয়াট্‌ ফ্রুট্‌ ইওর নোয়িং ?' আমার জানিয়া কোন ফল নাই বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

চেকার চলিয়া গেলেন।

শূন্য বোতল ঘটর্‌ ঘটর্‌ করিতে করিতে সোডাপানিওয়ালা আসিতেছিল।

'মিঞা, কেডী সাহেব কে বলতে পার ?'

'নীলগঞ্জের পাটের দালাল। সেকেন ক্লাশে আছেন।'

কেডী সাহেবের 'লেডী' আসিলেন, ষ্টেশন মাষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তুলিয়া দিলেন। গার্ড সাহেব ষ্টেশন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিশান তুলিলেন, গাড়ী ছাড়িল।

আমার কাণে হঠাৎ বাজিল, বুড়ীর সেই আর্তনাদ—'দোহাই বাবা, একটুখানি রাখ বাবা। ওরে বিপিন—বিপিন রে—।'

আপেল

সোমবারের সকালবেলা উঠিয়াই ছয় বৎসরের ছেলে বুধা ঘুমন্ত পিতার কাণে কাণে কহিল, "বাবা আজ সোমবার—আজ আনবে বাবা ?"

নটবর ছেঁড়া মাদুরখানার উপরে একবার পাশমোড়া দিয়ে নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে কহিলেন, "আনব।" বালকের সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বাহিরে গিয়া তাহার সমবয়সী বড়বাড়ীর ছেলে শ্রীকান্তকে ডাকিয়া কহিল, "আজ বাবা আনবে বলেছে, দেখিস সন্ধ্যেবেলা।"

পিতা-পুত্রের এই গোপন পরামর্শের বস্তু ছিল একটা আপেল। সেদিন শ্রীকান্ত রাস্তায় দাঁড়াইয়া একটা রক্তবর্ণ ফলে মহা উৎসাহে দন্তভেদ করিতেছিল, বুধা অনেকক্ষণ ধরিয়া দরজার ছেঁড়া চটের আবরণের মধ্য দিয়া শ্রীকান্তের এই ভোজনলীলা দেখিল, তাহার পর যখন লোভ সামলানো দুঃসাধ্য হইল তখন বাহিরে আসিয়া শ্রীকান্তকে কহিল, "কি খাচ্ছিস রে ছিরিকান্ত ?"

শ্রীকান্ত নির্বিকারচিত্তে কহিল, "আপেল"।

বুধা কহিল, "আমাকে এক কামড় দেনা ভাই।"

শ্রীকান্ত ফলটির শেষ অবশেষটুকু তাড়াতাড়ি গালে পুরিয়া কহিল, 'উঁহু।" তারপর চর্বণ সমাপ্ত করিয়া কহিল "আমার বাবা এনে দিয়েছে, তোর বাবা কেন এনে দেয় না রে ?"

সাড়ে বাইশ টাকার মাহিনার কেরাণীর ছেলে পাঁচ শত টাকা মাহিনার পুত্রের এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। সে কাঁদ কাঁদ মুখে পিতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। নটবর তখন ছেঁড়া কামিজটির উপর পাট করা মলিন চাদরখানা জড়াইয়া ন'টার গাড়ী ধরিবার উদ্দেশে যাত্রা করিতেছিলেন, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বুধা কহিল, 'বাবা আমাকে একটা আপেল এনে দিও।" "আচ্ছা" বলিয়া নটবর বাহির হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যার গাড়ীতে নটবর যখন আপিস হইতে ফিরিতেছিলেন তখন রাস্তার মোড়ে বুধার সহিত দেখা হইল। অন্যদিন বুধার এতক্ষণ দুপুর রাত, আজ আপেলের লোভে আর সে ঘুমাইতে পারে নাই। মাতা জোর করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন বটে কিন্তু সন্ধ্যার গাড়ী যখন বাঁশীর শব্দ করিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিল তখন সে নিদ্রার ভাণ ত্যাগ করিয়া রান্নাঘরের দিকে সভয়ে চাহিয়া একেবারে পথে গিয়া উপস্থিত হইল। পিতাকে দেখিয়াই ডান-হাতখানি প্রসারিত করিয়া কহিল, "বাবা, আমার আপেল ?"

নটবর কহিলেন, "ওঃ যাঃ। ভুলে গেছিরে বুধা, কাল দেব।"

মুহূর্তে বুধার মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল, একটি ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, "আচ্ছা।"

নটবর সত্য কথা বলেন নাই। পথে যাইতে আপেলের দোকান দেখিয়া বুধার ফরমাইসের কথা মনে হইয়াছিল কিন্তু পকেটে একটিও পয়সা ছিল না। দারোয়ান রামশরণ সিংহের কাছে চারি আনা পয়সা ধার চাহিয়া কিছু পান নাই। কাল কোথা হইতে চারি আনা জুটিবে তাহা নটবর জানিতেন না, শুধু নিরাশ পুত্রকে আশ্বাস দিবার জন্য আবার এই প্রতিজ্ঞা করিলেন।

তার পর দিনও বুধা সমস্ত দিনমান সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় কাটাইল। আজ যে আপেল আসিবে তাহাতে তাহার সন্দেহ মাত্র ছিল না। বাহিরের দ্বারের

পাশে সে দাঁড়াইয়াছিল, দূর হইতে পিতাকে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল, "বাবা আপেল দাও।"

নটবর ক্ষণেকের জন্য মুখ বিকৃত করিলেন তাহার পর পকেটে হাত দিয়াই বলিলেন, "এই রে। সেটা বুঝি পড়ে' গেছে। হ্যাঁ তাই তো।" এ উপায় ছাড়া আজ আর বুধাকে প্রবোধ দেওয়ার অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু এই ছলনাটুকু করিতে নটবরের চোখ ফাটিয়া জল আসিল।

বুধা পিতার হাত ছাড়িয়া দিল। তারপর সঙ্গ ছাড়িয়া সম্মুখে গিয়া আবার ফিরিয়া কহিল. "হ্যাঁ বাবা, সেটা কত বড় ছিল ?"

নটবর অঙ্গুলিগুলি বিস্তার করিয়া একটি কল্পিত পরিমাপ দেখাইয়া দিলেন।

বুধা কহিল "উঃ খুব বড় ত বাবা। আচ্ছা বাবা আবার কাল আনবে ?"

পরশু সোমবার মাহিনার দিন। নটবর কহিল, "কাল না বাবা, সোমবার আনব।"

বুধা প্রশ্ন করিল, "সোমবার কবে বাবা ?"

"কালকের দিন বাদ সোমবার। দুটো এনে দেব।"

মহা উল্লাসে বুধা কহিল, "অমনি বড় আর লাল এনো বাবা ?"

নটবর কহিলেন, "আচ্ছা।"

বুধা নাচিতে নাচিতে বাড়ীর উঠানে গিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "মা, বাবা আমায় দুটো আপেল এনে দেবে, জানো ? খুব বড়।"

রন্ধনশালা হইতে বুধার মাতা স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দেখছ ? না পেতেই এই, পেলে যে কি করবে খোকা।"

বৌবাজারের মোড়ে দাঁড়াইয়া এক কাবুলির দোকানে নটবর বাছিয়া বাছিয়া দু'টি বড় আপেল পছন্দ করিয়া দাম স্থির করিয়া খাঁ সাহেবকে কহিলেন, "এ দুটো আলাদা করে রেখে দিও, ফেরবার পথে নিয়ে যাব।"

দোকানের সেরা আপেল দু'টি। অনেক দিনের প্রার্থিত ফল দু'টি পুত্রের হাতে দিলে তাহার মুখে যে পুলকের হাসিটুকু দেখা দিবে, কল্পনায় তাহা দেখিয়া নটবর দত্তের শীর্ণ মুখখানি উল্লাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

বেলা তিনটা বাজিতেই মাহিনার বিল লইতে নটবর উঠিয়া বড়বাবুর ঘরে গেলেন। বড়বাবু বিলখানা নটবরের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। বিল দেখিয়াই নটবরের বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল। বিলের পাশে কাজ সম্পূর্ণ না করিবার অজুহাতে নটবর দত্তের মাহিনা দেওয়া স্থগিত রাখিবার হুকুম লেখা ছিল। লাল পেন্সিলের এই ইংরাজী অক্ষর কয়টা যেন হাতুড়ী দিয়া তাঁহার বুকের পাঁজর কয়খানি একেবারে চূর্ণ করিয়া দিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভগ্নকণ্ঠে নটবর কহিলেন, "বড়বাবু—"

বড়বাবু কহিলেন, "আমি কিছু করতে পারব না মশাই, সাহেব বড় কড়া লোক জানেন তো? আপনি সাহেবের কাছে যান।"

বিলখানি তুলিয়া লইয়া নটবর আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে বড় সাহেবের দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন। চাপরাশি খবর দিলে ভিতর হইতে হুকুম আসিল, "কম্ ইন্।"

নটবর সুদীর্ঘ প্রণতি করিয়া কহিলেন, "হুজুর আমার মাহিনা—"

সাহেব তখন ওয়ালটেয়ারে তাঁহার পত্নীকে আগামী বড়দিনের উপহার পাঠাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, তাঁহার সকল কথা শুনিবার সময় ছিল না, ইংরাজীতে কহিলেন, "হবে না। কাজ ফাঁকি দিলে আমার কাছে কোনও মাফ নেই। যাও।"

নটবর কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "হুজুর। কালই সারা রাত খেটে সব শেষ করে' দেব।"

সাহেব চিঠি হইতে কলম তুলিয়া কহিলেন, "তা হ'লে পরশু মাইনে পাবে।"

"হুজুর একটি টাকা, অন্ততঃ আট আনা পয়সা দেওয়ার হুকুম—"

"নট্ এ ফার্দিং! যাও—" বলিয়া ফলের দুইটি ঝুড়ি টেবিলের উপর তুলিয়া লেবেল আঁটিয়া দিলেন "ফর হ্যারি" "ফর নেলী।" হ্যারী সাহেবের পুত্র ও নেলী কন্যা; উভয়ে তখন মাতার সহিত স্বাস্থ্যাবাসে ছিল।

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নটবর বাহির হইয়া আসিলেন এবং বিল-খানি বড়বাবুর হাতে দিয়া কহিলেন, "কিছু হোলো না।" একবার মনে হইল বড়বাবুর কাছে একটা টাকা ধার চাহিয়া লইবেন। কিন্তু হঠাৎ যেন সমস্ত জগৎটার উপর কেমন ঘৃণা জন্মিয়া গেল, ইচ্ছাটা কাজে পরিণত করিবার আর প্রবৃত্তি হইল না। সমস্ত পথ মনে পড়িতে লাগিল বুধার কথা। কাল রবিবার সমস্তটা দিন বুধা তাঁহাকে তাঁহার সোমবারের প্রতিশ্রুতির কথা মনে করাইয়া দিয়াছে; সে বেচারা যে আজ সারাদিন পথের দিকে চাহিয়া থাকিবে সে বিষয়ে তাঁহার সংশয় ছিল না। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে ষ্টেশনের রাস্তার ধারে পিতার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিলেই আগ্রহে ছুটিয়া আসিবে—তাহার পর?

ভাবিতে ভাবিতে নটবর যে বহুবাজারের মোড়ে আসিয়া পোঁছিয়াছেন সে খেয়াল আদো ছিল না। হঠাৎ এক ঝাঁকামুটের ধাক্কা খাইয়া তাঁহার চমক হইল। রাস্তার অপর ধারেই সেই আপেলের দোকান। ধীরে ধীরে রাস্তা পার হইয়া গিয়া দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নটবর সেই আপেল দুইটির দিকে চাহিলেন। বুধার কথা মনে হইল যেন একটি নগ্নকায় শিশু আগ্রহে হাত বাড়াইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতেছে, "বাবা আপেল?"

আবিষ্টের মত নটবর আপেল দু'টি তুলিয়া লইলেন।

পর মুহূর্ত্তেই কে আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই চোট্টা হ্যায়।" তাহার পর আর কিছু মনে ছিল না, যখন জ্ঞান হইল তখন নটবর থানার গারদ ঘরে।

বেলা পাঁচটা হইতে বুধা ষ্টেশনের পথে দাঁড়াইয়া ছিল। সাড়ে ছয়টার গাড়ী হুস্ হুস্ করিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিল, তখন আনন্দে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পর যখন যাত্রীরা পথ দিয়া চলিতে লাগিল তখন তাহার আর ধৈর্য্য রহিল না। প্রতি মুহূর্ত্তেই সে একবার করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রত্যেক দূরের মানুষটিকেই পিতা বলিয়া মনে হইতেছিল, আগ্রহে অগ্রসর হইয়া পথচারীর মুখের দিকে চাহিয়া আবার সে ফিরিয়া আসিতেছিল। এমনি করিয়া এক ঘণ্টা কাটাইয়া যখন আর কেহ রাস্তায় চলিবার রহিল না তখন শুষ্কমুখে সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "বাবা আসেনি মা। বাবা এলে আমাকে ডাকবে হ্যাঁ, মা?"

ইহার পরে ন'টার গাড়ী ছিল। আজ মাহিনার দিন, হয়তো জিনিষ-পত্র কিনিয়া আনিতে দেরী হইয়া গেছে ভাবিয়া হৈমবতী কহিলেন, "আচ্ছা, তুই ঘুমো এখন।"

রাত্রে যখন বুধা স্বপ্ন দেখিতেছিল যে তাহার ছেঁড়া জামার পকেট দু'টি আপেলের ভারে ফুলিয়া উঠিয়াছে, তখন দারোগা রিপোর্ট লেখা শেষ করিয়া নটবর দত্তকে চুরির অপরাধে কোর্টে উপস্থিত করিবার অর্ডার লিখিতেছিলেন।

তীর্থে

তীর্থ। অতি প্রাচীন; বিগ্রহ জাগ্রৎ, মন্দির প্রকাণ্ড, তাহার সম্মুখে প্রশস্ত চত্বর, চত্বরের মধ্যে নাটমন্দির। নাটমন্দিরে তেত্রিশজন ব্রাহ্মণ তেত্রিশ-খানি কুশাসনে সারবন্দী হইয়া বসিয়া। গীতা, চণ্ডী ও শ্রাদ্ধের মন্ত্র একত্র মিলিয়া এক দুর্বোধ্য শব্দলোকের সৃষ্টি করিয়াছে।

বেলা আটটা। পাণ্ডাবাড়ীর ছেলেরা স্নান সারিয়া যাত্রী ধরিবার জন্য রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া বিড়ি ফুঁকিতেছে। জবা-ফুলের মালা গলায়, মাথায় টেরী, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা বাগ্দীর দল ছুরির ধার দিতেছে। শনিবার। পাঁঠার দাম চড়িয়া গিয়াছে।

(২)

বেলা নয়টা। তীর্থ-যাত্রীর আগমন আরম্ভ হইল। ছ্যাকরা, ট্যাক্সি, রিক্সা, ব্রুহাম, ল্যান্ডো সর্বপ্রকার বাহনে ভক্তেরা আসিতে লাগিলেন। "হে'গ, গো মা, একটা আধলা, লক্ষ্মী মা!" "লেংড়া কাণা কো—" "আরে এদিকে এদিকে! আমার দোকানে বসবেন, আসুন!" "মালা চাই? পাঁঠা? কটা?" "কি মুখুয্যে, আমার সাবেক কালের খদ্দের তুমি টানছ!" "ওরে বাজা, বাজা। আরতির বাজনা বাজা!" পূজা আরম্ভ হইয়াছে।

রামু মালীর ছেলের জ্বরবিকার, সে মায়ের বাড়ীতে পূজা দিতে আসিয়াছে। স্নান করিয়াছে এক ঘণ্টা, পূজা দিবার অবকাশ পায় নাই। পূজাটা নির্বিঘ্নে দিতে পারিলে, পুত্র নীরোগ হইয়া উঠিবে এই আশায় দাঁড়াইয়া ছিল।

"পথ ছাড়! পথ ছাড়!!" রামু সরিয়া পথ দিল। বিলাস হালদার আসিলেন, আজ তাঁহার পালা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। বাহুতে সোনার বিছা—তাহাতে গণ্ডা দুয়েক নানা আকারের কবচ। ললাটে রক্ত চন্দনের রেখা। রামু সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিল, "ঠাকুর আমার পুজোটা?"

"দাঁড়িয়ে থাক্, ক'টাকার পুজো?

"পাঁচ সিকের।"

"দাঁড়িয়ে থাক্।"

(৩)

মন্দির। তাহার মধ্যে কালীমূর্তি। দুই দিকে চর্বির ঘৃত-প্রদীপ। জবাফুল আর বিল্বপত্রে মাতার আকণ্ঠ আবৃত। মূর্তির মাথার উপরে বিজলী-বাতি, সম্মুখে প্রকাণ্ড পিতলের থালায় পয়সা আর সিকি পুঞ্জীকৃত।

সোরগোল। "কোথা যাচ্ছেন? দ্বার-প্রণামী দিয়ে যান।" "বাবা নকুলনাথের নামে এক পয়সা।" "পঞ্চায়েতের পয়সাটা দিলেন না?" "নিন চরণামৃত, দিন পয়সাটা।" "পড় বাছা, সর্বমঙ্গল মঙ্গলাং দক্ষিণে চার পয়সা, কল্যাণ হোক!" "নাও বাছা, উঠে পড়, আমার যাত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছে, তুমি একাই যে ঘণ্টাভর মাথা কুটছ।" বৃদ্ধা প্রবাসী সন্তানের কল্যাণ ভিক্ষা করিতেছিল, সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। "এস গো এস, চটপট সেরে নাও। পড়, কালী কালী মহাকালীং—আচ্ছা হয়েছে। নাও সিঁদুর আর বেলপাতা, ছেলের মাথায় দিও। আর জোড়া পাঁঠা মানৎ করে' যাও, ছেলে ভাল হ'য়ে যাবে! আর আমাকে খবর দিও, মানৎ শোধ দেওয়ার দিন আমি নিয়ে আসব।"

বেলা দশটার সঙ্গে সঙ্গে বলির বাজনা বাজিল; অনেকগুলি মাথা

নমস্কারের ভঙ্গীতে নত হইল সেই সঙ্গে দশ বারোটা পশু আতঙ্কে আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

বলি হইয়া গেল, পূজা দেওয়া হইল না। আশঙ্কায় রামুর বুক কাঁপিয়া উঠিল। আগ্রহে মন্দিরের সিঁড়ির দুই ধাপ উপরে উঠিতেই পূজারী ধমক দিলেন, "আরে সর্বনাশ! নেমে যাও, নেমে যাও। ভোগ রাগ হয়নি। কি সব অনাচার!"

রামু অপ্রতিভ হইয়া নীচে নামিয়া নর্দমার ধারে দাঁড়াইল। নর্দমা দিয়া তখন রক্তগঙ্গা বহিয়া যাইতেছে।

(৪)

"ওরে বাজা, বাজা, ভোগের বাজনা বাজা।"

ঢোল সানাই একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল, ড্যাং নাক্ পোঁ।

"সরে' যা, সরে' যা সব, ভোগ আসছে!"

রামু নর্দমার প্রান্ত ছাড়িয়া একেবারে চত্বরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভোঁ ঘরর্। সবুজ রঙের প্রকাণ্ড হাওয়া গাড়ী।

"কে এলেন বুঝি। সরে' যা সব, দাঁড়া সরে' দাঁড়া। আমার জপের মালাটা তুলে রাখ ঠাকুর।" বিলাস হালদার চত্বরে নামিলেন।

নামিল অনবগুণ্ঠিতা ভূষণমণ্ডিতা নারীমূর্তি। দীর্ঘ রজনী জাগরণে আরক্তনেত্র, পরিধানে শুভ্র গরদ, হাতে বেলফুলের মালা।

"কুসুম বাইজি! কুসুম বাইজী এসেছেন। ভোগের থালা সরিয়ে পথ করে দাও ঠাকুর! আসুন! আসুন!!" বিলাস হালদার গাড়ীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাতে ডালার দোকানীরা।

"মায়ের পাঁঠা হবে তো? কটা?"

"শ্রাদ্ধ করাবেন না চণ্ডীপাঠ?"

"আজ দিন ভাল আছে মা, একটা স্বস্ত্যয়নের যোগাড় করে দিই?"

"গঙ্গা নাইবেন তো? না স্নান করে' এসেছেন? তিলক হয়নি যে! ওরে চন্দন, রক্ত চন্দন আর ছাপগুলো আন্, দরজার কাছ থেকে সবাইকে সরিয়ে দাও ঠাকুর। কার্পেটের আসন বিছিয়ে দাও।"

সম্মুখে বিলাস হালদার, দুই পার্শ্বে পূজারী, পশ্চাতে চারিখানি থালায় পূজার উপকরণ বহিয়া চারিজন ব্রাহ্মণ। সুন্দরী মন্দিরে উঠিলেন।

বেলা বারোটা। পশুর রক্তের ধারা শুকাইয়া কালো হইয়া গেছে। পুত্রের পথ্যের সময় উপস্থিত। রামু চঞ্চল হইয়া উঠিল।

কুসুম বাইজী জপ করিতেছেন। জপ শেষের প্রতীক্ষায় বিলাস হালদার বারান্দায় দাঁড়াইয়া। চত্বরে মালী বাগ্দী পাঁঠাওয়ালা সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

মায়ের ভোগের অন্নব্যঞ্জনের উপর মাছি উড়িতেছে। কুসুম বাইজীর মানসিক কি আছে জানা যায় নাই, কাজেই ভোগ দেওয়া অসম্ভব।

গুড়ুম। একটার তোপ।

আর অপেক্ষা করা চলে না। দু'দিনের সঞ্চিত উপার্জনের বিনিময়ে সংগৃহীত পূজার উপচার একটি খঞ্জ ভিখারীর হাতে তুলিয়া দিয়া নর্দমা হইতে একটি রক্তচর্চ্চিত বিল্বদল তুলিয়া মাথায় ঠেকাইয়া রামু চলিয়া গেল। যাইবার সময় বার-বার মন্দিরের দিকে চাহিয়া রামু মালী যুক্তকরে প্রণাম করিতে করিতে মায়ের কাছে কি নিবেদন জানাইয়া গেল তাহা সেই জানে।

লাটের স্পেশাল

মাঘের দ্বিপ্রহর। আঙ্গিনায় রৌদ্রের দিকে পিঠ করিয়া বেণু সর্দার সম্মুখে একখানি পাথরের থালায় এক রাশি সরুচাকুলি লইয়া মাধ্যাহ্নিক জলযোগের উপক্রম করিতেছিল। রঙ্গীন ভিজা গামছাখানিতে মাথায় আধ-ঘোমটা টানিয়া স্ত্রী বিরাজ পিঠার কাঠা-হাতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। এমন সময় আহ্বান আসিল, "সর্দারের পো! বাইরে এসতো একবার।"

দফাদারের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বেণু উঠিয়া পড়িতেছিল, বিরাজ তাড়াতাড়ি কহিল, "মুখের 'গাস্'টা খেয়ে যাও গো।"

"দু'খানা খেয়ে আমার পেট ভরবে নারে, বিরাজ। তুই ওখানে দাঁড়িয়ে থাক্, আমি এক্ষুনি আসছি।"

বেণু হাত ধুইয়া উঠিয়া গেল।

মিনিট দশ পর ফিরিয়া আসিয়া হতাশস্বরে বেণু কহিল, "আমার আর তোর হাতের সরুচাকুলি খাওয়া অদেষ্টে নেইরে, বিরাজ। দে দিকিন্ পাগড়ীটা এখুনি, আবার বেরোতে হ'বে।"

"এই ভর দুপুরে আবার কোন্ পোড়ারমুখোর মুখ পুড়েছে যে, তোমায় যেতে হ'বে?" বিরাজ কহিল।

"চেঁচাস্‌নিরে পাগলী! লাটের গাড়ী আসছে, পাহারায় যেতে হবে। দে পাগড়ীটা। দাঁড়াওগো দফাদারদা, পাগড়ীটা বেঁধে যাচ্ছি।" দ্বারের দিকে চাহিয়া বেণু কহিল।

বাহির হইতে জবাব আসিল, "একটু চট্‌পট্ সেরে নাও, সর্দারের পো। যেতে হ'বে আবার পাকা ছ' কোশ।"

পাগড়ী বাঁধা শেষ হইলে বিরাজ দু'খানা সরুচাকুলি হাতে করিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মিনতি করিয়া কহিল, "আমার মাথা খাও, এই দু'খানি গালে দিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে যাও। সেদিনও গড়েছিনু, খেলে না, কোথায় মড়া আগলাতে গেলে। আজ—'

"এখন খেলে আর হাঁটতে পারবনা রে বিরাজ। সাঁঝে গাড়ী পার ক'রে দিয়ে পহর রাতেই ফিরে আসব। তুই উনুনে একটু জল বসিয়ে রাখিস। পিঠেগুলো ভালো ক'রে ঢেকে রাখ্‌গে!"—বলিয়া পিষ্টক-স্তুপের দিকে একটি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া লাঠি হাতে বেণু চৌকীদার বাহির হইয়া গেল।

স্বামীর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সর্বাপেক্ষা প্রীতিকর এই খাদ্যটি অনেক দিন চেষ্টা করিয়াও সে সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতে পারিল না। পিঠাগুলি গুছাইয়া তুলিয়া বিরাজ গামছায় চোখ মুছিল।

ঘরের বিঘ্নটিকে তো বেণু কোনমতে কাটাইয়া আসিল কিন্তু পথে আর এক বিঘ্ন উপস্থিত। একটি স্বল্পজল অন্ধকার ডোবার ধারে বেণুর সাত বছরের পুত্র মনাই বঁড়শী নাচাইয়া 'চ্যাং' মাছ ধরিতেছিল। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে এইটি ছিল তাহার নিত্যকর্ম। বেণু তাহার দৃষ্টি এড়াইবার জন্য অতি লঘুপদে আসিতেছিল কিন্তু মনাইকে ফাঁকি দিতে পারিল না। পিতার পরিচিত নীল পাগড়ী সে দূর হইতে দেখিয়াছিল কিন্তু পিতা অন্য পথে চলিয়া যাইবে ভয়ে, ভাবে ভঙ্গীতে কোনোরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই। বেণু সতর্ক পদে নিকটে আসিতেই, সে ছিপ ফেলিয়া এক লম্ফে পথের মাঝ-খানে উঠিয়া আসিল এবং তাহার পোষাকের প্রান্ত মুঠা করিয়া কহিল, "কোথা যাচ্ছ বাবা?"

বেণু বিপদে পড়িল। সত্য কথা বলিলে মনাই সঙ্গে যাইবার জিদ্‌ ধরিবে। একটু ভাবিয়া কহিল, "কালীতলায়।"

জগতে মনাইয়ের ভীতির একমাত্র স্থান ছিল এই বারোয়ারী কালীতলা। সেখানে যত ভূত আর প্রেতের আড্ডা, কোন সূত্রে এই তত্ত্বটি তার শিশু-মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া বাসা বাঁধিয়াছিল। কালীতলার নাম শুনিয়া সে এক পা পিছাইয়া গিয়া কহিল, "সাঁঝের আগে ফিরবে বাবা, জানলে?"

পুত্রের শঙ্কাবিহ্বল দৃষ্টি দেখিয়া বেণু কহিল, "সাঁঝের আগেই ফিরব মনাই, তুই ঘরে যা।" তাহার পর পুত্রকে একটি চুমা দিবার অভিপ্রায়ে দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকে তুলিতে যাইতেছিল, এমন সময় পিছনে দফাদার কহিয়া উঠিল, "পথে দাঁড়িয়ে আর দেরী কোরো না সর্দারের পো, বেলা ভাটিয়ে আসছে।"

অগত্যা মাথা নীচু করিয়া পুত্রের গালে তাড়াতাড়ি একটা চুমা দিয়া বেণু কহিল, "ঘরে যা মনাই, তোর মা পিঠে নিয়ে বসে আছে।"

পিঠার কথা শুনিয়া সে ছিপগাছি তুলিয়া লইয়া বিনাবাক্যে বাড়ীর পথ ধরিল এবং কিছুদূর গিয়া গলির মোড়ের বেত ঝোপের আড়াল হইতে মুখ বাহির করিয়া পিতাকে অবশ্য অবশ্য সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিবার জন্য দ্বিতীয় বার উপদেশ দিয়া গেল।

(২)

শীতের ছোট শেষ বেলাটি অনেকক্ষণ পূর্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রতি চল্লিশ হাত অন্তর চৌকীদার নামধারী এক-একটি মানব-সন্তান লাঠি ঘাড়ে করিয়া লাটের স্পেশালের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া খোলামাঠের তীব্র হাওয়ায় শীতে কাঁপিতেছিল। গাড়ী আসিবার সময় সন্ধ্যায়, কিন্তু রাত্রি প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল গাড়ী তখনও আসিল না। বেণু অধীর হইয়া উঠিল। দিব্য চক্ষে সে দেখিতে পাইল, পাথরের থালায় সরুচাকুলি সাজাইয়া এতক্ষণে বিরাজ প্রদীপ জ্বালিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। বেণু জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ীর খবর কি দফাদারদা ?"

দফাদার নিজেও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কহিল, "মালিক হুজুরদের হুকুম তামিল করতে এসেছি। থানা থেকে ব'লে দিলে সাঁঝবেলায় যাবে গাড়ী, এখন তো রাত এক পহর। কাঁথাখানাও আনিনি।" দফাদার মাথার পাগড়ী খুলিয়া গায়ে জড়াইল। শীত তখন ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছিল।

বস্তুতঃ গাড়ী ছাড়িবার সময় ঘণ্টা পাঁচেক পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু গণ্ডগ্রামের চৌকীদারের কাছে সে সংবাদ পেঁাছে নাই।

এমন সময় মেঘ করিয়া আসিল। চৌকীদারের দল প্রমাদ গণিল। ইহার পর যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় তাহা হইলে প্রাণ লইয়া গৃহে ফেরা অসম্ভব, এ কথা দফাদারকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইতে কেহই দ্বিধা করিল না। দফাদার একটি ছোট পুঁটলী উঁচু করিয়া ধরিয়া কহিল, "শীতের ওষুধ সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আয় দেখি !"

ইঙ্গিতটা সকলেই বুঝিল। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে "বোম্ বোম্ ভোলানাথ" শব্দে স্থানটি মুখর হইয়া উঠিল এবং গঞ্জিকার ধূমে অন্ধকার আরও জমাট বাঁধিয়া গেল। দফাদার ডাকিল, "সর্দারের পো, কোথায় গা ?"

বেণু জবাব দিল, "উঁহু। আমি খাব না দফাদারদা।" এক কালে সে পুরাদস্তুর গঞ্জিকাসেবী ছিল কিন্তু বৎসর তিনেক হইল বিরাজ তাহাকে শাঁখা সিঁদুরের দিব্য দিয়া নেশা ছাড়াইয়াছে; সেই অবধি বেণু গাঁজার কলিকা স্পর্শ করে নাই। শীতের ওষুধ সেবন করিয়া চৌকীদারের দল কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইল। কেবলমাত্র বেণু দুই হাঁটু মুড়িয়া তাহার

উপর মুখ রাখিয়া শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

হুস্! হুস্!

"উঠে দাঁড়া সব। লাঠি ঘাড়ে ঠিক হ'য়ে সামনে চেয়ে থাক্।"

দফাদার হাঁকিল।

হুস্! হুস্। গাড়ী চলিয়া গেল—মাল গাড়ী।

বিরক্ত হইয়া চৌকীদারেরা অদৃষ্টকে অভিসম্পাত দিল।

দফাদার কহিল, "শীতের ওষুধ আর একবার তৈরী করে নাও দেখি, শীত ভয়ে ভাগবে।"

ঔষধ সেবন চলিতে থাকিল, দূর হইতে বেণু ধূম-কুণ্ডলীর দিকে চাহিয়া রহিল, নড়িল না।

রাত্রি দশটায় দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িল। বেণু কোনক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল যে, সঙ্গীরা চার পাঁচজন করিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ভূমি-শয্যায় আশ্রয় লইয়াছে।

বেণুর মনে হিংসা হইল। সর্বাঙ্গ তখন অসহ্য শীতে আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল ; পদতলের পাথরের নুড়িগুলি মনে হইতেছিল বরফের টুক্‌রার মত। কিছু দূরে তারের বেড়ায় হেলান দিয়া দফাদার ঘুমাইতেছিল। বেণু কিছুক্ষণ কি ভাবিল তাহার পর দফাদারের গাঁজার সরঞ্জামের পুঁটলীটি বাহির করিয়া আনিল। কলিকায় আগুন দিয়া সে মৃদুস্বরে কহিল্ "কিছু মনে করিসনি, বিরাজ! তোর শাঁখা-সিঁদুর অক্ষয় হোক! আজ এক টান না টানলে আর বাঁচব না। বোম্। বোম্।"

অনেক দিনের অনভ্যাস, কলিকায় বার দুই দম দিতেই বেণুর মাথা ঘুরিয়া উঠিল, লাইনের দিকে ঠিক্‌রিয়া পড়িয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মাথায় একটু জল দাও গো দফাদারদা। সারা পিরথিম ঘুরছে।" তাহার আড়ষ্টকণ্ঠ হইতে কথাগুলি বাহির হইল অতি ক্ষীণস্বরে, তাহাতে দফাদারের নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

মধ্য রাত্রি। হিমসিক্ত আচ্ছাদনের নীচে কুণ্ডলী করিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রহরীর দল কাঁপিতেছিল। এমন সময়ে দূরের কোনো সজাগ প্রাণীর কণ্ঠ শোনা গেল, "লাটের গাড়ী! লাটের গাড়ী!"

প্রদীপ্ত আলোক-ফলকে নিশীথের অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া রক্তচক্ষু লৌহ-দানব ছুটিয়া আসিল। চৌকীদারের দল কাঁপিতে কাঁপিতে ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কেবল উঠিল না একজন। যেখানে বেণু সর্দার পাহারায় ছিল সেখান হইতে অতি ক্ষীণ একটি আর্তনাদ শোনা গেল—মুহূর্তের জন্য। এঞ্জিন কোনও অজ্ঞাত বস্তুতে বাধা পাইয়া একটু দুলিল কিন্তু তাহার গতি মন্থর হইল না।

স্পেশাল চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতে সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপিত হইল যে

লাটের গাড়ী নিরাপদে সহরে পেঁছিয়াছে।

বেণু সর্দারের নিষ্প্রাণ দেহপিণ্ড যখন সহরের 'মর্গ' হইতে শতদীর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিল তাহার পূর্বেই বিরাজের সরুচাকুলি শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে।

চণ্ডীমণ্ডপ

প্রকাণ্ড একটি বেলগাছ। তাহার ছায়ায় মোহন ঠাকুরের চণ্ডীমণ্ডপ। সম্মুখে আঙ্গিনা, প্রথম রাত্রির পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় ধব্ ধব্ করিতেছে।

কোজাগরের পরের দিনের রাত্রি। চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন মোহনপুরের সমাজপতিদের বার্ষিক বৈঠক। সামাজিক দুষ্কৃতকারীদের বিচার ও দণ্ড-দানের সভা।

দেবীর আসনের চৌকীতে তখন সিন্দুর জ্বল জ্বল করিতেছে। সেই আসনকে কেন্দ্র করিয়া কুশাসন এবং পাটি বিছাইয়া সমাজপতিরা বসিয়াছেন। প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড নিমের গুঁড়ি জ্বলন্ত, তাহার পাশে চিমটা হাতে দীর্ঘদেহ বংশী গোপ তামাক জোগাইতেছে। চণ্ডীমণ্ডপে ডাবা থেলো ও বাঁধা হুঁকা অস্থাবর সম্পত্তির মত হস্ত হইতে হস্তান্তরে ঘুরিতেছে, পণ্ডিত মহাশয় মহিষ-শৃঙ্গের কৌটা খুলিয়া ঘন ঘন নস্য লইতেছেন। কাশি এবং হাঁচির শব্দ চণ্ডীমণ্ডপ মুখর।

"না হে চক্কোত্তি, আর সওয়া যায় না। দিন-কাল ক্রমেই খারাপ হ'য়ে আসছে। তোমরা গাঁয়ে থাক, রাঘবও রয়েছে—তোমাদের দেখা-শোনা উচিত, এখন হাল ছেড়ে দিলে শেষে সামলাতে পারবে না।"

"দেওয়ানজী যা বললেন ঠিক! কিন্তু রাঘব করবে কি? মোহন ঠাকুরের ছেলে হ'লেই ত হয় না, বয়সটা কি তার? আপনি থাকুন একটা মাস, দেখুন কি করি!"

সাহেবপুরের রেশমকুঠির দেওয়ান হরি মুখুয্যে মেরজাইয়ের বোতাম খুলিয়া স্ফীতোদর বাহির করিয়া কহিলেন, "বুঝি তো সব দাদা, কিন্তু চাকর আর কুকুর। এই পনেরটি দিন ছাড়া সাহেব ছুটি মঞ্জুর করে না তার কি? গাঁয়ে থাকতে গেলে চাকুরী ছাড়তে হয়, একবার ভাবি—"

ন্যায়রত্ন মহাশয় কহিলেন, "সর্বনাশ! তুমি আছ তবু মোহনপুরের গাজনতলায় ঢাক বাজে হে, মুখুয্যে। চাকুরী তো তোমার একার নয়, দশ

জনের। দশ জন খাচ্ছে। পাল-পার্বণে অতিথি বোষ্টম সেবা হচ্ছে। গোয়াল মাল্লীরা টিঁকে আছে। দীর্ঘজীবী হ'য়ে থাক, বাবা!"

হরি মুখুয্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পায়ের ধূলা লইয়া কহিলেন, "এটা কি একটা কথা, পণ্ডিত মশায়? আপনাদের আশীর্বাদই সব, দশ জনের বরাতেই হচ্ছে, আমি তো নিমিত্ত।"

দেওয়ানজী মের্জাইয়ের বোতাম আঁটিয়া দিলেন।

চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আঙ্গিনায় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া দাঁড়াইল এক বৃদ্ধ।

"কে, সাধুচরণ?"

নিজের অপরাধের গুরুত্ব সে জানিত। কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "আজ্ঞে, বাবাঠাকুর!"

"ওরে বেটা হারামজাদা!"—শশাঙ্ক ঘোষাল হাঁকিলেন।

"খড়ম পেটা ক'রে তাড়াও ব্যাটাকে গাঁ থেকে। ধর্ম নষ্ট করলি"—ন্যায়রত্ন মহাশয় নস্য লইলেন। সাধুচরণ কাঁপিতে লাগিল।

দেওয়ানজী ডাকিলেন, "রাঘব কোথায় হে? কি করা যাবে এর, এস দেখি, শুনি।"

স্বর্গীয় মোহন ঠাকুরের সন্তান রাঘব ঠাকুর। বছর ত্রিশেক বয়স। মাথায় বাবরী, বলিষ্ঠ সুপুষ্ট দেহ। কপালে সিন্দূরের ত্রিপুণ্ড্র, হাতে মোটা বাঁশের লাঠি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। বয়সে সকলের ছোট বলিয়া সকলের পশ্চাতে এক কোণে বসিয়া কলিকায় তামাক খাইতেছিলেন। সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "বিচার আপনারা করুন, খুড়োমশাই। আপনাদের যা মত হবে আমারও—"

"তা কি হয়?" দেওয়ানজী কহিলেন, "মোহন ঠাকুরের ছেলে তুমি বাবাজী! বয়সে যাই হও মোহনপুরে তোমার কথাই আগে।"

রাঘব ঠাকুরের গম্ভীর তীব্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "সাধুচরণ!"

রাঘব ঠাকুরের দিকে ভয়ে সাধুচরণ চাহিতে পারিল না, চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠায় মাথা রাখিয়া আর্তনাদ করিয়া কহিয়া উঠিল, "আর করব না, বাবা-ঠাকুর! এবারকার মত—"

"বেটা হারামজাদা! এবারকার মত! মোহনপুরের জেলে তুই বেটা, তোর পান্সীতে মুর্গী রেঁধে খেল সাহেব! মোহনপুরের মুখে কালী দিলি বুড়োকালে, হারামজাদা!"

সাধুচরণ রাঘব ঠাকুরের সম্মুখে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল মাত্র।

ন্যায়রত্ন মহাশয় নস্যদানি রাখিয়া খড়ম তুলিয়া লইলেন। সাধুচরণ আর্তনাদ করিয়া উঠিল, "প্রাচিত্তির করব বাবাঠাকুর!"

"প্রায়শ্চিত্তির ! পয়সা পাবি কোথা রে ? কে কে ছিলি সে পান্সীতে ?"

কাঁপিতে কাঁপিতে আরও পাঁচজন নত মস্তকে কম্পমান দেহে সাধুচরণের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

জগৎ, মানুকে, বৈকুণ্ঠ, বিপিন আর শ্যামাদাস।

"মুর্গী আর পেঁয়াজের গন্ধ বড় ভালো রে হতভাগা ! আবার তুলসীর মালা রেখেছিস !"

জগৎ, মাণিক, বিপিন প্রভৃতি সমস্বরে কহিল, "আর হবে না, বাবাঠাকুর।"

"আর যদি কখনও হয় তো, দেখছিস লাঠি, পাঁজর ভেঙ্গে দেব। গত বচ্ছর সনাতনের কথা মনে আছে তো ? যা সব। এবার কালীপূজোর দিন পাঁচ মণ মাছ জোগাতে হবে তোদের ছ'জনকে, দাম পাবিনি।"

ছয়টি প্রাণী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইল।

"তোদের পাড়াশুদ্ধ ছেলে-মেয়েকে এখানে পাঠাবি সেদিন দু'বেলা প্রসাদ পাবে। যা বেটারা ! আজ রাতভোর কীর্তন ক'রে কাল সকালে স্নান ক'রে আসবি, একটু শান্তি দিয়ে দেব।" রাঘব ঠাকুর লাঠি কোলের উপর রাখিয়া আসন লইলেন।

বৃন্দাবন বিশ্বাস আসিয়া দাঁড়াইল। অপরাধ গুরুতর। কায়স্থ পরিচয়ে পানীয় জল দিয়া সে এক সদ্‌ব্রাহ্মণের ধর্ম নষ্ট করিয়াছে, অভিযোগ এইরূপ।

"পেরনাম হই—" বৃন্দাবন যুক্তকরে প্রণাম করিল।

"কি রে বেন্দা ? বামুন-কায়েতকে জল খাওয়াতে সাধ হয় কণ্ঠী নিলেই পারিস। এসব দুর্মতি কেন রে বেল্লিক !" রাঘব ঠাকুরের কথা শুনিয়া নতশিরে বৃন্দাবন দাঁড়াইয়া রহিল জবাব দিল না।

"বেটা ! অধার্মিক চণ্ডাল !" ন্যায়রত্ন মহাশয় চীৎকার করিয়া খড়ম ছুঁড়িলেন। বাঁ হাতে ললাটের রক্তধারা চাপিয়া বৃন্দাবন বসিয়া পড়িল। পর মুহূর্তেই উঠিয়া খড়মখানিতে মাথা ঠেকাইয়া সসম্ভ্রমে সেখানিকে চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে তুলিয়া দিল।

"আর কে আছিস ?" রাঘব ঠাকুর হাঁকিলেন। প্রাঙ্গণের অন্ধকার কোণ হইতে জনকয়েক লোক উঠিয়া আসিল। তাহাদের অঙ্গ কম্পমান মুখ পাংশু !

"বাবাঠাকুর ! বাবাঠাকুর !!" উন্মাদের মত একটি স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল।

"বাবাঠাকুর !"

"আরে ছুঁস্‌নি ছুঁস্‌নি বাগ্দী-বৌ ! হোথা থেকেই বল্ !"

বাগ্দী-বৌ ছাড়িল না, রাঘব ঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিল। সমস্ত অঙ্গ অশুচি হইয়া গেল, রাঘব ঠাকুর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "দিলি ছুঁয়ে সন্ধ্যাবেলায় !"

বাগ্দী-বৌ তথাপি পা ছাড়িল না—"বাঁচান, বাবাঠাকুর !"

"আরে উৎপাত, হ'ল কি বল্ দেখি তোর ?"

"মান-সরম্ভম সব গেল বাবাঠাকুর। শেষবেলায় ঘাটে গিয়েছিল নারাণী। নেয়ে আসবার পথে ও-গাঁয়ের রহিম সর্দারের বেটা বলে কিনা—মেয়ে তো আমার কলসী ফেলে পালিয়ে এসেছে। লজ্জায় মাথা কাটা গেল, বাবাঠাকুর !"

চণ্ডীমণ্ডপ শুদ্ধ সমাজপতিরা হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আঙ্গিনায় বংশী গোপের হাতে চিম্টা ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। বৃদ্ধ সাধু মাঝির ন্যুব্জ দেহ সহসা ঋজু হইয়া গেল। ক্ষতস্থানে খানিকটা ছাই লেপিয়া বৃন্দাবন উঠিয়া দাঁড়াইল। বাম হস্তের বংশ-যষ্টি দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া রক্তচক্ষু রাঘব ঠাকুর তিন লম্ফে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া গেলেন, অপরাধীর দল বিনাবাক্যে তাঁহার অনুসরণ করিল, চণ্ডীমণ্ডপের অঙ্গন শূন্য হইয়া গেল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় শ্যামা বাগ্দীনীর হাত ধরিয়া তুলিয়া কহিলেন—"ভয় করিস্নে বাগ্দী-বৌ। আমরা আছি। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা দেখে নেব। আজ রাতে দেওয়ানজীর বাড়ীতে নারাণীকে নিয়ে এসে শুয়ে থাকবি। রামু, জগাই, বৈকুণ্ঠ যা বাগ্দী-বৌয়ের সঙ্গে—মা-বেটিকে সাথে ক'রে দেওয়ান-বাড়ীতে পেঁছে দে।"

ইহার পর চল্লিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মোহন ঠাকুরের চণ্ডীমণ্ডপ দেনার দায়ে কয়েক হাত ঘুরিয়া শেষে 'দি মোহনপুর ড্রামাটিক ক্লাবে' পরিণত হইয়াছে।

কোজাগরের পরের দিন সন্ধ্যা। আগামী দীপান্বিতার দিন বারোয়ারী কালীতলায় মেবার-পতনের অভিনয় হইবে, তাহারই মহলা চলিতেছিল।

ক্লাব-ঘরে জন বিশেক লোক বালক এবং যুবক। কয়েক জোড়া তবলা, ডুগি, গুটি দুই হার্মোনিয়াম, একখানা বেহালা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; বেড়ার গায়ে খানকয়েক স্বদেশী ও বিদেশী অভিনেতার বিচিত্র মুখভঙ্গীর ছবি, গুটিকয়েক বাবরী চুল, জমিদার চাপকান ও একখানি বড় আয়না।

হার্মোনিয়ামে সুর দিয়া চপল কহিল, "আচ্ছা 'সি-সাপে' ধ'রে দাওতো দেখি।"

জনকয়েক বালক মুখের জ্বলন্ত বিড়ি মাটিতে নামাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়, যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর।'

"ও কি হচ্ছে অনঙ্গ ! চিতোর বলছ অমন ক'রে যে। তোমার 'ফিলিং' হচ্ছে না মোটে। চোখটা একটু বোজ—মিঠে রকমের। ঘাড়টা একটু কাৎ কর, বাঁ পা'টা একটু সামনে। ব্যস্ অনেকটা হ'য়েছে। মনে ভাবতে থাক তুমি সত্যিকার অমরসিংহ, তা হ'লে ঠিক 'পস্চার' আসবে। ওরে একটা সিগারেট দে।"

"মাষ্টার মশাইকে একটা সিগারেট দিয়ে যা কমল। আচ্ছা নাচগুলোতে আমাদের খুব সাক্সেস হবে, না? কি বলেন, মাষ্টার মশাই?" অনন্ত উত্তরের প্রতীক্ষায় ব্যাকুলভাবে মাষ্টারের দিকে চাহিল।

মাষ্টার আশ্বাস দিয়া একবার গামোড়া দিতে দিতে বলিলেন, "খুব সম্ভব। আমরা কলকাতায় ছোক্রা খুঁজতে খুঁজতে হায়রান, আর তোমাদের জেলে ছুতোরপাড়া থেকেই তিনটে প্লের নাচের ছেলে জুটে যায়, তাও বিনি পয়সায়। কি? ডাব? না, খাব না, গলা ধ'রে যাবে, তার চেয়ে চা আনো।"

"ওরে চায়ের জল চাপিয়ে দে।" তিন চারজন সমস্বরে আদেশ দিল।

একটি যুবক হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া উপস্থিত।

অনঙ্গ কহিল, "কি প্রেম-কোরক, হাঁফাতে হাঁফাতে আসছিস যে?"

"আর শুনো না, অনঙ্গ-দা! বুড়োরা সব বৈঠক বসিয়েছে, বলছে জাত গেল, ধর্ম গেল! যত জেলে মালী ছোট জাতের ছেলে নিয়ে নাকি আমাদের কারবার, তাদের হাতের জল খেয়ে চা খেয়ে উচ্ছন্ন যাচ্ছি: হাঃ। হাঃ।" প্রেম-কোরক হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িল।

"ফুল্স্! ছোট জাত! আর ওরা সব বড় জাত! ওরাই তো সর্বনাশ করলেন জাতটার। ও সব গোঁড়ামি--"

অনঙ্গ রুখিয়া উঠিল।

চপল হার্মোনিয়ামে সুর দিয়া কহিল, "ছোট জাতই আমরা চাই, তারা থাকলেই জাত থাকবে।"

"ধা ধিঙ্গাড় ধা, ধিঙ্গাড় ধা ধা" বোল আওড়াইয়া সুধাংশু তবলায় চাঁটি দিয়া কহিল, "একবার তেরে কেটে তাক্ ক'রে দিতে পার না অনঙ্গ-দা?"

"আর দু'টি বচ্ছর সবুর কর সুধাংশু, মোহনপুরের চেহারা একদম বদলে দেব, দেখে নিও।" অনঙ্গ সিগারেট ধরাইল।

অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল বিপিন মালী। তাহার দৃষ্টি শঙ্কিত।

"কি রে, বিপিন, অত শুকনো যে?"

"আজ্ঞে বাবু কি বলব, আপনাদের চরণে আছি।"

"ব্যাপার কি বল্‌তো দেখি। আবার বুঝি সমাজে 'ঠেকা' করেছে, না?"

"না বাবু। বাড়ীর মেয়েদের তো ঘাটে যাওয়া বন্ধ হ'ল, বাবু। কাল আমার বোনকে ঘাটের পথে ইসারায় ও পাড়ার কবির সেখ ডাকছিল, আজ আমার মেয়ের হাত ধ'রে টেনেছে। আর ভয় দেখিয়েছে যদি বোনকে তাদের বাড়ী না পাঠাই তবে বাড়ীতে চড়াও করবে।"

"তুই কি করেছিস?"

"গরীব মানুষ, আমি কি করব, বাবু? আপনারা একটা বিহিত করুন।"

"চৌকীদারকে বলিসনি ?"

"বলেছিনু। সে 'গা' করলে না। থানায় যেতে বলে। সে তো আবার দশ কোশ পথ, ঘর ফেলে যাই কি ক'রে ? আপনারা আছেন বাপের মত—" হাউ হাউ করিয়া বিপিন মালী কাঁদিয়া উঠিল।

"এই তোমাদের গাঁয়ের একটা মস্ত 'ড্রব্যাক'—কাছে থানা নেই।"—বলিয়া মাষ্টার মহাশয় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন।

"সেটা ঠিক ! যে রকম অবস্থা, থানা কাছে না থাকলে চলবার আর উপায় নেই। কাগজে এসব নিয়ে লেখালেখি করবারও দরকার হ'য়ে পড়েছে দেখছি। শেষে কোন্‌দিন গুণ্ডাগুলো আমাদেরই মাথা ফাটিয়ে দিয়ে যাবে। আচ্ছা তুমি যাও বিপিন, বাড়ীতেই থেকো, কোথাও যেয়ো না। মেয়েদের আর ঘাটে জল আনতে পাঠিও না। কাল সকালে একবার এসো। ভেবে-চিন্তে যা হয় করা যাবে। হঠাৎ তো কিছু করা যায় না।"

বিপিন চলিয়া গেল। আধ ঘণ্টা পরে সমবেত কণ্ঠস্বরে সমস্ত পল্লী মুখর হইয়া উঠিল—

"জ্বলিল যেখানে সেই দাবাগ্নি
—সে রূপ-বহ্নি পদ্মিনীর।
ঝাঁপিয়া পড়িল সে মহা আহবে
যবন-সৈন্য ক্ষত্রবীর।"

প্রত্যর্পণ

যে তাহার নাম চাঁপা রাখিয়াছিল, সে মোটেই ভুল করে নাই। ফুলটির বর্ণের সহিত দেহের বর্ণের কোনও পার্থক্য ছিল না ; কিন্তু চাঁপার অদৃষ্ট ছিল মন্দ। দশ বছর বয়সে গোপাল বৈরাগীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তেরো বৎসরে সে বিধবা হইল। তখন চাঁপার মা বাঁচিয়া ছিল ; আর এক বার চাঁপাকে পাত্রস্থ করিবার চেষ্টা বুড়ী অনেকবার করিয়াছিল কিন্তু কন্যা রাজী হইল না। তারপর মা মরিয়া গেল। চাঁপাও নিরুদ্বেগে দিন কাটাইয়া সবে বিশ বৎসরে আসিয়া পেঁ'ছিয়াছে।

একেবারেই নিরুদ্বেগে দিন কাটাইয়াছে বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। তাহার রূপের পূজারীর অভাব ছিল না ; নবীন গোয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া ছিদাম বৈষ্ণব পর্য্যন্ত সকলেই এক আধবার তাহার অনুগ্রহ প্রার্থনা

করিয়া ধমক খাইয়া গেছে। আজকাল আর বড় কেহ চাঁপার কাছে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিত না। একে চাঁপার ধর্মবাপ গ্রামের জমিদার রাজীববাবুর শাসন, তাহার উপর চাঁপার তিরস্কার, এই দুইটি পদার্থ পাণিপ্রার্থীদের আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেছিল।

চাঁপা লেখাপড়া কিছু জানিত। গ্রামের প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয়ে লব্ধ বিদ্যাকে সে ক্রমাগত রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া অনেকদূর অগ্রসর করিয়া লইয়াছিল। সকালে মুড়ি ভাজিয়া বৈকালে রূপগাঁর বাজারে সে মুড়ি বেচিত। রাত্রে ফিরিয়া তাহার সঙ্গিনী জমিদার বাড়ীর ঝি লক্ষ্মীবুড়ীকে শ্রোত্রীর আসনে বসাইয়া মহাভারত পড়িত, এইরূপে চাঁপার দিন কাটিয়া যাইতেছিল।

সেদিন শ্রাবণের মেঘ অপরাহ্নেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া তুলিয়াছে। চাঁপা তাড়াতাড়ি মুড়ী বেচিয়া বাড়ী ফিরিল। গৃহের বাহিরের আঙ্গিনায় নিমগাছের ঘন ছায়া অন্ধকার রচনা করিয়া রাখিয়াছে। আঙ্গিনায় পা দিয়াই চাঁপা দেখিল কে যেন বারান্দায় শুইয়া। অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখিবার উপায় ছিল না, চাঁপা প্রশ্ন করিল, 'কে ও?" কোন উত্তর আসিল না। তখন মুড়ীর ডালাটি রাখিয়া একটি প্রদীপ হাতে করিয়া বাহিরে আসিল।

যে শুইয়াছিল তাহাকে চাঁপা কোনও দিন দেখে নাই। কুড়ি বাইশ বছরের যুবক চক্ষু মুদিয়া শুইয়া ছিল, চাঁপা তাহার কাছে দাঁড়াইয়া আবার প্রশ্ন করিতেই যুবক চক্ষু মেলিয়া কহিল, "জল"।

চাঁপা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? কি হ'য়েছে?"

যুবক শুধু কহিল, "জল! পিপাসা!"

চাঁপা বুঝিল আগন্তুক অসুস্থ। ঘটিতে জল আনিয়া তাহাকে জলপান করাইয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিল দারুণ জ্বর! জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি? এখানে কি ক'রে এলে?"

যুবক যাহা বলিল, তাহার সংক্ষিপ্তসার এই যে, তাহার নাম বনমালী। মহেশতলায় যাইতে জ্বরের বেগ প্রবল হওয়াতে এইখানে শুইয়া আছে, জ্বর কমিলেই চলিয়া যাইবে। মহেশতলা রূপগাঁ হইতে দুই ক্রোশ। আত্মীয় থাকিলে সেখানে সংবাদ পাঠাইবে ভাবিয়া চাঁপা প্রশ্ন করিল, "সেখানে তোমার কে আছে?"

যুবক শুধু কহিল, "কেউ না। মন্দির দেখতে যাচ্ছিলাম।"

চাঁপা একটু বিব্রত হইয়া কহিল, "তাইতো! এখানে তোমাকে কে দেখবে? কোথা থেকে বা এলে!"

যুবক কহিল, "কাউকে দেখতে হবে না। জ্বর কমলেই আমি চ'লে যাব। তুমি যাও।" স্বরে একটু তীব্রতা ছিল, চাঁপা তাহা অনুভব

করিল। সে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। "মাথার কাছে ঘটিতে জল রইল, পিপাসা হ'লে খেও"—বলিয়া চাঁপা ভিতরে চলিয়া গেল।

রাত ন'টায় চাঁপা একবার বাহিরে আসিল। বনমালী তখন জ্বরের ঘোরে অস্ফুটস্বরে প্রলাপ বকিতেছিল। চাঁপা প্রমাদ গণিল। বাহিরে এই অবস্থায় একটা মানুষকে কি করিয়া ফেলিয়া রাখা যায়? আর ভিতরেই বা অপরিচিত যুবাকে স্থান দেয় কি করিয়া? মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ সেই সময় লক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত দেখিয়া সে কহিল, "তা আর কি করবে? 'কৃষ্টের জীব' ফেলতে তো পারবে না। বাইরের ঘরে মাচার উপর বিছানা ক'রে দাও। আহা কার বাছা যেন!"

সেইটিই সুযুক্তি বোধ হইল; বিছানা করিয়া দুইজনে ধরাধরি করিয়া আনিয়া বনমালীকে ভিতরে শোয়াইয়া দিল। সারা রাত্রি ধরিয়া মাথায় জল ঢালিয়া আর পাখার বাতাস করিয়া চাঁপা যখন ঘুমাইয়া পড়িল তখন প্রভাত হইয়া গেছে।

সে দিন আর মুড়ি ভাজা হইল না।

(২)

সে দিনও জ্বর পূর্ববৎই রহিল। চাঁপা প্রথম প্রথম একটু বিরক্তি বোধ করিতেছিল কিন্তু দুপুরে জ্বরের ঘোরে যখন বনমালী তাহার হাত দুখানি ধরিয়া কহিল, "তুমি অনেক করেছ আমার জন্যে, কিন্তু আমি বোধ করি বাঁচব না।" তখন অকস্মাৎ চাঁপার চক্ষু দুটি ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। মুহূর্তের মধ্যে নিজের সমস্ত শ্রম ও অসুবিধার কথা ভুলিয়া গিয়া সে কহিল, "ভয় কি? সেরে উঠবে। তুমি ঘুমোও, আমি বদ্দি ডেকে আনছি।"

বেলা তিনটায় মাখন কবিরাজ আসিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন।

পাঁচদিন দোকান-পাট ফেলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে চাঁপা বনমালীর সেবা করিল। কবিরাজ যেদিন আসিয়া কহিয়া গেলেন যে, ভয়ের কারণ আর নাই, সেদিন চাঁপা আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল।

বনমালী তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "কাঁদছ কেন? আমি সেরে উঠেছি।"

চাঁপা হাত ছাড়াইয়া পথ্য আনিতে চলিয়া গেল।

অন্নপথ্য পাইবার পর বনমালী কহিল, "তুমি যা করেছ আমার জন্যে তার শোধ নেই। যদি ভগবান দিন দেন—"

চাঁপা কহিল, "সে সব আর শুনতে পারিনে, হপ্তা ধ'রে দোকান বন্ধ, এখুনি যাব। তুমি বাইরে বেরিও না, ঘরেই ব'সে থাক। আর এই ওষুধটা—" বলিয়া এক মোড়ক গুঁড়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, "এটা দুপুরে

তুলসী রস দিয়ে খেও। আমি স্নান সেরে তুলসী তুলে দিয়ে যাব'খন।"

সমস্ত দিন ধরিয়া বনমালী কত কি ভাবিল। এই দরিদ্র নারীর উপার্জন সে কেবল বসিয়া বসিয়া ভোগ করিতেছে। এ অবস্থাটা সুখকর নহে।

সন্ধ্যায় চাঁপা ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জ্বর আসেনি?"

বনমালী কহিল, "না।" পরক্ষণেই কহিল, "দেখ আমি যেতে চাই!"

চাঁপার মুখখানা সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। অন্ধকারে বনমালী তাহা দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সে কহিল, "তা বেশ, যাও না। তা আর আমায় জিজ্ঞেস কেন?"

কথাটি ঠিক অনুমতির মত শোনাইল না দেখিয়া বনমালী চুপ করিয়া গেল।

এক প্রহর রাত্রে যখন দুধ বার্লি লইয়া চাঁপা উপস্থিত হইল, তখনও তাহার মুখের কালো ছায়াটি কাটিয়া যায় নাই। বনমালী এক চুমুকে পাত্রটি নিঃশেষ করিয়া কহিল, "দেখ তুমি গরীব। আর কতদিন আমাকে পুষবে? সেইজন্য যেতে চাইছি। এখন ভাল হ'য়েছি, বোধ করি যেতে পারব।"

চাঁপা একবার বনমালীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার যে যাওয়াই উচিত তাহাতে চাঁপারও কেনো সন্দেহ ছিল না কিন্তু মনের একটি কোণে একান্ত অসহায় অতিথিটির জন্য খানিকটা মমতা সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল 'চলিয়া যাও' বলিতে মন সরিতেছিল না। অনেক ভাবিয়া কহিল, 'দু'বেলা ভাত খেয়েই চ'লে যেও।"

"আচ্ছা" বলিয়া বনমালী শয্যা লইল।

(৩)

সে দিন বনমালী ধরিয়া বসিল যে বিকালেও তাহাকে ভাত দিতে হইবে। আপত্তি করিলে সে অন্য কিছু ভাবিয়া লইতে পারে ভাবিয়া চাঁপা কহিল, "বেশ!" কিন্তু তাহার মুখের ভাব বদলাইয়া গেল, সমস্ত দিন আর সে ভালো করিয়া বনমালীর সঙ্গে কথা কহিল না। বনমালী তাহা লক্ষ্য করিল। কয়েকদিন নিয়ত নারীর সংসর্গে থাকিয়া রমণীর চিত্ত-বিশ্লেষণের তাহার কিঞ্চিৎ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল।

অপরাহ্নে উনুন জ্বালিয়া চাঁপা হাঁড়ি চড়াইয়াছে এমন সময় ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া এক বৈষ্ণব আসিয়া আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া অতি করুণকণ্ঠে কহিল, "দুটো চাল দাও মা, বৈষ্ণব, একাদশীর দিন। পারণ করব।"

আজ একাদশী শুনিয়াই চাঁপার বুকের ভার যেন অনেকটা লঘু হইয়া গেল, বনমালীর দিকে ফিরিয়া সে কহিল, "আজ যে একাদশী তা তো ভুলেই গেছলাম!"

বনমালী সমস্ত দিন ধরিয়াই চাঁপার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিল। এ কথাটির উদ্দেশ্য কি বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না, কহিল, "তাহ'লে, আজ আর ভাত খাব না। থাক্!"

চাঁপার মুখখানি প্রসন্ন হইয়া উঠিল, কহিল, "রুটি গড়ে দেব, দুধ দিয়ে তাই খেও, কি বল?"

বনমালী নিতান্ত সুবোধ বালকের মত কহিল, "তাই দিও।"

ভিখারী সেদিন চাঁপার বাড়ী হইতে তিন দিনের উপযোগী সিধা লইয়া গেল।

পরদিন বনমালী আর বৈকালে ভাত খাইবার জন্য জিদ্ করিল না, শুধু বাজারে যাইবার সময় এক দিস্তা রঙ্গীন কাগজ আনিতে চাঁপাকে বলিয়া দিল। রাত্রে রঙ্গীন কাগজের দিস্তাটি হাতে করিয়া বনমালীর ঘরে আসিয়া চাঁপা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি ভাত খাবে?"

এ প্রশ্নের উত্তর বনমালী অনেকক্ষণই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, কহিল, 'না। এ কদিন থাক্, একেবারে পূর্ণিমার পরেই খাব!"

চাঁপা খুসী হইয়া গেল।

প্রভাতে উঠিয়া চাঁপা দেখিল যে তাহার ঘরের দাওয়ায় আট দশটি রঙ্গীন কাগজের খাঁচা, তাহার মধ্যে নানা রঙের পাখী। খাঁচা আর পাখীর নির্মাণ কৌশল দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বেলা হইলে বনমালী যখন চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিল তখন চাঁপা কহিল, "কাল সারারাত জেগে বুঝি এই সব করেছ? এরপর যদি অসুখ করে তাহলে কে দেখবে বলতো?"

বনমালী সে কথার কোনও জবাব না দিয়া কহিল, "তুমিতো বাজারে যাবে, এগুলো নিয়ে যাবে।"

চাঁপা কহিল, "কি হবে?"

বনমালী কহিল, "বিক্রী! দু'দশ আনা যা হয় তাই লাভ। শুধু ব'সে ব'সে খাচ্ছি।"

চাঁপা বলিল, "তাই ব'লে তুমি রাত জেগে রোগ ক'রে আমাকে ভোগাবে? আর এ সব বইবে কে? আমি একা মানুষ মুড়ি দেখব না পাখী দেখব?"

বনমালী চুপ করিয়া গেল।

বৈকালে চাঁপা দেখিল যে, সুতার সঙ্গে খাঁচাগুলি ঝুলাইয়া বনমালী বাহির হইয়া যাইতেছে। সকালবেলার কথাগুলি মনে পড়িল। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া কহিল, "তোমাকে আর যেতে হবে না। দু'দিন ভাত খেয়েছ আর আজ যাবে এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে বাজারে! এমন মানুষ আমি দেখিনি। দাও দেখি আমার হাতে।"

বনমালী বিনা বাক্যে খাঁচার সুতাগাছি চাঁপার হাতে দিয়া কহিল, "বেশ সাবধান ক'রে নিয়ে যেও। জোর হাওয়া লাগলে ছিঁড়ে যাবে।"

চাঁপা মুড়ির ডালি মাথায় করিয়া হাতে খাঁচাগুলি ঝুলাইয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যায় ফিরিয়া চাঁপা হাসিতে হাসিতে কহিল, "এই নাওগো তোমার খাঁচার দাম। দু'টাকা ছ'আনা।"

বনমালী হাত সরাইয়া কহিল, "তুমি রাখ।"

চাঁপা কহিল, "তোমার জিনিষ—"

বনমালী তাহাকে বাধা দিয়া একান্ত অসঙ্কোচে চাঁপার আঁচলের খোঁটায় পয়সাগুলি বাঁধিয়া দিয়া কহিল, "তুমি যদি না বাঁচাতে তবে এ খাঁচা কে গড়ত চাঁপা ?"

চাঁপা একবার মাত্র বনমালীর দিকে চাহিয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল।

পরদিন হইতে বনমালী রীতিমত কাগজের ফুল পাখী পাতা গড়িতে লাগিয়া গেল। চাঁপা অবসর মত তাহার কাজে সাহায্য করিত। এইরূপে দিনকয়েক কাটিয়া গেল। একদিন বনমালী কহিল, "আচ্ছা একটা দোকানঘর ভাড়া করলে হয় না ? মুড়ি মুড়কী থাকবে তার সঙ্গে থাকবে ফুল পাখী খেলনা। দিনের বেলা সেখানে ব'সেই কাজ করব।"

চাঁপা উৎসাহিত হইয়া কহিল "সে খুব ভালো হবে। তুমি বেচাকেনা জান তো ? অনেকে আবার ঠকিয়ে নেয়।"

বনমালী কহিল, "তুমি শুধু দাম ব'লে দাঁড়ি পাল্লা ঠিক ক'রে দেবে। আর সব আমি নিজে করব।"

ইহার পর দোকানে কি কি রাখিবে সে সম্বন্ধে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা হইল। প্রতিবেশিনী মণি বৈষ্ণবীর মত দোকান করিবার ইচ্ছা চাঁপার অনেকদিন হইতেই ছিল কিন্তু একা মানুষের সাধ্য নয় বলিয়া এতদিন অভিপ্রায়টি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বহুদিনকার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা আসন্ন দেখিয়া সে অতিমাত্রায় উৎসাহিত হইয়া উঠিল, সারারাত এই উৎসাহের উত্তেজনায় তাহার ঘুম হইল না। তাহার মুড়ি মুড়কির দোকান কয় বৎসরে নবীন সরকারের মত মনোহারী দোকানে রূপান্তরিত হইতে পারে, তাহারও একটা সময় সে স্থির করিয়া রাখিল।

চাঁপার দোকান ঘর ভাড়া করা হইয়া গেছে। মাসিক ভাড়া সাড়ে পাঁচ টাকা শুনিয়া চাঁপা প্রথমে একটু দমিয়া গিয়াছিল। বনমালী আশ্বাস দিয়া কহিল, "সাড়ে পাঁচ টাকা তো একদিনের কামাই চাঁপা। পুজোর বাজারে একদিনের কাগজের হাতী আর নৌকো বেচে তোমার বছরের ভাড়া তুলে দেব!" চাঁপা হাস্যময় স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে বনমালীকে পুরস্কৃত করিল।

রং বেরং কাগজের ফুল দিয়া বনমালী দুইদিন ধরিয়া ঘরখানি সাজাইয়া ফেলিল। দোকান সাজান হইলে চাঁপার সঙ্গে তাহার দুই একজন বান্ধবী সন্ধ্যাকালে দোকান দেখিতে আসিল। কি চমৎকার! সমস্ত ঘরখানিতে যেন হাজারখানেক রঙ্গিন প্রজাপতি উড়িয়া আসিয়া বসিয়াছে। শিল্পীকে

প্রশংসা করিয়া মণি বৈষ্ণবী চাঁপার কানে কানে কহিল, "বড় ভাগ্যিরে তোর চাঁপা। দেখিস আবার হেলায় হারাসনি যেন!" চাঁপা লজ্জায় লাল হইয়া গেল।

সেদিন ফিরিতে তাহার রাত্রি হইল। সে একেবারে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে দোকান খুলিবার দিন পর্য্যন্ত জানিয়া আসিয়াছে। মাথায় মুড়ীর ডালিতে দিস্তাখানেক খবরের কাগজ।

"এ কাগজ কি হবে চাঁপা?" বনমালী জিজ্ঞাসা করিল।

"ঠোঙ্গা গড়তে হবে যে। সবাই তো আর আঁচল পেতে মুড়ি নেবে না।" চাঁপা কহিল।

হাত বাড়াইয়া বনমালী কহিল, "দাও। রাতে ক'রে রাখব।"

"সারাদিন মেহনৎ করেছ, আবার সারারাত জাগতে চাও? তোমার সখ তো খুব!"—এই বলিয়া চাঁপা একেবারে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

আহারান্তে নিজের ঘরে চাঁপা ঠোঙ্গার জন্য কাগজ কাটিতে বসিয়া গেল। কাল দোকানের অন্যান্য আসবাব-পত্র যোগাড় করিতে হইবে। হাতে কাঁচি চলিতেছিল আর চাঁপার সমস্ত মন তখন মুড়ি-মুড়কির দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া নবীন সরকারের মনোহারী ও গোপাল গোয়ালার সন্দেশের দোকান আশ্রয় করিয়া ঘুরিতেছিল। বেশ স্পষ্টই সে দেখিতে পাইতেছিল যে, বনমালী রীতিমত মোটা-সোটা হইয়া লাল খেরুয়ার বাঁধা খাতাখানিতে বড় বড় টাকার অঙ্ক ফাঁদিতেছে। দোকানের সম্মুখে পথের ধারে অসংখ্য খরিদ্দার আর পিছনে কুঞ্জলতার বেড়ায় ঘেরা ছোট বাড়ীখানির আঙ্গিনায় বসিয়া সোনার সুতায় গাঁথা তুলসীর মালা লইয়া সে জপ করিতেছে। আরো যে কত প্রকারের সুখস্বপ্নই শরতের মেঘের মত একে একে তাহার মনের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল তাহার সংখ্যা নাই। সহসা চাঁপা চমকিয়া উঠিল। বনমালীর ছবি! খবরের কাগজে বনমালীর ছবি উঠিল কেমন করিয়া? তাড়াতাড়ি প্রদীপটির কাছে আনিয়া ছবির নীচে লেখা কয়েক ছত্রে চাঁপা চোখ বুলাইয়া গেল। নিমেষে কোথা হইতে এক অন্ধকারের বন্যা আসিয়া তাহার দোকান-পসার বাড়ী-ঘর সব ভাসাইয়া লইয়া গেল; রহিল শুধু বনমালীর ছবি, কয়েক পংক্তি অক্ষর আর চাঁপা নিজে। পরমুহূর্ত্তেই দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস টানিয়া চাঁপা কহিয়া উঠিল, "উঃ!"

একখানি বাঙ্গালা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় বনমালীর ছবি, তাহার নীচে লেখা,—আমার ভ্রাতা শ্রীমান বনমালী বসু আজ ছয়মাস হইতে নিরুদ্দেশ। আমার মাতা তাহার জন্য অন্ন-জল ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার বাঁচিবার আশা নাই। শ্রীমান সামান্য কারণে রাগ করিয়া বাড়ী হইতে

চলিয়া গিয়াছে। যিনি তাহার সন্ধান করিয়া দিবেন, তাঁহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

শ্রীকানাইলাল বসু, বর্দ্ধমান।

রাত্রি শেষ হইতে যখন দণ্ডখানেক বাকী ছিল, তখনও চাঁপা কাগজখানি সম্মুখে করিয়া আবিষ্টের মত বসিয়া ছিল। কাকের ডাকে তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে কি ভাবিল, তাহার পর ভিন্ গাঁয়ে তাহার মামাতো ভাই পোষ্টাফিসের পিওন জলধরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিয়া গেল।

বনমালী যখন সবে হাত-মুখ ধুইয়া বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া বসিয়াছে তখন চাঁপা ফিরিল। তখন বেলা হইয়াছে। বনমালী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কি হ'য়েছে তোমার চাঁপা ?"

চাঁপা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কহিল, "কিছু না।" তাহার পর মুড়ি ভাজিবার অছিলায় সে বাহির হইয়া গেল, ফিরিল সন্ধ্যার পর।

বনমালী অত্যন্ত উদ্বেগে সমস্ত দিন কাটাইয়া সন্ধ্যায় পথে দাঁড়াইয়া চাঁপার অপেক্ষা করিতেছিল, চাঁপাকে আসিতে দেখিয়াই কহিল, "আজ সারাদিন না দেখে কেবলই ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছি।"

কথা শুনিয়া চাঁপার চোখে জল আসিল। আপনাকে কোনমতে সামলাইয়া সে জবাব দিল, "আজ রতন গাঁয়ে মুড়ির যোগান দিতে গেছলাম।"

বনমালী কহিল, "সারাদিন খাওনি তাহ'লে! হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও গে। ভাত-তরকারী ঢাকা আছে। আমি একবার দোকানটা দেখে আসিগে।" বনমালী চলিয়া গেল।

দাওয়ায় আঁচল বিছাইয়া চাঁপা ঘণ্টাখানেক গড়াইল, তারপর তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া ভাত লইয়া বসিল।

বনমালী তাহারই জন্য ভাত রাঁধিয়া গিয়াছে। বিধাতার কি পরিহাস! অন্নের প্রথম গ্রাসটি কপালে ঠেকাইয়া মুখে দিতে গিয়েই সে ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরক্ষণেই ভাতের থালা ঢাকিয়া রাখিয়া গেল।

সেদিন আর খাওয়া হইল না।

কয়দিন হইতে চাঁপা এত বিমর্ষ আর গম্ভীর হইয়া আছে, বনমালী তাহা বুঝিতে পারিল না। চতুর্থ দিন আহারান্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কই ? আজ যে দোকান খুলবে! সব আমাকে বুঝিয়ে দাও।"

চাঁপা একটি কথা বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শুধু কহিল, "সে আজ থাক্।"

"কেন ? সামনে পুজোর মরশুম, এখন থেকে গুছিয়ে না নিলে তখন কি করবে ? একটা যে দোকান তাতো খদ্দেরের জানা চাই।" বনমালী কহিল।

চাঁপা তুলসীতলায় গোবর লেপিতেছিল, হতাশা উদাস-স্বরে অতি মৃদু কণ্ঠে কহিল, "আর দোকান!"

বনমালী শুনিতে পাইল না, ফিরিয়া সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিল। চাঁপা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, "দোকানের কথা জানেন নারায়ণ। তুমি আর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না।" বনমালী যদিও এ কথার অর্থ বুঝিল না, তথাপি চাঁপার মুখ দেখিয়া দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিয়া গেল।

বৈকালে তাহার ঘরের বারান্দায় মাথা নীচু করিয়া চাঁপা কাঁথা সেলাই করিতেছিল আর বনমালী বাহিরের ঘরের রোয়াকে পা ঝুলাইয়া বসিয়া অবিলম্বে দোকান খুলিবার পক্ষে বিবিধ যুক্তি দেখাইয়া অনর্গল বকিতেছিল। এমন সময় বাহিরের দরজার কাছে কে ডাকিল, "চাঁপা বোষ্টুমী বাড়ীতে আছ?"

চাঁপা উত্তর দিবার পূর্বেই একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক এক বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলেন। অকস্মাৎ ভ্রাতা ও জননীকে দেখিয়া বনমালী একেবারে বিমূঢ় হইয়া গেল। বৃদ্ধা বনমালীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। চাঁপা কোন কথা না বলিয়া বনমালীর ঘরের বারান্দায় একখানি মাদুর বিছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বাহিরে গরুর গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। রাঁধিবার আছিলায় চাঁপা একটি হাঁড়িতে শুধু জল চাপাইয়া রান্নাঘরে উনুন জ্বালিয়া বসিয়া ছিল। এমন সময় ঝড়ের মত বনমালী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আমি চললাম, কিন্তু তুমি কেন আমার সঙ্গে চাতুরী করলে? আমাকে সইতে পার না বললেই তো আমি চ'লে যেতাম।"

বনমালীকে দেখিয়া চাঁপা উঠিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইল, বনমালীর অভিযোগের উত্তরে একটি কথাও কহিল না। একবার তাহার দিকে চাহিল মাত্র। বনমালী সে সজল চক্ষুর ব্যথাতুর দৃষ্টির অর্থ বুঝিল না। শ্লেষের স্বরে কহিল, "পাঁচশো টাকার লোভে বুঝি!" ভ্রাতা যে তাহার সন্ধানের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা সে জানিত।

বনমালীর কথা শুনিয়া চাঁপার চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল এমন সময়, "চাঁপা মা লক্ষ্মী কোথা?" বলিতে বলিতে বনমালীর মাতা গৃহে প্রবেশ করিলেন, পরে চাঁপাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "আমি চললুম মা, তুমি বুড়ীর হারানো ধন ফিরিয়ে দিয়েছ, তোমার অক্ষয় বৈকুণ্ঠ হ'বে। আর বলবার কিছুই নেই, বুড়ীকে বাঁচিয়েছ; যে ক'টা দিন বাঁচব নিত্য তোমার নামে নারায়ণকে তুলসী দেব। এই নাও, সংসারের কত দরকার কত রকম আছে, কাছে রাখ।"—বলিয়া অনেক প্রকার

আশীর্বাদের সঙ্গে ছোট একটা পুঁটুলী তাহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। চাঁপা অপলক নেত্রে চলন্ত গো-যানখানির দিকে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় মণি বৈষ্ণবীর রাখাল মাণিক আসিয়া ডাকিল "চাঁপা দিদি ?" চাঁপার বাড়ীতে কে আসিয়াছে জানিবার জন্য মণি তাহাকে পাঠাইয়াছিল।

মাণিককে দেখিয়া চাঁপার হুঁস হইল, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, "দয়াল হরি! হরি হে।" তারপর রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করিতে গিয়া হাতের মুঠায় ছোট পুঁটুলিটি চোখে পড়িল। খুলিয়া দেখিল একশত টাকার পাঁচখানি নোট। পুরস্কার! বিদ্রুপের হাস্যে চাঁপার ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে মাণিককে কহিল, "একটু দাঁড়াতো মাণিক! দেখি আমি গাড়ীটা কতদূর গেল!"

গাড়ী তখন কেবল বাবুদের দীঘি ছাড়াইয়া গেছে এমন সময় পিছন হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া মাণিক কহিল, "গাড়ী রাখ একটুখানি।"

কানাইলাল মুখ বাহির করিয়া কহিলেন, "কে ?"

"আমি মাণিক ঘোষ। এই নিন চাঁপা দিদি পুঁটুলী ফিরিয়ে দিয়েছে"—বলিয়া পুঁটুলিটি গাড়ীর মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে বাঁকা পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বনমালী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ও দাদা ?"

কানাই কহিল, "সেই পাঁচশো টাকার নোট দেখছি ফিরিয়ে দিয়েছে।"

মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া পরক্ষণেই বনমালীর চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

চাঁপা আজও মাথায় করিয়া মুড়ী বেচে। সে দোকান ঘর তালা বন্ধ কিন্তু মাসে মাসে চাঁপা তাহার ভাড়া যোগাইয়া যায়। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে সন্ধ্যাদীপ দেয়, কেন তাহা কেহ বলিতে পারে না।

দুলাল

স্বর্গীয় পিতার একটি গুণ পূর্ণভাবেই পুত্র দুলালচন্দ্রে বর্তিয়াছিল। দুলালের পিতা চরণদাস বৈরাগী একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিল। তাহার রচিত মান-মাথুরের পালা আজও সাতপাড়া অঞ্চলে গাওয়া হয়। এখনও কোন বড় ওস্তাদ সে অঞ্চলে আসিলে মজলিসে বসিয়া ইতর-ভদ্র সকলেই স্বর্গীয় চরণদাসের কথা তুলিয়া দুটা গল্প করে।

দুলালকে তিন বছরেরটি রাখিয়া চরণ মারা যায়। সে আজ চার বছরের কথা। ইতিমধ্যে দুলালের মা শ্যামা বৈষ্ণবী গোবিন্দ বৈরাগীর সহিত কণ্ঠিবদল করিয়া আবার নূতন গৃহে সংসার পাতিয়াছে। তাহাতে দুলালের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না। সে আগেকার মতই চারবেলা ভাত খায়, সমস্ত দিন বাড়ী-বাড়ী নাম কীর্তন ও মান-মাথুরের এক-আধখানা ভাঙ্গা গান গাহিয়া বেড়ায়। গোবিন্দ প্রহার করিয়াও দুলালকে তার মুড়ী-মুড়কীর দোকানে কাক তাড়াইবার কাজে লাগাইতে পারে না।

এই প্রহার পিতার আমলে তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সে কথা তাহার মনে পড়ে না, তবে এখন এটা নিত্যকার ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে; কাজেই প্রহার তাহার সহিয়াও গিয়াছে। সমস্ত দিনের পর শুষ্কমুখে বাড়ী ফিরিয়া চারটি ভাত ও একঘটি জল খাইয়া মা'র আঁচলে মুখ মুছিয়া সে শয্যা লয়, পরদিন ঘুম ভাঙ্গিলে আবার একবাটি ভাত, গুড় ও তেঁতুলের সহিত উদরস্থ করিয়া প্রহরকালের জন্য দৈনন্দিন সঙ্গীতকলার অনুশীলনে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়।

কিন্তু সহসা একদিন এই নিশ্চিন্ত জীবন-যাত্রায় বাধা পড়িল।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া দুলাল দেখিল উঠানে জলচৌকির উপর ভদ্রবেশধারী একটি লোক, সম্মুখে তার মা ও গোবিন্দ; উভয়ে দাঁড়াইয়া পরম নিবিষ্ট চিত্তে সে লোকটির সহিত বাক্যালাপ করিতেছে। ভদ্রলোক দেখিলেই প্রণাম করিতে হয়,—খুব শৈশবেই চরণ তাহাকে এ কথা শিখাইয়াছিল। সে আসিয়া ঢিপ করিয়া আগন্তুকের পায়ের কাছে প্রণাম করিল। আগন্তুক দুলালের মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন, "বাঃ বেশ সভ্য তো তোমার ছেলেটি, বোষ্টমী!"

শ্যামা কোনো কথা বলিবার পূর্বেই ক্ষুধার্ত দুলাল মা'র আঁচল টানিয়া কহিল, "ভাত দে মা।"

ভদ্রলোক কহিলেন, "আহা, যাও, যাও ভাত দাও গে. কথা তো হয়েই আছে, সন্ধ্যা হ'লেই আগাম টাকাটা দিয়ে যাবো'খন।"

শ্যামা দুলালের হাত ধরিয়া চলিয়া গেল।

ভদ্রলোকটি কলিকাতার 'সুরেন্দ্র থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি'র ম্যানেজার। তিনি এদিকে তাঁর শ্যালিকার গৃহে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। কাল সন্ধ্যায় সেখানে হরিসংকীর্তনে দুলালের গান শুনিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে এমন মিষ্ট কণ্ঠে তান-লয়-শুদ্ধ গান তিনি আর কখনো শোনেন নাই। তাই গান শুনিয়া ছেলেটির প্রতি তাঁহার লোভ হয় এবং সন্ধান লইয়া গোবিন্দের সঙ্গে শ্যামার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গোবিন্দের মোটেই আপত্তি নাই। তবে শ্যামা? শ্যামাও মাসিক এক-কুড়ি টাকা মাহিনা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল—তবু ছেলে দূরে চলিয়া যাইবে, এ কল্পনায় মন তার বেদনায়

আর্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু টাকা! এক মাসের মাহিনা নগদ হাতে পাইবে, তাছাড়া ছেলের ভবিষ্যতেরও একটা হিল্লে হইয়া যাইবে! মনকে বুঝাইয়া শ্যামা দুঃখ ভুলিবার চেষ্টা করিল।

মা'র মুখে অন্যত্র যাইতে হইবে শুনিয়া দুলাল শঙ্কিত দৃষ্টিতে মা'র দিকে চাহিয়া যখন কহিল, "মা, আমি যাব না।" তখন এ কথায় শ্যামার মনে আবার সেই বেদনা জাগিয়া উঠিল।

গোবিন্দ রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া কহিল, "তুমি উঠে এসোনা। বাবু কি বলছেন, টাকাক'টি নেবে কি না?"

এক-কুড়ি টাকা চট্ করিয়া ফেলিয়া দিতেও শ্যামার মন সরিল না। দুলালের দিকে না চাহিয়া সে বাহিরে আসিল এবং আরো কিছুক্ষণ কথা-বার্তার পর নোট দুখানি আঁচলে বাঁধিয়া আগন্তুকের পা ধরিয়া কহিল "আপনি আমার বাপ! ও'টি বই আমার আর কেউ নেই। দেখবেন, আপনার হাতেই ওকে তুলে দিচ্ছি!"

আগন্তুক গোপাল বণিক সহাস্যে কহিলেন, "ছ'মাস পরে চিনতে পারবে না বোষ্টুমী, তোমার এই ছেলেকে।"

শ্যামা তথাপি বার-বার করিয়া বলিয়া দিল, তাহার ছেলে কি কি খাইতে ভালবাসে কি তার সাধ, এই সবের মস্ত ফর্দ সে দিতে চলিল। গোপাল বণিক ধৈর্য্য-সহকারে সব কথা শুনিয়া কহিলেন, "কিছু ভেবো না, দু'বেলা ভাত-মাছ তো আছেই—তাছাড়া লুচী-মেঠায়ের ছড়াছড়ি। পুজোর পর ছেলে এলে তার মুখেই সব শুনতে পাবে গো!"

শ্যামা আশ্বস্ত হইল, দুলাল কিন্তু সারারাত মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কেবলই কহিতে লাগিল, "আমি যাবো না মা, আমি যাবো না।"

গোবিন্দ দু'বার তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে রাজী করাইবার চেষ্টা করিল। শ্যামা কহিল, "আহা, মেরো না—আমি বুঝিয়ে বলচি।"

শ্যামা অনেক করিয়া বুঝাইল, মিঠাই, মোণ্ডা, কেমন রঙীন ঝক্‌মকে সাজ-পোষাক, কত আদর! তার উপর কলিকাতা সহর—কত গাড়ী-ঘোড়া কত বড় বড় বাড়ী, লোকজন! এত প্রলোভনের কথা শুনিয়াও দুলাল কহিল, "সেখানে যে তুমি নেই।"

শ্যামা অঞ্চলে চোখ মুছিল। দুলাল কহিল, "তুমি যা'বে সঙ্গে?"

শ্যামা এ কথার একটা জবাব খুঁজিয়া পাইল, কহিল, "তুই আগে যা, তারপর আমাকে চিঠি দিলেই যাবো।" এ ব্যবস্থায় দুলাল রাজী হইল।

পরদিন প্রাতে গোপাল বণিকের হাতে পায়ে ধরিয়া অনেক মিনতির সহিত ছেলেকে দেখিবার অনুরোধ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্যামা দুলালকে বিদায় দিল। রাত্রির কথা ভুলিয়া প্রাণপণ শক্তিতে দুলাল মা'র অঞ্চল-প্রান্ত মুঠা করিয়া ধরিয়াছিল—গোবিন্দ আসিয়া মুঠা খুলিয়া দুলালকে টানিয়া গাড়ীতে

বসাইয়া দিয়া গাড়োয়ানকে বলিল, "গাড়ী ছাড়্।" গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। দুলাল কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া কহিল, "কাল চিঠি দেবো মা—চ'লে আসিস!"

গাড়ী পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। শুধু একটা আর্ত ভগ্ন কণ্ঠস্বর বাতাসকে নিমেষের জন্য ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

(২)

চিৎপুর রোডের উপর তিনতলা বাড়ী। তেতলার একটি ঘরের বাহিরে বড় সাইনবোর্ডে লেখা—"সেই সুপ্রসিদ্ধ সুরেন্দ্র থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা-পার্টি। স্বত্বাধিকারী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাহা। ম্যানেজার শ্রীগোপালচরণ বণিক।" গৃহের অভ্যন্তরে অনেকগুলি ছেঁড়া মাদুর বিছানো। তাহার উপর মাঝে মাঝে বালিশ, ছিন্ন আবরণ-শূন্য। ইতস্ততঃ অনেকগুলি বই। অধিকাংশই যাত্রার পালা, খান-কয়েক সচিত্র প্রেমলিপি, থিয়েটার সঙ্গীত, পাঁচালী ও কবির লড়াই। ঘরের কোণে গুটি-কয়েক বাক্স, তাহাদের গায়ে নানা বর্ণের লেবেল আঁটা। বাক্সগুলির উপর কয়েক জোড়া তবলা ও খঞ্জনী; দেওয়ালের উপর দিকে খান-কয়েক নগ্ন নারীর বিলাতী ছবি, একটা কুলুঙ্গিতে একটি গণেশের সিঁদুর-মাখা মাটির মূর্তি। মূর্তিটির পায়ে ন্যাকড়া জড়ানো একটি গাঁজার কলিকা। দেওয়ালের নীচের দিকে ও গৃহের প্রত্যেকটি কোণ পানের পিকে বিচিত্রিত। তখন বেলা এক প্রহর। মেঝেয় বসিয়া কয়েকজন অভিনেতা আয়নার সামনে বিচিত্র-ভাবের মুখভঙ্গী করিতেছিল।

গৃহের কোণে একটি ছিন্ন তাকিয়ায় বুক রাখিয়া স্বত্বাধিকারী মহাশয় গড়্গড়ার নল মুখে দিয়া দৈনিক জমা-খরচের খাতা পরীক্ষা করিতেছিলেন।

এই সময় দুলালকে লইয়া ম্যানেজারবাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বত্বাধিকারী মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখুন, এনেচি। তৈরি করে' নিতে পারলে ভড়ের "সীতা-নির্বাসন" একেবারে কাণা!"

স্বত্বাধিকারী মহাশয় গড়্গড়ার নল ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "এ যে একেবারে খোকা দেখছি। পারবে কি?"

"পরখ করেই নিন না।"

"আচ্ছা, একটা গাও তো খোকা।"

দুলালের অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। সে কহিল, "বড্ড খিদে পেয়েছে।"

ম্যানেজারবাবু চাকর ডাকিয়া দু' পয়সার মুড়ি আনিবার আদেশ দিয়া কহিলেন, "আসচে খাবার—তুমি ততক্ষণ একটা গেয়ে ফ্যালো তো।"

দুলাল ভূমিতলে বসিয়া হাত নাড়িয়া একটা পদ কীর্তন আরম্ভ করিল। নিত্যকার মত আজকে গানে প্রাণ তার লুটাইয়া পড়ে নাই, তবু স্বত্ত্বাধিকারী ও অভিনেতার দল বিমুগ্ধ হইল। স্বত্ত্বাধিকারী বলিলেন, "চলবে। ভালই চলবে। তবে রাখতে পারলে হয়।" তারপর দুলালের গৃহের সংবাদ শুনিয়া কহিলেন, "না, পালাবার ভয় নেই। আজ থেকেই তালিম দিন। কুশের পাটটায় গান আছে, আর দু'একটা চণ্ডীদাসের পদ জুড়ে দিলে ছোকরার সুবিধে হবে।" সেই দিন হইতেই দুলালের শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

বৈকালে দুলাল জানালা দিয়া বাহিরের জগৎটাকে দেখিয়া লইল। এই কলিকাতা সহর! লোকজন, গাড়ী-ঘোড়া! দুলালের এ-সব মোটে ভাল লাগে না। গাঁয়ের সঙ্গীদের কথা মনে পড়িতে লাগিল। আর মনে পড়িল সেই বাবলা গাছের সারি, সেই বাঁশঝাড় ও গাবগাছের অন্তরালে তাদের সেই ক্ষুদ্র গৃহখানি! অদূরে এক স্যাকরার দোকানে বসিয়া একটি ছোকরা বাঁশী বাজাইতেছিল,—কি করুণ সুর! দুলালের মনটা উদাস হইয়া উঠিল।

মা'র কথা মনে পড়িল! মা এখন কি করিতেছে? সেকথা মনে হইতেই দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। বাহিরের বিশ্ব সে জলে ভাসিয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল—আর অশ্রুর আবছায়ার মধ্যে মা'র মূর্তি সহস্ররূপে তার সামনে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। জানালার গরাদে দুই গাল চাপিয়া অস্পষ্ট স্বরে সে ডাকিল, "মা, মা, মাগো!"

কতক্ষণ কাঁদিয়া সে ম্যানেজারবাবুর কাছে গিয়া কহিল, "আমি থাকতে পারবো না এখানে, মা'র কাছে যাব।"

ম্যানেজারবাবু তখন দু'পয়সার ফুলুরির সঙ্গে বৈকালিক চা পান করিতে-ছিলেন, দুলালের কথা শুনিয়া মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "সোনার চাঁদ আর কি! যা, ওপর-তলায় বোস্‌গে। এখনি মাষ্টার আসবে।" বিষণ্ণ-ম্লান মুখে দুলাল চলিয়া গেল।

সন্ধ্যায় মোশন-মাষ্টার আসিয়া দুলালকে নানা ভাবে পরীক্ষা করিয়া স্বত্ত্বাধিকারীকে কহিলেন, "ছেলেটা খুব ভালই মিলেছে, বাবু। টিঁকে থাকলে আসচে পুজোয় 'নরমেধ যজ্ঞ' খুব ভাল উৎরে যাবে।"

দুলালের শিক্ষা সুরু হইল। সেই সঙ্গে দু'বেলা চার পয়সার মুড়ি-মুড়কী জলখাবারেরও বন্দোবস্ত হইয়া গেল। ম্যানেজারবাবু দুলালকে রাস্তায় বাহির হইতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন। 'সুরেন্দ্র থিয়েট্রি-ক্যালের' প্রতিদ্বন্দ্বী 'নিতাই অপেরা'র ঘর রাস্তার মোড়ে। সে দলের অভিনেতারা সর্বদাই সন্ধান লইয়া বেড়াইতেছে। এমন একটা রত্নের সন্ধান পাইলে তারা তাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে! গত বৎসর তাদের একটি ছেলেকে

ভাঙ্গাইয়া নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক 'সমুদ্র-মন্থন'কে এরা একেবারে জখম করিয়া দিয়াছিল।

দুলালকে সতর্ক করিয়া ম্যানেজারবাবু দরোয়ান, চাকর ও অভিনেতা-দিগকে এই বালকটির দিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন। ইট-কাঠের আবেষ্টনে অনেকগুলি দৃষ্টির শৃঙ্খলে পল্লীর দুলাল বন্দী রহিল। মন তার সারাদিন পড়িয়া থাকিত তার সেই গ্রামের মাঠ-ঘাটের মধ্যে। বেলা দশটায় ভাত খাইতে বসিয়া প্রথম যে অন্নের গ্রাসটি সে মুখে তুলিত, সেটা প্রত্যহই অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইত। যেদিন মা'র কথা বেশী করিয়া মনে হইত, সেদিন অন্ন আর মুখেও রুচিত না। ইতিমধ্যে ম্যানেজরাবাবুকে অনুরোধ করিয়া সে মা'র কাছে একখানা চিঠি পাঠাইয়াছিল। ম্যানেজারবাবু একখানা সাদা পোষ্টকার্ড লিখিয়া বিনা মাশুলেই সেখানা পোষ্ট করিয়াছিলেন। দুলাল জানিত যে পত্রপাঠ মাত্র মা এখানে আসিবে। কাজেই দিনকয়েক বিনা বাক্যব্যয়ে সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল। কিন্তু চিঠি পাঠাইবার দিন হইতে দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনিলেই ছুটিয়া গিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিত এবং পর মুহূর্তেই মুখখানা ছোট করিয়া ফিরিয়া আসিত।

এমনিভাবেই দেড় মাস কাটিয়া গেল। প্রত্যহ প্রত্যূষের আশা সন্ধ্যায় একেবারে বিলীন হইয়া যাইত। তথাপি দুলাল মা'র আগমন সম্বন্ধে নিরাশ হইতে পারিল না। এই আশা ও নৈরাশ্যের অবকাশে দুলালের শিক্ষা সমাপ্ত হইল।

(৩)

পূজো আসিতেছে। যাত্রার দলের নূতন পালা "সীতার বনবাস" নাটকের বিজ্ঞাপন বড় বড় রক্তাক্ষরে চারিদিকে প্রচারিত হইয়া গেল। জোড়াসাঁকোর বারোয়ারিতলায় এই যুগান্তকারী নাটকের প্রথম অভিনয় হইবে, স্থির হইয়া গিয়াছে।

অভিনয়ের দিন প্রাতঃকালে দুলাল কাঁদিতে কাঁদিতে ম্যানেজারের কাছে উপস্থিত হইয়া কহিল, "আমি মা'র কাছে যাব।"

ম্যানেজার তাহার কথা শুনিয়া দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কহিল, 'তুমি বেশ ত' ছোক্‌রা! আজ প্লে, আর তুমি যাবে মা'র কাছে! আব্দার আর কা'কে বলে।" দুলাল বুঝিল যাওয়া হইবে না। চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে চলিয়া গেল।

রাত্রে অভিনয় আরম্ভ হইল। সত্ত্বাধিকারী দেখিল ম্যানেজার মিথ্যা বলে নাই। কুশের অভিনয়ে দুলাল যে দক্ষতায় পরিচয় দিতেছিল তাহা

অপূর্ব। তাঁহার যাত্রার ইতিহাসে এমনটি দেখা যায় নাই। শ্রোতার দলও মুগ্ধ হইয়াছিল এবং প্রত্যেক বারই দুলালের আগমনের সঙ্গে করতালিধ্বনিতে তাহাকে উৎসাহিত করিতেছিল। দুলালের চরম কৃতিত্ব ফুটিল শেষ দৃশ্যে,—রামায়ণগানের অবসরে যখন সীতা আসিলেন এবং কুশবেশধারী দুলাল যখন "এই যে মা" বলিয়া সীতাকে জড়াইয়া ধরিল। শ্রোতাদের চক্ষু সে মিলন-দৃশ্যে ছল-ছল করিয়া উঠিল। বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে অভিনয়ের কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মা, মা, মাগো।"

তাহার এই ক্রন্দনে আর ভগ্ন কণ্ঠস্বরে কিছুকালের জন্য শ্রোতৃমণ্ডলী যাত্রার আসর ভুলিয়া যেন কোন্ সুদূর অতীত লোকে গিয়া উপস্থিত হইল। স্বত্ত্বাধিকারী হইতে বেহালাদার পর্য্যন্ত দুলালের এই শেষ দৃশ্যের অভিনয়ে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাঁহাদের জীবনে যাত্রার আসরে এমন জীবন্ত অভিনয় করিতে তাহারা আর কাহাকেও দেখেন নাই।

গান ভাঙ্গিল। চিকের আড়াল হইতে একটি রমণী একখানা বহুমূল্য শাল কুশের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। পুরুষদের দলেও দু'একজন পুরস্কার দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন দুলালের ডাক পড়িল। কিন্তু খুঁজিয়া কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না।

অভিনয় শেষে দুলাল সাজ-ঘরে আসিয়া পোষাক ছাড়িয়া অপরের অলক্ষিতে একেবারে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। তার সমস্ত অন্তর মা'র বুকে ফিরিয়া যাইবার জন্য অধীর আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। যাত্রার দলের সাজ-ঘর, ম্যানেজার ও মাষ্টারের প্রশংসা, শ্রোতাদের উৎসাহ-বাণী এ সব কিছু নয়, কিছু নয়, কিছু নয়! প্রশ্ন করিতে করিতে সে একেবারে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু পয়সা চাই—টিকিট কিনিতে হইবে। নইলে তো চাড়তে দিবে না! উপায়? প্লাটফর্মের এদিক-ওদিক বৃথা ঘুরিয়া ক্লান্ত-পদে গিয়া সে একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। দুই চোখ মুদিয়া আসিতেছিল—সে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন ষ্টেশনের প্লাটফর্ম জনশূন্য হইয়া আসিয়াছে।

দুলাল স্বপ্ন দেখিতেছিল, সে যেন মা'র কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে, মা'র বুকে মাথা রাখিয়া বলিতেছে, "আমি যাবো না, আর যাবো না মা।" মা তাকে বুকে টানিয়া বলিতেছে, "না, বাবা, না, আর তোমায় যেতে দেবো না।" সহসা মাথায় আঘাত পাইয়া সে উঠিয়া বসিল। চোখ চাহিয়া দেখে, সম্মুখে দাঁড়াইয়া ম্যানেজার আর চাকর ভোলা। তারা খোঁজ করিয়া একেবারে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত। ম্যানেজারকে দেখিয়াই দুলালের মুখ শুকাইয়া গেল। সে কাঁদিয়া কহিল, "আমি মা'র কাছে যাবো।"

চোখ রাঙাইয়া দুলালের কাণ ধরিয়া তাহাকে বেঞ্চ হইতে নামাইয়া ম্যানেজার কহিল, "হতভাগা! কম ভোগান ভুগিয়েচো! যাওয়াচ্ছি মা'র

কাছে...'' বলিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে ঘোড়ার গাড়ীতে উঠাইয়া চিৎপুর রোডের দিকে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

যাত্রার দলে যে আসে সেই দু'দশ দিনে পোষ মানিয়া যায়—আর এ ছেলেটা বাগ মানিবে না! অধিকারী মহাশয় রাগে গম্‌গম্‌ করিতেছিলেন। এই সময় ম্যানেজারের সহিত ঘরে প্রবেশ করিয়া দুলাল নতমুখে অপরাধীর মত দাঁড়াইল। দেখিবামাত্র পা হইতে চটি খুলিয়া অধিকারী তাকে প্রহার করিলেন। দুলাল বিনা বাক্যে সে প্রহার পিঠ পাতিয়া গ্রহণ করিল। তারপর একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

সারাদিন না খাইয়া ঘুমে কাটাইয়া সে সন্ধ্যায় যখন উঠিল, তখন মাথা বিষম ভার বোধ হইতেছে। দুই চোখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, জ্বালা করিতেছে! শরীর এমন যে নড়িবার সাধ্য নাই। গা তাতিয়া আগুন। প্রবল জ্বর! অত্যন্ত তৃষ্ণা পাইয়াছিল, জলপানের জন্য নীচে সিঁড়ির উপর পড়িয়া গিয়া দুলাল কাঁদিয়া উঠিল। ম্যানেজার ও দুই-একজন অভিনেতা আসিয়া তাকে তুলিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। রাত্রে কুড়ি গ্রেণ কুইনিন খাওয়াইয়াও ম্যানেজার দুলালের জ্বর ছাড়াইতে পারিলেন না। শেষ রাত্রি হইতে দুলাল গান গাহিতে সুরু করিল,—

"এই তো এসেছিস মা—
এবার আমায় কর্ মা কোলে—
বনবাসের বড় জ্বালা মা!"

পাড়ার একটা ডিস্‌পেন্সারির কম্পাউন্ডার আসিয়া দেখিয়া বলিয়া গেল, বিকার।

সন্ধ্যায় দুলালের গান থামিল, সঙ্গে সঙ্গে সেও ইহজীবনের মত ম্যানেজার ও অধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে শেষ-বিদায় লইয়া গেল।

গ্রামের তিন ক্রোশের মধ্যে এক জায়গায় পূজার সময় দুলালের সেই যাত্রার দলের বায়না ছিল। ছেলে দুলালও সঙ্গে আসিবে—তা'কে তা'র অতি প্রিয় খাদ্য নূতন ধানের চিঁড়া খাওয়াইবে বলিয়া শ্যামা আর একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে চিঁড়া কুটিতেছিল। এমন সময় পিয়ন শ্যামা বৈষ্ণবীকে এক মনি-অর্ডার আনিয়া দিল।

মনি-অর্ডারের কমিশন-বাদ দুলালের প্রাপ্য মাহিনা ন' টাকা ছ' আনা অধিকারী মহাশয় পাঠাইয়া দিয়াছেন। শেষের ছত্রে লেখা আছে, জ্বর-বিকারে ২৭শে ভাদ্র দুলাল মারা গিয়াছে।

শ্যামা টাকা কয়টা ছুড়িয়া ফেলিয়া চিঁড়ার কাঠাটি বুকে করিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে দুলো—দুলাল...!"

পিওন চলিয়া গেল।

নিধিরামের বেসাতি

চৈতালীর আবাদ শেষ করিয়া নিধিরাম কলিকাতা আসিত, তাহার পর বর্ষা নামিতেই দেশে ফিরিত, এই কয়টি মাস প্রত্যহ দেখিতাম একচক্ষু নিধিরাম পাঠক মাথায় একটি ছোট লাল টিনের বাক্স চাপাইয়া হাঁকিয়া যাইতেছে, "চাই—ই চীনা-আ সিঁদুর।" আর তাহার পশ্চাতে নগ্নকায় শিশুর দল বাদল মিত্রের গলির তন্দ্রালস মধ্যাহ্নকে সচকিত করিয়া চীৎকার করিতেছে, "চাই-ই কানা ইঁদুর।" কবে ছন্দরসিক কোন্ শিশুকবি সিন্দুরওয়ালা নিধিরামের এই অপূর্ব স্তববাণী প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিল তাহা কেহ জানে না। সম্ভবত স্বয়ং কবিরও সে কথা মনে নাই, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতি বৎসর নব নব শিশুকণ্ঠ একই ভাষায় নিধিরামকে অভ্যর্থনা করিয়া আসিতেছিল। এই বিরূপ সম্বর্ধনায় নিধিরাম কোনও দিন রাগ করে নাই, প্রত্যুত্তরে মূষিকের অনুকরণে শব্দ করিয়া তাহার শিশু-বন্ধুগণকে খুসী করিয়াছে, দেখিয়াছি।

বিশ বৎসর ধরিয়া এইরূপেই চলিতেছিল, সহসা একদিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া নিধিরাম আশ্চর্য্য হইয়া গেল। গলির মধ্যে একস্থানে গুটিকয়েক শিশু জটলা করিতেছিল, নিধিরাম সেখানে আসিয়া গলার স্বর উঁচু করিয়া হাঁকিল, "চাই-ই চীনা-আ সিঁদুর!" দূর হইতে দুই-একটি কণ্ঠে পরিচিত প্রতিধ্বনি শোনা গেল বটে, কিন্তু প্রত্যহের মত তাহা জমাট বাঁধিয়া উঠিল না।

শিশুর দল নীরবে পরম সম্ভ্রমের সহিত একজনকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। নিধিরাম নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কথা কহিতেছিল একটি বালিকা। কোমরে নীলাম্বরী শাড়ীর অঞ্চল জড়াইয়া হাত নাড়িয়া সে প্রতিপন্ন করিতেছিল যে, কাণাকে কাণা এবং খোঁড়াকে খোঁড়া বলিতে নাই এবং যদি কেহ বলে, তবে তাহার সহিত বক্তার জন্মের মত আড়ি এবং পুতুলের বিবাহে সে তাহাকে কদাচ নিমন্ত্রণ করিবে না। সমাজ-চ্যুতির এই নিদারুণ শাস্তির ভয়ে পরিচিত কণ্ঠধ্বনি শুনিয়াও শিশুর দল আজ নীরব হইয়াছিল, নিধিরাম তাহা বুঝিল এবং বক্তাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া গেল।

সন্ধ্যায় ফিরিবার পথে গলির মোড়ে নীলবাড়ীর দরজায় শিবপ্রহরে শিশুসভার এই নেত্রীটির সহিত নিধিরামের সাক্ষাৎ পরিচয় হইল। নিধিরামকে দেখিয়াই বিনা ভূমিকায় বালিকা কহিল, "তুমি বুঝি আর-জন্মে কাণাকে কাণা ব'লেছিলে সিঁদুরওয়ালা?"

বলা বাহুল্য জন্মান্তরের কথা নিধিরামের স্মরণ ছিল না। শুধু এই

নবাগতার সহিত আলাপ জমাইবার অভিপ্রায়ে সে কহিল, "হাঁ মা লক্ষ্মী।"

"মা বলেছে তাই এ জন্মে তুমি কাণা হ'য়েছ, না?"—বলিয়াই সে এক প্রচণ্ড অভিশাপ-বাণী উচ্চারণ করিল, "যদু, মধু, ছোটকু, নিমাই সব্বাই আর জন্মে কাণা হ'বে! তোমাকে খেপায় কিনা।"

নিধিরাম দাঁতে জিভ কাটিয়া কহিল, "ও কথা বলতে নেই মা লক্ষ্মী!"

'মা লক্ষ্মী' এইবার রুখিয়া উঠিয়া কহিল, "বলব, একশো বার বলব! তারা কেন তোমাকে কাণা বলবে?"—বলিয়াই একটু থামিয়া সে প্রশ্ন করিল, "তুমি বামুন?"

নিধিরাম কহিল, "হ্যাঁ।"

প্রশ্নকর্ত্রীর চক্ষে সংশয় ফুটিয়া উঠিল, সে কহিল, "দেখি পৈতে?"

নিধিরাম ছিন্ন মের্জাইয়ের মধ্য হইতে মলিন উপবীতগুচ্ছ বাহির করিয়া দেখাইল। বালিকা কহিল, "কাল রাধুর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে। তুমি মন্তর পড়াবে?"

নিধিরাম তৎক্ষণাৎ পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া কহিল, "পড়াব।"

"আমরা কিন্তু গরীব মানুষ, দক্ষিণে দিতে পারব না বুঝলে?"—বলিয়া পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত বালিকা কহিল, "এইটি পার হ'লেই আমি বাঁচি। আর দু'টিকে এক রকমে বিয়ে দিইছি। মাগো, ছেলেমেয়ে মানুষ করা যে কি কষ্ট!"—এই বলিয়া পুতুলের ডালাখানি নিধিরামের হাতে দিয়া সে কহিল, "দেখছ মেয়ের আমার মুখখানা রোদে একেবারে শুকিয়ে গেছে। এখন আবার জল দিয়ে রাখতে হবে, নইলে পাড়ার লোকে বৌ দেখবার সময় খোঁটা দিয়ে বলবে, বৌ কুচ্ছিৎ।"

এমন সময় ভিতর হইতে আহ্বান আসিল, "সরু—"

"মাগো মা! দেখছ? দু-দণ্ড আপন ছেলেমেয়ের কথা কইবার যো নেই!"—বলিয়া বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইল।

পুতুলের ডালা তাহার হাতে দিয়া নিধিরাম কহিল, "তবে আসি মা লক্ষ্মী!"

"আমি লক্ষ্মী নইগো, সরস্বতী। আমাকে মা সরস্বতী ব'লে ডাকবে, বুঝলে?" এই বলিয়া বালিকা ভিতরে ঢুকিল। নিধিরামের সহিত সরস্বতীর পরিচয়ের সূত্রপাত হইল এই প্রকারে।

(২)

এই মুখরা মেয়েটিকে সহসা নিধিরামের অত্যন্ত ভাল লাগিয়া গেল! ক্রমে ক্রমে কালীঘাটের পুতুল, গালার চুড়ী, দু-এক টুক্‌রা জরির কাপড় নিধিরামের সিঁদুরের বাক্সে আশ্রয় পাইয়া অবশেষে সরস্বতীর খেলাঘরে

স্থানলাভ করিতে লাগিল। প্রত্যহের আনন্দহীন একঘেয়ে কেনাবেচার মধ্যে এই মেয়েটির সঙ্গে দু'দণ্ড কথা কহিয়া নিধিরাম আনন্দ পাইত; সময় সময় নীলবাড়ীর জানালার রোয়াকে সিন্দুরের পেটরা কোলের উপর রাখিয়া নিধিরাম সরস্বতীর সহিত তাহার মাটির ছেলেমেয়েদের সুখদুঃখের কথা কহিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছে; ভিন্ন পল্লীতে গিয়া বেসাতি বেচিলে দশটা পয়সা রোজগার হয়, এ কথা মাঝে মাঝে মনে হইয়াছে বটে, তথাপি তাহার প্রগল্‌ভা বান্ধবীর কথার মোহ সে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। অথচ সে কথাগুলি একান্তই নিরর্থক এবং কোনো দিন নিধিরামেরও কোনও কাজে লাগিবার সম্ভাবনা ছিল না।

বর্ষা নামিলে নিধিরাম দেশে গেল।

সেবার দেশে মারাত্মক রকমের একটা ব্যাধির উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার আক্রমণ হইতে নিধিরামও নিষ্কৃতি পাইল না। মাস ছয় ভুগিয়া একদিন মাঘের দ্বিপ্রহরে নিধিরাম তাহার সিন্দুরের লাল বাক্সটি মাথায় করিয়া সরস্বতীর বাড়ীর দরজায় আসিয়া হাঁকিল, "চাই—ই চীনা-আ সিঁদুর।" আগেকার মত আর কেহ দুড়-দাড় করিয়া নামিয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল না। দ্বিতীয়বার হাঁকিতে নীচের ঘরের একটা জানালা খুলিয়া গেল। জানালায় সরস্বতীকে দেখিয়াই এক গাল হাসিয়া নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিল—"বুড়ো বেটার কথা মনে ছিল সরু-মা?" সরস্বতী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল।

নিধিরাম আশ্চর্য্য হইল, সরস্বতী তো কথা না বলিয়া থাকিবার পাত্রী নহে! জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ছেলেমেয়ে সব ভাল আছে সরু-মা?"

এইবার সরস্বতী কথা কহিল, "সে সব আমি রাধুকে বিলিয়ে দিয়েছি।"

ইহার পর আর কোনও প্রশ্ন করিবার সূত্র খুঁজিয়া পাইল না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অনেক ভাবিয়া সে কহিল, "একবার বাইরে আসবে মা?"

সরু কথা কহিল না, পিছন হইতে সরস্বতীর কনিষ্ঠ ভাইটি কহিয়া উঠিল, "মা বলেছে দিদি আর বাইরে যাবে না। দিদি বড় হ'য়েছে কিনা।"

ওঃ! তাই! এইবার নিধিরামের চক্ষে সরস্বতীর পরিবর্ত্তন ধরা পড়িল। এক বৎসর সে সরস্বতীকে দেখে নাই। কিন্তু বর্ষ পূর্ব্বে গৃহযাত্রার দিন সে যে মুখরা চঞ্চলা বালিকার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছিল তাহার সহিত এ মেয়েটির প্রভেদ বিস্তর। ইহার সহিত কি ভাষায় কোন উপলক্ষে কথা কহিবে তাহা সহসা নিধিরাম স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। ইতস্তত করিয়া বাড়ী হইতে যে পাটালী গুড় আনিয়াছিল তাহার পুঁটুলীটা জানালা গলাইয়া সরস্বতীর হাতে দিয়া নিধিরাম কহিল, "বাড়ী

থেকে এনেছি সরু-মা, নিয়ে যাও।" তাহার পর নিজ গৃহ সম্বন্ধে দুই-একটি অসম্বন্ধ কথা কহিয়া নিধিরাম চলিয়া গেল, গ্রামের কারিকরের দ্বারা যে বিচিত্র বর্ণের কাঠের পুতুলগুলি গড়িয়া আনিয়াছিল, সেগুলি আর বাক্স হইতে বাহির করিবার আবশ্যক হইল না।

পরদিন নিধিরাম প্রত্যহের বেসাতি লইয়া নীলবাড়ীর জানালায় দাঁড়াইল, নীচের ঘরে তক্তপোষের উপর বসিয়া সরস্বতী লেখাপড়া করিতেছিল, নিধিরাম মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, 'কি পড়ছ সরু-মা ?"

সরস্বতী মুখ তুলিয়া নিধিরামকে দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "কথামালা।"

পরক্ষণেই প্রশ্ন করিল, "মা জিজ্ঞেস করেছে গুড়ের দাম কত ?"

প্রশ্ন শুনিয়া নিধিরাম থমকিয়া গেল ; তাহার পর শুষ্ক মুখে কহিল, "দিদিমাকে বোলো সরু-মা, আমার ঘরের তৈরী গুড়, পয়সা লাগেনি।"

সরস্বতী কহিল, "আচ্ছা !"

ইহার পর আর দুই দিন সে পথে নিধিরাম আসিল না। তৃতীয় দিনের মধ্যাহ্নে নিধিরাম যথারীতি নীলবাড়ীর জানালায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, "সরু-মা !"

সরস্বতী শেলট হইতে মুখ তুলিয়া একেবারে প্রশ্ন করিল, "দু'দিন কেন আসনি ?"

নিধিরামের মুখ উল্লাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহা হইলে সরু-মা তাহার কথা মনে রাখিয়াছে ! অনুপস্থিতির একটি কারণ নির্দেশ করিয়া নিধিরাম অতি সতর্ক মৃদুস্বরে কহিল, "সরু-মা ! একখানা বই এনেছি, পড়বে ?"— বলিয়া জানালা দিয়া একখানা বটতলার কৃত্তিবাসী বাঁধানো রামায়ণ চারিদিক চাহিয়া সরস্বতীর চৌকির উপর রাখিয়া দিল। সরস্বতী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছবি আছে ?"

নিধিরাম হাসিয়া কহিল, "অনেক ! রাম, রাবণ, হনুমান সবার ছবি। আমি পড়তে জানিনে সরু-মা, তুমি আগে প'ড়ে নাও, তারপর আমাকে প'ড়ে শোনাবে।"

সরস্বতী কহিল, "আচ্ছা। তুমি আবার কাল আসবে ?"

নিধিরাম একটি সমুজ্জ্বল আনন্দ-হাস্যের সহিত সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল।

সরস্বতী রামায়ণ পড়িত আর নিধিরাম সিন্দুরের পেট্‌রা কোলের উপর রাখিয়া জানালার রোয়াকে বসিয়া শুনিত। মধ্যে যে ইঁটের দেওয়ালের ব্যবধান ছিল, শ্রোতা ও পাঠিকার কাহারও তাহা মনে ছিল না। সহসা একদিন ব্যবধান বাড়িয়া গেল।

পাঠ যখন অযোধ্যাকাণ্ড পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, তখন একদিন নিধিরাম

আসিয়া দেখিল যে, সরস্বতীর পরিবর্তে নীচের ঘরে তক্তপোষের উপর দুইটি ভদ্রলোক পরিষ্কার বিছানায় বসিয়া তামাক টানিতেছেন। নিধিরাম ডাকিল, "চাই—ই চীনা-আ সিঁদুর।" দোতলার একটা জানালা খুলিয়া গেল সরস্বতী দাঁড়াইয়া বাম হাত মুখে দিয়া ডান হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল যে, সে আজ পড়িবে না! নিধিরাম যে পথে আসিয়াছিল সেই পথেই ফিরিয়া গেল। গলির মোড়ে সরস্বতীর সখী রাধারাণী ওরফে রাধু নিধিরামকে সংবাদ জানাইল যে, সরস্বতীর বিবাহ আসন্ন এবং পাত্রপক্ষ দেখিতে আসিয়াছেন।

সরু-মার বিবাহ! তারপর শ্বশুরবাড়ী! সে কতদূর! নিধিরাম একবার ফিরিয়া দূরে নীলবাড়ীর দোতলার রুদ্ধ বাতায়নের দিকে চাহিয়া মন্থরপদে চলিয়া গেল।

তিন চারি দিন ঘরে কাটাইয়া আবার সেই পেট্‌রা মাথায় করিয়া নিধিরাম গলির মোড়ে আসিয়া একদিন হাঁকিল, "চাই—ই চীনা-আ সিঁদুর।"

সেদিন নীলবাড়ীতে নহবৎ বাজিতেছে, নিধিরাম অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল, উপরের খোলা জানালার ধারে আজ আর আসিয়া কেহ দাঁড়াইল না।

পর দিন হইতে পুনরায় যথারীতি নিধিরামের কণ্ঠস্বর গলির সর্বত্র ধ্বনিত হইতে লাগিল, শুধু নীলবাড়ীর সম্মুখ দিয়া নীরবে সে চলিয়া যাইত, শত চেষ্টাতেও কণ্ঠে কথা ফুটিতে চাহিত না।

(৩)

নিত্যকার মত সেদিনও নিধিরাম নীরবে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় নীলবাড়ীর জানালা হইতে একটি শিশু ডাকিল, "দাঁড়াও সিঁদুরওয়ালা! দিদি তোমাকে ডাকছে।"

নিধিরামের বুক কাঁপিয়া উঠিল। ফিরিতেই সে দেখিল নীচের ঘরের জানলায় সরস্বতী দাঁড়াইয়া। নিধিরাম আনন্দ গদ্‌গদ স্বরে কহিয়া উঠিল, "কবে এলে সরু-মা? আমি তো জানিনে তাই—"

সরস্বতী সংক্ষেপে কহিল, "আজ।" ইহার পর নিধিরাম ঘণ্টাখানেক ধরিয়া অবিশ্রান্ত কত কথা কহিয়া গেল। শেষে কহিল, "তোমার সিঁদুরের কৌটোটা আন তো সরু-মা। খুব ভাল উজ্‌লি সিঁদুর আছে।"

সরস্বতীর সোনার কৌটা সিঁদুরে ভরিয়া নিধিরাম সেদিনকার মত চলিয়া গেল। তাহার পর হইতে ক্রমে ক্রমে বিচিত্র বর্ণের কাঠের কৌটায় সিঁদুরের উপঢৌকন আসিতে আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে তরল আলতা হইতে সুরু করিয়া শাঁখের কঙ্কণ পর্য্যন্ত এয়োতির কোনও সরঞ্জামই বাদ পড়িল না।

সেবার বর্ষায় আর নিধিরাম দেশে গেল না।

আশ্বিনে পূজার পূর্বে সরস্বতী যেদিন শ্বশুর-গৃহে যাত্রা করিল, নিধিরামও সেইদিন দেশে গেল। বর্ষায় বাড়ীতে উপস্থিত না থাকিবার জন্য আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে এই বলিয়া স্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র পর্য্যন্ত নিধিরামকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল কিন্তু আর্থিক ক্ষতির প্রকাণ্ড অঙ্কটি তাহাকে মোটেই বিচলিত করিল না।

ফাল্গুনের বাতাসে কৃষ্ণচূড়ার গাছের ডালে রং ধরিয়াছে। নিধিরাম কলিকাতায় ফিরিল।

সরস্বতী শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়াছে কি না সে জানিত না। নীল-বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাঁকিল, "চাই—ই চীনা-আ সিঁদুর।" কোনো সাড়া আসিল না। নিধিরাম গলির পথে ফিরিয়া গেল কিন্তু কি ভাবিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়া ডাকিল, "চাই—ই চীনা-আ সিঁদুর!"

অতি ক্ষীণ পদধ্বনি যেন শোনা গেল। নিধিরাম কম্পিত বক্ষে জানালার ধারে আসিয়া প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল। জানালা খুলিয়া সরস্বতীর ছোট ভাইটি কহিল, "তোমাকে এ পথে আসতে মা বারণ ক'রে দিয়েছে সিঁদুরওয়ালা।"

অজ্ঞাতে কোনও অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া নিধিরামের মুখ শুকাইল। আমতা আমতা করিয়া সে কহিল, "কেন?"

এমন সময় দরজা খুলিয়া গেল। দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল ম্লানমুখী শুভ্রাবেশা নিরাভরণা সরস্বতী। নিধিরাম চমকিয়া উঠিল। তাহার পর মাথার পেটরা মাটিতে নামাইয়া তাহার উপরে বসিয়া পড়িয়া অর্থহীন উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল।

নীলবাড়ীর দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

সম্বিৎ পাইয়া যখন নিধিরাম ফিরিয়া চলিল, তখন তাহার মাথায় সিঁদুরের পেটরা বিশ মণ ভারী হইয়া গিয়াছে।

ইহার পর আর সাত দিন সে গলিতে কেহ নিধিরামকে দেখে নাই। অবশেষে একদিন হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া জানলা খুলিলাম। নিধি-রামের মূর্তি দেখা গেল। সিঁদুরের পেটরার পরিবর্তে তাহার মাথায় প্রকাণ্ড ফলের ঝাঁকা। তাহার গুরুভারে অবনত হইয়া বৃদ্ধ নিধিরাম পাঠক ঘর্মাক্ত কলেবরে নীলবাড়ীর সম্মুখ দিয়া গলির পথে হাঁকিয়া যাইতেছে—"ফল চাই মা, পাকা ফল!"

পরের ছেলে

বুড়া শম্ভু সরকার স্বগ্রাম ঝাউডাঙ্গাতে পাঠশালা খুলিয়া গত চল্লিশ বৎসর যাবৎ গুরুমহাশয়ের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ; এই দীর্ঘকালের মধ্যে শুধু পূজার কয়েকদিন ছাড়া আর কেহ তাঁহার পাঠশালার দুয়ার বন্ধ দেখে নাই। তাই সেদিন হঠাৎ পাঠশালার দরজায় তালা বন্ধ দেখিয়া পাড়ার লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সন্ধ্যায় দুই-একজন প্রতিবেশী কৌতূহলী হইয়া সরকার মহাশয়ের সন্ধান লইতে আসিলেন। সরকার মহাশয় তখন বহুকালের পুরাতন ক্যাম্বিসের ব্যাগের মধ্যে তাঁহার তিনখানি কাপড় ও দুইটি মেরজাই পাট করিয়া গুছাইয়া তুলিতেছিলেন। প্রতিবেশীরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি, সরকার মশাই ?"

"চললুম দাদা, আর পারছিনে। দিনকয়েক ঘুরে আসি। মধু দাসকে ব'লে গেলাম, সে পাঠশালা দেখবে। বাড়ী-ঘর যেমন আছে থাকুক। আর কি হবে এসব।"—বলিয়া ব্যাগটি তুলিয়া তাহার ওজন পরীক্ষা করিলেন, তারপর নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, "রতন বৃত্তি পেয়েছিল দাদা!"—বলিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে একখানি ভাঁজ করা কাগজ পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকের হাতে তুলিয়া দিলেন। তিনি সেখানিতে একবার চোখ বুলাইয়া কহিলেন, "এখানি আবার রেখেছেন কেন ? দেখে মিছিমিছি মন খারাপ করা !"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি কাগজখানি লইয়া কহিলেন, "না থাক্।" তারপর বলিলেন, "বুড়োকে মনে রেখো ভাই সব, ফিরে আসলে আবার দেখা হবে। আর দেরী করব না, দুর্গা শ্রীহরি। সিদ্ধিদাতা গণেশ।"—বলিয়া বেতের মোটা লাঠিটার মাথায় ব্যাগ ঝুলাইয়া লাঠিগাছ কাঁধে করিয়া কহিলেন, "শুধু একটা কথা দাদা, আমি মধুকে ব'লে গেলাম, তোমরাও মনে করিয়ে দিও, ছেলেগুলোকে যেন মার-ধোর না করে। কে কবে যাবে কে জানে ? দু' দিনের জন্য আর কেন—দুর্গা শ্রীহরি !" শম্ভু সরকার বাহির হইয়া গেলেন।

রাম দত্ত কহিলেন, "পুত্রশোকে রাজা দশরথ মরেছিলেন, শম্ভু সরকার তো ছার ! আহা রতন ছেলেটি বড় ভাল ছিল।"

শম্ভু সরকারের স্ত্রী রতনের জন্মের পরদিনই ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। শম্ভু সরকার আর বিবাহ না করিয়া নিজেই রতনের মায়ের স্থান অধিকার করিলেন। ক্রমে রতন বড় হইয়া পাঠশালায় ঢুকিল। এবার সে প্রাইমারী বৃত্তি-পরীক্ষা দিয়াছিল কিন্তু ফল বাহির হইবার মাসখানেক পূর্বেই একদিনের জ্বরে হঠাৎ সে মৃত্যুলোকে প্রস্থান করিল। অসীম ধৈর্য্যের সহিত শম্ভু সরকার এই আঘাত সহিয়া গেলেন, পাঠশালা রীতিমত চলিতে

লাগিল কিন্তু যেদিন পরীক্ষার ফল ও সেই সঙ্গে পুত্রের বৃত্তি প্রাপ্তির সংবাদ বাহির হইল, সেদিন পুত্রশোক তাঁহাকে নূতন করিয়া বাজিল। ঘরে আর কোনমতেই মন বসিতেছিল না ; পাঠশালায় গিয়া যে স্থানটিতে রতন বসিত সেই দিকে দৃষ্টি পড়িত সকলের আগে, আর বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিত, কাজেই আজ শম্ভূ সরকার ষাট বৎসর বয়সে জীবনে প্রথম গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইলেন।

(২)

মাস-পাঁচেকের মধ্যে তীর্থভ্রমণ শেষ হইল, সম্বলও ফুরাইয়া আসিল। তখন সরকার মহাশয় স্থির করিলেন যে, চাকুরী করিবেন ; কিন্তু ভগ্নদেহ বৃদ্ধকে কাহারও কাজে লাগিল না। অগত্যা পদব্রজে দেশে ফিরিবার সংকল্প করিয়া শম্ভূ সরকার যাত্রা করিলেন।

কান্তপুরে আসিয়া প্রথম দিন সন্ধ্যা হইল। বাবুদের অতিথিশালায় রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতঃকালে যখন সরকার মহাশয় ইষ্টমন্ত্র জপিতেছিলেন সেই সময় একটি ছোট ছেলে আসিয়া পরম কৌতূহলের সঙ্গে শম্ভূ সরকারের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "তুমি কে ?"

ছেলেটিকে সরকার মহাশয়ের ভালো লাগিল, তিনি মন্ত্রজপ ছাড়িয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "তুমি কে আগে বল।"

সে বলিল, "আমি রতন।"

রতন ! শম্ভূ সরকারের বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তুমি কার ছেলে ?"

"বাবার ছেলে।" রতন জবাব দিল।

শম্ভূ সরকার রতনের হাত ধরিয়া কহিলেন, "আমিও বাবার ছেলে, আমার নাম শম্ভূ সরকার।"

রতন তাড়াতাড়ি কহিল, "তুমি শম্ভূ ? বাবা যে তোমাকে ডাকছে ! চল।"—বলিয়াই শম্ভূ সরকারের হাত ধরিয়া টানিল।

সরকার মহাশয় বুঝিলেন যে শিশু ভুল করিয়াছে, তথাপি উঠিয়া কহিলেন, "চল যাই।" তখনকার মত তাঁহার মন্ত্রজপ বন্ধ রহিল।

বড়বাবু ফরাসে বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, এমন সময় রতন শম্ভূ সরকারের হাত ধরিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল, "তুমি যে ডাকছিলে, এনেছি।"

বড়বাবু হাসিয়া কহিলেন, "কাকে এনেছিস রে ?"

"তুমি যে বললে শম্ভূ সরকার !" রতন কহিল।

"আপনার নামও বুঝি শম্ভূ সরকার, তাই খোকা আপনাকে টেনে

এনেছে। আমি আমাদের নায়েব শম্ভূ সরকারকে খুঁজেছিলাম। যাহোক আপনি বসুন।"

শম্ভূ সরকার আসন লইলেন। তারপর কথাবার্তায় শম্ভূ সরকার তাঁহার জীবনের সমস্ত কাহিনী আদ্যোপান্ত বলিয়া গেলেন, শেষে কহিলেন, "শেষ-জীবনে যদি কোথাও আশ্রয় পাই, তাহ'লে দিন ক'টা একরকমে কাটিয়ে দিই।"

বড়বাবুর দয়া হইল। কহিলেন, "এখানে থাকতে পারেন, আপত্তি নেই। খোকাকে একটু দেখবেন শুনবেন। দশ টাকা মাইনে, খোরাক পোষাক—পোষাবে ?"

শম্ভূ সরকার উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিয়া উঠিলেন, "খুব ! খুব !! পরম দয়াল আপনি" ইত্যাদি।

(৩)

প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঘণ্টাদুই করিয়া পড়াইবার বাঁধা সময় ছিল। কিন্তু ছাত্র ও শিক্ষক কেহই এই নিয়মের ধার ধারিতেন না। দিনের বারো ঘণ্টার মধ্যে অর্ধেক সময় রতন শম্ভূ সরকারের ঘরেই কাটাইত, অবশ্য পড়া-শুনার কাজে নহে। সুদীর্ঘ জীবনকালের মধ্যে যত প্রকার অদ্ভুত পশুপক্ষীর সহিত শম্ভূ সরকারের পরিচয় হইয়াছিল, তাহাদের সকলের কাহিনী সবিস্তারে তিনি তাঁহার এই শিশু ছাত্রটির নিকট বর্ণনা করিতেন, রতন খেলা ভুলিয়া পরম কৌতূহলের সহিত তাহা শুনিয়া যাইত। রতনের খেলার সাথীর সংখ্যাও কমিয়া আসিতেছিল ; মাষ্টার মহাশয়কে ছাড়িয়া অন্যত্র খেলিতে যাইতে তাহার মন সরিত না। অগত্যা সরকার মহাশয় নিজেই তাহার সহিত খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। ষাট এবং ছয় এই উভয় সংখ্যার মধ্যে যে ব্যবধান আছে, সরকার মহাশয়ের আচরণে তাহা আর মনে করিবার কোনও উপায় রহিল না। তিনি কখনও ঘোড়া হইয়া তাঁহার শিশু ছাত্রটিকে পিঠে করিয়া ছুটিতেন, কখনও তাহার কাঠের গাড়ীখানিতে দড়ি বাঁধিয়া কাছারি বাড়ীর আঙ্গিনায় অসংখ্য কৌতূহলী দৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া পরম নির্বিকার চিত্তে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। এইরূপে বৎসরখানেক কাটিয়া গেল।

ইতিমধ্যে শম্ভূ সরকার দেশে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, পত্রের উত্তরে জানিলেন যে, বাড়ীর আঙ্গিনায় জঙ্গল জমিয়াছে এবং বাহিরের পাঠশালা ঘরের জীর্ণ দশা ; আগামী বর্ষায় যদি টিঁকিয়া যায়, তবে বহু ভাগ্য বলিতে হইবে। সংবাদ শুনিয়া তাঁহার কিছুমাত্র চাঞ্চল্য দেখা গেল না, তিনি তাঁহার শিশু ছাত্রটির অধ্যাপনায় পূর্বের মতই মগ্ন হইয়া রহিলেন।

রতন সময়ে বাড়ী আসে না, অধিকাংশ সময় মাষ্টারের ঘরেই কাটাইয়া দেয় ; ইহা কিন্তু রতনের মাতার একান্ত অপ্রীতিকর ছিল, এক-আধবার

আপত্তির আভাস কর্তাকেও দিয়াছিলেন কিন্তু কর্তা তাঁহার স্বাভাবিক ঔদাস্য বশতঃ সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। এদিকে ছেলে পর হইয়া যাইতেছে এই আশঙ্কা মাতাকে ক্রমেই অধীর করিয়া তুলিতেছিল। সেদিন গৃহিণী সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, কথাটির একেবারে শেষ মীমাংসা করিয়া ফেলিবেন। কর্ত্তার আহার শেষ হইতেই তিনি কহিলেন, "ছেলেকে তো মাষ্টারের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত ব'সে আছ! পড়া-শুনা করে কি না তার খবরটা কি নিয়ে থাক? না মাসমাইনে গুণে দিয়েই খালাস!"

কর্ত্তা কহিলেন, "মাষ্টার ভাল, আমি বরাবর দেখছি।"

অনেক জিনিষ পুরুষলোক দেখিতে পায় না কিন্তু স্ত্রীলোকের চক্ষে পড়ে, এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়া গৃহিণী কহিলেন, "আচ্ছা একবার পরখ করেই দেখনা, ছেলে তো তোমারই।"

রতনের ডাক পড়িল এবং অনতিবিলম্বে পরীক্ষা আরম্ভ হইয়া গেল; রতন অনায়াসে ধারাপাত ও বোধোদয়ের আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিয়া গেল। কর্ত্তা সহাস্যে কহিলেন, "দেখছ!"

পুত্রের কৃতিত্বে মায়েরও যে আনন্দ না হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু তখন উল্লাস প্রকাশ করাটা সমীচীন মনে করিলেন না এবং তখনকার মতন নীরব হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যায় গৃহিণী আবার কথা পাড়িলেন কিন্তু অন্য ভাবে। সেদিন রতনের সমবয়সী ও বাড়ীর যদু ইংরাজী বলিতেছিল, রতন কিছু বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া ছিল, সে কথাটি কর্ত্তাকে জানাইয়া গৃহিণী কহিলেন, "দেখ একটু ইংরিজী শেখা তো খোকার দরকার। বড় হ'লে সাহেব-সুবোর সঙ্গে কথা কইতে হবে তো!"

কর্ত্তার কাছে কথাটি মূল্যবান মনে হইল। পাশ না দিক, বড়মানুষের ছেলের ইংরাজী না শিখলে চলে না এ ধারণা তাঁহারও ছিল। রতনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা, তুমি ইংরেজী পড় না?"

রতন কহিল, "না বাবা। মাষ্টার মশাই তো পড়ান নি।"

কর্ত্তা কহিলেন না, গৃহিণী কহিলেন, "মাষ্টার মশাই না পারেন তুমি খোকার ইংরিজী পড়াবার জন্যে নতুন মাষ্টার ঠিক কর। ছেলেকে আমার মূর্খ ক'রে রাইতে পারবে না।"

রতন নীরবে মায়ের কথা শুনিল, তাহার পর মনে মনে ইংরাজী ভাষার মুণ্ডপাত করিতে করিতে চলিয়া গেল।

(৪)

পরদিন প্রাতে যখন রতন গত রাত্রির কাহিনী সবিস্তারে সরকার মহাশয়ের নিকট বর্ণনা শেষ করিল, শম্ভু সরকারের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

তিনি অতি মৃদুস্বরে আপন মনে কহিলেন, "মায়া ! মায়া ! পরের ছেলে !"

রতন কথা কহিল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শম্ভু সরকার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে রতন, তুই ঠিক শুনেছিস গিন্নি-মা নতুন মাষ্টার আনতে চেয়েছেন ?"

"হ্যাঁ, মাষ্টার মশাই। আমি কিন্তু পড়ব না, আমি মামাবাড়ী চলে' যাব।" রতন ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল।

সরকার মহাশয় রতনের মাথায় হাত বুলাইয়া অনেক চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "পড়বি বইকি বাবা, তা নইলে কি বিদ্যে হয় ?" পরক্ষণেই আবার প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা গিন্নি-মা আর কি বললেন ? আর বাঙ্গলা পড়তে হবে না ? কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী এসব তো পড়াই হয়নি, তুই বললিনে কেন ?"

"আমি বলিনি মাষ্টার মশাই।" রতন অসঙ্কোচে কহিল।

"তাই বল্, তা নইলে কি আর গিন্নি-মা ইংরিজী পড়তে বলেন ? আচ্ছা আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলব।"

গিন্নি-মাকে একটু বুঝাইয়া বলিলেই তিনি বুঝিয়া যাইবেন এই ভরসায় শম্ভু সরকার একটু স্বস্তি লাভ করিলেন ; তারপর কেবল বোধোদয়খানা খুলিয়া উদ্ভিদের সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় কর্ত্তা ডাকিলেন, "সরকার মশাই !" আহ্বান শুনিয়া আপনার অজ্ঞাতেই শম্ভু সরকার কাঁপিয়া উঠিলেন।

কর্ত্তা আসন লইয়া দুই-একটি সাধারণ কথার পর বলিলেন, "খোকা তো এদিকে মন্দ শেখেনি দেখলাম। কিন্তু জানেন তো ইংরেজী শেখাও একটু দরকার। এখন থেকেই অল্প-স্বল্প কিছু পড়াশুনা করলে সহজেই কতকটা শিখে ফেলবে। আপনি কি বলেন ?"

কর্ত্তা ঘুরাইয়া বলিলেও শম্ভু সরকার ইঙ্গিতটা স্পষ্ট বুঝিলেন, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন, "আজ্ঞে সে অতি যথার্থ কথা, রাজভাষা শেখাই তো উচিত।"

"আপনি তাহ'লে একটু দেখবেন ও গ্রামের ইস্কুলের মাষ্টারেরা কেউ যদি—" বলিয়াই কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বুঝি ইংরেজী জানেন না ?"

কোন সময় ইংরেজীর অক্ষর পরিচয় শম্ভু সরকারের হইয়াছিল, কিন্তু সেটাকে ইংরেজী জানা বলা যায় কি না তাহা তিনি তাড়াতাড়ি স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না, কহিলেন, "আজ্ঞে বাবু আমরা সেকেলে মানুষ।"

কথাটা শেষ করিবার অবকাশ না দিয়া কর্ত্তা উঠিয়া কহিলেন, "আচ্ছা আপনিও দেখবেন, আমিও খোঁজ নিচ্ছি।"

কর্ত্তা বাহির হইয়া গেলে সরকার মহাশয় রতনকে ছুটি দিলেন। রতন

বোধোদয়ের পাতা হইতে মুখ না তুলিয়াই অত্যন্ত ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "আর পড়াবেন না মাষ্টার মশাই ?"

সরকার মহাশয় রতনকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "পড়াব বইকি বাবা ! এখন যাও ধারাপাতটা একটু দেখগে, আমি ডাক্‌ব'খন ।"

রতন খিড়কির পুকুরের পৈঠায় ধারাপাত খুলিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল কিন্তু মাষ্টার মহাশয় ডাকিলেন না । বেলা বাড়িলে সে ধারাপাতখানি বন্ধ করিয়া মাষ্টার মহাশয়ের ঘরের দরজার কাছে উঁকি দিয়া দেখিল যে, মাষ্টার মহাশয় চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন । রতন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিল, "এক কড়া পোয়া-গণ্ডা, দুই কড়া আধ গণ্ডা ।"

শম্ভূ সরকার ঘুমান নাই, ডাকিলেন, "আয় রতন !" রতন ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলে সরকার মহাশয় কহিলেন, "আমি একটু তালবাড়ীতে যাচ্ছি রতন, বেলা পড়লে ফিরব । এ বেলা খাব না, বলে দিস্ ।" চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া শম্ভূ সরকার বাহির হইয়া গেলেন ।

তালবাড়ী হইতে শম্ভূ সরকার যখন ফিরিলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে । বড়বাবু বাহিরেই বসিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টার পেলেন সরকার মশাই ?"

শম্ভূ সরকার আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন, "আজ্ঞে না ।"—বলিয়াই হাতের বইখানা চাদরের নীচে লুকাইয়া একেবারে আপনার ঘরে গিয়া ঢুকিলেন ।

বলা বাহুল্য, সরকার মশায় সত্য কথা বলেন নাই । তালবাড়ীর মাইনর স্কুলের সকল মাষ্টারেরই বড়বাড়ীর ছেলেটির উপর লোভ ছিল । শম্ভূ সরকার একজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন কিন্তু বৈকালে তাঁহাকে শেষ কথা না দিয়াই চলিয়া আসিয়াছেন । রতন অপরের কাছে পড়িবে ভাবিতেই তাঁহার মনে হইল যেন জগতের সহিত হৃদয়ের যে যোগসূত্রটি ছিল তাহা একেবারে ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে ।

রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছে । তালবাড়ী হইতে যে ফার্ষ্ট বুকখানি কিনিয়া আনিয়াছিলেন. শম্ভূ সরকার তাহা খুলিয়া নূতন করিয়া ইংরেজী শিখিতে বসিলেন । রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল তথাপি শম্ভূ সরকারের ইংরেজী জ্ঞান কিছুমাত্র অগ্রসর হইল না । অক্ষরগুলি ক্রমাগতই ভুল হইতে লাগিল । বার-বার তন্দ্রা আর ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া শম্ভূ সরকার ক্লান্ত হইয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বহি বন্ধ করিলেন এবং অনতিকাল মধ্যে পরিশ্রান্ত বৃদ্ধ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন ।

প্রভাতে রতন আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে মাষ্টার মহাশয়কে ডাকে নাই । বেলা যখন দশটা তখন হঠাৎ বড়বাবুর খাস

মুন্সির ডাকে শম্ভূ সরকার ধড়ফড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন, "উঃ বড্ড বেলা হয়েছে দেখছি যে !"

মুন্সি মহাশয় কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু অনেকক্ষণ থেকেই আপনাকে ডাকছেন।"

"বাবু ডাকছেন ! দুর্গা শ্রীহরি !" শম্ভূ সরকার তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বাহির হইলেন।

কাছারি-ঘরের বাহিরে চৌকিতে বাবু বসিয়া, তাহার সম্মুখে কে ও ! তালবাড়ীর বিনোদ মাষ্টার ! সরকার মহাশয়ের মুখখানি একেবারে পাংশু হইয়া গেল। বড়বাবু সরকার মহাশয়কে ডাকিয়া কহিলেন, "আপনি এঁকেই বুঝি কাল ব'লে এসেছিলেন ? তা এঁর দ্বারাই চলবে।"

শম্ভূ সরকার বিনোদ মাষ্টারের দিকে একবার চাহিলেন, সে দৃষ্টিতে যে জ্বালা ছিল তাহাতে সত্যযুগ হইলে বিনোদ মাষ্টার ভস্ম হইয়া যাইতেন। বাবু সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া কহিলেন, "আপনি রতনের ইংরেজী একটা বই কিনে এনে দিন আজই, বুঝলেন ?"

শম্ভূ সরকার মাথা নোয়াইয়া 'যে আজ্ঞে' বলিয়াই সোজা নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যায় শম্ভূ সরকার আপনার জীর্ণ তক্তপোষখানার উপর বসিয়া দূরে কাছারির বারান্দায় যেখানে রতন তাহার নূতন মাষ্টারের নিকট হইতে ইংরাজী বর্ণমালার পাঠ লইতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া ছিলেন। রতন বার-বার মুখ মুখ তুলিয়া সরকার মহাশয়ের ঘরের দিকে চাহিতেছিল আর সরকার মহাশয়ের চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল। অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া শেষে কি ভাবিয়া শম্ভূ সরকার উঠিয়া গেলেন।

বড়বাবু বাগানে পায়চারি করিতেছিলেন, শম্ভু সরকার আসিয়া যুক্তকরে কহিলেন, "বাবু আমাকে বিদায় দিন।" আরও দুই-একটি কথাও বলিতে যাইতেছিলেন গলার স্বর সহসা অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল, ভালো করিয়া আওয়াজ বাহির হইল না।

বড়বাবু সহজভাবেই কহিলেন, "যেতে চাইছেন ? কোথায় যাবেন ?"

"যে দিকে দু' চক্ষু যায়, আর ক'টা দিনই বা ? একরকম কেটেই যাবে।" শম্ভূ সরকার কহিলেন।

"তা বেশ। সন্ধ্যার পর কথা হবে।"

শম্ভূ সরকার তখনকার মত ফিরিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রহর-খানেকের সময় সরকার মহাশয়ের ডাক পড়িল। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বিশেষ দুঃখ বোধ করিতেছেন, এই প্রকারের গুটিকয়েক মামুলী কথা বলিয়া দশখানি দশ টাকার নোট শম্ভু সরকারের হাতে দিয়া বড়বাবু কহিলেন, "আপনার পারিশ্রমিক যৎকিঞ্চিত দিলাম।"

নোট কয়খানি হাত পাতিয়া লইতে তাঁহার হাত কাঁপিয়া গেল। কোনক্রমে আত্মসম্বরণ করিয়া নোট কয়খানি ছেঁড়া জামার পকেটে ফেলিয়া শম্ভূ সরকার বাবুকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "কাল ভোরেই বেরোব। একবার রতনকে দেখে যাব।"

বড়বাবু কহিলেন, "সে তো ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণ বুঝি।"

সরকার মহাশয় তাড়াতাড়ি কহিলেন, "ঘুমুচ্ছে? আহা! তবে থাক্। সারাদিন তো বিশ্রাম নেই।"

রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই শম্ভূ সরকার তাঁহার সেই পুরাতন ব্যাগের হাতলে ছেঁড়া গামছা জড়াইয়া ছাতির ডগায় ঝুলাইয়া বাহির হইলেন। পথে উঠিয়া একবার পিছন ফিরিয়া দোতলায় রতনের রুদ্ধ-বাতায়ন শয়নকক্ষের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "মায়া! মায়া! পরের ছেলে!" তাহার পরক্ষণেই দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিলেন। অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘপথে আজ নূতন করিয়া শম্ভূ সরকারের যাত্রা আরম্ভ হইল।

মাসখানেক পর একদিন বড়বাবুর সম্মুখে বসিয়া রতন বিনোদ মাষ্টারের নিকট অধীত বিদ্যার পরীক্ষা দিতেছিল সেই সময় পিয়ন রতনের এক পার্শেল আনিয়া উপস্থিত করিল। বড়বাবু কৌতূহলী হইয়া পার্শেল খুলিলেন। মধ্যে প্রায় একশ' টাকা দামের একটি সোনার ঘড়ি আর এক টুক্‌রা কাগজে লেখা 'বাবা রতনের জন্য।' প্রেরক শ্রীশম্ভূনাথ সরকার। কোন ঠিকানা নাই।

অনেকক্ষণ ঘড়িটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া রতনের হাতে ঘড়িটি দিয়া বড়বাবু নীরবে বসিয়া রহিলেন। হঠাৎ তাঁহার চোখে ছবির মত ভাসিয়া উঠিল একদিনের কথা—বুড়া শম্ভূ সরকার বাহিরের আঙ্গিনায় হামাগুড়ি দিয়া ঘোড়া হইয়া ছুটিতেছেন, আর রতন তাঁহার পিঠে সওয়ার হইয়া বসিয়া আছে।

বছিরের দরগা

এর একটু ইতিহাস আছে।

বিশু জন্মিয়াছিল বাগ্দীর ঘরে। কিন্তু তার মা ও পাড়া-প্রতিবেশী সকলেরই নিশ্চিত ধারণা ছিল, যে, সে ছিল পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ, কোন পাপে বাগ্দীর ঘরে আসিয়া এবারে জন্ম লইয়াছে। এই ধারণার কারণও ছিল, পাঁচ বৎসরে পড়িয়াই বিশু একদিন বলিল, "আমি মাছ খাব না।"

মা প্রথমে প্রহারের চোটে তাকে সংকল্পচ্যুত করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু বিশু টলিল না। অগত্যা মাকেও এই জেদী ছেলের জন্য নিজের পরমপ্রিয় খাদ্য মৎস্য ত্যাগ করিতে হইল। আরও একটু বড় হইলে বিশু জেলেবাড়ী হইতে একটা ছোট ঢোলক জোগাড় করিয়া সেটাকে গলায় ঝুলাইয়া পাড়ায় পাড়ায় "জয় রাধা গোবিন্দ" "ভজ গৌরাঙ্গ" গাহিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল; মা বিরক্ত হইল; বিশুর সমবয়সী কেষ্ট ঘোষাল-বাড়ী গরু চরাইয়া মাসে নগদ এক টাকা উপার্জন করে, অথচ তার ছেলে মায়ের দুঃখ বোঝে না। কিন্তু কিছু বলিবার উপায় নাই! ভগবানের নাম কীর্ত্তন—তাহাতে বাধা দিলে মহাপাপ! কাজেই নিরুপদ্রবে বালক বিশ্বনাথ প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় বাড়ী বাড়ী হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ইহার পর বিশু যে কাজে হাত দিল, তাহাতে সে পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিল এই সত্য নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়া গেল। এমন কি পাঠশালার পণ্ডিত তাবণ চক্রবর্তী পর্য্যন্ত বলিয়া গেলেন, "দেখো বাগ্দী-বৌ, এই জলজীয়ন্ত বামুনের কথা। তোমার ছেলে ম'রে আবার বামুন হবে।"

মা কাণে হাত দিয়া কহিল, "ষাট্ ষাট্।"

ব্যাপার এই। বিশু রথ দেখিতে গিয়া ভিনগাঁয়ে গিয়া এক নূতন বিষ্ণুমন্দির নির্মাণের কাজ দেখিয়া আসিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে মাথায় তাহার খেয়াল গজাইয়া উঠিল। বাড়ী আসিয়া মাকে কহিল, "আমি হরি-মন্দির গড়ব তুই পয়সা দে।" মন্দির গড়িতে কতটা পয়সার দরকার তাহা হাতে গণিয়া ও কুড়ি হিসাবে বিশুকে বুঝাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বিরক্ত হইয়া বিশুর মা বিড়াল তাড়াইবার লাঠি দিয়া বিশুর পিঠে দু'ঘা বসাইয়া দিল।

ইহাতেও বিশুর সংকল্প টলিল না। ভোর না হইতেই সে একটা ঝাঁকা মাথায় করিয়া গ্রামের বাহিরের ভাঙ্গা শিবমন্দির হইতে সুরকী সংগ্রহ আরম্ভ করিল। দেব-স্থানের মাটি পায়ে লাগিবে বলিয়া মা প্রথমে তাহাকে যথেষ্ঠ ভর্ৎসনা করিল; অবশেষে প্রহার। বিশু চড়-চাপড় বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করিয়া পুনরায় স্বকার্য্যে মন দিল। এইবার বিশুর মা চক্রবর্তী মহাশয়ের শরণ লইল; তিনি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়া দিলেন, "খুব সাবধান বাগ্দী-বৌ, ভগবান ওকে দিয়ে তাঁর কাজ করাচ্ছেন। বাগড়া দিসনে।" ইহার পর বিশুর মা আর পুত্রের সংকল্পে বাধা দিল না।

(২)

সুরকী আসিল। কিন্তু বিশুর কল্পনা যতখানি উঁচু ছিল, সুরকীর দেওয়াল তত উঁচু হইয়া উঠিল না! মাটি, কাদা, তুষ ও সুরকীর অপূর্ব্ব

মিশ্রণে দেয়াল উঠিল দুই হাত। বিশুর মুখখানি ছোট হইয়া গেল। কলসগাঁয়ের মন্দিরের মত হইল না তো! রাত্রে বিশু মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "অমনি একটা মন্দির গ'ড়ে দে মা।"

মা পুত্রকে ভরসা দিয়া বলিল, "ছোট জাতের ছোট মন্দিরই ভালোরে বিশু। ডাকলে ঠাকুর এখানে আসবেন।"

পরদিন বিশু প্রাণপণে ঠাকুরকে তাহার ঢোলকের বাজনার সঙ্গে আহ্বান আরম্ভ করিল। ঠাকুর আসিলেন কিনা জানি না কিন্তু পাড়ার মাতব্বর বৃন্দাবন ঠাকুর আসিয়া জানাইয়া গেলেন যে, দিন-রাত ঢোলক বাজাইলে তিনি বিশুর কাণ ধরিয়া চৌকীদারের নিকট লইয়া যাইবেন। চৌকীদারের ভয়ে মা বিশুর ঢোলক কাড়িয়া লইল। অগত্যা বিশু ঝোথা হইতে ছোট একটি আঙ্গুরের বাক্স কুড়াইয়া আনিয়া তাহাতেই তাল দিয়া ঢোলকের কাজ চালাইতে লাগিল আর মনে মনে কেবলই ঠাকুরকে তাহার ছোট মন্দিরটিতে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিল।

সেদিন পূর্ণিমা। বৃন্দাবন ঠাকুরের বাড়িতে রাস-মহোৎসব উপলক্ষে ঠাকুর আসিয়াছেন, সমস্ত দিন বিশু গান গাহিল, "একবার এস এস হে'" সন্ধ্যাকালে ঘণ্টাখানেক ঠাকুরবাড়ীর পুরোহিতের ভঙ্গীতে বসিয়া ঠাকুরকে তার ছোট মন্দিরে আনিবার জন্য অনেক মিনতি করিয়া বলিয়া দিল এবং রাত্রে যে ঠাকুর আসিবেন তাহাতে আর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় রাখিতে পারিল না। কারণ পূর্ণিমার রাত্রেই ঠাকুর আসেন, এ কথাটি তাকে বলিয়াছিল তার মা।

মা বাতাসী তখন নাসিকাধ্বনি সহকারে ঘুমাইতেছিল, বিশু ঠাকুরের আগমনের প্রতীক্ষায় ঘুমাইতে পারে নাই। উৎসববাড়ীতে যখন কীর্তনের প্রারম্ভিক মৃদঙ্গধ্বনি উঠিল, তখন বিশু অতি সন্তর্পণে উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। পদশব্দ শুনিয়া পাছে ঠাকুর পলায়ন করেন এই ভয়ে হামাগুড়ি দিয়া তাহার মন্দিরে উঁকি দিয়া দেখিল—মন্দির শূন্য। নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়া সে শয্যা লইল এবং সকালে মাকে জানাইল যে, ছোট মন্দিরে ঠাকুর আসিতে পারেন না, কাজেই তাহাকে বড় মন্দির গড়িতেই হইবে। বড় মন্দির গড়িতে হইলে যে পদার্থটির সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাহাও বিশু শুনিল এবং সেই বস্তুটি সংগ্রহ করিবার জন্য পরদিন বারো বছরের ছেলে বিশু মাসিক তিন টাকা মাহিনায় কলসগাঁয়ের বাবুর বাড়ীর বাগানের কাজে ভর্তি হইয়া গেল। কিন্তু এক ক্রোশ দূরে থাকিয়াও বিশু তাহার মন্দিরের কথা ভুলিল না। প্রতি শনিবার ছিল তাহার ছুটি—সেদিন সে আসিয়া সে মন্দিরে দীপমালা দিয়া পাঁচ পয়সার বাতাসার লোভ দেখাইয়া পাড়ার বাগ্দী ছেলেগুলিকে জড় করিত। মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বিচিত্র বাদ্যধ্বনি ও নামগানের শব্দে পাড়ার লোকের কাহারো চোখে নিদ্রা আসিত না।

(৩)

বছর তিনেক এইভাবে কাটিল। বিশ্বনাথের মনিব বৃদ্ধ বয়সে বৃন্দাবন-বাস করিতে গ্রাম ত্যাগ করিলেন, বিশুও বিদায় লইল। বিশুর সংকল্পের কথা শুনিয়া তাহার মাহিনা চুকাইয়া আরো একটা মোটা রকমের দান তাহার সহিত যোগ করিয়া বাবু তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। বিশু মন্দির-নির্মাণের পুঁজি লইয়া গ্রামে ফিরিল।

অনতিকাল মধ্যে ইঁট-সুরকীতে বিশুর প্রাঙ্গণ ভরিয়া গেল। গ্রামের লোকে প্রথমে এতটুকু সন্দেহ করে নাই, কিন্তু যখন বিশুর মা'র মুখে আসল উদ্দেশ্যটি প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন গ্রামের ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। বাগ্দীর ছেলে মন্দির গড়িতেছে! শাস্ত্র-ধর্ম সব রসাতলে গেল! দুই একজন বিশুর মাকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। বাতাসী ব্রহ্মশাপের ভয়ে বিবর্ণ মুখে গৃহে ফিরিয়া বিশুর কাছে কাঁদিয়া পড়িল। বিশু কহিল, "কিছু হবে না। আমি কালই পণ্ডিত মহাশয়ের পাঁতি নিয়ে আসব।" পণ্ডিত মহাশয় কলস গ্রামের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, সে অঞ্চলে তাঁহার বিধানই প্রামাণ্য ছিল।

কিন্তু বিশুকে আর পাঁতি আনিতে হইল না, সেই রাত্রেই বাতাসী কলেরার আক্রমণে ও ব্রহ্মশাপের ভয়ে ইহলোক ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। ভদ্র-সজ্জনেরা কহিলেন—"শাস্ত্র না মানলে এমনি হয়। ঘোর কলি এখনও হয়নি তো।"

মা'র মৃত্যুর পর বিশু দিন-দুই খুব কাহিল রহিল। তারপর দ্বিগুণ উৎসাহে তার দলবল লইয়া মন্দিরের কাজে লাগিয়া গেল। বৃন্দাবনঠাকুর ছিলেন গ্রামের মাতব্বর, তার উপর বিশুর বাড়ী ছিল তাঁরই বাড়ীর পাশে; বিশুর কীর্তন, সঙ্গীদের হরিধ্বনি, মৃদঙ্গ-করতালের শব্দ তাঁহারই নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইত বেশী। ইহার পর বিশুর মন্দির উঠিলে তাঁহার বিগ্রহের প্রণামী কমিয়া যাইবারও ভয় ছিল, কাজেই এই বাগ্দী ছোঁড়ার উপর তিনি জাতক্রোধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বিশু তখন বড় হইয়াছে—কাহারও ভ্রূকুটি সে গ্রাহ্য করিল না।

(৪)

মন্দির যখন অর্দ্ধেক দূর উঠিয়াছে, তখন এক ঘটনায় গ্রাম তোলপাড় হইয়া উঠিল। রহিম মিস্ত্রীর স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর এক কন্যা ছিল। তার বিবাহ হইয়াছিল দূর গ্রামের এক কৃষকের সঙ্গে। সে প্রায় তিন বৎসর পূর্বেকার কথা। এক মাস স্বামীর ঘর করিবার পর সে তাহাকে 'তালাক' দিয়া বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিল। রহিম তাহাতে মোটেই দুঃখিত হইল

না, তাহার মিস্ত্রির কাজে একজন আপনার লোক জোগানদারের প্রয়োজন ছিল। আমিনা রহিমের সহিত বিশ্বনাথের মন্দিরের কাজ করিত। হঠাৎ কেমন করিয়া এই মেয়েটিকে বিশুর বড় ভালো লাগিয়া গেল। আমিনাও এই মিষ্টভাষী সুঠাম বাগ্দী যুবাকে ভালো না বাসিয়া থাকিতে পারিল না। তার কৈশোরে তখন যৌবনের রং ধরিয়াছে। মনে ক্ষুধাও ছিল বিস্তর। কোন কিছু বিচার না করিয়াই এই নবীন প্রণয়ী-যুগল প্রেমের দান-প্রতিদান আরম্ভ করিল। একজন বাগ্দী আর একজন সেখ, এ বোধ উভয়ের কাহারও ছিল না। কিন্তু বাগ্দী-পাড়ার যে দুই-একটি রমণীর এ সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য ছিল, তারা এই ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করিল এবং সেখের বেটীর সহিত বিশুর এই অসঙ্গত ঘনিষ্ঠতায় ধিক্কার দিল।

বাহিরের লোক কিছুই জানিত না, কাজেই কিশোর-কিশোরীর এই প্রেম-লীলা অব্যাহত চলিতে লাগিল।

একদিন অপরাহ্নে বাবুর বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বিশুর ডাক পড়িল। বিশু আসিল ; গ্রামের বাবুরা চণ্ডীমণ্ডপ দখল করিয়া বসিয়া ছিলেন ; পাঁচ সাতটা কলিকায় যুগপৎ তামাক পুড়িতেছিল। গিদ্দা বালিশ হেলান দিয়া বৃন্দা-ঠাকুর, লালন চক্রবর্তী প্রভৃতি মাতব্বরেরা বসিয়া ছিলেন ; মণ্ডপের প্রাঙ্গণে যুক্তকরে আমিনার মাতা, তার পশ্চাতে জনকয়েক তারই প্রতিবেশী, আর এক কোণে দাঁড়াইয়া আমিনা মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতেছিল। এই বৈঠক আর সেই সঙ্গে আমিনার মাকে দেখিয়া বিশুর বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল! সে আসিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাঠাকুর কহিলেন- "কেষ্টঠাকুর এসেছেন! বেটা ছোট জাতের আস্পর্দ্ধা দ্যাখো না। মন্দির গড়বে না! বেটার পেট-পোরা সয়তানী মৎলব!"

"সেখের বেটী, তোর নালিশ?"

আমিনার মা দশ মিনিট ধরিয়া নানা কথা কহিয়া গেল। বিশু তার মেয়ের ইজ্জৎ নষ্ট করিয়াছে, সে বিচার চায়!

বিশুর মাথা ঘুরিতেছিল, আমিনা শেষে তাহার সহিত প্রতারণা করিয়াছে, এই চিন্তা তার সমস্ত মনকে বিষাক্ত করিয়া দিয়াছিল, বিশু কথা কহিল না। আমিনা এতটা মনে করে নাই। মা'র মনে অনেক দিন হইতেই সন্দেহ ছিল। কিন্তু সে কিছু দেখিয়াও দেখে নাই। কাল সন্ধ্যায় যখন কাণা-ঘুষায় কথাটি শুনিয়া বৃন্দাঠাকুর তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তখন সে তার সন্দেহের কথা তাঁকে জানাইল। তারপর তাঁহারই পরামর্শ মত আমিনাকে প্রশ্ন করিয়া সকল সংবাদ জানিয়া লইল। আমিনা এতখানি ঘটিবে ভাবে নাই, অকপটে মা'র কাছে সমস্তই বলিয়াছিল। তারপর আজ দ্বিপ্রহরে যখন স্বয়ং বৃন্দাঠাকুর তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমিনার মা'র সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া গেলেন- তখন অন্তরাল হইতে শুনিয়া ভয়ে তার

সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া গেল। বাবুর বাড়ীতে আসিতেও সে আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু মা তাকে প্রহার করিয়া লইয়া আসিয়াছে। সে আমিনাকে হাজির করিবার 'জবান' দিয়াছে, তা' ছাড়া বৃন্দাঠাকুরের দেওয়া অগ্রিম দশ টাকার নোট তখনও অঞ্চলে বাঁধা ছিল, নেমকহারামী সে কি করিয়া করিবে ?

মা'র অভিযোগ শেষ হইলে বিশু তীব্র অথচ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আমিনার দিকে চাহিল, তখন সে আরো বেশী করিয়া কাঁদিতে লাগিল। চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বিশুকে জবাবদিহি করিবার আদেশ হইল, বিশু তবুও কথা কহিল না। তখন ছোটলোকের দুষ্কার্য্যের জন্য যে শাস্তির বিধান আছে, বিশুর প্রতি তাহাই প্রযুক্ত হইল। লালন চক্রবর্তীর নির্দেশ মত তাঁহার পাইক ফেকু সর্দার বিশুর কাণ ধরিয়া সমস্ত উঠান ঘুরাইতে লাগিল, বিশু আপত্তি করিল না। কিন্তু আমিনা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একেবারে ফেকু সর্দারের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল, "মামুজী, মাপ কর! মাপ!"

চণ্ডীমণ্ডপ শুদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিল।

কর্ণমর্দন-পর্ব শেষ হইলে বৃন্দাঠাকুর কহিলেন, "তা যেন হলো! তারপর এ মেয়েকে বিয়ে করবে কে ? কি বল চৌধুরী, সেখের বেটী যে ইজ্জৎ হানির নালিশ করেছে, তার কি করবে ?"

চৌধুরী চুপি চুপি কহিলেন, "দু'-দশ টাকা দিয়ে বিশে বিদেয় ক'রে দিক!"

বৃন্দাঠাকুর কহিলেন, "আরে বল কি, জাত-মারা কাণ্ড! দু'-দশ টাকায় জাত ফিরবে ?" তারপর আমিনার মাতাকে কহিলেন, "কি গো সেখের বেটী, দু'-দশ টাকা খেসারত নেবে ?"

পূর্ব শিক্ষামত আমিনার মা কাঁদিয়া কহিল, "টাকায় কি ইজ্জৎ ফিরবে বাবু ? আমার মেয়ে নিয়ে কে ঘর করবে ? বাগ্দীর পো আমার বেটীকে 'নিকা' করুক!"

এত বড় সৎযুক্তিটা এতক্ষণ সমাজপতিদের মাথার খেলে নাই দেখিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইলেন। বৃন্দাঠাকুর কহিলেন, "আমরা যখন আছি গাঁয়ের মাথা, তখন বিচার করতেই হবে,—কি বল চৌধুরী ? সেখের বেটী যা বলে।"

আমিনার মাতার পশ্চাৎ হইতে গুটি-কয়েক কণ্ঠ সমস্বরে কহিল, "হাঁ বাবুজী, ঠিক হবে বিচার!"

তখন চণ্ডীমণ্ডপ হইতে আদেশ জারি হইল বিশুকে কলেমা পড়িয়া আমিনাকে বিবাহ করিতে হইবে।

কলেমা পড়িবার কথা শুনিয়া বিশু কাঁপিয়া উঠিল। সমস্ত পৃথিবীটা তার চোখের সম্মুখ হইতে মুহূর্ত্তে অপসৃত হইয়া গেল। বিশু সংজ্ঞা

হারাইল। কিন্তু বাবুদের পঞ্চায়েতের বিচারের নড়চড় হইবার যো নাই। অচেতন বিশুকে লইয়া যাইবার হুকুম পাইয়া আমিনার মা'র প্রতিবেশীরা "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি তুলিল। চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বুন্দাঠাকুর কহিলেন, "যা বেটারা নিয়ে যা, এখানে আর গোল করিস নে।"

বিশুর চেতনা হইয়াছিল অনেক পূর্ব্বেই; কিন্তু আপনার অবস্থা সম্পূর্ণ বুঝিবার মত জ্ঞান হইল এক প্রহর রাত্রে। দেখিল যে, আমিনার মাতার কুটীরে সে বসিয়া আছে, তার পাশে বসিয়া আমিনা তাকে পাখার বাতাস করিতেছে। মাথার উপর একটা ভারী পদার্থের অস্তিত্ব সে বোধ করিতেছিল—তুলিয়া দেখিল সেটা একটা টুপী। মুহূর্ত্তের মধ্যে টুপীটা ফেলিয়া দারুণ অন্তর্দ্দাহের আবেগে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কোন দিকে না চাহিয়া একেবারে সোজা চলিয়া গেল।

(৫)

তারপর ?

পরের কথা অতি অল্প। সমস্ত রাত্রি পাড়ার লোক শুনিল, বিশু তারস্বরে সুর করিয়া ডাকিতেছে "জয় রাধে গোবিন্দ", তার সমস্ত দেহ-মন যেন এই সুরের রূপ ধরিয়া অপ্রত্যক্ষ দেবলোকে কোন্ অভীষ্ট দেবের সন্ধান করিতেছিল! সুরের বিরাম নাই। রাত্রি তিন প্রহর হইয়া গেল—গান থামিল না। ভোরের সময় একটা ভীষণ শব্দ হইল, সেই সঙ্গে গানের সুর থামিল। পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিল।

নিজের হাতে শাবল দিয়া খুঁড়িয়া মন্দিরের দেওয়াল ফেলিয়া তাহারই নীচে বিশু আপনার সমাধি রচনা করিয়াছে। বাহির হইতে দেখা যাইতেছিল শুধু তার রক্তাক্ত সুদীর্ঘ কেশর গুচ্ছ।

গ্রামের ভদ্রলোকেরা আসিয়া ব্যবস্থা দিলেন, ভাঙ্গা দেয়ালের উপর মাটি চাপা দিয়া বিশুর কবর দেওয়া হোক। ওই মাটীর ঢিবিটা তাই!

মসজিদে বিশুর নাম হইয়াছিল বছির, তাই ইহার নাম হইয়াছে 'বছিরের দরগা'।

আমিনা ?

এই ঘটনার পরদিন বিশুর কবরের উপর শাবল দিয়া আপনার মাথা ভাঙ্গিয়া সেও মরিয়াছে। সে নাকি মৃত্যুর পূর্ব্বে পাগল হইয়া গিয়াছিল।

গিরিবালার জীবন-পঞ্জী

গিরিবালাকে জানিতাম। গ্রামের নদীটির বাঁকের মুখে বেত-ঝোপের ছায়ার অন্ধকার আশ্রয় করিয়া ছুটির সময় যখন সন্ধ্যাকালে বোয়াল মাছের সন্ধানে ছিপ ফেলিয়া বসিতাম, তখন সে ঘাটে প্রদীপ ভাসাইতে আসিত। একখানি গোল মুখ, টীকল নাক, তাহাতে একটি ছোট নোলক—নিতাই জেলের আট বছরের মেয়ে—নাম গিরিবালা, প্রতি সন্ধ্যায় সে নদীর স্রোতে ভাগ্যের প্রদীপ ভাসাইয়া মাটির কলসীতে জল ভরিয়া মৃদুস্বরে 'বন্দ মাতা সুরধনী' গাহিতে গাহিতে ঘরে ফিরিয়া যায়;—গিরিবালার বাল্য-জীবনের এই বৈচিত্র্যবিহীন ইতিহাসটুকুই আমাব জানা ছিল।

ইহার পর যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। দশ বৎসর যখন বয়স—তখন গিরিবালার বিবাহ হইল এবং সেই বৎসরেই পিতা নিতাই ও স্বামী সদানন্দ পদ্মায় মাছ ধরিতে গিয়া আর ফিরিল না। মায়ের সঙ্গে গিরিবালাও কাঁদিল। তাহার পর নিতাই মাঝির জাল শুকাইবার চালাখানিতে ঢেঁকি পাতিয়া মাতা ও পুত্রী পাড়ার লোকের ধান ভানিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

(২)

বৎসর চার-পাঁচ পর একদিন রায়বাবুদের আঙ্গিনায় আছড়াইয়া পড়িয়া গিরিবালার মাতা কাঁদিয়া জানাইল যে, আজ একমাস হইতে রাত্রিতে তাহার ঘুম হয় নাই। সমস্ত রাত্রি তাহার বাড়ীর চারিপাশে লোকের পায়ের শব্দ শোনা যায়, ভয়ে তাহার গা ছম্-ছম্ করিতে থাকে। তিনপুরুষ আগে রায়বাবুরা ছিলেন গ্রামের জমিদার; জমিদারী এখন বাস্তুভিটার সাড়ে সাত বিঘা জমিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। দেউড়ী এখনও আছে কিন্তু দারোয়ান নাই। তথাপি এখনও বদন রায় মহাশয়কে অনেক অভিযোগ শুনিতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বেও বিচার করিয়া জরিমানা ও নজর বাবদ কিছু প্রাপ্তি ছিল, কিন্তু সম্প্রতি ফজল মিঞা বাঁশচিটা ইউনিয়ানের প্রেসিডেণ্ট হওয়াতে প্রাপ্তির পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কাজেই এখন বিচার না করিয়া রায়বাবু শুধু পরামর্শ দিয়া থাকেন। দারোগাকে সকল কথা জানাইবার উপদেশ দিয়া তিনি বুড়ি মানদাকে বিদায় করিয়া দিলেন, দরকার হইলে তাহার পক্ষ হইয়া দারোগাকে দুই কথা বলিবেন, এ ভরসা দিতেও ত্রুটি করিলেন না।

এইবার মানদা বিপদে পড়িয়া গেল। দারোগা হাকিম। তাঁহার সহিত কি করিয়া কথা বলা যায়? অনেক ভাবিয়া একদিন সে এক কাঠা সরু ধানের

চিঁড়া লইয়া গ্রামের চৌকীদার নছর সেখের শরণ লইল। উপঢৌকন পাইয়া খুসী হইয়া নছর সেখ দিনকয়েক রোঁদ হইতে ফিরিবার পথে নিতাই মাঝির বাড়ীর নিকটে হাঁক দিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহাতেও গিরিবালার মাতার আস্বস্তির কারণ ঘুচিল না। অবশেষে বিনা পারিশ্রমিকে নছর সেখের ধান ভানিয়া ও গাছের মর্ত্তমান কলা উপহার দিয়া বুড়ি একদিন তাহাকে দারোগার নিকট লইয়া যাইতে নছর সেখকে রাজী করিল।

সুযোগও ঘটিয়া গেল। পাশের গ্রামেই দারোগা সাহেব তদন্তে আসিয়াছিলেন। নছর সেখকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কালীগাইয়ের এক ঘটি দুধ হাতে বুড়ি গিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সম্মুখে আসামী ও ফরিয়াদী পক্ষের অনেকগুলি সাক্ষী যুক্তকরে দণ্ডায়মান, তাহাদের সম্মুখে সদ্যগঠিত ছোট বংশমঞ্চে দারোগা সাহেব বসিয়া, মঞ্চের সম্মুখ দিককার একটা খুঁটিতে বাঁধা একজোড়া মুরগী, পিছনের খুঁটিতে বিরাট কৃষ্ণকায় এক খাসী বাঁধা। গম্ভীর মুখে দারোগা সাহেব লিখিতেছিলেন। মুরগী ও খাসীর সহিত এক ঘটি দুধের তুলনা করিয়া বুড়ী মনে মনে শঙ্কিত হইল; পরক্ষণেই নছর সেখের ইঙ্গিত মাত্রে দারোগা সাহেবের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপাতের সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী আপনার বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিল।

দারোগা সাহেব অর্দ্ধেক শুনিয়াই কহিলেন, 'মেয়ের বয়স কত?"

"এই ষোল বছর হুজুর। সোমত্ত—"

"এখন যাও। সরেজমিন তদন্ত করব। হ্যাঁ, তারপর আসামীর দুই নম্বর সাক্ষী বাঁটু দপ্তরী।"

বাঁটু দপ্তরী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। নছর বুড়ীকে লইয়া গিয়া কানে কানে কহিল, "সাঁঝে বাড়ী থেকো জেলের বেটী, দারোগা সাহেব যাবেন।"

বুড়ী অকুলে কুল পাইয়া মা মনসার নামে পাঁচ পয়সার বাতাসা মানৎ করিয়া ঘরে ফিরিল। মায়ের মুখে সমস্ত শুনিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে গিরিবালা খানিক কাঁদিল। তাহার পর বেড়ায় টাঙ্গানো সত্যনারায়ণের ছবিখানির সম্মুখে গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া কহিল, "লজ্জা-নিবারণ হরি! লজ্জা নিবারণ কর, ঠাকুর!"

তখন সন্ধ্যা। তুলসী-তলায় প্রদীপ দিয়া গললগ্ন বস্ত্রাঞ্চলে বার-বার মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া গিরিবালা সম্ভবতঃ কোনো প্রার্থনা জানাইতেছিল, এমন সময় দারোগা সাহেব আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলেন। জুতার শব্দে মুখ ফিরাইয়া দারোগাকে দেখিয়া গিরিবালা মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘরের পিছনে অদৃশ্য হইয়া গেল। মানদা রান্নাঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া দাওয়ায় একখানি মাদুর বিছাইয়া দিল। দারোগা সাহেব আসন লইয়া সমস্ত শুনিয়া গিরিবালাকে ডাকিলেন। পরণের ছোট কাপড়খানির চারিদিক সামলাইতে

সামলাইতে সংকুচিতা গিরিবালা আসিয়া দাঁড়াইল। দুই চক্ষুর সমস্ত শক্তিকে একত্র করিয়া সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকেও দারোগা সাহেব ভালো করিয়া গিরিবালাকে দেখিয়া লইলেন। মেয়েটি দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে। তখন তাহার মনের গতিটা কোন্ দিকে বুঝিবার জন্য দুই-একটি প্রশ্ন করিতেই লজ্জায় মরিয়া গিরি একেবারে ঘরের অন্ধকার বেড়ায় গিয়া মুখ লুকাইল। মানদা ক্রমাগত ঘরের মধ্য হইতে ঠেলিতে লাগিল, কিন্তু কোনো-ক্রমেই কন্যাকে বাহিরে পাঠাইতে পারিল না।

অগত্যা কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর দারোগা সাহেব উঠিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সন্ধান লইবেন—মৃদু হাসিয়া এই প্রতিশ্রুতিটা দিয়া গেলেন। দারোগা চলিয়া গেলে বাহির হইতে নছর চৌকীদার আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া কহিল, "বেঁচে গেলে জেলে-বৌ, হাকিম তোমার সহায় হ'য়েছেন।"

বুড়ী নিশ্চিন্ত হইয়া দুই কর কপালে ঠেকাইয়া দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিল, কিন্তু গিরি সেদিন আর শয্যা ছাড়িয়া উঠিল না।

(৩)

ইহার পর দিনকয়েক নানা স্থানে তদন্তে যাইবার পথে দারোগা সাহেব প্রতিশ্রুতি মত বুড়ী ও তাহার কন্যার সন্ধান লইতে আসিলেন। কিন্তু সন্ধানের মুখ্য বস্তুটি ঘোড়ার পায়ের শব্দ পাইলেই ঘরের পিছনের ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়া যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত, তাহা মানদাও আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিত না। কন্যার এই অকৃতজ্ঞতায় বুড়ী লজ্জিত হইত ও কন্যার পক্ষ হইতে হাকিমের কাছে ক্ষমা চাহিয়া, তাঁহার জন্য প্রতিবারই ভগবানের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিত। বলা বাহুল্য, এই একঘেয়ে নীরস ক্ষমাভিক্ষা দারোগা সাহেবের বেশী দিন ভালো লাগিল না এবং বাঁশ-চিটার হাটের পথে তাঁহার গতিবিধি ক্রমে ক্রমে বিরল হইয়া আসিল।

ইহাতে অবশ্য গিরিবালার অবস্থার কোনো ইতর-বিশেষ হইল না; জীবনধারা যেমন বহিতেছিল তেমনই বহিয়া যাইতে থাকিল। সমস্ত দিন নানা কাজের মধ্যে আপনার অবস্থার কথাটি বিশেষ মনে থাকিত না, কিন্তু সূর্য্যাস্তের সঙ্গে-সঙ্গেই জগতের দুর্ভাবনা আসিয়া জুটিত এবং পৃথিবীটাকে মনে হইত একটি জীবন্ত প্রেতপুরী। সহসা একদিন গিরিবালার সমস্ত দুর্ভাবনার সমাপ্তি হইল।

সেদিন শ্রাবণের বর্ষণ প্রভাত হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। বর্ষার রাত্রি। প্রথম প্রহরেই পল্লীর বুকে নিশীথের নিস্তব্ধতা ঘনাইয়া আসিয়াছিল। সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গিরিবালার মাতার কুটীর-প্রাঙ্গণ হইতে সহসা এক আর্ত্ত চীৎকারধ্বনি উঠিল। শ্রাবণের বর্ষণ-রব ছাপাইয়া সে আর্ত্তনাদ সুখ-সুপ্ত

ভদ্রপল্লীকে পর্যন্ত ধ্বনিত করিয়া তুলিল এবং পল্লীর নিদ্রার জড়তা টুটিবার পূর্বেই ভরা নদীর তরঙ্গ-কল্লোলে ডুবিয়া গেল।

গ্রামে যে একেবারে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল না, তাহা নহে। ও-পারের ঝাউবনের অন্ধকারের অন্তরালে যখন গিরিবালাকে বহিয়া পান্সী অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, তখন পথের মোড়ে নছর চৌকীদারের ভীম গর্জন শোনা গেল! এদিকে গণেশ মাঝির মুখে সংবাদ পাইয়া হারু ঘোষাল আসিয়া রায়বাবুকে ডাকিয়া তুলিয়া কহিলেন, "যা ভেবেছিলাম রায়বাবু, তাই হ'ল, নিতাই মাঝির মেয়েকে নিয়ে গেল!" রায়বাবু চক্ষু মুছিয়া রাম-নাম জপিতে জপিতে বাহিরে আসিলেন। ক্রমে ক্রমে রায়-বাড়ীর বৈঠকখানায় গ্রামের ভদ্রসন্তানদের একটি ছোট সভা বসিয়া গেল। মাখন ভৌমিকের বয়স অল্প। সখের থিয়েটারে ক্রমাগত লক্ষ্মণের ভূমিকা অভিনয় করিতে করিতে বিপন্না স্ত্রীলোকের প্রতি তাহার একরকম মমত্ব-বোধ জন্মিয়াছিল। সভাস্থ একজন থানায় সংবাদ দিবার প্রস্তাব করিতেই সে কহিল, "থানায় খবর দেওয়া কিছু নয়। আমি যাচ্ছি, আপনারা আসুন!" হারু ঘোষাল ধমক দিয়া কহিলেন, "ওই কাজটি কোরো না বাবাজী! থিয়েটার করতে গিয়ে চিন্তে চাঁড়ালের পা' ধ'রে 'দাদা' 'দাদা' ব'লে চেঁচাও সেটা বরং সওয়া যায়, কিন্তু ছোট লোকের হাতে মার খেয়ে আর আমাদের মুখ হাসিও না।" ছোট লোকের হাতে মার খাওয়ার আশংকায় অকস্মাৎ মাখন ভৌমিকের উৎসাহ দপ্ করিয়া নিভিয়া গেল এবং অতঃপর থানায় সংবাদ দেওয়াই যে সর্বাপেক্ষা সুযুক্তি সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ রহিল না।

গিরিবালার চরিত্র সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা সর্বপ্রকার আলোচনা করিয়া যখন ক্রমে ক্রমে থামিয়া গেল, তখন একদিন হঠাৎ সংবাদ আসিল যে, গিরিবালাকে বারখালির আমীর সেখের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। গ্রাম আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং যদিও হাটবার—তথাপি বাঁশচিটা ইউনিয়ানের প্রেসিডেণ্ট চামড়ার দালাল ফজল মিঞার বাড়ীর বাহিরের আঙ্গিনায় কৌতূহলী দর্শকের ভিড় জমিয়া গেল।

ক্ষান্তবর্ষণ শ্রাবণ-দিবসের রক্তসন্ধ্যা সমস্ত আকাশকে আরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সঙ্গী চৌকীদার দু'জনের কাঁধে হাত রাখিয়া টলিতে টলিতে গিরিবালা আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যর্থ অশ্রুপাতের চিহ্ন তখনও তাহার কপোলে শুকায় নাই, জাগরণরক্তিম নিষ্প্রভ চক্ষু দু'টি তখনও সন্ধ্যার রক্তদীপ্তিতে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। চারিপাশের চিরপরিচিত মূর্তি-গুলি গিরিবালা একবার দেখিয়া লইল কিন্তু সেকালের মত আজ আর মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল না। ক্ষণিকের জন্য গ্রামের লোকের মনে হইল এ যেন সে গিরিবালা নহে। এই সময় জনতার পিছন হইতে ছুটিয়া আসিয়া উম্মাদের মত কন্যার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মানদা চীৎকার করিয়া উঠিল,

"তোর এ দশা কে করেছে গিরি !" উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে নিমেষ কালের জন্য মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া গিরিবালা অঙ্গুলি তুলিয়া আকাশের দিকে দেখাইয়া দিল, কথা কহিল না।

ফজল মিঞার হুকুমে আসামী আমীর সেখ হাজির হইল। ফজল মিঞাকে পায়ের নাগরা খুলিতে দেখিয়া আমীর সেখ দুই হাত জুড়িয়া কহিয়া উঠিল, "হুজুর, ও আমার 'নেকার' বিবি।"

সহসা এই কথা শুনিয়া গিরিবালা শিহরিয়া উঠিল এবং সমস্ত দেহভার ফজল মিঞার পদতলে নিক্ষেপ করিয়া অস্ফুটস্বরে কি কহিল, তাহা বোঝা গেল না। তাহার মাথায় হাত দিয়া সংক্ষিপ্ত একটি আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করিয়া ফজল মিঞা আমীর সেখকে থানায় লইয়া যাইতে হুকুম দিলেন। থানা বহুদূরে, কাজেই সে রাত্রি ফজল মিঞার জিম্মায় গিরিবালাকে রাখিয়া মেম্বারেরা হাট করিতে চলিয়া গেলেন।

গভীর রাত্রে ফজল মিঞার গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান কাদের শুনিতে পাইল, কে যেন তাহার মনিবের বাহিরের কোঠাঘরে মিনতির স্বরে কহিতেছে, "আপনার পায়ে পড়ি হুজুর, আপনি আমার ধর্মবাপ।" তাহার পরই মেঘগর্জনের সাথে সাথে শ্রাবণ-রাত্রির ধারা নামিয়া আসিল, আর কিছু শোনা গেল না।

ইহার পর থানা। অভিযোগ দণ্ডবিধি আইনের অনেকগুলি ধারা ঘেঁসিয়া গিয়াছে; মামলা সঙ্গীন। আসামীর একরার লইতে হইবে। কাজেই গিরিবালাকেও একরাত্রি থানায় অপেক্ষা করিতে হইল। পরদিন প্রভাতে যখন চৌকিদারের সাথে সে গরুর গাড়ীতে গিয়া উঠিল, তখন থানার বারান্দায় চেয়ারে উপবিষ্ট দারোগা সাহেব এবং তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান শৃঙ্খলিত আমীর সেখ এই উভয়ের মধ্যে গিরিবালা কোনও প্রভেদ দেখিতে পাইল না।

(৪)

ইহার পর সাহেব ডাক্তার, লেডী ডাক্তার, পুলিশের বড় কর্তা, উকীল, মোক্তার কয়েকদিন ধরিয়া তাহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বপ্নাবিষ্টের মত গিরিবালা তাহার উত্তর দিয়া গেল। কি বলিল তাহাও মনে রহিল না। কিন্তু কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া আসামী আমীর সেখ ও তাহার ছয়টি সহচরকে দেখাইয়া আপনার জীবনের কলঙ্কের প্রত্যেকটি কাহিনী সে স্পষ্ট ভাষায় কহিয়া গেল, বলিতে কোথাও বাধিল না। গ্রাম হইতে যে দুই-একজন ভদ্রসন্তান মানদাকে লইয়া মামলা উপলক্ষে সহরে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা নিতাই মাঝির কন্যার এই নির্লজ্জতায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

বিচার সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আদালতের বটতলায় মানদার গরুর গাড়ী গ্রামে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল, গিরিবালা ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে চলন্ত গাড়ীর চাকা ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল, "আমাকে ফেলে যাস্‌নি মা! নিয়ে চল্‌!"

ইহার উত্তরে গাড়ীর মধ্যে একজন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তাহাকে ধমক্‌ দিয়া হারু ঘোষাল গাড়ীর পর্দা তুলিয়া দাঁত খিঁচাইয়া কহিলেন, "তা বটেই তো! বুড়ী তোমাকে নিয়ে এখন পরকাল খোয়াক্‌!"

গরুর গাড়ীর চাকা হইতে গিরিবালার শিথিল মুষ্টি খুলিয়া পড়িল, গাড়ী চলিয়া গেল।

লোকের মুখে এই পর্য্যন্তই শুনিয়াছিলাম, ইহার পর বিচিত্র পুঁথির বিবিধ তথ্যের নীচে পুরাতন কাহিনীটা একেবারেই চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

আজ সহসা গিরিবালার কথা মনে হইবার হেতু আছে। কাল বদ্‌লী হইয়া আসিয়া প্রাতে প্রাথমিক পরিদর্শনের কাজে বাহির হইয়াছিলাম, এমন সময় কে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ছেড়ে দাও গো, ছেড়ে দাও! আমার দেশের মানুষ যাচ্ছে, ছেড়ে দাও!" মুখ ফিরাইয়া দেখি একটি রমণী পাগলা গারদের মোটা লোহার শিক্‌ দুই হাতে ধরিয়া টানিতেছে। নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলাম, চিনিতে বিলম্ব হইল না। মাটিতে জানু পাতিয়া বসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া গিরিবালা জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো আমার দেশের মানুষ, এমন কেন হ'ল?"

আমার ডাক্তারী বিদ্যায় আর এ প্রশ্নের উত্তর জুটিল না, নীরবে ফিরিয়া গেলাম।

দেশদ্রোহী

অমরেশ সসম্মানে বি-এ পাশ করিয়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলে মাষ্টারী জুটাইয়া লইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এম-এ পরীক্ষার বই পড়া ও সন্ধ্যায় স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করা ছাড়া তাহার আর কোনও কাজ ছিল না।

স্বদেশ-প্রেমের বন্যায় তখন সহরের সরকারী স্কুল কলেজগুলি টল্‌মল্‌ করিতেছিল। একদিন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মিঃ দত্তকে ভগীরথ করিয়া এই

বন্যা সহসা দশঘরা গ্রামে প্রবেশ করিল। মিঃ দত্তের নাম আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। সংবাদপত্রে তাঁহার অসাধারণ ত্যাগের কাহিনী সে প্রায় প্রত্যহই পড়িত। তাঁহার ত্যাগ ও চরিত্র অমরেশকে তাঁহার অনুরাগী করিয়াছিল। মিঃ দত্তের আগমনের বার্ত্তা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

সাহাবাবুদের বাগান-বাড়ীতে মিঃ দত্ত বিশ্রাম করিতেছেন। সম্মুখের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে অগণ্য নরমুণ্ড। তাহাদের মধ্যে গান্ধী-টুপী মাথায় হলুদ-রংএর ব্যাজ পরিয়া স্বেচ্ছাসেবকের দল শান্তিরক্ষা করিতেছিল। অমরেশ পাশ কাটাইয়া যেখানে মিঃ দত্ত অনুরাগীগণ পরিবৃত হইয়া স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। একজন কহিয়া উঠিল, "এই যে অমরেশবাবু নিজেই এসেছেন!"

অমরেশ সে কথায় কান দিল না, সে মিঃ দত্তকে দেখিতে লাগিল। ত্যাগী কর্ম্মবীরের এই তো যোগ্য বেশ! খদ্দরের সংক্ষিপ্ত পরিধান আর একখানি মোটা চাদর; অবিন্যস্ত সুদীর্ঘ কেশরাশি। মিঃ দত্ত অমরেশের প্রশংসমান দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "বসুন, আপনার কথাই বলছিলাম। আপনাকে আমাদের চাই।"

অমরেশ আসন লইয়া কহিল, "আমি কি কাজে লাগতে পারি?"

"সমস্ত কাজে। আপনাকে আমি গুরুতর কাজের ভার দেব। আজ আপনারা যদি না আসেন, তবে এই হতভাগ্য অন্ধ দেশবাসীকে কে দৃষ্টি দেবে? এই অত্যাচার জর্জ্জর, বুভুক্ষু জীবন্মৃত মানুষগুলোর মধ্যে নবজীবন সঞ্চারের জন্য দেশমাতা আপনাদের ডাকছেন। আপনারা সাড়া দেবেন না?"

তাহার পর জালিয়ানওয়ালাবাগের কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ পর্য্যন্ত দেশের যাবতীয় ঘটনা মিঃ দত্তের ভাষায় এমন করুণ হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল যে, অমরেশ অশ্রু ত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারিল না। মিঃ দত্তের কথা শেষ হইলে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবেগ গদ্‌গদ স্বরে কহিল, "আমি সম্পূর্ণভাবে আজ আমাকে আপনার হাতে সমর্পণ করলাম। দেশের কল্যাণের জন্য আমার দ্বারা যা সম্ভব হ'তে পারে আপনি মনে করেন, আমি তা করব। আপনি শুধু আদেশ দেবেন।"

মিঃ দত্ত কহিলেন, "আমি তোমাকে দেশমাতৃকার নামে গ্রহণ করলাম। একটা কথা আমি তোমাকে এইখানেই জানাচ্ছি—তোমার অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট হবে না। তবে আমার দেশ দরিদ্র, তোমার উপযুক্ত মূল্যে সে কিনতে পারবে না। তবে যতদূর সম্ভব হয়—"

অমরেশ বাধা দিয় কহিল,—"আমার চিন্তা আমি করিনে। ঘরে

মা আছেন, তাঁর প্রয়োজন স্বল্প, তিনি যেন আমার জন্য কষ্ট না পান দেখবেন।"

মিঃ দত্ত কহিলেন, "তাঁকে দেখবার ভার আমার। চল বাইরে লোকজন অপেক্ষা করছে।"

মিঃ দত্ত সভাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন. পুরনারীরা লাজ ও পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিলেন। "বন্দেমাতরম্" শব্দে বৃহৎ দশঘরা গ্রামখানি ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

তাহার পর সর্বসমক্ষে অমরেশকে আনিয়া দাঁড় করাইয়া স্বহস্তে পুষ্প-মাল্যে ভূষিত করিয়া মিঃ দত্ত তাহাকে স্থানীয় জনমণ্ডলীর নেতৃপদে অভিষিক্ত করিলেন। জনতা জয়ধ্বনি দিল।

এম-এ পরীক্ষার বইগুলি বাক্সে বন্ধ করিয়া ও ডেপুটীগিরির নমিনেশ-নের চিঠিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অমরেশ সন্ধ্যায় স্বগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাতা পূর্বেই সংবাদ শুনিয়াছিলেন, অমরেশকে দেখিয়া কহিলেন, "তুই চাকরী ছেড়ে এলি অমর? সব ভেবে-চিন্তে দেখেছিস তো? বাপের কিছু দেনা-পত্তর আছে তাও তো জানিস?"

অমরেশ কহিল, "ভেবো না মা, দেশমাতার আশীর্বাদে সমস্ত মঙ্গল হবে। যে বিরাট ত্যাগের আদর্শ আজ দেখে এলাম, তা দেখে কি আর নিজের ক্ষুদ্র চিন্তা নিয়ে থাকা সম্ভব? তুমি আশীর্বাদ কর।"

অমরেশ মাতার পদধূলি মাথায় লইল।

ইহার পর একদিন মাত্র আমি অমরেশকে দেখিয়াছি। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছিলাম। সন্ধ্যা হইতে কালবৈশাখীর ঝড় সুরু হইয়াছিল, রাত্রি দ্বিপ্রহর—তখনও ঝড় থামে নাই। বাহিরের ঘরে বিছানায় শুইয়া সেক্সপিয়র পড়িতেছিলাম, সহসা ডাক শুনিলাম, "সতু বাড়িতে আছ?"

"কে?"

"আমি অমরেশ।"

অমরেশ এই দুর্যোগে! দরজা খুলিলাম। ভিতরে আসিয়া যে মনুষ্যমূর্তি দাঁড়াইল, অতি পরিচিত ব্যক্তিও প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকে অমরেশ বলিয়া চিনিতে পারিত না। তাহার চমৎকার বর্ণ তামাটে হইয়া গিয়াছে। মাথায় এক ঝাড় চুল; তাহা বাহিয়া তখনও জল পড়িতেছিল। গায়ে একটি ছিন্ন মলিন পিরাণ, তাহার হাতায় এক টুক্‌রা হলুদ-রংএর কাপড়ে লেখা "বন্দেমাতরম্"। পরণের কাপড়খানার নিম্নার্ধ জল এবং কাদায় মাখা। হাতে একগাছা লাঠি। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া আমার চ'খে জল আসিতে-ছিল। অমরেশ আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "দুঃখ করো না সতু! এই বিধাতার বিধান! কঠোর তপস্যা ছাড়া দেশের মুক্তির পথ নেই।"—

বলিয়া অমরেশ মাটিতে বসিয়া পড়িল।

আমি কহিলাম, "সব শুনেছি, কাপড় ছাড় আগে।"

"উঁহু। কাপড় ছাড়বার সময় নেই! দুটো খেতে দিতে পার কিনা দেখ।"

বৌদিদিকে ডাকিয়া তুলিয়া রান্নাঘরে যাহা অবশিষ্ট ছিল আনিয়া দিলাম। অমরেশ খাইতে বসিয়া বলিতে লাগিল, "আজ চার দিন খাইনি সতু! সতেরো তারিখে হোসেনগঞ্জের মিটিং ক'রে কামারদয় আসি। সেখান থেকে নোয়াখালি, তারপর আজ প্রাতে রওনা হ'য়ে এই তোমার এখানে—"

"সর্বনাশ! নোয়াখালি থেকে বরাবর এখানে! চল্লিশ মাইল পথ!"

"কত মাইল তাতো গুণিনি ভাই, মায়ের নামে চলে এসেছি। আবার ভোরেই রূপকাঠি পেঁছুতে হবে।"

কথা কহিতে পারিলাম না। আমাদের গ্রাম হইতে রূপকাঠি অন্ততঃ বিশ মাইল। এই বিশ মাইল পথ এই দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া যে স্বচ্ছন্দে যাইতে সাহস করে, তাহাকে সাধারণ মানুষ কখনও বলা যাইতে পারে না। বাধা দিলে সে মানিবে না জানিতাম, তথাপি কহিলাম, "রূপকাঠি কি কাল সকালে গেলে চলবে না?"

অমরেশ লাঠিগাছটা তুলিয়া লইয়া কহিল, "তা হয় না সতু। কাল সকালে মিঃ দত্তের বোট রূপকাঠির ঘাটে পেঁছুবে। তার আগে আমায় গিয়ে পেঁছুতে হবে। অভ্যর্থনা, সভা, তাঁর আহার-বিশ্রাম সব আয়োজনই আমাকে করতে হবে।"

"এক ঘণ্টা জিরিয়ে যাও, বৃষ্টি ধরুক!" আমি কহিলাম।

অমরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার হাত ধরিয়া কহিল, "মনে কিছু করো না সতু, তোমার কথা রাখতে পারলাম না, ঝড়-বৃষ্টি মানলে চলবে না। ক্লাইভের যে সেনারা বাঙ্গলা জয় করেছিল, তারা মেঘ-বৃষ্টির দিকে চায়নি, চেয়েছিল সম্মুখে। আজ যদি তাদের হাত থেকে দেশকে ফিরিয়ে নিতে হয়, তবে আমাদেরও সামনে চাইতে হবে, উপরে কিংবা পিছনে চাইলে চলবে না। সামনের পথই সোজা পথ।"—বলিয়াই অমরেশ বাহির হইয়া নিদাঘ-নিশীথের অন্ধকারে মিশিয়া গেল। বৈশাখী মেঘের গর্জনের সাথে একটি অতি তীব্র স্বর দূর হইতে শুনিতে পাইলাম—"মায়ের নাম নিয়ে ভাসানো তরী যেদিন ডুবে যাবেরে!"

ইহার পর আর অমরের সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে সকল সংবাদ আমি শুনিয়াছি।

গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অমরেশ দেশসেবা-ব্রতের পুণ্যকথা কীর্তন করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও চরিত্র-মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে লোক যখন উপদেশ লইতে আসিত, তখন সে মৃদু হাসিয়া কহিত,

"আমি কেউ নই। সেবা-ব্রতের দীক্ষা নিতে চাও, তবে আদর্শ পুরুষের শরণ লও।" এইরূপে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া বীজবপনের জন্য সে মিঃ দত্তকে সহর হইতে আহ্বান করিয়া আনিত। এইরূপে বৎসরের মধ্যে অমরেশ মিঃ দত্তকে লক্ষ লক্ষ লোকের রাষ্ট্রীয় গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল।

সহসা একদিন পুলিশ আসিয়া বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে অমরেশকে অপসারিত করিয়া লইয়া গেল। অমরেশ সমবেত বিক্ষুব্ধ জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ভাই সব, আমি চললাম। তোমরা যে ব্রত নিয়েছ, তা জীবন দিয়ে সফল কর! অভাব অভিযোগ প্রয়োজন সব মিঃ দত্তকে জানাবে। তাঁর উপদেশ ও নির্দেশে চলবে, সিদ্ধি নিশ্চয় হবে।"

রাজদ্রোহের অপরাধে অমরেশের তিন বৎসর জেল হইল। অমরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "বন্দেমাতরম্।" জেলে যাইবার পূর্বে একখানি কাগজের টুকরায় মিঃ দত্তের উদ্দেশে লিখিল, "মাকে দেখবেন।" তাহার পর অমরেশ জেলের গাড়ীতে উঠিল। স্বেচ্ছাসেবকেরা জয়ধ্বনি করিয়া ফিরিয়া গেল।

দীর্ঘ তিন বৎসর। ইহার মধ্যে কত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। দেশ-সেবার ধারা, দেশ-প্রেমের সংজ্ঞা সমস্ত বদলাইয়া গিয়াছে। নূতন নূতন দল গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের কার্য্য অভিনব, কার্য্যধারা নূতন।

এই নূতন ভাবের আবেষ্টনের মধ্যে একদিন বর্ষার প্রভাতে ক্ষয়কাশির আক্রমণে জীর্ণ দেহ লইয়া অমরেশ জেল হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে পরিচিত কাহাকেও দেখিল না। সহরের এক হোটেলে বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে সে বাড়ী ফিরিল।

ভোরে বাড়ীর দরজায় ঘা দিয়া সে ডাকিল, "মা!" সাড়া আসিল না। কিছুক্ষণ পরে হুঁকা হাতে নবীন পোদ্দার বাহির হইয়া আসিলেন।

অমরেশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "আপনি?"

পোদ্দার হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া করজোড়ে নমস্কার করিয়া কহিল, "এজ্ঞে কি—কি করি আর! বামুনের ভিটে মোছলমানে নিলেম ডেকে নেবে তাকি দেখতে পারি? তাই দু'শ আটাশ টাকাতেই নিলাম। তার বড় লাভ হয়নি; দেখুন না, দক্ষিণ পোতার ঘরে একরকম তো কিছু ছিলই না। পুকুরের ঘাটে—"

অমরেশ বাধা দিয়া কহিল, "মা?—"

বৃদ্ধ একটি বিব্রত হইল, তারপর মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, "এজ্ঞে তিনি তো ভট্‌চাজ বাড়ীতে—"

অমরেশ কথা না বলিয়া ভট্টাচার্য্য বাড়ীর পথ ধরিল। পোদ্দারের প্রথম কথাতেই বুঝিয়াছিল যে, পিতার ঋণের দায়ে বাস্তুভিটা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী আঙ্গিনায় ছড়াঝাঁট দিতেছিলেন, অমরেশকে দেখিয়া ম্লান

মুখে কহিলেন, "এস বাবা, কবে এলে ?"

অমরেশ প্রণাম করিয়া কহিল, "আজই। মা কোথায় ?"

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী কহিলেন, "হাত-মুখ ধোও, বিশ্রাম কর।"

অমরেশের মনে শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল, সে প্রশ্ন করিল, "মা কোথায় ?"

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া অমরেশের প্রশ্নের জবাব দিলেন। অমরেশ করতলে মুখ ঢাকিয়া আচ্ছন্নের মত বসিয়া রহিল।

দ্বিপ্রহরে মায়ের মৃত্যুর কাহিনী অমরেশ সমস্তই শুনিল। পুত্রের কারাদণ্ডের সংবাদ পাইয়া বিধবার মূর্চ্ছারোগের সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া পাওনাদারের তাগিদ, অবশেষে বাস্তুভিটা বিক্রয়, শেষে উন্মাদপ্রায় জননীর অন্নজল ত্যাগ এবং মৃত্যু সমস্ত কথাই ভট্টাচার্য-গৃহিণী সবিস্তারে কহিয়া গেলেন। অমরেশ নীরবে শুনিয়া গেল মাত্র।

অমরেশ কলিকাতায় আসিয়া দেখিল যে, সে দিনের সে কলিকাতা আর নাই। স্কুল কলেজে পূর্বের মতন ছাত্রেরা যাতায়াত করিতেছে। যে বস্তুটির বিরুদ্ধে তিন-চার বৎসর পূর্বে নিদারুণ বিদ্রোহ বিচিত্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই কাউন্সিলের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে। যাঁহাদের ত্যাগের আদর্শ তাহাকে একদিন অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহাদের মোটরগাড়ী রীতিমত বেলা দশটায় হাইকোর্টে গিয়া পাঁচটায় ফিরিয়া আসিতেছে।

সঙ্গে সম্বল বিশেষ কিছু ছিল না। শিয়ালদায় এক হোটেলে প্রত্যহ একবেলা খাইয়া সে মিঃ দত্তের সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাঁহার নেতৃত্ব তখন মক্কেলের নিবিড় অরণ্যে ও অগণ্য প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে স্থান লাভ করিয়া দুর্লভদর্শন হইয়া গিয়াছে, সাক্ষাৎ সহসা মিলিল না।

কিন্তু তাঁহাকে অমরেশের চাই-ই। অর্থ সাহায্যের জন্য নহে, মায়ের মৃত্যুর জবাবদিহির জন্য।

একদিন সুযোগ ঘটিল; সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া সে এক পরামর্শ বৈঠকে গিয়া উপস্থিত হইল। আগামী নির্বাচনের জন্য সভা বসিয়াছিল। জোর বিতর্ক চলিতেছিল সহসা অমরেশ প্রবেশ করিয়া তারস্বরে কহিল, "মিঃ দত্ত! বাইরে আসুন!"

মিঃ দত্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। একজন সদস্য উঠিয়া কহিলেন, "তুমি কে হে ছোক্‌রা ? যাও—বেরিয়ে যাও!"

অমরেশ মিঃ দত্তের দিকে চাহিল, তিনি কথা কহিলেন না। রুদ্ধ-আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে অমরেশ বাহির হইয়া আসিল।

হোটেলে ফিরিয়া দেখিল পূর্বের স্কুলের চাকরীতে, পুনরায় ফিরিয়া ভর্তি হইবার জন্য তাহার দরখাস্তখানি প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

অমরেশ শূন্যদৃষ্টিতে বাহিরে চাহিয়া রহিল। বাহিরের রাস্তায় তখন অসংখ্য মোটরকারে স্বেচ্ছাসেবকের দল দেশনায়ক মিঃ দত্তের জন্য ভোট ভিক্ষা করিয়া তারস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া ছুটিতেছিল।

পরদিন কলেজ স্কোয়ারে বিরাট নির্বাচন-সভায় রক্তচক্ষু জীর্ণ-বেশ, উপবাসী অমরেশ যখন আসিয়া দাঁড়াইল, তখন মিঃ দত্ত কেবল মাত্র বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বক্তৃতা আরম্ভ হইতেই তীরবেগে ছুটিয়া গিয়া অমরেশ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল—"ভণ্ড—প্রতারক—পশু—"

অধীর জনতা রুখিয়া উঠিল, "দেশদ্রোহী গুপ্তচর—"

মুহূর্ত মধ্যে অমরেশের দুর্বল দেহ আঘাতে রক্তাপ্লুত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

পরদিন সবিস্তারে স্বদেশদ্রোহী অমরেশ কর্তৃক দেশনায়কের বধ-চেষ্টার কাহিনী সমস্ত সংবাদপত্রে তীব্র ভাষায় প্রচারিত হইয়া গেল।

দেশদ্রোহী অমরেশ মধ্যরাত্রেই জীবন দিয়া তাহার দেশদ্রোহের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়াছিল, কাজেই এ কথার প্রতিবাদ করিবার আর কেহ ছিল না।

শাঁখের করাত

পনের বৎসর পর পশুপতি গ্রামে ফিরিল। এতদিন পাঞ্জাবে খুড়ার কাছে থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছে, গ্রামের খবর বড় জানিত না। সন্ধ্যাকালে গ্রামের প্রধানেরা একত্র হইয়া গ্রামের এই কৃতবিদ্য সন্তানটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, সংক্ষেপে গ্রামের সংবাদ তাহাকে জানাইলেন। সংবাদগুলি এই,—

বিশ সনের ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া জমিদার মধু মিত্র মহাশয় পরলোকে গিয়াছেন। তদীয় পুত্র অনুকূল সম্পত্তি বন্ধক দিয়া বিলাত যাইবার নাম করিয়া, বোম্বাইতে এক সাহেবী হোটেলে আছে।

রায়-বাড়ীতে রায়-গিন্নী আছেন। রায় মহাশয় ওলাউঠায় ও তাঁহার তিন পুত্র মরিয়াছে কালাজ্বরে।

কুণ্ডু-বাড়ীতে কেহ নাই; দুই সরিকে বৎসর দশেক ধরিয়া কাঁঠাল গাছের স্বত্ব লইয়া মামলা করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া, শেষে এক সরিক বগুড়ায় মামা-বাড়ী, অপর সরিক মালদয় মাসীবাড়ীতে গিয়াছে। বাড়ী খালি, তাহাতে বাছিরদ্দি চৌকীদারের মুর্গী ও ধনাই দাসের গরু থাকে।

ছেলের অভাবে গ্রামের মাইনর ইস্কুলটি উঠিয়া গিয়াছে। ছেলেরা এক হাফ্‌আখড়াইয়ের দল করিয়াছে, কদম বিশ্বাসের বাড়ীর দরদালানে দুপুরবেলা তাস পিটিয়া, সন্ধ্যাকালে আখড়াই জুড়িয়া দেয়।

গ্রামের মেয়েরা দুপুরে নদীতে এবং সন্ধ্যায় মল্লিকদের এঁদো পুকুরে স্নান করেন। নদীর ঘাটে যাইবার উপায় নাই। নবিগঞ্জের চামড়ার গুদামওয়ালার মুন্সী সরকার আর একদল লোক রংদার লুঙ্গী ও ধোপদস্ত কামিজের উপর ওয়েস্ট কোট আঁটিয়া মাঝ নদীতে বিশ্রী সারি গাহিয়া বাচ খেলে, কখনও কখনও ঘাটে বসিয়া নির্ভয়ে বিড়ি ফুঁকিতে থাকে।

এই কথা শুনিয়া পশুপতি একেবারে জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, "আপনারা কি করেন?"

নবীন রায় মহাশয় প্রাচীন ব্যক্তি, অনেক দেখিয়াছেন। তিনি কহিলেন, "কি করব দাদা? টাকাই সব। টাকার জোরেই সব হয়। গত বৎসর রাধা বোষ্টমী আর এই বোশেখে মাখন মাঝির জলজ্যান্ত বৌকে ঘাট থেকে তুলে নিয়ে গেল, কে কি করল? টাকায় সাক্ষী বোবা হয়, পুলিশ খোঁড়া হয়। আমরা যদি দু'কথা বলতে যাই, তা হ'লে আর হাটে যাওয়ার পথ থাকে না।"

দাশু ঘোষ কহিলেন, "মান-ইজ্জৎ সব মধু মিত্তির মশাইয়ের সঙ্গেই গিয়েছে। জেলেপাড়া নবিগঞ্জের দালালের উৎপাতে সাফ্‌। বৌ-ঝি ঘরে রেখে জাল বাইতে যাবে কে? ভাবছি এই পোষ পেরুলে ঘর দু'খানা ভেঙ্গে নিয়ে সদরে গিয়ে তুলব।"

পশুপতি পূর্ব্ববৎ তীব্র স্বরে কহিল, "কোথাও যেতে হবে না! আমি দু'দিনে সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। নিশ্চিন্ত থাকুন! শুধু ছেলেগুলোকে একবার আমার কাছে ডেকে দেবেন।"

(২)

এক বড়মানুষ তাহার পর এম-এ পাশ; বহুকাল পর দেশে ফিরিয়াছে। ছেলের দল তাহাকে বড় কেহ দেখে নাই; কৌতূহলী হইয়া হাফ্‌আখড়াইয়ের দলশুদ্ধ রাত্রি এক প্রহরে পশুপতির বাড়ীর আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল।

পশুপতি মুগুর ভাঁজিতেছিল। মুগুর রাখিয়া ছেলেদের পরিচয় লইয়া কহিল, "তোমরা বেঁচে থাকতে গাঁয়ে এই সব অত্যাচার হয়! কি কর তোমরা?"

দলের নেতা নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বয়স বছর বাইশ, কিন্তু এই বয়সেই সংসারের যাবতীয় অভিজ্ঞতা সে লাভ করিয়া অত্যন্ত প্রবীণ হইয়া

পড়িয়াছিল। সে কহিল, "করতে পারি সবই। কিন্তু পিছনে দাঁড়ায় কে বলুন? সব কাজেই টাকা চাই। টাকা পেলে দু'দশটা লাঠিয়াল—"

পশুপতি রুখিয়া উঠিল, "লাঠিয়াল দিয়ে মা-বোনের ইজ্জৎ বাঁচাবে? এ বুদ্ধি পেলে কোত্থেকে!"

আপনার সাঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদের সম্মুখে ধমক খাইয়া নরেন্দ্রের নিতান্ত অপমান বোধ হইল। মনের ক্রোধ মনে চাপিয়া মুখে হাসিয়া কহিল "তা আপনি যখন এসেছেন যা বলবেন করব।"

পশুপতি কহিল, "যা বলবার বলব কাল। যা করতে হবে তাও বলব কাল, বেলা দশটায় এসো।"

"আজ্ঞে আচ্ছা" বলিয়া নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী চলিয়া গেল এবং পথে বিড়ি ধরাইতে ধরাইতে পার্ষদবৃন্দের দিকে চাহিয়া কহিল, "হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলেন কত জল। কেমন পাঁচকড়ি?"

পাঁচকড়ি সূত্রধর একটু কাষ্ঠ হাসিয়া কহিল, "তা বইকি প্রভু।"

একপ্রহর রাত্রে পশুপতি একাকী গ্রামের পথে বাহির হইল তখন হাফ্-আখড়াইয়ের গান পর্য্যন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত গ্রাম নিঃঝুম। কাহারো বৈঠকখানায় প্রদীপ নাই। মল্লিকদের চণ্ডীমণ্ডপে সারারাত্রি এককালে পাশা চলিত, সে কথা আবছায়ার মত তাহার মনে ছিল। দেখিল সেখানে গুটিকতক কুকুর জড়াজড়ি করিতেছে, পথে জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ পাইল না, শুধু নদীর ধারে বারোয়ারীতলার বাঁধানো বেলগাছের নীচে নবিগঞ্জের জনকয়েক লোক তাস পিটিতেছিল, আর একজন বাঁশের বাঁশীতে আড়খেমটায় একটি পিলু বাঁরোয়ায় টপ্পা বাজাইতেছিল।

ভোরে বাইক চাপিয়া প্রথমে পশুপতি গেল থানায়। দারোগা বাবু অপাঙ্গে এই নবাগত যুবককে দেখিয়া লইলেন, কিন্তু তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া খুসি হইতে পারিলেন না। পশুপতি তাঁহাকে গ্রামের অবস্থা জানাইয়া পুলিশের কথা কহিতেই দারোগাবাবু কহিলেন, "পুলিশের সাধ্য কি মশাই! সব গাঁয়ের অবস্থাই এই রকম, পুলিশ করবে কি? আপনারা লাগুন, সাক্ষী জোগাড় করুন, আমরা পিছনে আছি। আপনারা নিজেরা কিছু করবেন না, মামলা করলে সাক্ষী জোটাতে পারবেন না, মামলা ফেঁসে গেলে পুলিশকে গালাগাল করবেন!"

পশুপতি এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কথা না বলিয়াই সদরের পথ ধরিল। সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া মহকুমা হাকিমের কুঠীতে সে যখন উপস্থিত হইল, সাহেব তখন বারান্দায় বসিয়া 'ব্রেকফাষ্ট' করিতেছিলেন। পশুপতি কাউদিয়া গ্রামের অবস্থা সংক্ষেপে কহিয়া গেল। সাহেব সদ্য বিলাত হইতে আসিয়াছেন, এই বলিষ্ঠ যুবকটিকে তাঁহার ভালো লাগিল। ইংরাজীতে কহিলেন, "জানো বাবু, যে মানুষ আপনাকে সাহায্য করে, ভগবান তাকে সাহায্য করেন।

তোমার গ্রামের ছেলেদের নিয়ে একটা 'পেট্রোল' আর 'ডিফেন্স পার্টি' গ'ড়ে ফেল, দেখবে আপনি উৎপাত কমে যাবে, গুড্ মর্ণিং !"

পশুপতি ফিরিয়া আসিল। তাহার পূর্ব্ব আদেশ অনুযায়ী ছেলের দল আঙ্গিনায় অপেক্ষা করিতেছিল, পশুপতি তাহাদিগকে কহিল, "আমি কুস্তির আখড়া খুলছি, সেখানে লাঠি খেলাও চলবে, তা ছাড়া সকল রকম খেলার সরঞ্জাম রাখব। তোমাদের সবাইকে আসতে হবে।" ছেলেরা স্বীকার করিয়া চলিয়া গেল।

দ্বিপ্রহরে ঘাটে যাইবার পথে নবীন রায় মহাশয়কে ডাকিয়া পশুপতি কহিল, "প্রায় ক'রে তুলেছি দাদামশাই, দু'দিনে ঠিক ক'রে দেব, ভয় পাবেন না!"

(৩)

বৈকালে পশুপতি সরকার-বাড়ীর দোলমঞ্চের সম্মুখের মাঠের একবুক ঘেঁটুবন সাফ করিতে লাগিল। মাঠ সাফ হইলে পরদিন সেখানে কুস্তির আখড়া বসিল।

নিজের জলপানির সঞ্চিত টাকা নিঃশেষ করিয়া সহর হইতে মুগুর ডাম্বেল প্রভৃতি ব্যায়ামের সর্ব্ববিধ সরঞ্জাম কিনিয়া আনিল এবং দশ টাকা বেতনে একজন লাঠিয়াল শিক্ষক রাখিতেও ত্রুটি করিল না। প্রথম দুই-একদিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী হইল না। হাফ্‌আখড়াইয়ের দলের বড় কেহ আসিল না। কিন্তু ক্রমে যখন ছেলেরা দেখিল যে, চাঁদা দিতে হয় না অথচ পেট ভরিয়া ছোলা আর গুড় খাইতে পাওয়া যায়, তখন নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী শুদ্ধ আসিয়া কুস্তি করিতে লাগিয়া গেল। সপ্তাহখানেক পর একদিন পশুপতি লাঠি ঘাড়ে করিয়া তাহার বাছা বাছা কয়েকটি সাগরেদের সহিত নবিগঞ্জ গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে চামড়ার আড়তদারের সঙ্গে পশুপতির কি কথাবার্তা হইল জানি না, কিন্তু সেদিন হইতে সন্ধ্যায় তাঁহার লোকজনের বাচখেলা বন্ধ হইয়া গেল, নদীর ঘাটে বসিয়া বিড়ি ফুঁকিতেও কাহাকে দেখা গেল না।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যায় নদীর ঘাট গ্রাম-বধূদের কলহাস্য ও কঙ্কণ-ঝনৎকারে পুনরায় মুখর হইয়া উঠিতে লাগিল এবং জ্যোৎস্না নিশীথে পল্লী-পথ নিঃশঙ্ক পদসঞ্চারে শব্দিত করিয়া গৃহিণীরা পূর্ব্বের মতই পুনরায় রায়-গৃহিণীর নৈশ নারী-সভায় যোগদান করিতে থাকিলেন।

সেদিন পশুপতি কি কাজে ঘাটের পথে চলিতেছিল; রায়-গৃহিণী কয়েকটি তরুণী বধূর পুরোবর্ত্তিনী হইয়া সান্ধ্য-স্নান সারিয়া ফিরিতে-ছিলেন। পশুপতিকে দেখিয়া কহিলেন, "বেঁচে থাক লক্ষ্মী দাদা আমার! তোমার দৌলতে নেয়ে বাঁচছি।"

তরুণীরা কেহ কথা কহিলেন না, কিন্তু অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে অনেকগুলি চক্ষু যুগপৎ তাহার প্রতি স্নিগ্ধ প্রসন্ন কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিল, পশুপতি তাহা দেখিল এবং রায়-গৃহিণীর আশীর্বাদের উত্তরে নীচু মাথা করিয়া নীরবে ঘাটের পথে চলিয়া গেল।

পশুপতির উৎসাহে ক্রমে ক্রমে দূর গ্রাম হইতে ছেলেরাও আসিয়া তাহার দলে যোগ দিতে আরম্ভ করিল। খুড়া মহাশয় পাঞ্জাব হইতে লিখিলেন, "বেশ করিতেছ, যদি স্থায়ী করিতে পার, তবে একটা কাজের মত কাজ হইবে।" পিতৃব্যের অনুজ্ঞাক্রমে সে বৎসরের ফসল বিক্রয় করিয়া লব্ধ অর্থ তাহার আখড়ার সর্বাঙ্গীন উন্নতি-কল্পে ব্যয় করিল এবং মোটা মাহিনা দিয়া কলিকাতা হইতে কুস্তি শিখাইবার জন্য ভোজপুরী পালোয়ান লইয়া আসিল।

আখড়ার শিক্ষার্থীর সংখ্যা যখন একশত ছাড়াইয়া গিয়াছে তখন একদিন. সহসা পশুপতি দেখিল যে, ভিনগ্রামের জন-ত্রিশেক ছাত্র অনুপস্থিত। কারণ অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠাইল, তাহারা অনুপস্থিতির কারণ কিছু জানাইল না তবে বলিয়া দিল তাহারা আর আসিতে পারিবে না। পরদিন নরেন্দ্র চক্রবর্তী ও তাহার দলের জনকয়েক লোককে দেখা গেল না। তাহাদের সকলেরই অসুখ।

অকস্মাৎ এতগুলি লোকের একসঙ্গে অসুখ হইবার কারণ কিছু পশুপতি আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিল না, তবে বুঝিল যে ভিতরে রহস্য আছে। তৃতীয় দিন প্রভাতে থানা হইতে একজন হাওলদার আসিয়া পশুপতির ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের সংবাদ লিখিয়া লইয়া গেল এবং বৈকালে নবীন রায় মহাশয় পাংশু-মলিন মুখে আসিয়া পশুপতির নিকট শঙ্কিত মৃদুস্বরে যাহা বলিলেন, তাহাতেই সমস্ত রহস্যের উদ্ভেদ হইল।

কয়েকদিন হইতে জন-দুই আগন্তুক গ্রামে ঘোরা-ফেরা করিতেছে। দফাদার আসিয়া সকলকে গোপনে জানাইয়া গিয়াছে যে, কুস্তীর আখড়ায় যাহারা খেলা করে, তাহাদের উপর কড়া নজর রাখিবার জন্য দারোগার উপর হুকুম আসিয়াছে। সংবাদ দিয়া নবীন রায় কহিলেন, "তুমি ভাল করতেই এসেছিলে দাদা, কিন্তু আমাদের পোড়া কপালে সইল না, তা' আর কি করবে বল ?"

পশুপতি কোনো কথা কহিল না।

(৪)

পরদিন আখড়া একেবারে শূন্য হইয়া গেল। পশুপতি তাহার বাছা বাছা সাগরেদের বাড়ীতে নিজেই গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের অধিকাংশই শারীরিক অস্বাস্থ্যের দোহাই দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল না। দুই-

চারিজন স্পষ্টই জানাইল যে দারোগাবাবু আখড়ায় যাইতে তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

পরদিন প্রভাতে পশুপতি সদরে গিয়া উপস্থিত হইল। পুরাতন ম্যাজিষ্ট্রেট্ বদলি হইয়া গিয়াছে; নূতন যিনি আসিয়াছেন তিনি পাকা সিভিলিয়ান্, তাঁহার গোঁফ ও চুলেও পাক ধরিয়াছে। পশুপতির নাম শুনিয়াই তিনি পরিষ্কার বাঙ্গলায় কহিলেন, "এসব চালাকি ছেড়ে দাও বাবু। কুস্তির আখড়ার নামে ছেলে জড় করে loyalty undermine করছ তুমি, আমি শুনেছি।"

পশুপতি তীব্র স্বরে কহিল "মিথ্যা কথা! গুণ্ডার হাত থেকে গ্রামের লোকজনকে বিশেষ করে মেয়েদের বাঁচাবার জন্যই আমি ছেলেদের শিক্ষা দিচ্ছিলাম, তার সঙ্গে পলিটিক্সের কোন সম্বন্ধ নেই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ টেবিলের কাগজের দিস্তায় নাম সই করিতে করিতে বলিলেন, "গ্রামের লোকজনকে দেখবার জন্য গভর্ণমেণ্ট আছে, পুলিশ আছে, তার জন্য তোমার কষ্ট করবার দরকার নেই। অবশ্য তুমি যদি কিছু করতে চাও, সে তোমার ইচ্ছা, তবে জানবে গভর্ণমেণ্ট বোকা নন। গুডমর্ণিং।"

পশুপতি ফিরিয়া আসিয়া সেইদিনই তাহার দলবলকে ডাকিয়া পাঠাইল, দুই-একজন ছাড়া কেহ আসিল না। যাহারা আসিল, তাহারাও আখড়ায় যোগ দিতে কোনমতেই রাজী হইল না।

পরদিন সন্ধ্যাকালে কাহারও নিকট হইতে বিদায় না লইয়া ভোজপুরী পালোয়ানের সঙ্গে পশুপতি পাল্সীতে গিয়া উঠিল এবং মুখ ফিরাইয়া মুহূর্তকালের জন্য সন্ধ্যার তিমিরচ্ছায়ায় অদৃশ্য নির্জন নদীর ঘাটের দিকে চাহিয়া একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

ঘাট নির্জন, কিন্তু শুনিল দূরে কদম বিশ্বাসের বাড়ীর আঙ্গিনায় হাফ্-আখড়াইয়ের গান আরম্ভ হইয়াছে—

"রমণী পরম রতনো
সুখের শিকলে বাঁধি করহে যতনো।"

আর তাহার সহিত তাল রাখিয়া ওপাড়ে নবিগঞ্জের হাটে মহরমের লাঠি খেলার একুশখানি কাড়া বাজিতেছে এবং কাছেই রঙ্গিণী খেমটাওয়ালীর বাড়ীর বারান্দায় দারোগাবাবুর জড়িত কণ্ঠস্বরে নিধুবাবুর টপ্পা ও তাঁহার সঙ্গীদের অট্টহাস্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে।

উদাসীর মাঠ

আট-বৎসর বয়সে কন্যা উদাসীকে মধু মণ্ডল গৌরীদান করিয়াছিল, নয় বৎসরে পড়িতেই সে হাতের 'নোয়া' ঘুচাইয়া বাপের বাড়ীতে আসিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে বসিল। মা-বাপ কহিল, আবাগী!

গ্রামের এক বুড়া আত্মীয় উপদেশ দিল, "একটা ভাল ছেলে দেখে মেয়েকে গছিয়ে দাও মণ্ডল, দুধের মেয়ে!"

মণ্ডলের জ্যেষ্ঠপুত্র যদু এণ্ট্রান্স ক্লাশ হইতে বিদায় লইয়া তাহার বংশের আদিপুরুষদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনে ব্যস্ত দিল—সে দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কহিয়া উঠিল. "ও কথাটি বলবেন না। আমাদের বংশে যে কাজ কোন কালে হয়নি, আজ—" বলিয়া অসম্ভব রকমের অনুস্বর সংযুক্ত একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সে পরামর্শদাতাকে স্তব্ধ করিয়া দিল।

ইহার পর আর উদাসীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার কাহারও কোন প্রয়োজন রহিল না। উদাসীও নির্বিবাদে বৈশাখে কচি আম ও আশ্বিনে শিউলী ফুল কুড়াইয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

বৎসর-ছয়েক এই রকমেই কাটিল। ইতিমধ্যে সংসারে কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই; কেবল মাত্র মধু মণ্ডল তাহার মনিবের গোমস্তাগিরি ছাড়িয়া স্বয়ং তেজারতি ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে এবং যদু বিবাহ করিয়া বৌ ঘরে আনিয়াছে ও বিবাহের বৎসরেই তাহার শ্যালক মাণিকের সহযোগে একত্রে 'মণ্ডল ক্ষত্রিয়-সমাজ' প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। নববধূর সহিত প্রেমালাপ করিয়া যে সময়টুকু অবশিষ্ট থাকিত, তাহা সে সমাজের সেবায় ব্যয় করিত, কাজেই অন্য কাজ করিবার তাহার অবকাশ ছিল না। কদাচিৎ উদাসীকে খেলিতে দেখিলে সে তিরস্কার করিয়া তাহার স্ত্রীর কাছে পড়িতে পাঠাইত—এই প্রকারে উদাসী ষোল বৎসর বয়সে 'শিশুবোধ' শেষ করিল।

সেবার আশ্বিনে 'মণ্ডল ক্ষত্রিয়-সমাজের' বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে মণ্ডলপুর গ্রাম উৎসব-কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিল। অধিবেশন দিবসের একমাস পূর্ব হইতেই আয়োজন চলিতেছিল। গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের সহিত উদাসীও লাল কাগজের ফুল তৈয়ারীর কাজে লাগিয়া গেল। একদিন প্রভাতে দেবদারুপাতা ও লাল কাগজের ফুলে ঢাকা গ্রাম্যপথ দিয়া কলিকাতার নিমন্ত্রিত বক্তারা মধু মণ্ডলের বৈঠকখানায় পৌঁছিলেন; তাঁহাদের সঙ্গে আসিল যদুর বন্ধু ললিত। ললিত পড়িত কলেজে এবং সভা-সমিতিতে উদ্বোধন-সঙ্গীত গাহিয়া বেড়াইত; প্রয়োজন হইলে বাবরী দোলাইয়া বক্তৃতাও করিত। এই কারণে দেশের সকল প্রকার নেতার নিকট ললিতের বেশ সমাদর ছিল।

অধিবেশন শেষ হইয়া গেল এবং 'সুপ্ত মণ্ডল-সমাজের চেতনা-সঞ্চার' করিয়া বক্তারা পরের দিন কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন। যদুর সনির্বন্ধ অনুরোধে ললিত রহিয়া গেল। যদুর অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল, স্ত্রীকে গান শিখাইবে। এই উদ্দেশ্যে সে বরাভবণের অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে শ্বশুরের নিকট হইতে একটি হার্মোনিয়ামও আদায় করিয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সেটাকে কাজে লাগাইতে পারে নাই। এইবার সুযোগ ঘটিল। মধু মণ্ডল যদুর প্রস্তাবে মিহি রকমের একটু আপত্তি জানাইল, কিন্তু তাহা টিকিল না, অগত্যা বুড়া সুদ আদায় করিতে খাতা বগলে করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া ভিন্ গ্রামে চলিয়া গেল।

বুড়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু ছাত্রী বাহিরে আসিতে রাজী হইল না। তখন যদু উদাসীকে টানিয়া আনিল; বিশ্বাস ছিল একজন কেহ শিখিতে আরম্ভ করিলেই অপর ছাত্রীটিও আসিবে। উদাসী প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু মা কহিল, "ঘরের মেয়ে তোর লজ্জা কিসের? সহরের বড় মানুষের ছেলে গরজ ক'রে শেখাতে চাইছে, এ তো ভাগ্যি!"

অতএব ভাগ্যবতী উদাসী নতশিরে জড়সড় হইয়া শিক্ষকের সম্মুখে আসিয়া বসিল। ললিত মুহূর্ত্তের জন্য ছাত্রীটির সমস্ত দেহে একবার চোখ বুলাইয়া মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি গান শিখবে?"

উদাসী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

ললিত কহিল, "একটা গাও তো, যা পার।"

উদাসী কোনো মতে কহিল, "কিছু পারিনে।"

ললিত কহিল, "আচ্ছা, আমি গাই তুমি আমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে যাও।"—বলিয়া সে গান ধরিল কিন্তু অনেক যত্নেও উদাসীর কণ্ঠে সুর ফুটিল না। ললিত গাহিয়া চলিল; উদাসীর মনে হইতে লাগিল ললিতের গানের সুর যেন একটা বন্ধনপাশের মত তাহার দেহ-মনকে বাঁধিয়া ফেলিতেছে! যখন গান শেষ হইল তখনও উদাসী নড়িল না। ললিতের কথায় তাহার চমক ভাঙ্গিল। ললিত প্রশ্ন করিল, "তুমি এমনি গান গাইতে পারবে?"

উদাসী ললিতের দিকে না চাহিয়াই কহিল, "শিখলে পারব।"

যদু কহিল, "যেদিন তুই বাজানো শিখবি, সেদিন তোকে একটা নতুন বাজনা কিনে দেব।"

উদাসী খুসী হইয়া চলিয়া গেল। নূতন বাজনার লোভে অথবা যে কারণেই হোক্ পরদিন উদাসীকে গান শিখিতে যাইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে হইল না। দুই তিন দিনের মধ্যেই সে নিঃসঙ্কোচে ললিতের সঙ্গে সমানে সুর মিলাইয়া গান গাহিতে শিখিল।

মা কহিল, "আবাগীর এত গুণ কিছুই কাজে লাগল না, কপাল!"

যদু স্ত্রী কুমুদিনীর দিকে একটি বক্র-কটাক্ষ হানিয়া কহিল, "উদাসীর

বাঁ-পায়ের গুণ এ বাড়ীতে কারোর নেই।"

প্রথমে সঙ্কোচের বাঁধ যখন ভাঙ্গিল তখন আর উদাসীকে আয়ত্ত করিতে ললিতের বেগ পাইতে হইল না। চাবি টিপিতে শিখাইবার অছিলায় সে উদাসীর আঙ্গুল টিপিয়া দেয়, উদাসী আগেকার মত সসম্ভ্রমে হাত টানিয়া লয় না, সুরের কোমল তুলিতে শিখাইতে গিয়া উদাসীর মুখের কাছে মুখ লইয়া যায়, তাহার নিশ্বাস উদাসীর ঠোঁটে লাগে, উদাসীর শরীর কেমন যেন অবশ হইয়া আসে—তবু মুখ সরাইয়া লইতে ইচ্ছা করে না।

পূজা কাটিয়া গেছে। কোজাগরের রাত্রি; ললিত বিছানায় বসিয়া বাহিরে যেখানে ঘনপত্র তেঁতুলের ছায়ায় জ্যোৎস্নার টুকরাগুলি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল সেইদিকে চাহিয়া ছিল; উদাসী থালায় করিয়া কতকগুলি নারিকেলের নাড়ু আনিয়া থালাখানি সশব্দে ললিতের বিছানার উপর রাখিয়া ফিরিবার উপক্রম করিল। ললিত মুখ তুলিয়া কহিল, "চললে?"

উদাসী মুখ ফিরাইল।

ললিত কহিল, "কাল আমি চলে যাচ্ছি।"

উদাসী চমকিয়া উঠিল, মনে হইল—এই লোকটা চলিয়া গেলে তাহার যেন আর করিবার কিছু থাকিবে না। উদাসীর বিহ্বল ভাব ললিত লক্ষ্য করিল, মুহূর্তের মধ্যে উদাসীকে বুকের উপর টানিয়া আনিয়া কহিল, "তুমি আমাকে ভালবাস উদাসী?"

প্রশ্নের অর্থ উদাসী ভাল করিয়া বুঝিল না, ললিতের কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া তবু কহিল, "বাসি।"

সে রাত্রি আর উদাসীর চোখে ঘুম আসিল না।

পরদিনও ললিতের যাওয়া ঘটিল না। দীপান্বিতার পরদিন যদুর মাতার পায়ের ধূলা লইয়া ললিত কলিকাতা যাত্রা করিল। পূর্বদিন রাত্রিতে উদাসীকে নিভৃতে ডাকিয়া ললিত তাহার মুখে চুমা দিয়া কহিল, "আমি তোমাকে বিয়ে করব উদাসী।"

উদাসী চোখের জল মুছিয়া একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কবে?"

"কলকাতা গিয়ে সব ঠিক ক'রে চিঠি লিখব। যদু তোমাকে ইস্কুলে ভর্তি করতে সহরে নিয়ে যাবে সেই সময়।"

উদাসী ললিতের বুকে মাথা রাখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আচ্ছা।"

*

ললিত চলিয়া গিয়াছে, উদাসীর কিছু ভাল লাগে না। সঙ্গিনীরা আসিয়া ডাকিয়া যায়, উদাসী ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, সাড়া দেয় না। জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে দাঁড়াইয়া খেলা দেখে, খেলায় যোগ দিতে তাহার বিন্দুমাত্র আগ্রহই দেখা যায় না। ললিত তাহাকে ইংরাজী

শিখিতে বলিয়া গিয়াছিল, তাই শুধু পড়াশুনায় তাহার বিন্দুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। পূর্বে অতি প্রত্যূষে যখন সে ফুলের সাজি লইয়া বাহির হইত, আজকাল সে সময় ফার্ষ্ট-বুক খুলিয়া ইংরাজী শিখিতে বসে। যদু দেখিয়া খুসী হয়, আর মাঝে মাঝে উৎসাহ দিয়ে বলে, "বড়দিনের সময় সহরে গিয়ে তোকে ইস্কুলে দিয়ে আসব।"

উদাসী শুনিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে চীৎকার করিয়া এ, বি, সি, ডি পড়িতে থাকে।

কথা ছিল কলিকাতায় পেঁাছিয়া ললিত প্রতি সপ্তাহে একখানি করিয়া পত্র দিবে কিন্তু দাদার কাছে পেঁাছানো-খবরের এক পোষ্টকার্ড ছাড়া আর কোনও চিঠি সে লেখে নাই। যদুর পকেট হইতে চিঠিখানা চুরি করিয়া উদাসী রাখিয়াছিল; অবকাশ হইলেই সেখানা একবার করিয়া পড়িত; পড়িতে পড়িতে চিঠিখানার আদ্যোপান্ত উদাসীর মুখস্থ হইয়া গেল, তথাপি নূতন চিঠি আসিল না।

একদিন উদাসী ধরা পড়িয়া গেল, চিঠিখানা কোলের উপর রাখিয়া উন্মনা হইয়া বসিয়া ছিল, কুমুদিনী কখন যে আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছে তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। বৌদিদির কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া চিঠিখানা লুকাইবার উপক্রম করিতেই কুমুদিনী তাহার চিবুক ধরিয়া হাসিয়া কহিল, "কিলো, শকুন্তলা হ'য়েছিস যে!"

বলা আবশ্যক যে, কুমুদিনী গ্রামের মেয়ে-ইস্কুল হইতে উচ্চ-প্রাইমারী পাশ করিবার পর বটতলার কমবেশী ত্রিশখানা উপন্যাস পাঠ করিয়া এক রকম পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কুমুদিনীর কথায় বাঁ-হাতে চিঠিখানি মুড়িয়া উদাসী উঠিয়া দাঁড়াইল, কুমুদিনী চিঠিখানা ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেই উদাসী তাহার পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "তোমার পায়ে পড়ি বৌদিদি!"

তখনকার মত উদাসী বাঁচিয়া গেল কিন্তু বেশীক্ষণ আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইল না। আদর করিয়া ভুলাইয়া সন্ধ্যা নাগাইদ কুমুদিনী সমস্তই জানিয়া লইল। মনের মধ্যে যে আনন্দ ও সন্তাপ একত্র জমিয়া উঠিয়াছিল তাহার বোঝা একজনের কাছে নামাইতে পারিয়া উদাসীও বাঁচিয়া গেল। সকল শুনিয়া কুমুদিনী আদৌ বিস্ময় বা ক্রোধ প্রকাশ করিল না বরং ঠাট্টা করিয়া কহিল, "এবার জামাই-ষষ্ঠীতে আসতে ললিতকে চিঠি লিখে দেব, কেমন?"

উদাসী ছুটিয়া পলাইল।

মধ্যে উদাসীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া ললিত এক পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিল, তাহার পর মাস-দুই কাটিয়া গেল, উদাসী ফার্ষ্ট-বুক শেষ করিয়া সেকেণ্ড-বুক আরম্ভ করিল; তথাপি আর ললিতের কোন সংবাদ আসিল না।

কিছুদিন পর সহসা একদিন ব্যাগ হাতে করিয়া যদু কলিকাতা যাত্রা করিল ; উদাসী প্রণাম করিতে আসিয়া দাদার মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে পিছাইয়া গেল। পূর্বদিন রাত্রে কুমুদিনীর মুখে উদাসীর সম্বন্ধে একটি কথা শুনিয়া যদু দুর্ভাবনায় সারারাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই। হঠাৎ কলিকাতা যাইবার হেতু পিতা-মাতা উভয়েই জিজ্ঞাসা করিল। যদু উদাসীর দিকে একটি ক্রুদ্ধ-দৃষ্টি হানিয়া সংক্ষেপে কহিল, "কাজ আছে।"

দাদার মুখ দেখিয়া উদাসীর ভয় হইল। বৌদিদিকে নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কেন গেল বৌদি ?"

কুমুদিনী বিষণ্ণ মুখখানি যথাসম্ভব প্রফুল্ল করিয়া কহিল, "তোর বর খুঁজতে।"

উদাসী নিত্যকার মতই পলাইয়া গেল।

ছেলে-বৌতে ঝগড়া হইয়াছে মনে করিয়া বুড়ী এতদিন বৌকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে নাই, কিন্তু যখন সাত দিনেও যদু ফিরিল না তখন বুড়ী শঙ্কিত হইয়া যদুর অকস্মাৎ কলিকাতা গমনের কারণ বধূকে জিজ্ঞাসা করিল। দুর্ভাবনার ভার একা আর কুমুদিনী বহিতে পারিতেছিল না। যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া তাহার সন্দেহের কথা শাশুড়ীকে জানাইল। শুনিয়া দুই চোখ কপালে তুলিয়া বুড়ী মাটিতে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সেদিন সন্ধ্যায় কুমুদিনী উদাসীকে ঘরে টানিয়া আনিল। তাহার বাল্য-সখীদের বিবাহ হইবার অনেক পরে, বয়স হইয়া বিবাহ হইয়াছে, নারী-জীবনের অনেক রহস্য তাহার জানা ছিল। ললিত চলিয়া যাইবার পর হইতেই সে উদাসীকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছিল, মনে তাহার সম্বন্ধে একটা সংশয় জন্মিয়াছিল। যদুকে তাহার আভাসও সে দিয়াছে। কয়েক দিন হইতেই উদাসীকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিতেছিল, নিতান্ত সঙ্কোচের বশেই পারে নাই। আজ উদাসীকে ঘরে টানিয়া আনিয়া কুমুদিনী তাহার চিবুকে হাত দিয়া কহিল, "আমাকে লুকোবিনে উদাস ?"

বৌদিদি কি জিজ্ঞাসা করিবে উদাসী তাহা জানিত না ; কহিল, "না বৌদিদি।"

কিন্তু ইহার পর কুমুদিনী তাহাকে যে প্রশ্ন করিল তাহা শুনিয়া উদাসী লজ্জায় মরিয়া গেল। কুমুদিনী তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া অনেক বুঝাইল। উদাসী বৌদিদির বুকের কাপড়ে মুখ লুকাইয়া কোনমতে তাহার প্রশ্নের জবাব দিয়া গেল।

সমস্ত শুনিয়া কুমুদিনী কহিল, "ঘরে ব'সে থাক্ ! কারো সামনে বের হসনি, বুঝলি ?"

উদাসী বুঝিল না তথাপি প্রশ্ন না করিয়া কহিল, "আচ্ছা।"

কিছুকাল পর অতি কষ্টে মুখ তুলিয়া সে অপাঙ্গে একবার বৌদিদির

মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, বৌদিদির চমৎকার মুখখানি একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে।

কাহারও সম্মুখে বাহির হইতে কেন বৌদিদি তাহাকে নিষেধ করিয়াছে উদাসী তাহা বুঝিল না, বুঝিবার চেষ্টাও করিল না। তবে দেখিল, অকস্মাৎ সমস্ত বাড়ীখানা যেন তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া গিয়াছে। বাপ তাহাকে দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয়, মা বাঁ-হাতে ভাতের থালাখানি দূর হইতে ঠেলিয়া দেয়, উদাসী অভিমানে অর্দ্ধভুক্ত ভাতের রাশি ফেলিয়া উঠিয়া পড়ে, আগেকার মত কেহ আর সাধিয়া খাওয়ায় না। বেশী কথা বলা কোন কালে তাহার অভ্যাস ছিল না, সে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে না। যদুর বড় শালা মানিক ইতিপূর্ব্বে কোনোদিন তাহার সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহে নাই, আজ সে দরজার ফাঁক দিয়া চাহিয়া কেমন করিয়া হাসে। উদাসীর সর্বাঙ্গ শির্ শির্ করিয়া উঠে, সে ঘরে গিয়া শয্যা লয়।

বৌদিদি ব্যতীত কাহারও সহিত কোনদিন সে বেশী কথা কহিত না, কিন্তু সেই দিন বৌদিদিকে সেই কথা বলিবার পর আর সে তাহার সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহে নাই। কিন্তু সমস্ত বাড়ীখানার এই বিরূপ-মূর্ত্তি তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল।

সেদিন রাত্রে কুমুদিনী ঘরে আসিলে উদাসী তাহার হাত জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কি হ'য়েছে বৌদিদি? সবাই—" এই পর্য্যন্ত কহিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

এত বড় মেয়ে কিছু বোঝে না! কুমুদিনী অবাক হইয়া গেল। খানিক পরে উদাসীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "পাগলামি করিস্‌নে উদাস, স্থির হ'য়ে শোন্ বলছি।"

উদাসীর নিকট সত্য গোপন করিবার আর প্রয়োজন ছিল না। কুমুদিনী সমস্তই খুলিয়া বলিল। শুনিয়া উদাসী মুখ নীচু করিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল।

উদাসী সন্তানের জননী!

সহসা উদাসীর চক্ষের সম্মুখের একখানি যবনিকা যেন অপসৃত হইয়া গেল! বর্ষীয়সীদের মুখে এই আলোচনা সে একাধিকবার শুনিয়াছে, সঙ্গিনীরা একত্র বসিয়া নারীর এই পরিবর্ত্তনের অর্থ আবিষ্কারের বহু চেষ্টা করিয়াছে—কোনো দিন অর্থবোধ হয় নাই, আজ উদাসী বুঝিল! মাঝে মাঝে নিজ দেহের একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন উদাসীর চোখে পড়িত—সেটিকে উদাসী এ পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করে নাই, আজ লজ্জায় উদাসী—নিজের দিকে চাহিতে পারিল না। পরদিন সমস্ত দিনমান একখানি কাঁথা গায়ে জড়াইয়া সে ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিল।

ক্রমে কুমুদিনী ব্যাপারটির গুরুত্ব উদাসীকে বুঝাইয়া দিল। উদাসী

ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। গ্রামের আরও একটি মেয়ের কাহিনী—কতক তাহার জানা ছিল—তখন এ বিষয়ে তাহার জ্ঞান বিশেষ সচেতন ছিল না। অনেক দিনের কথা হইলেও আজ আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটি বিচিত্র-বর্ণের একখানি ছবির মত চোখে পড়িল। টুপি-পরা দারোগা ঘোড়ায় চড়িয়া আগে আগে চলিয়াছেন, তাঁহার পিছনে একবুক ঘোমটা-দেওয়া একটি মেয়ে, তাহার সঙ্গে দুই চোকীদার কনুই দিয়া তাহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে লইয়া চলিয়াছে, আর দুইধারে দাঁড়াইয়া গ্রামের কয়েকটি ছেলে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে—আর পিছনে একটি বুড়ী মাটিতে পড়িয়া মাথা কুটিতেছে। ইহার পর আর মেয়েটিকে সে দেখে নাই; কিন্তু পরদিন কি একটা ঘটিয়াছে শুনিয়া সখীদের সঙ্গে লুকাইয়া বুড়ীকে দেখিতে গিয়াছিল—দেখিল, গলায় ফাঁস দিয়া বুড়ী ঘরের চালা হইতে ঝুলিতেছে; তাহার চোখ দুটির কথা মনে হইয়া আজও উদাসীর ভয় হইল। মনে হইল, বুড়ীর মত তাহার মাও গলায় ফাঁস দিয়া ঝুলিবে হয়ত! উদাসী কাঁপিয়া উঠিল। কুমুদিনী চলিয়া যাইতেছিল, সহসা উদাসী তাহার পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া কহিল, "আমার কি হবে বৌদিদি?"

কুমুদিনী তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, 'ললিত তোকে বিয়ে করলেই সব মিটে যাবে। তোর দাদা সহরে তাকে আনতে গিয়েছে। ভয় কি?"

এই কথায় উদাসী অন্ধকারে আলো দেখিল। ললিত এ সংবাদ শুনিলে একদিনও বিলম্ব করিবে না, তাহাতে তাহার তিলমাত্রও সন্দেহ ছিল না। এমন কি ললিতের আগমন কল্পনায় রাত্রে তাহার সমস্ত দুর্ভাবনার যেন শেষ হইয়া গেল। সারারাত্রি নিজের অবস্থার কথা আর সে ভাবিতে পারিল না—বারবার ললিতের মুখখানিই মনে পড়িতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অন্ততঃ বিশবার উদাসী মা-সুবচনীর কাছে যুক্তকরে প্রার্থনা জানাইল, "হে মা, দাদার সঙ্গে যেন তাঁর দেখা হয়।"

মা-সুবচনী প্রার্থনা শুনিলেন, ললিতের সঙ্গে যদুর দেখা হইল।

ললিত কেবল সান্ধ্য-ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিয়াছে, সেই সময় যদু আসিয়া উপস্থিত হইল। ললিত হাসিয়া কহিল, "যদু যে! এত শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন?"

যদুর মাথায় খুন চাপিয়া গেল কিন্তু বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সে কহিল, "তোমাকে দেখতে এলাম। চিঠি-পত্র দাও না যে।"

ললিত কহিল, "সময় পাইনে ভাই! জান তো দেশের কাজ করতে গেলে—" তারপর কথা ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উদাসী কেমন আছে? ইস্কুলে ভর্ত্তি করতে চেয়েছিলে যে!"

যদু প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিল যে, যেমন করিয়াই হোক ললিতের সহিত

উদাসীর বিবাহ দিয়া এই কলঙ্কের শেষ মীমাংসা করিয়া ফেলিবে। ললিত যে উদাসীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছে স্ত্রীর মুখে সে-কথা সে শুনিয়াছিল।

ললিতের প্রশ্নে সুযোগ পাইয়া যদু কহিল, "তার জন্যেই ত আসা। সবার ইচ্ছে উদাসীকে তোমার হাতে দিয়ে—"

ললিত হাসিয়া কহিল, "বেশ তো, ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়ে যাও—গার্জ্জেন হ'য়ে দেখা-শোনা করব। দেশের নারীরা যদি—"

যদু বাধা দিয়া কহিল, "সে সব তুমি যা পারো ক'রো। উদাসীর বিয়ে দিতে চাই। তুমি তাকে—"

যদু কি বলিবে তাহা অনুমান করিয়া ললিতের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল; সন্ধ্যার অন্ধকারে যদু তাহা দেখিতে পাইল না।

ললিতকে নীরব দেখিয়া যদু কহিল, "উদাসী তার বৌদিদিকে সমস্ত বলেছে, এ অবস্থায়—"

ললিতের মুখ শুকাইল, চারিদিক চাহিয়া সে কহিল, "আমার মা আছেন জান তো। তাঁকে—"

আর ধৈর্য্য রাখা যদুর পক্ষে অসম্ভব হইল, সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "যখন আশা দিয়েছিলে, তখন তো মার কথা মনে করনি—আর আজ তাকে বিপদে ফেলে—" এই সঙ্গেই আরও কয়েকটি এমন কথা যদু কহিয়া গেল যাহা শুনিয়া যদুর হাতের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে ললিতের সাহসে কুলাইল না। সে দরজার কাছে সরিয়া গেল। যদু কহিল, "যদি তুমি তাকে বিয়ে না করো তা হ'লে—"

ললিত সে কথার স্পষ্ট জবাব না দিয়া কহিল, "তুমি একটু বাইরে চল যদু, তোমার শোবার ব্যবস্থাটা আগে করে আসি।"

যদু প্রশ্ন করিল, "কেন, এখানে?"

"অসুবিধে আছে।"

উভয়ে বাহির হইয়া গেল। হ্যারিসন রোডের এক হোটেলে যদুর থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া ললিত কহিল, "কাল সকালেই আমি আসব, তুমি থেকো। তখন সব কথাবার্ত্তা ক'য়ে এর ব্যবস্থা করব।"—বলিয়া ললিত বাহির হইয়া আসিল। যদু নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্তু পরদিন প্রাতে দশটা পর্য্যন্ত যদু অপেক্ষা করিল, তথাপি ললিত আসিল না। তখন সে নিজেই ললিতের মেসে গিয়া উপস্থিত হইল। মেসের ম্যানেজার কহিল, "তিনি তো কাল রাত্রেই মেদিনীপুর গেছেন, সেখানে সভায় তাঁকে গান গাইতে হবে।"

রুদ্ধ-নিশ্বাসে যদু কহিল, "কবে ফিরবেন?"

ম্যানেজার কহিল, "জিনিস-পত্তর সব নিয়েই গেছেন, কবে ফিরবেন ঠিক নেই।"

যদু বুঝিল যে ললিত পলাইয়াছে। তথাপি আরও দিন-কয়েক ললিতের জন্য সে অপেক্ষা করিল।

ললিত ফিরিল না।

শুধু উদাসী নহে, উদাসীর পিতা-মাতা ও কুমুদিনী সকলেই ললিতের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। ললিতের হাতে কোন মতে উদাসীকে সঁপিয়া দিতে পারিলেই মুক্তি! তাহার পর যাহা হয়, হোক। এই কল্পনাটুকু দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যেও সকলকে একটু স্বস্তি দিতেছিল; কাজেই যদু আসিয়া পেঁৗছিবামাত্র উদ্বিগ্ন উৎসুক-মুখে তিনটি প্রাণী যদুকে গিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। যদু চাপা-গলায় এক নিশ্বাসে ললিতের সহিত তাহার সাক্ষাতের বৃত্তান্ত কহিয়া গেল। শুনিয়া বুড়ী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মধু মণ্ডল পাংশু মুখে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে উপায়?"

যদু উদাসীর ঘরের দিকে চাহিয়া কহিল, "ভেবে দেখি।"

দিন-কয়েক হইতে উদাসী প্রতিদিন প্রত্যূষ হইতেই জানালা একটুখানি ফাঁক করিয়া নদীর ঘাটের পথের দিকে চাহিয়া থাকিত। এই পথ দিয়া ললিতের আসিবার কথা। আজও দাঁড়াইয়া ছিল। দাদাকে দেখিয়াই আর-একজনের প্রত্যাশায় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি আলুথালু চুলগুলি ললাট হইতে সরাইয়া আঁচলখানি ঘোমটার মত করিয়া মাথায় টানিয়া দিল। দাদা বাড়ীতে আসিয়া পেঁৗছিল, তথাপি আর কাহাকেও পথে দেখা গেল না। উদাসী ভাবিল—ললিত নৌকায় আছে, লজ্জায় আসিতে পারিতেছে না। কিন্তু সহসা মায়ের ক্রন্দন-স্বর শুনিয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে সে যদুর একটি কথা শুনিয়া বুঝিল যে, ললিত আসে নাই। উদাসীর আর নড়িবার সামর্থ্য রহিল না।

উদাসী আর ঘরের বাহির হয় না। দরজার ফাঁক দিয়া সে ঘরকন্নার কাজ দেখে; পূর্বে উদাসী ভিন্ন যে-কাজ হইত না, সে সকল কাজ মা একাই করিয়া যায়, মায়ের পাশে গিয়া একবার বসিতে উদাসীর ইচ্ছা করে, কিন্তু কেহ তাহাকে ডাকে না। সেদিন উদাসীর বুধী-গাইটি আসিয়া উৎপাত করিতেছিল, মধু মণ্ডল কিছুতেই তাহাকে রাখিতে পারিতেছিল না, উদাসী বাহিরে আসিয়া বুধীর গায়ে হাত দিতেই পিতা এমন করিয়া তাহার দিকে চাহিল যে, উদাসী দেখিয়া ভয়ে পিছাইয়া গেল।

মুমূর্ষু রোগীর কক্ষের দিকে যেমন-দৃষ্টিতে আত্মজন চাহিয়া থাকে, তাহার রুদ্ধদ্বার গৃহের দিকে তেমনি শঙ্কিত-নেত্রে সকলে চাহিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহে,—উদাসী দেখে। বৌদিদিও যেন কয়েকদিন হইতে কেমন হইয়া গিয়াছে। ভাল করিয়া কথা কহে না, কিছু জিজ্ঞাসা করিলে

রুখিয়া উঠে, উদাসী ভয়ে স্থবিরের মত বসিয়া থাকে। কুমুদিনী ভাতের থালা নীরবে ঘরের মধ্যে রাখিয়া চলিয়া যায়। কোনো-কিছুর প্রয়োজন আছে কি না তাহাও জিজ্ঞাসা করে না। সম্প্রতি তাহার সঙ্গিনীরাও বাড়ীর উপর দিয়া চলে না; পাড়ার মেয়েদের চলাচলের জন্য যে সঙ্কীর্ণ পথটি গৃহের পাশ দিয়া ছিল, যদু সেদিন একটা বেড়া দিয়া সেটাকে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সমস্ত দিন তাহার ঘরের সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া উদাসী বসিয়া থাকে। জানালা খুলিলেই মনে হয়, যেন আকাশের সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া মাটির গাছ-পালাগুলি পর্য্যন্ত তাহার দেহের অঙ্গ-বিশেষের দিকে চাহিয়া আছে। কলের পুতুলের মত ঘরের জিনিসগুলি নাড়াচাড়া করিয়া উদাসী দিন কাটাইয়া দেয়। নিজের অবস্থার কথা মনে হইলে গালে হাত দিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবে, ভাবনার যখন আর শেষ হয় না, তখন বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে।

এমনি করিয়া উদাসীর দিন কাটে।

সেদিন স্নানের ঘাট হইতে মা আসিয়া যদুর হাত ধরিয়া কহিল, "যা হয় একটা ব্যবস্থা কর্ বাপ! আর সহ্য হয় না যে!"

যদু বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্যাপারটি এই—উদাসীর মা ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিল, ও-পাড়ার গৃহিণীরাও ছিলেন। ঘোষ-গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদুর মা, উদোসকে দেখিনি যে অনেক দিন, কি হ'য়েছে?"

বুড়ী কাঁপিয়া উঠিল, কোনক্রমে কহিল, "জ্বর।"

ঘোষ-গিন্নী পাশ্বর্বর্ত্তিনী গৃহিণীর গা টিপিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া কহিলেন, "জ্বর! ওমা তা তো জানিনি! আজ গিয়ে দেখে আসব।"

বুড়ীর আর স্নান করা হইল না, একেবারে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

মধু মণ্ডল বাহির হইতে আসিয়া সমস্ত শুনিল, তাহার পর স্ত্রীর হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া রান্নাঘরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "যেমন গর্ভে ধরেছিলে তেমনি ভোগো!"

বুড়ী ধমক খাইয়া চুপ করিয়া গেল।

স্ত্রীকে ধমকাইয়া মধু মণ্ডল বাহিরে গিয়া ভাবিতে বসিল। সমস্ত ঠিক করিয়া উদাসীকে কাহারও সহিত কাশী পাঠাইয়া দিবে বুড়ার মনে এইরূপ একটা সঙ্কল্প ছিল। ভিতরে ভিতরে একটি ভাল-মানুষের সন্ধান চলিতেছিল, সহসা আজ স্ত্রীর কথা শুনিয়া তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। গ্রামের হালচাল সে ভালই জানিত—কোনক্রমে এ-সংবাদ বাহিরে কেহ জানিতে পারিলে থানা-পুলিশ পর্য্যন্ত গড়াইবে। তাহার পর যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই হইবে। ভাবিতে ভাবিতে বুড়ার সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিল।

যদু আসিয়া দেখিল, পিতা কাঠের মূর্তির মত বসিয়া আছে। যদুকে দেখিয়াই মধু মণ্ডল কহিল, "পাপ বিদেয় ক'রে দেরে যদু! শেষে বুড়ো কালে থানায় দিবি?"

গ্রামে উদাসীর কথা লইয়া কানা-ঘুষা চলিতেছে তাহা যদু শুনিয়াছিল। আজ বুঝিল, বিপদ আসন্ন। পুলিশের কথা শুনিয়া তাহারও ভয় হইল।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া মধু মণ্ডল কত কি ভাবিল। ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখিল যে, থানার সিপাহীরা আসিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোককে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। বুড়া 'গোবিন্দ! গোবিন্দ!' বলিয়া চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিল। তখন প্রায় ফর্সা হইয়াছে। দেখিল বাহিরের ঘরের রোয়াকে কে যেন একজন বসিয়া আছে। ডাকিল, "কে ও!"

উত্তর আসিল, "মফিজ চৌকীদার!"

মধু মণ্ডল বিমূঢ়ের মত খানিকক্ষণ চৌকীদারের দিকে চাহিয়া রহিল; পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, "শেখের-পো, এত সকালে যে?"

মফিজ শেখ সংক্ষেপে জানাইল যে, মণ্ডলের বিধবা কন্যার গর্ভ হইয়াছে, দারোগা-সাহেব এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে বাড়ীতে চৌকী দিবার জন্য মোতায়েন করিয়াছেন।

মধু মণ্ডল আতঙ্কে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল, মুখে তাহার আর কথা জোগাইল না।

রাত্রি শেষে উদাসীর তন্দ্রা-বোধ হইয়াছিল। হঠাৎ চৌকীদারের নাম শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার পর ঘরের বেড়া একটুখানি ফাঁক করিয়া চৌকীদারকে দেখিয়াই স্তম্ভিত হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই মেয়েটির কথা মনে পড়িল। আতঙ্কে আর্ত্তনাদ করিয়া কোণে সুপ্ত ছোট ভাইটিকে প্রাণপণ বলে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে উদাসী মুখ লুকাইল। হঠাৎ জাগিয়া ছোট ভাই নিধুও চীৎকার করিয়া উঠিল।

যদু চৌকীদারের আগমন-বার্ত্তা জানিত না; চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, উদাসী নিধুকে জড়াইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। যদু জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে নিধু?" নিধু কিছু কহিতে পারিল না, উদাসী বাহিরের দিকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া চাপাগলায় কহিল, 'চৌকীদার!'

মফিজ চৌকীদার যখন মধু মণ্ডলের নিকট হইতে পাঁচ টাকা মর্য্যাদা আদায় করিয়া সে-দিনের মত ফিরিয়া গেল, তখনও উদাসী ঘরের এক কোণে কলসীর আড়ালে একখানি মোটা কাঁথায় সর্বাঙ্গ মুড়িয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। দেখিতে দেখিতে দ্বিপ্রহর হইয়া গেল তথাপি সে উঠিল না। নিত্যকার মত কুমুদিনী—ভাতের থালা ঘরে রাখিয়া চলিয়া গেল। উদাসী পায়ের শব্দে চমকিত হইয়া একবার নিতান্ত অসহায়ের মত কুমুদিনীর মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কুমুদিনী কথা কহিল না। ক্রমে সমস্ত আঙ্গিনায় সন্ধ্যার

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, তবু সন্ধ্যাদীপ জ্বলিল না ; উদাসী অন্ধকারে বসিয়া রহিল। বাড়ীতে একটা কিসের নিঃশব্দ সন্ত্রস্ত আয়োজন চলিতেছিল—কাহারও অবকাশ ছিল না।

প্রহর রাত্রির শেষে বুড়ী একটি প্রদীপ লইয়া উদাসীর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ভাতের থালা তেমনই পড়িয়া আছে। উদাসী দুই হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া বসিয়া ছিল, বুড়ী তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল, "জন্মের মত এ-বাড়ীর ভাত দু'টো মুখে দিয়ে যা মা!" উদাসী মূঢ়ের মত মায়ের মুখের দিকে চাহিল, কিছু বলিল না। বাহির হইতে যদু চাপা-গলায় কহিল, "বড় দেরী হ'য়ে যাচ্ছে বেরিয়ে পড় মা!" কুমুদিনী বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া উদাসীকে বাহির করিয়া আনিল।

আঙ্গিনার অপর প্রান্তে কালো কম্বলে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া পুঁটুলী হাতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ছিল, সে মাণিক। নগদ পাঁচ শত টাকা পথ-খরচ পাইয়া তীর্থে কোনো ভাল-মানুষের হাতে উদাসীকে সমর্পণ করিয়া আসিতে সে রাজী হইয়াছিল।

বুক পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া উদাসী কলের পুতুলের মত বাড়ীর আঙ্গিনা পার হইয়া আসিল। পিতামাতা, ভাই কাহারও দিকে চাহিল না। তাহার শিউলীতলার খেলাঘরখানি যখন উদাসী ছাড়াইয়া গিয়াছে তখন বুড়ী গুটিকয়েক মুড়ির মোয়া পুঁটুলী করিয়া ছুটিয়া আসিল, "সারাদিন খাস্‌নি মা! নিয়ে যা!"

শিউলীতলায় অন্ধকারে মধু মণ্ডল দাঁড়াইয়া ছিল দৃঢ়-মুষ্টিতে স্ত্রীর হাত ধরিয়া সে কহিল, "চুপ!" উদাসী পিতা-মাতা উভয়ের কথাই শুনিল, কিন্তু ফিরিয়া চাহিল না।

মাঠে পড়িয়া মাণিক মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কষ্ট হচ্ছে উদোস ঠাকুর-ঝি?"

উদাসী কহিল, "না।"

মাণিক কহিল, "বাড়ীর ঘাটে গেলে লোক জানাজানি হবে, তাই সাতপুতের ঘাটে যাচ্ছি। বেশী নয় ক্রোশ-পাঁচেক।"

উদাসী অগাধ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "হোক!"

হোক। তবু এ-মুক্তি! এ মুক্তি! উদাসীর মাথার উপর সীমাহীন নীলাকাশ। চারিধারে প্রান্তরের বিস্তার। সম্মুখে মুক্ত দীর্ঘ পথ। অনেকদিন পরে আজ পৃথিবীকে উদাসীর ভাল লাগিল।

শীতের বাতাস হু হু করিয়া মাঠের উপর দিয়া বহিয়া গেল।

মাণিক উদাসীর গা ঘেঁষিয়া আসিয়া কহিল, "আর একটু জোরে পায়ে চলতে পারবে ঠাকুর-ঝি? আর ক্রোশ-দুই, ভোর না হতেই নৌকো নেব।"

কণ্টকবিক্ষত পায়ের দিকে একবার চাহিয়া উদাসী কহিল, "পারব।"

মাথার উপর দিয়া একটা পাখী ডাকিয়া গেল।

খানিক পথ গিয়া উদাসী কহিল, "একটু দাঁড়াও মাণিক-দাদা! জিরিয়ে নিই।"

মাণিক কহিল, "সর্বনাশ! ওই বাঁশ-বনের ওধারে থানা! এখানে কি দাঁড়ানো যায়!"

থানার নাম শুনিয়া উদাসী শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "তাহ'লে ছুটে চল মাণিক-দাদা!"

উভয়ে দ্রুত-পদে চলিল, কিন্তু অল্পকালের জন্য। পথের বাঁকের মুখে জোড়া বাবলা-তলায় দাঁড়াইয়া উদাসী কহিল, "আর পারব না মাণিক-দা! দম আটকে আসছে।"—কহিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া উদাসী বসিয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে সাতপুতের ঘাটের লোক—জোড়া বাবলা-তলায় আসিয়া দেখিল—দুই বাহু দিয়া একটি প্রাণহীন শিশুকে জড়াইয়া ধরিয়া রক্ত-লিপ্ত দেহে একটি কালো মেয়ে মুক্ত-আকাশের দিকে নিষ্প্রভ-নেত্রে চাহিয়া আছে। দেহে জীবন নাই।

সে কে কেহ তাহা জানিল না।

দেশে ফিরিতেছিলাম, সঙ্গীর মুখে এই কাহিনী শুনিতে শুনিতে কখন যে মাঠের মাঝখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি খেয়াল ছিল না।

সঙ্গী কহিল, "এ সেই জোড়া বাবলা-তলা!"

থমকিয়া দাঁড়াইলাম।

দক্ষিণের উদাস বাতাস হা হা করিয়া উদাসীর মাঠের বাবলার সারি দোলাইয়া চলিয়া গেল।

ক্যানভাসার

সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু গার্ড সবুজ নিশান দোলাইতে তাড়াতাড়ি সম্মুখের থার্ড ক্লাসেই উঠিয়া বসিলাম। ভদ্রবেশ দেখিয়া সামনের বেঞ্চের এক কোণ হইতে খানিকটা সরিয়া গিয়া একটি হিন্দুস্থানী যাত্রী কহিল, "বৈঠিয়ে বাবুজী!"

আমার একটি বদ্ অভ্যাস আছে, গাড়ীতে উঠিলেই ঘুম পায়। বসিয়া ঢুলিতে লাগিলাম। মেল ট্রেন, আধ ঘণ্টার মধ্যে আর কোথাও দাঁড়াইবে না। একটু তন্দ্রার আকর্ষণ হইতেছিল, কিন্তু ঘুমাইতে পারিলাম না। কে যেন ঠিক কানের কাছেই চীৎকার করিয়া উঠিল, "যদি বাঁচতে চান—"

সভয়ে চমকিয়া উঠিয়া চোখ মেলিলাম, দেখিলাম গাড়ীর কাঠের দেয়ালে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া একখানি মলিন ঝুটা-হাঁসিয়াদার লাল-র‍্যাপারে সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া কাঁসির আওয়াজে একজন আধাবয়সী শীর্ণকায় ভদ্রলোক বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহার বাঁ-হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ, ডান-হাতে লাল লেবেল লাগানো একটি শিশি।

"যদি বাঁচতে চান তবে আজই এক শিশি কিনে নিয়ে যান, নিয়ে গিয়ে যত্ন করে তুলে রেখে দিন, কাজে লাগবে। এতে কাশি সারে, হাঁপি সারে, উৎকাশি, খুৎকাশি, যক্ষ্মা, রাজযক্ষ্মা, আমাশয়, উদরাময়জনিত কাশি, সব সারে। শুধু কাশি নয় সকল রকম ব্যাধি সারে। ছোট ছেলের পেঁচোয় পাওয়া, মেয়েদের হিষ্টিরিয়া, চোখওঠা, কান দিয়ে পুঁয পড়া, বাত, আমবাত, গিঁট বাত, পক্ষাঘাত, দাদ, চুলকানি, পাঁচড়া সারে। এই যে ধন্বন্তরি বটিকা অনুপান ভেদে এতে না সারে—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ভদ্রলোক কাশিতে লাগিলেন। মিনিটখানেক অবিশ্রান্ত কাশিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভদ্রলোক আবার বক্তৃতা সুরু করিয়া দিলেন, "যদি বাঁচতে চান, ধন্বন্তরি বটি আজই কিনে নিয়ে যান। ফাঁকি নাই, গবর্ণমেণ্ট থেকে রেজেষ্টারী করা বড়ি, সর্ব্বরোগে ধন্বন্তরি। জ্বরে শিউলী-পাতা, কালাজ্বরে পান, পালাজ্বরে ক্ষেতপাঁপড়া, সর্দ্দিতে আদা, কাশিতে নিমপাতার রস, যক্ষ্মায় পিপুল, রাজযক্ষ্মায় বচ, নিউমোনিয়ায় যষ্টিমধুর গুঁড়ো দেবেন—এক বড়িতে জল হ'য়ে যাবে। কানে পুঁয হলে বড়ির সঙ্গে ফটকিরি পিষে একটি বার; দাদ চুলকানিতে তুঁতে আর পাঁচড়ায় চালমুগরার তেল গুলে। নেবেন?"

ভদ্রলোক একটু অগ্রসর হইয়া আসিলেন, "নেবেন? যাঁর বাড়ীতে ছেলে-মেয়ে আছে, বুড়ো-বুড়ি আছে, যুবক-যুবতী আছে, তাঁদের সবারই দরকার, নিয়ে যান। দাম বেশী নয়, বত্রিশ পয়সা, শিশিটা অমনি দিচ্ছি। ভাবুন মনে একবার আপনার সব ব্যারাম সারিয়ে, নিচ্ছি মোটে আট আনা—ডাক্তার ডাকলে এতগুলো ব্যারামে অন্তত চার-পাঁচশ টাকা খরচ হত। আসুন।"

বক্তৃতা ভালোই লাগিতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ আবার রসভঙ্গ হইল। ভদ্রলোক ভয়ানক কাশিতে লাগিলেন। কাশি থামিলে আবার বক্তৃতা আরম্ভ হইল। একটু মিহি আওয়াজে। "নেবেন? দেখুন ভেবে, বাড়ী গিয়ে হয় ত দেখবেন খুকীর জ্বর, খোকার পেট-বেদনা, গিন্নীর

হিস্টিরিয়া। হিস্টিরিয়া হ'লে দু'টি বড়ি শনি মঙ্গলবারে তিন ধাতুর মাদুলিতে ভ'রে লাল সুতোয় বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে দেবেন—বাস্ জল! আর সব ব্যারামের অনুপানের কাগজ পাবেন বিনি পয়সায়—আসুন!"

দুই একজন যাত্রী বেশ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, কোণের একটি লোক পকেটেও হাত দিল। দেখিয়া ভদ্রলোক স্মিতমুখে আরও একটু অগ্রসর হইয়া আসিলেন, "আসুন! এই ধন্বন্তরির বটি সব ব্যারামের দাঁতকপাটি—বত্রিশ বড়ি বত্রিশ পয়সা।" দুই একখানি হাত ধীরে ধীরে পকেট হইতে বাহির হইতেছে দেখিলাম। ভদ্রলোকের চোখ দু'টি আনন্দে হাসিয়া উঠিল; তিনি আবার গোড়া হইতেই সুরু করিলেন, "কাশি সারে, হাঁপি সারে—" কিন্তু এবারকার বক্তৃতাও বাধা পাইল, বক্তা আবার কাশিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় পিছন হইতে অল্পবয়সের একটি ছোকরা বিরক্ত হইয়া কহিয়া উঠিল, "দেখছি যে সবই সারে আপনার কাশিটা ছাড়া। থামুন!" ভদ্রলোকের মুখখানি সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। যে দুই একখানি হাত পকেট হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল সেগুলিও আবার পকেটে গিয়া ঢুকিল। ভদ্রলোক আর কথা কহিলেন না, শিশি-হাতে দেওয়ালে ঠেস দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কি মনে করিয়া আমি ডাকিলাম, "আসুন এদিকে।"

ভদ্রলোক মন্থরপদে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নেবেন?"

ঔষধ লইবার প্রয়োজন ছিল না, তবু একটি টাকা বাহির করিয়া কহিলাম, "দিন দু'শিশি।"

একটি নির্জীব হাস্যের সহিত টাকাটি পকেটে ফেলিয়া ক্যানভাসার কহিলেন, "আপনার হাতেই আজ বৌনি হ'ল। ভগবান আপনার—"

আমি বাধা দিয়া কহিলাম, "ওষুধটা আপনার?"

"আজ্ঞে, না। আমি ক্যানভাসার।"

"ক্যানভাসার! আমি ভেবেছিলাম—যাক্, মাইনে?"

চারিদিক একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া ক্যানভাসার কহিলেন, "পনেরো; তবে প্রোপাইটারের হুকুম কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতে হবে পঁয়ত্রিশ। তিনি বলেন, নইলে ওষুধের মান থাকে না। তবে কমিশন আছে। টাকায় দু'পয়সা।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাতে পোষায়?"

"এক রকম। না পোষালে চলে কি ক'রে? আর খেটে খেতে হবেই তো।"—বলিয়াই তিনি আবার কাশিতে কাশিতে লাল হইয়া উঠিলেন।

কাশি থামিলে কহিলাম, "কাশিটা তো ভাল নয় মনে হচ্ছে। নিজের ওষুধটাই—"

স্বর অত্যন্ত মৃদু করিয়া ভদ্রলোক কহিলেন, "ছাই হবে মশাই ! আমার এ তো কাশি নয়, কাল। কোনো রকমে মাসটা পেরিয়ে গেলেই বাঁচি। মেয়েটা বড্ড বড় হ'য়ে উঠেছে, ছুটি নিতে সাহসে কুলোচ্ছে না। হাজার-তিনেক শিশি বেচে দিতে পারলে টাকায় তিন পয়সা কমিশন দেবেন মালিক বলেছেন। মাইনে সমেত সাত দিনের ছুটি আর এক মাসের মাইনে আগাম, তারও আশা দিয়েছেন। মালিক লোক ভাল, তাঁতিপাড়ার ব্রজ পালকে চেনেন তো ? তিনিই।"

কোথায় বা তাঁতিপাড়া, কে বা ব্রজ পাল জানিতাম না, তবু সামনের ষ্টেশন পর্য্যন্ত গল্প চালাইবার অভিপ্রায়ে কহিলাম, "তাঁতিপাড়া, ব্রজ পাল ? তিনি বুঝি—"

ভদ্রলোক পরম উৎসাহের সহিত কহিলেন, "মহৎ লোক মশাই, মহৎ লোক ! কলকাতায় তিনতলা বাড়ী, কোম্পানীর কাগজ, চিটে গুড়ের কারবার। সবই এই বড়ি থেকে। বড়ি নয় তো সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী ! জনত্রিশেক ক্যানভাসার খাটছে !"

গাড়ীর গতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। ভদ্রলোক উঠিয়া কহিলেন, "তবে উঠি মশাই।"

কহিলাম, "বসুন। গাড়ী থামুক।"

ক্যানভাসার তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আজ্ঞে না। মালিক পাশের গাড়ীতে আছেন। গলার আওয়াজ না শুনলে ভাববেন বসে আছি।"—বলিয়া তারস্বরে ধন্বন্তরি বটিকার জয়কীর্ত্তন করিতে করিতে ভদ্রলোক নামিয়া গেলেন।

আমি সেকেণ্ড ক্লাশে গিয়া উঠিলাম, কামরায় আর একটি ভদ্রলোক আড় হইয়া শুইয়া আলবোলায় নল টানিতে টানিতে সম্ভবতঃ ভৃত্যকে ধমকাইতেছিলেন। সে বেচারী একটি রূপার রেকাবে গুটিকয়েক অর্দ্ধভুক্ত সন্দেশ লইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। আমাকে দেখিয়া ভদ্রলোক সোজা হইয়া বসিলেন। সন্ধ্যা-সূর্য্যের আলোকে তাঁহার চেনের লকেটের হীরাটি জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল। অপাঙ্গে একবার তাঁহাকে দেখিয়া লইলাম। বেশ মোটাসোটা, কালো ; পরনে মিহি ফরাসডাঙ্গার কাশীপাড় ধুতি, গায়ে রেশমের চুড়িদার পাঞ্জাবী, তাহাতে মতি-বসানো সোণার বোতাম, গলায় সোণার সরু শিক্‌লিতে ঝোলানো একখানা রূপার চৌকা তক্তি, ঘাড়ের কাছে কামানো, মাথায় কাঁচা-পাকা চুলে বাঁকা টেরী, পাণে লাল পুরু দুটি ঠোঁট, দুইটি চোখ ছোট কিন্তু উজ্জ্বল।

সহযাত্রীটির সহিত পরিচয়লাভের সূত্র খুঁজিতেছিলাম। সহসা ভদ্রলোক হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিয়া আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনাকেও ভজিয়েছে দেখছি !"

বুঝিতে পারিলাম না, কহিলাম, "কি বলুন তো ?"

আমার হাতের ধন্বন্তরি বড়ির শিশি দু'টি দেখাইয়া সমস্তগুলি দাঁত বাহির করিয়া পুনরায় ভদ্রলোক হাসিয়া উঠিলেন, "হাঁ। একেই বলে ক্যানভাসার ! তা বেশ করেছেন। দাম বেশী নেয়নি তো ? আমি সব ক্যানভাসারকে বারণ করে দিইছি এক পয়সা বেশী নিলে চাকরী থাকবে না।"

অনুমানে বুঝিলাম ইনিই সেই মালিক ব্রজ পাল। প্রশ্ন করিলাম, "আপনারই ওষুধ বুঝি ? কাটে ?"

ভদ্রলোক আর একবার হাসিলেন, "কাটে ! ক্ষুরের মত কাটে। জন-তিরিশ ক্যানভাসার খাটছে, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইনে—ওষুধের বাবা কাটবে মশাই। বসিয়ে কি আর কেউ মাইনে গোণে ?

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কতদিন বের করেছেন ? আগে তো নাম শুনিনি !"

ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "ব্রজ পালের ধন্বন্তরি বড়ির নাম শোনেন নি ? খবরের কাগজ পড়েন না বুঝি ?"

অত্যন্ত বিনীতভাবে কহিলাম, "আজ্ঞে বিজ্ঞাপনগুলো পড়বার ফুরসৎ পাইনে। তাই হয়তো—"

ভদ্রলোক যেন একটু উত্তেজিত হইলেন মনে হইল, কহিলেন, "তা যেন না দেখলেন, কিন্তু তাঁতিপাড়ার ধন্বন্তরি দেখেননি নাকি ? গাড়ী-বারান্দা-ওয়ালা লাল বাড়ীটা। চীনে মিস্ত্রির হাতের রেলিং। সাড়ে বারো কাঠা জমি, সেদিন জহুরী ছগনমল বলছিল—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ভদ্রলোক আবার হাসিয়া উঠিলেন, "শুনছেন ! মাইরি, বেড়ে রসিক লোক কিন্তু—শুনুন !"

কান পাতিলাম। পাশের গাড়ী হইতে দম আটকানো একটি কাশির শব্দ, আর তাহারই ফাঁকে ক্যানভাসারের কাশির আওয়াজে সেই পুরাতন বক্তৃতার কয়েকটি কথা শুনিতে পাইলাম,—"কাশি সারে হাঁপি সারে—"

ধন্বন্তরি বটিকার মালিক আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন, "বেড়ে রসিক, নামেও রসিক কাজেও—" বলিয়া ভদ্রলোক ভয়ানক হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ফীতোদরের উপর হীরার লকেটটি বারবার আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল, আমি নীরবে তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

ডাক্তার আসিয়া কহিয়া গেলেন, "কিছু না খাওয়াতে পারলে বাঁচানো যাবে না। যেমন ক'রে হোক্—"

মহেশ ডাক্তারের দুটি পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "যা হয় করুন ডাক্তার-বাবু, সব বেচে আপনার দেনা শুধব! খোকাকে আমায় ফিরিয়ে দিন।"

নিতাই ডাক্তার ম্লান হাসিয়া কহিলেন, "কি করি বল মহেশ, চেষ্টার তো ত্রুটি নেই দেখছ। না খেলে করি কি বল? আজ এই বড়িটা দিয়ে দাও, কাল সকালে আসব আবার।"

খোকার পোষা ছাগলটি বেচিয়া যে কয়টি টাকা আনিয়াছিল, তাহা ডাক্তারের পায়ের কাছে রাখিয়া মহেশ আবার কাঁদিয়া কহিল, "ভাল ওষুধ দিয়ে যান ডাক্তারবাবু। যত দাম লাগে—"

ডাক্তারবাবু মহেশের হাত ধরিয়া তুলিয়া কহিলেন, "দরকার হ'লে রাত্রে খবর দিও। আমি আজ বাড়ীতেই থাকব।" তারপর অচেতন-শিশু রোগীটির দিকে চাহিয়া একটি চাপা-নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

ঘরের কোণে খোকার চৌকীর পায়ের কাছে বসিয়া মহেশের স্ত্রী নীরবে চক্ষু মুছিতেছিল। মহেশ তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিল, "কেঁদে আর অকল্যাণ করিসনে, খোকার-মা। পাখাটা নিয়ে বোস্ একটুখানি। আমি মুর্গী-হাটাটা দেখে আসি।"

(২)

নিত্যানন্দ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের দপ্তরী মহেশ বৈষ্ণবের একমাত্র পুত্র মাখনলাল ওরফে খোকা। তিন মাসের মাহিনা জমাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে রাধারাণীর সোণার নথ গড়াইয়া দিয়া প্রৌঢ় বয়সে বৎসর পাঁচেক পূর্বে মহেশ সন্তান লাভ করিয়াছিল। শেষ বয়সের সন্তান; আদরের সীমা ছিল না! জন্মাবধি খোকার স্বাস্থ্য ভালই ছিল। দিন-পনেরো পূর্বে খোকার প্রথম জ্বর হয়। সঞ্চিত দুই কুড়ি টাকা ও স্ত্রীর একমাত্র অলঙ্কার মটর-মালা বন্ধক দিয়া যাহা পাইয়াছিল, তাহা দিয়া মহেশ খোকার চিকিৎসা করিল। কাল খোকার পোষা ছাগলটিও বেচিয়া আসিয়াছে।

রোগের প্রধান উপসর্গ আহারে আপত্তি। প্রথম প্রথম খোকা কিছু খাইত; আজ তিন-চারদিন পথ্য একেবারে বন্ধ। কিছু খাইতে বলিলে খোকা হেঁদল কুৎকুতে চাহিয়া বসে। এই অদ্ভুত বস্তুটি কি? মহেশ

তাহা বোঝে না। অনেক খুঁজিয়াছে। ফিরিঙ্গি-পাড়া হইতে নানা রকম পুতুল আসিল, খোকা মুখ বাঁকাইয়া টান দিয়া সেগুলিকে ফেলিয়া দিল। নানা স্থানে ব্যর্থ অন্বেষণ করিয়া আজ মহেশ হোঁদল কুৎকুতে খুঁজিতে মুগীহাটায় বাহির হইয়াছিল। সমস্ত দোকান আঁতি-পাঁতি খুঁজিয়া বেলা তিনটায় একেবারে ডাক্তার সঙ্গে করিয়া সে ফিরিল।

খোকার তখন চেতনা ছিল; পিতাকে দেখিয়া দুটি শীর্ণ হাত বাড়াইয়া সে ক্ষীণ-স্বরে কহিল, "বাবা, হোঁদল কুৎকুতে?"

মহেশ উড়ানীর মধ্য হইতে ভেড়ার লোমে তৈরী একটি পুতুল বাহির করিয়া কহিল, "এই যে বাবা!"

পুতুলটি হাতে লইয়া মাখন একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, তারপর ফেলিয়া দিয়া কহিল, "ধ্যেৎ!"

মহেশের মুখ ছোট হইয়া গেল! ছেলের বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে কহিল, "একটু দুধ খাও বাবা! এখুনি নতুন একটা এনে দেব।"

মাখন বিরক্ত হইয়া কহিল, "নাঃ।"

ডাক্তার অনেকক্ষণ দেখিয়া, যাইবার সময় সেই এক কথাই বলিয়া গেলেন, "যেমন ক'রে হোক পথ্য দেওয়াই চাই। নইলে—" তাহার পর কহিলেন, "আজ অমাবস্যা, একটু সাবধানে থেকো মহেশ!"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল, কাহারও মুখে কথা ফুটিল না। ডাক্তার চলিয়া গেলে মাটিতে লুটাইয়া খোকার-মা কাঁদিয়া উঠিল, "বুকের রক্ত দিয়ে তোমার পায়ে আল্‌তা পরাব রাধারাণী। খোকাকে আমার ফিরিয়ে দাও!"

সন্ধ্যা হইতে অনবরত প্রলাপ বকিতে বকিতে খোকা অবসন্ন হইয়া পড়িয়া ছিল। পিতা-মাতা ভাঙা একটি কেরোসিনের বাক্স পুত্রের চৌকীর কাছে টানিয়া তাহার উপর পাশাপাশি নিস্পন্দ বসিয়া নির্বাক-শঙ্কায় রুগ্ন-পুত্রের দিকে চাহিয়া ছিল। স্ত্রী ঘন ঘন অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছিল। আর মহেশের সমস্ত অন্তর বিশ্বসংসার মন্থন করিয়া হোঁদল কুৎকুতে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এই সময়ে খোকার ঠোঁট নড়িয়া উঠিল। পিতা-মাতা তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া শুনিল, খোকা কহিতেছে, "আয় আয়, হোঁদল কুৎকুতে আয় আয়।"

মহেশের চোখের উপর হইতে একখানি পর্দা যেন সরিয়া গেল। আর একদিনের কথা মনে পড়িল; সে দিনও এমনি করিয়া হাত নাড়িয়া খোকা 'হোঁদল কুৎকুতে' ডাকিতেছিল। তীর বেগে উঠিয়া মহেশ কহিল, "আমি এখুনি ফিরে আসছি খোকার-মা! ভয় পাসনি!"

মাইল-খানেক পথ উদ্‌ভ্রান্তের মত চলিয়া আসিয়া সিঙ্গিবাবুদের দরজায় যখন মহেশ দাঁড়াইল তখন প্রায় ভোর। দারোয়ান হরবন্‌শ পাঁড়ে ঢুলিতে-

ছিল ; পায়ের শব্দে উঠিয়া বন্দুক ঘাড়ে তুলিয়া কহিল, "কোন্ হ্যায় ?"

মহেশ দারোয়ানের হাত দু'টি ধরিয়া কহিল, "দারোয়ানজী ! বড়বাবুর সঙ্গে মোলাকাৎ—"

দারোয়ান না শুনিয়াই কহিল, "আঠ্ বাজে।"

মহেশ হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আট্‌টা পর্য্যন্ত বাঁচবে না যে দারোয়ানজী।"

মহেশের ক্রন্দনধ্বনি সম্ভবতঃ ভিতরে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। দোতলার গাড়ী-বারান্দা হইতে গম্ভীরশব্দে প্রশ্ন আসিল, "কোন্ হ্যায় দারোয়ান ?"

হরবন্‌শ কহিল, "নেহি জান্‌তা হুজুর ! রোতা হ্যায়।"

পূর্ব্ববৎ গম্ভীরস্বরে হুকুম আসিল, "লে আও !" বলিতে বলিতে বাবু নিজে মদের গ্লাস হাতে লইয়াই নামিয়া আসিলেন। মহেশ বাগানে ঢুকিয়াই দেখিল স্বয়ং বড়বাবু। সিঙ্গি-বাড়ীর এই ভীষণ প্রকৃতির মালিকটিকে ভয় করিত না এমন লোক সে পাড়ায় কেহ ছিল না। মহেশের সমস্ত গোলমাল হইয়া গেল, কথা যোগাইল না। সে নীরবে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। বড়বাবু তাঁহার বিপুল দেহভার সশব্দে একটি বেঞ্চের উপর নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা শুনাচ।"

মহেশের বুক কাঁপিতে লাগিল। তবু সে মাখনের জন্ম-বৃত্তান্ত কহিয়া গেল। কত হত্যা, ধর্‌না, মানসিক—তার পর পুত্রলাভ। শেষে হঠাৎ এই ব্যাধি। চিকিৎসার জন্য সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কিছুই হইল না। আজই সব শেষ হইয়া যাইবে, তবে বড়বাবু যদি একবার পায়ের ধূলা দেন তাহা হইলে—এই পর্য্যন্ত কহিয়াই মহেশের গলা ধরিয়া আসিল, আর কিছু বলা হইল না।

গ্লাসটি ঠোঁটের কাছ হইতে নামাইয়া বড়বাবু কহিলেন, "আমি গেলে কি হবে ?"

তখন খোকার বায়না হোঁদল কুৎকুতের কথা সবিস্তারে মহেশ কহিল। তার পর কহিল, "সারা সহর এরই জন্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি হুজুর ! কাল রাত্রে হঠাৎ মনে হ'ল—" মহেশ বলিতে গিয়া ভয়ে থামিয়া গেল।

বড়বাবু কহিলেন, "বল।"

মহেশ হাত যোড় করিয়া বড়বাবুর পায়ের দিকে চাহিয়া তাহার অনুমানের কথা কহিয়া গেল। খোকা সেদিন তাহার সঙ্গে সিঙ্গি-বাড়ীতে সখের যাত্রা শুনিতে আসিয়াছিল। পালায় সে রাত্রে বড়বাবু "হোঁদল কুৎকুতে" সাজিয়াছিলেন। পরদিন হইতেই খোকার জ্বর। বড়বাবুকে দেখিলেই সে ভাল হইয়া যাইবে, সে বড়বাবুকেই দেখিতে চায়।

বড়বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "বেশ ! চল।"

বড়বাবুকে সঙ্গে করিয়া মহেশ যখন আসিয়া পৌঁছিল, তখন খোকার

জ্ঞান ছিল। ছেলের কানের কাছে মুখ লইয়া মহেশ কি যেন কহিল, খোকা দু'টি চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "কই ?"

মহেশ বড়বাবুকে দেখাইয়া দিল।

খোকা বড়বাবুর দিকে চাহিয়া ক্ষীণ-স্বরে কহিল, "হোঁদল কুৎকুতে ! এঃ নাঃ।" তারপর আবার মুখ ফিরাইয়া লইল।

বড়বাবু অনেকক্ষণ শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে মাখনের কপালে হাত দিয়া কহিলেন, 'আমি হোঁদল কুৎকুতে এনে দেব খোকা, ভয় নেই।"

মহেশের স্ত্রী গলায় আঁচল জড়াইয়া বড়বাবুর পায়ের উপর পড়িয়া কহিল, "অপরাধ নেবেন না বাবা ! মা-বাপের মন—"

বেলা সাতটার সময় নিতাই ডাক্তার আসিয়া নাড়ী দেখিলেন, যাইবার সময় গম্ভীরমুখে কহিলেন, "বড় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ছে, মহেশ ! আমি আধঘণ্টার মধ্যে আসছি। তুমি একটু গরম জলের ব্যবস্থা কর।"

ডাক্তারের মুখের ভাব দেখিয়া মহেশের বুকের রক্ত যেন জল হইয়া গেল। স্ত্রী রান্নাঘরে ছিল, তাহাকে ডাকিতে যাইবে, এমন সময় দরজার সম্মুখে বড় গাড়ী থামিবার শব্দ পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে, "হোঁ হোঁ-দল কুৎকুতে !" বলিয়া সিঙ্গি-বাড়ীর বড়বাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সমস্ত মুখে আলকাতরা, তাহাতে তুলার পটী, মাথায় গাধার টুপী, গায়ে যাত্রার সংয়ের সেই সাতরঙ্গা ছেঁড়া চাপকান। মহেশ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। খোকা মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া দুই হাতে তালি দিয়া হাসিয়া কহিয়া উঠিল, "আয় ! আয় ! হোঁদল কুৎকুতে আয় ! আয় !"

বড়বাবু দুই হাতে খোকাকে বুকে তুলিয়া ছেঁড়া চাপকানটির পকেট হইতে এক গোছা আঙ্গুর বাহির করিয়া খোকার হাতে দিয়া কহিলেন, "খাও বাবা !"

আধঘণ্টা পরে নিতাই ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া অবাক্ হইয়া দেখিলেন, সিঙ্গি-বাড়ীর বড়বাবুর কোলে বসিয়া খোকা গল্প করিতে করিতে আঙ্গুর খাইতেছে। আর মহেশ ও খোকার-মা হাতযোড় করিয়া ঘরের কোণে প্রসন্ন-মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

জুয়াড়ী

সেদিন প্রাতে তিনহাটির মেলায় জুয়াড়ীদের বৈঠক বসিয়াছিল, বৈঠকের বিচার্য্য বস্তু ছিল জনৈক হিন্দুস্থানী জুয়াড়ী। কাল রাত্রে কোনো হতভাগ্যকে খেলায় নিঃস্ব করিয়া পরে তাহার সহসা করুণার উদ্রেক হয়; সে তাহাকে পাথেয় বাবদ দুই টাকা দিয়া বিদায় করে। কথাটি রটিতে বিলম্ব হইল না এবং অতি-অল্পক্ষণের মধ্যেই এই পরম দয়ালু হিন্দুস্থানী জুয়াড়ীর ছকে খেলোয়াড়দের ভিড় জমিয়া গেল। অন্যান্য জুয়াড়ীদের তাহা সহিল না, তাহারা তাহাদের সর্দার সতীশ কর্মকার ওরফে সতু জুয়াড়ীর কাছে গিয়া নালিশ করিল। তাহার ফলে আজিকার বৈঠক।

ভকত জুয়াড়ীর অবৈধ আচরণের দণ্ডের ব্যবস্থা লইয়া জুয়াড়ীদের মধ্যে আন্দোলন চলিতেছিল, তখন সতীশ আসিয়া পৌঁছিল। অতি শীর্ণকায়, দীর্ঘদেহ, কৃষ্ণবর্ণ— গলায় তুলসীর কণ্ঠী।

ভকতকে দেখিয়াই রক্ত-চক্ষু আরও আরক্ত করিয়া সতীশ কহিল, "কি হে দয়াময়!"

ভকত বিদ্রূপ বুঝিল না, বলিল, "হাঁ সর্দারজী! দয়া করবার লাগে। তুলসীদাস জীনে—"

"বেটা ছাতুখোর! খেলতে এসেছিস জুয়া—তুলসীদাসে তোর কাজ কিরে বাপু?"

এবার ভকত বুঝিল। তখন তুলসীদাস ছাড়িয়া সে একেবারে গুরু নানকের দোঁহা আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিল।

সতীশ ধমক দিয়া কহিল, "শোলোকে বলতে হয় ঠাকুর টিকিতে ফুল গুঁজে ঠাকুর-বাড়ী যাও। দয়া করতে গেলে এ মেলা ছাড়তে হবে!" বৎসরের খোরাক এই মেলা হইতেই ভকত যোগাড় করে—মেলা ছাড়িলে, আর অন্ন মিলিবে না।

ভয় পাইয়া ভকত কহিল, "কসুর মাপ করিও সর্দারজী, আর এ্যায়সা হোবে না।"

সতীশ খৈনির ডেলাটি মুখে ফেলিয়া কহিল, "আচ্ছা! যাও জরিমানা দিতে হবে পঞ্চাশ টাকা।"

ভকত বাঁচিয়া গেল, কহিল, "আপনার বহুৎ দয়া আছে সর্দারজী—টাকা আমি নিয়ে আসছি।" ভকত চলিয়া গেল।

সতীশ সকলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল—"জুয়াড়ীর দয়া! ভূতের মুখে রাম নাম আর কি?" সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সতীশ কহিল, "যা হোক! আজ অমাবস্যার পূজো, লোকের ভিড় হবে। দু'-এক পয়সার দান কেউ খেলবে না। দু'-আনা থেকে সুরু বুঝলে সব?" সকলে বিনা বাক্যে সতীশের আদেশ মানিয়া লইল। সতীশ চলিয়া গেল।

তিনহাটির মেলায় সতীশের প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। মেলার মালিকও তাহাকে খাতির করিয়া চলিতেন। কারণও ছিল। আজ কয়েক বৎসর হইল, পৈত্রিক স্বর্ণকারবৃত্তি ছাড়িয়া সতীশ জুয়ার ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল এই মেলাতেই। তখনও মেলার শৈশব অবস্থা। এই জমিদারের সহিত সতীশের পরিচয় হয়। পর বৎসর জমিদারের নির্দেশক্রমে মেলায় খেলিবার জন্য সতীশ একদল জুয়াড়ীর আমদানী করিল। দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যেই মেলা জাঁকিয়া গেল, সতীশের প্রতিষ্ঠার অন্ত রহিল না। লোক সংক্ষেপে তিনহাটির মেলার নাম দিয়াছিল, "জুয়ার মেলা"। প্রকৃত পক্ষে দোকান-পসারের অর্ধেক ছিল জুয়ার দোকান। আর মেলার এই অংশের প্রাণস্বরূপ ছিল সতীশ। জুয়াড়ীদের সুখ-সুবিধা দেখিবার ভার ছিল তাহার উপর—শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা—দারোগা-সিপাহীদের পার্বণী আদায় করা প্রভৃতি কাজ সেই করিত। এই একমাস তাহার বিশ্রাম রহিত না। শুধু পুত্র হরিদাসের কথা মনে হইলে সেদিন আর সতীশের খেলা জমিত না; বৎসর তেরো পূর্বে একদিন এই তিনহাটির মেলাতেই সে তাহাকে বিসর্জন দিয়া ঘরে ফিরিয়াছিল। ক্ষত শুকাইয়া গিয়াছিল বহুদিন, কিন্তু আজও স্মৃতির বিন্দুমাত্র আঘাতে তাহা হইতে রং ঝরিত।

অমাবস্যা। মেলায় রক্ষাকালী পূজো দারুণ ভিড়। চারিপাশে কতকগুলি লোহার চেয়ার, তাহার সম্মুখে প্রকাণ্ড একটি চৌকিতে ধোপদস্ত চাদর পাতা, দুই পাশে দুইটি ফুলদানী, মধ্যে একটি বারকোষে পানের খিলি ও বিড়ি, মাথার উপরে মোমবাতির ঝাড়—এই সরঞ্জাম লইয়া সন্ধ্যা হইতেই সতীশ তাহার জুয়ার আসর পাতিয়া বসিয়াছিল। এই দিনে মেলায় জমিদার ও চারিপাশের পল্লীর সম্পন্ন-ব্যক্তিরা সতীশের ছকে জুয়া খেলিতেন। পূর্বে ইহা নিতান্তই সখের ব্যাপার ছিল; সম্প্রতি বার্ষিকে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সতীশের নিমন্ত্রিত খেলোয়াড়দের দল তখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই; কিন্তু দোকানের চারি পাশে ভিড় কম ছিল না। অনেকগুলি দর্শক দাঁড়াইয়া সতীশের খেলা আরম্ভের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারা কেন দাঁড়াইয়া আছে সতীশ তাহা জানিত, তথাপি কহিল, "তোরা দাঁড়িয়ে ভিড় জমাস্ কেন? খেলতে পারবিনে—বড়দানের খেলা আজ।"

সম্মুখের লোকেরা কেহ কিছু কহিল না, কিন্তু পিছন হইতে একজন ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে আসিয়া কহিল, "পারব না—বটে! কেন? পয়সা নেই আমাদের,—না?"

সতীশ অপাঙ্গে এবার লোকটাকে দেখিয়া লইল। তাহার গায়ে লাল ফুলদার কামিজ, গলায় নানা বর্ণের ও উলের কম্ফটার, সদ্যতৈলাক্ত চুলে ঢেউ তোলা সিঁথি, কোমরে জড়ানো বেগুনী রংয়ের একখানা ফুলদার আলোয়ান। সতীশকে কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই হাতের ডবলস্প্রিংয়ের ছাতিটা কাঁধের উপর ফেলিয়া সে পুনরায় কহিল, "চাষার পয়সা নেই বুঝি, না? খেলা লাগাও।"

সতীশ বুঝিল লোকটি সদ্য কিছু পাট বেচিয়া আসিয়াছে। মনে মনে হাসিয়া কহিল, "বোস তবে মণ্ডলের-পো। তোমার হাতেই বৌনি হোক্। নাও ধর খিলি, বিড়ি নাও।"

খেলা সুরু হইল। প্রথম প্রথম দুই চারি দান সতীশ হারিল।

মণ্ডলের পুত্র হাসিয়া কহিল, "এইবার বড়দান লাগাও জুয়াড়ী ভাই।" আরও জনকয়েকের খেলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাহাদের সম্বল ছিল অল্প—মণ্ডলের পুত্রের প্রস্তাবে তাহারা আপত্তি জানাইল।

সতীশ হাসিয়া কহিল, "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। কি করব? টাকা টাকা দান।"

মণ্ডলের পুত্র কহিল, "উঁহু। পাঁচ টাকা।"

সতীশ মনে মনে হাসিল, মুখে কহিল, "রাজী। তোমার হাতেই ফকীর হলাম দেখছি!"

খেলা চলিল। পাঁচ টাকার দান ক্রমে দশ টাকায় উঠিল এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই মণ্ডলের পুত্রকে নিঃসম্বল করিয়া সতীশ হাসিয়া কহিল, "কেমন? আর কহ?"

মণ্ডলের পুত্রের মর্য্যাদায় আঘাত করিল। কোমর হইতে আলোয়ানখানি খুলিয়া জুয়ার ছকের কোণে রাখিয়া কহিল, "শেষ দান!"

বলা বাহুল্য, শেষ-দানেও মণ্ডল-পুত্রের ভাগ্য ফিরিল না।

বিবর্ণমুখে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া মণ্ডলের-পো কহিল, "আচ্ছা কাল হবে আবার।"

আলোয়ানখানি ভৃত্য গণেশের হাতে দিয়া সতীশ কহিল, "বেশ ত! আজ ধুনী জেবলে দেহটা একটু তাতিয়ে রেখো।"

অপমানে মণ্ডল-পুত্রের চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল—কথা না কহিয়া ভিড় ঠেলিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার দিকে চাহিয়া সতীশ একটু বিদ্রুপের হাসি হাসিল। তাহার পর সম্মুখের জনতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "তোরা যদি না খেলিস তবে ভিড় করিসনে—বাবুরা আসবেন। না, এলেন বুঝি—সরে দাঁড়া সব।"

জমিদারবাবুকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পল্লীর ভদ্র-সন্তানেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সতীশ উঠিয়া যুক্তকরে নমস্কার করিয়া সকলকে বসিতে অনুরোধ করিল। দুই একটি সাধারণ কথার পর খেলা আরম্ভ হইল।

টাকার খেলা ! তামার সম্পর্ক নাই। পাঁচ-পাঁচ টাকা দান ; প্রকাণ্ড জুয়ার ছকখানিতে শুধু টাকা—এক মুহূর্তে শূন্য হইয়া যায়, পর মুহূর্তে ভরিয়া উঠে। এত টাকা কোথা হইতে আসে, পিছনের লোকগুলা বিস্ময়ে তাহাই ভাবিতেছিল। রৌপ্যচক্রের ঝণৎধ্বনি ভিন্ন আর কোন শব্দ ছিল না, শুধু মাঝে মাঝে সতীশের কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল,—"মার দান। ডবল।"

ভিড়ের মধ্যে পুত্র হারানিধির হাত ধরিয়া রাখাল কেরাণী খেলা দেখিতে-ছিলেন। সম্মুখের জুয়ার ছকখানির দিকে চাহিয়া তাহার চক্ষু ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছিল, শুধু টাকা—এত টাকা ! এক সঙ্গে দেখিবার সৌভাগ্য রেজেষ্ট্রী অফিসের কেরাণী রাখাল ঘোষালের এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

রাত্রি প্রায় দশটা তখন খেলোয়াড়েরা উঠিলেন। সতীশ আপ্যায়ন করিয়া সকলকে বিদায় করিয়া দিল। ভকত জুয়াড়ী সংবাদ লইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি সর্দারজী। চিড়িয়া উড়্ গেল ?"

সতীশ ছকের কোণের টাকার পুঞ্জ দেখাইয়া সংক্ষেপে কহিল, "আর দম নেই। ছেড়ে দিলাম।" বলিয়া সম্মুখের লোকগুলোকে ডাকিয়া কহিল, "খেলোয়াড় আছিস কেউ, না ছক তুলব ?"

দুই একজন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। রাখাল কেরাণী হারুর হাত ধরিয়া সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "বোস্ হারু একটুখানি। একদান খেলি।"

সতীশ চোখ তুলিয়া কহিল, "কে কেরাণীবাবু দেখ্‌ছি যে ?"

ইতিপূর্বে দুই একবার সতীশ রাখাল কেরাণীকে দিয়া মনিঅর্ডার লিখাইয়া লইয়াছিল ; সেই হইতে অল্প পরিচয় ছিল।

রাখাল কেরাণী কহিলেন, "হাঁ খেলি একদান, কি বল ?"

"খেলবেন বইকি ! আপনাদের ভরসাতেই আসা, বসুন।"

"কম থেকেই সুরু করি, কি বলিস হারু ?" হারু কোন পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিল না।

রাখাল কেরাণী হাঁকিলেন, "দু'-আনা লাল পান।"

"তাই তো বরাত ভাল দেখছি আপনার—ডবল উঠেছে।" সতীশ দান তুলিয়া দেখাইল।

রাখালবাবু বিড়িতে আগুন দিয়া কহিলেন, "লাল পান আবার।"

সতীশ দান তুলিল, কেরাণীবাবু জিতিয়াছেন।

রাখাল হাসিয়া কহিলেন, "বরাৎ জুয়াড়ী-ভাই, বরাৎ।"

সতীশও হাসিল, কিন্তু রাখালবাবু তাহা দেখিতে পাইলেন না। খেলা চলিতে লাগিল। প্রত্যেক দানই রাখাল জিতিতেছিলেন। তাঁহার পাতা রুমালের উপর পুঞ্জীকৃত সিকি-দুয়ানিগুলি হারু নাড়াচাড়া করিতেছিল, এমন সময় সতীশ কহিয়া উঠিল, "দানে মেরেছি ঠাকুর। চিড়িতন খতম।"

রাখালবাবু বিন্দুমাত্র চঞ্চল না হইয়া কহিলেন, "চিড়িতন আবার। এক টাকা।"

"আবার খতম!" সতীশ হাঁকিল।

"বারবার তিনবার। দু'-টাকা।"

সতীশ হাসিয়া কহিল, "হবে না ঠাকুর। চিড়িতনে ঘুঁটির আড়ি।" দেখুন। চিড়িতন নেই।"

এবার রাখালবাবুর মাথায় খুন চাপিয়া গেল। চিড়িতনে খেলিয়া চলিলেন। খধূপ যেমন ঊর্ধ্বগতিতে মেঘলোকে উঠিয়া পরক্ষণেই দ্রুততর বেগে নীচে নামিতে থাকে, রাখালবাবুর ভাগ্যও তেমনি নামিতে লাগিল।

সতীশ কহিল, "এইবার ছুটি হোক্ কেরাণীবাবু!"

রাখাল রুখিয়া কহিলেন, "উঁহু! সে হবে না! শেষ না দেখে—" বলিয়া অবশিষ্ট পয়সাগুলি মুঠা করিয়া চিড়িতনের কোঠায় রাখিতে যাইবেন, এমন সময় হারু দুই হাতে পিতার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আর খেলো না বাবা!"

রাখাল হারুকে ধমক দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইলেন

সতীশ একবার হারুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলে বুঝি! বড্ড রোগা দেখছি যেন?"

"হুঁ!" এই সাতমাস জ্বরে ভুগে উঠেছে। যাক্‌কে তোল দান।"

সতীশ ঘুঁটি চালিতে গিয়া থামিয়া কহিল, "আর খেলবেন না কেরাণীবাবু! ঘরে যান।"

রাখাল অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "সে হবে না। হয় সব দিয়ে যাব তোমার ছকে, নইলে—"

সতীশ নীরবে ঘুঁটি চালিল, তিন জাহাজ! চিড়িতন নেই! রাখালের মাথার মধ্যে ওলট-পালট হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল যেন সতীশের জুয়ার ছকখানি তাহার দিকে চাহিয়া হি-হি করিয়া হাসিতেছে।

মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করিয়া রাখালবাবু কহিয়া উঠিলেন, "আর একদান! দে তো হারু, টাকা দু'টো।"

হারু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। রাখাল গর্জিয়া উঠিলেন, "টাকা দে হারামজাদা!"

হারু কাঁদ কাঁদ হইয়া চাদরের খুঁট পিতার দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল, "পুজোর টাকা যে বাবা!"

"হোক্! দে টাকা!"—বলিয়া রাখাল মুহূর্তের মধ্যে টাকা দু'টি বন্ধনমুক্ত করিয়া ছকের উপর রাখিয়া কহিলেন, "আবার চিড়িতন! লাগাও।"

সতীশ নীরবে টাকা রাখালের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, "হবে না ঠাকুর! এবারও চিড়িতন খতম্। ফির্‌দানে খেলো।"

"যায় যাবে, তোল দান !" রাখাল চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সতীশ ম্লান হাসিল, তারপর ঘুঁটি চালিয়া তুলিতে গিয়া আবার কহিল, "দান তুলে নাও ঠাকুর !"

"মিছে দেরী কোরো না। তোল—" রাখাল রুদ্ধ-নিশ্বাসে কহিলেন, টাকা তুলিতে।

সতীশের হাত কাঁপিয়া গেল, সে মৃদুস্বরে কহিল, "দুই লাল পান, এক জাহাজ, চিড়িতন নেই ঠাকুর !"

মুহূর্ত্তকালের জন্য রাখালের মুখখানা পাংশু হইয়া গেল। কোনো ক্রমে উঠিয়া হারুর হাত ধরিয়া কহিলেন, "চল্ হারু।"

সতীশ উঠিয়া হারুর হাতে টাকা দুইটি গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "ও পুজোর টাকা নিয়ে যাও খোকা।"

হারু টাকা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পিতার সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল, সতীশের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

সতীশ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কি জিদ্ ! বাপরে ! যাক্‌গে—তুই দান চাল গণ্‌শা, আমি একটু জিরিয়ে নিই।"

তখন চাষার দল খেলা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। গণেশ খেলিতেছিল। সতীশ কম্বল মুড়ী দিয়া একপাশে কাৎ হইয়া পড়িয়া ছিল, সহসা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল, "ও কিসের আওয়াজ রে গণ্‌শা ?"

"বলির বাজনা বাজছে বুঝি।" দান চালিতে চালিতে গণেশ কহিল।

সতীশ নিঃশব্দে নামিয়া পুজা-মণ্ডপের দিকে চলিয়া গেল।

সেই প্রতিমা, সেই চত্বর, সেই মেলা ! বহু পুরাতন কথাটি মনে পড়িয়া গেল। এমনই একটি দিনে পুত্র হরিদাসের মানৎ শোধ দিবার উপলক্ষ করিয়া এই মেলায় সে প্রথম আসিয়াছিল। জুয়ার ছকে যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়া জুয়াড়ীর নিকট দুইটি টাকা সে ভিক্ষা চাহিয়াছিল, পায় নাই।

পরদিন পুত্র হরিদাস অকস্মাৎ জন্মের মত ফাঁকি দিয়া গেল। পর বৎসর সতীশ মেলায় আসিল জুয়াড়ী হইয়া। বারো বৎসর আগেকার কথাগুলি বড় স্পষ্ট হইয়াই আজ মনে পড়িতেছিল। ভোগের বাজনা বাজিল, সেই সঙ্গে সতীশ স্পষ্ট শুনিল, হরিদাস কহিতেছে—"পুজোর টাকা বাবা !"

মেলার মণ্ডপে পুজোর বাজনা অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। ভাঙা ঘরখানির দাওয়ায় একটি কেরোসিন ল্যাম্পের সম্মুখে দুই হাঁটুর উপরে মাথা রাখিয়া রাখাল কেরাণী অপরাধীর মত নীরবে বসিয়া ছিলেন। আঙ্গিনায় স্ত্রী মাতঙ্গিনী হারুকে প্রাণপণ-বলে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মাথা খুঁড়িয়া

কাঁদিতেছিলেন, "এবারকার মত ঘেন্না-ঘেন্না ক'রে রেখে যেও মা! আসছে বার বুক চিরে রক্ত দিয়ে পুজো দেব!" মায়ের সঙ্গে হারুও কাঁদিতেছিল।

এমন সময় নিঃশব্দে আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া কে হাঁকিল, "বাড়ীতে আছ ঠাকুর?"

রাখাল কেরাণী চমকিয়া উঠিলেন, অকস্মাৎ সতীশ-জুয়াড়ীকে দেখিয়া তাঁহার হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। সতীশ সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া সন্ত্রস্ত মাতঙ্গিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাথার ঝাঁকা মাটিতে নামাইয়া কহিল, "প্রসাদ নাও মা। খোকার মানৎ দিয়ে এলাম, পুজোর টাকা রেখে ঠাকুর যে কোন দিক দিয়ে—" বলিয়াই সে রাখাল কেরাণীর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর হারুর হাত ধরিয়া কহিল, "মাকে বল খোকা, আজ এখানেই দু'টো প্রসাদ পাবো।"

পরদিন প্রাতে জুয়াড়ীর দল সবিস্ময়ে দেখিল যে, জুয়ার ছকখানি গুটাইয়া সতীশ নীরবে বসিয়া আছে।

দীনু-জুয়াড়ী জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি ওস্তাদ?"

সতীশ ম্লানহাস্যে কহিল, "আর খেলা হবে না দাদা! সব হেরে গেছি।"

বলা বাহুল্য সে কথা কেহ বিশ্বাস করিল না।

ঊর্ধ্বরেখা

ননী হালদার ও মাখন বিশ্বাস উভয়েই ক্যাপিটাল খুঁজিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে পরিচয়ও ছিল না; ননী হালদার শ্যামবাজারে একটি ছোট ষ্টীল ট্রাঙ্কের দোকানের পাশে অতি ছোট একখানি ত্রিকোণ কামরা ভাড়া করিয়া দরজায় সাইনবোর্ড লটকাইয়া দিয়াছিলেন, "বৃহৎ জ্যোতির্বিজ্ঞান বিদ্যালয়। ফলিত-জ্যোতিষ গণিত-জ্যোতিষ সম্বন্ধে নির্ভুল গণনা। পরীক্ষায় পাশ-ফেল, রেসের হার-জিত, ব্যবসায়ে উন্নতি-অবনতি বিষয়ে বিশুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী। অধ্যাপক জ্যোতিষী শ্রীননীগোপাল হালদার, জ্যোতিরম্বু-বাচস্পতি।" ছিদাম ময়রার লেনের বিখ্যাত কস্‌মোপলিটান্‌ ফেডারেটেড্‌ হোমিও ইউনিভারসিটি হইতে এম-বি (হোমিও) পাশ করিয়া ননী হালদার শা'পুরে প্রথমে চিকিৎসালয় খুলিয়াছিলেন, কিন্তু মূলধনের অভাবে তাহা চলিল না। কলিকাতায় জ্যোতিষীর ব্যবসায়ে সহজে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিবেন স্থির করিয়া অতঃপর তিনি সহরে আসিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বহিগুলি বাঁধাইয়া তাহার পিছনে সোণার হরফে

জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রচলিত ও অপ্রচলিত সুলভ ও দুর্লভ বহির নাম লিখাইয়া লইলেন। একটি ভাঙা আলমারি মেরামত করিয়া তাহার উপরের তাকে সেগুলি সাজাইয়া নীচের তাকে রাখিলেন। খান-ত্রিশেক পুরাতন পঞ্জিকা। আলমারি ছাড়া ঘরের আসবাব একখানা তক্তাপোষ, তাহার উপর একখানি ছেঁড়া সতরঞ্চি পরিষ্কার বোম্বাই চাদর দিয়া ঢাকা। ফরাসের উপর একখানা পেণ্টবোর্ডে করতলের একটি নক্‌সা ও একটি ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস।

মাখন বিশ্বাস ঘরভাড়া লইয়াছিলেন ভবানীপুরে। অভিরাম ত্রিপাঠীর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেলের ৬ ফুট × ৪ ফুট একতলার একটি কামরা ভাড়া করিয়া মাসখানেক হইতে বাস করিতেছিলেন। দালালী ব্যবসায়ে কিছু মূলধন সংগ্রহ করিয়া অবশেষে একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন—সেই সঙ্গে 'সৌভাগ্য-মাদুলী' ও 'ভাগ্যোদয় কবচে'র কারবার করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। ক্যাপিটাল জুটিয়াও জুটিতেছিল না। সতেরো নম্বরের বাড়ীখানির একটা গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারিলেই হয়! গ্রাহকেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু কোন ক্রমেই দেউড়ীর দরোয়ানকে এড়াইয়া মাখন বিশ্বাস ভিতরে ঢুকিতে পারিলেন না। একখানি মোটর গাড়ীও বিক্রয়ের জন্য ছিল। দিনকয়েক আগে এক সাহেবের বাড়ীর সম্মুখে হাঁটাহাঁটি করিয়া মনে মনে বলিবার কথাগুলি স্থির করিয়া লইয়া মাখন বিশ্বাস ভিতরে ঢুকিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দূর হইতে সাহেবের চেহারা দেখিয়াই তাঁহার বুকের পুরাতন স্পন্দন ব্যাধিটা বাড়িয়া উঠিল—তিনি একেবারে ভবানীপুরে ফিরিয়া আসিলেন। দমদমার বাগানবাড়ীটার খরিদ্দার জুটাইয়া দিতে পারিলে এক থোকে পাঁচ হাজার টাকা মিলিয়া যায়। বাগানবাড়ীর মালিকও অনবরত তাগিদ দিতেছিল—তিন-চার দিনের মধ্যে তাঁহার বাড়ী বিক্রয় হওয়া চাই-ই, নতুবা তিনি অন্য দালাল দেখিবেন। মাখন বিশ্বাস প্রাণপণ করিতে লাগিলেন, কাশীপুর হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানের সম্ভব-অসম্ভব সর্ব্বপ্রকার খরিদ্দারের বাড়ীর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া যানে এবং পদব্রজে ঘুরিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। বাড়ীর ভিতরে ঢুকিলেই বুকের ব্যাধিটা দেখা দিত: অবশেষে দুই টাকা ভিজিট দিয়া ডাক্তার ডাকিয়া বুক দেখাইলেন এবং সাড়ে-এগারো আনায় প্রেসক্রপসন অনুযায়ী ছয় দাগ ঔষধ আনাইয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিয়া প্রাতে বুকে হাত দিয়া অনুভব করিলেন যে, ব্যাধিটা অনেক কম পড়িয়া আসিয়াছে, অতএব তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া মাখন বিশ্বাস মহারাজ সম্পৎ রায়ের বাড়ীর সন্ধানে বাহির হইয়া গেলেন। মহারাজ সম্পৎ রায় একটি বড় বাগানবাড়ী খুঁজিতেছেন—এ কথা মাখন বিশ্বাস গত সন্ধ্যায় শুনিয়াছিলেন ট্রামে।

রাজবাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাখন বিশ্বাস বুকে হাত দিয়া দেখিলেন

যে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা স্বাভাবিক। চোখ বুজিয়া দেউড়ীর দরোয়ানকে এড়াইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া আর একবার বুকে হাত দিলেন, দেখিলেন অবস্থা পূর্ববৎ। মনে সাহস হইল, কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে মাখন বিশ্বাস বরাবর ড্রয়িংরুমে গিয়া ঢুকিলেন। সেখানে প্রথমেই মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী বলদেও প্রসাদের সহিত তাঁহার দেখা হইল। বলদেও প্রসাদের ঢেউতোলা টেরী, বিরাট গোঁফ, হীরা-বসানো সোণার বোতাম, জরির নাগরা ও আরক্ত-চক্ষু দেখিয়া মাখন বিশ্বাসের বুকের ব্যাধিটা দেখা দিবার উপক্রম করিতে লাগিল। সেক্রেটারী মাখন বিশ্বাসের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং উত্তরে হিন্দি, ইংরাজী ও বাঙ্গালা তিন ভাষার সমাবেশে কি বলিলেন তাহা তাঁহার মনে রহিল না। কিছুকাল পর মাখন বিশ্বাস দেখিলেন যে, তিনি সদর রাস্তায় বুকে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রাজবাড়ীর সিংহদ্বারের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছেন।

হঠাৎ আপনার হৃৎপিণ্ডটার উপর মাখন বিশ্বাসের দারুণ ক্রোধ জন্মিয়া গেল। সাহেব ডাক্তারের দ্বারা হৃৎপিণ্ডকে সমুচিত শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়া তিনি পথ ধরিলেন। মোড় ফিরিতেই বৃহৎ জ্যোতির্বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড চোখে পড়িল: মাখন বিশ্বাস থমকিয়া দাঁড়াইলেন, ভাবিলেন সর্বপ্রথম অদৃষ্ট-বিচার করানোই সঙ্গত। কারণ, অদৃষ্টে অর্থলাভ না থাকিলে সাহেব-ডাক্তার ডাকিয়া হৃৎপিণ্ডের জন্য ষোল টাকা ব্যয় করা একেবারেই অনর্থক। এই ভাবিয়া তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে ঢুকিলেন,—ননী হালদার গম্ভীর-মুখে অর্ধনিমীলিত-নেত্রে ফরাসের একটি কোণ দেখাইয়া কহিলেন, "বসুন।"

এইরূপে মূলধনের দুই সন্ধানীর পরিচয় হইল।

ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস চোখে দিয়া মাখন বিশ্বাসের প্রসারিত দক্ষিণ করতলের দিকে চাহিয়া ননী হালদার কহিলেন, "উচ্চস্থান" হইতে পতন। আপনি কখনও উপর থেকে পড়েছিলেন কি?"

মাখন বিশ্বাস অতীত জীবনটি একবার মনে মনে আবৃত্তি করিয়া গেলেন। গত বৎসর গ্রামের বারোয়ারী তলায় "প্রফুল্লের" অভিনয়ে যোগেশ সাজিয়া জ্ঞানদাকে পদাঘাত করিবার সময় অভিনয়ের বংশমঞ্চ ভাঙিয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন, সে কথা মনে পড়িল, কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনার পিতা—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মারা গেছেন।"

"আহা!! আপনি বলবেন না, সে তো আমিই বলব। মারা গেছেন? কত বয়সে?"

"এই পঞ্চাশ-একান্ন!"

"উঁহু! বায়ান্ন বৎসর একমাস তাঁর পরমায়ু ছিল।"

"আচ্ছা মাকে জিজ্ঞাসা করব।"

"করবেন। এখন আপনার ভবিষ্যৎ—"

"বলুন! তাই শুনতেই আসা। বড় মুস্কিল!"

"কিছু বলবেন না, আমিই বলব। মুস্কিলও আছে, আসানও আছে, ভয় পাবেন না। চমৎকার ঊর্ধ্বরেখা দেখছি।"

"সবই তো আছে, কিন্তু বুকের ব্যাধিটা—"

ননী হালদার চক্ষু একটু নিমীলিত করিয়া কহিলেন, "ওটা ব্যাধি নয়, যন্ত্রণা। বেদনা করে, কাঁপেও, দমও আটকায়, কেমন?"

"আজ্ঞে কাঁপুনিই বেশী।" মাখন বিশ্বাস কহিলেন।

"হ্যাঁ তা জানি, এই দেখুন এইটে হচ্ছে হৃদ্-রেখা—কাঁপতে কাঁপতে উপরে উঠেছে। কাঁপুনিটা কি সদ্যঃ হয়েছে না বরাবর ছিল?"

মাখন বিশ্বাস আবার একটু ভাবিয়া দেখিলেন। ইস্কুলে থার্ড মাষ্টারকে দেখিলে বুক কাঁপিত। তাহার পর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার সময় অঙ্কের প্রশ্ন-পত্র পড়িয়া বুক কাঁপিয়াছিল প্রায় আধ ঘণ্টা।

"আজ্ঞে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার সময় খুব একদিন কেঁপেছিল! সে প্রায় দশ বছরের কথা।"

ননী হালদার গম্ভীর-মুখে কহিলেন, "তার পরও তো কম্পন দেখছি। ভেবে দেখুন।"

আর একদিনের কথা মনে পড়িয়া মাখন বিশ্বাসের মুখ লাল হইয়া উঠিল। প্রায় বৎসর পাঁচেক পূর্বে বিবাহের পর ফুলশয্যার রাত্রে নববধূর সহিত প্রথম কথা কহিতে গিয়া তাঁহার দারুণ হৃৎস্পন্দন উপস্থিত হইয়াছিল; সমস্ত রাত্রি আর সে কাঁপুনি থামে নাই। শেষে শীতের দোহাই দিয়া সেই জ্যৈষ্ঠ মাসেও তিনি কাঁথা মুড়ি দিয়া রাত্রি কাটাইয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা কহিতে মাখন বিশ্বাসের বাধিয়া গেল।

ননী হালদার মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "কম্পমান আরও হ'য়েছে, এখনও হয়, তবে থাকবে না। যে রকম ঊর্ধ্বরেখা দেখছি তাতে—"

মাখন বিশ্বাস সোৎসাহে কহিলেন, "হবে কি কিছু? না, বুকের কাঁপুনিতেই সব ভেস্তে যাবে?"

"উঁহু! ধনলাভ, ব্যবসায়ে উন্নতি সবই স্পষ্ট দেখছি। এই দেখুন ঊর্ধ্বরেখা কম্পন-রেখা ভেদ ক'রে বরাবর তর্জনীর মূলে গিয়ে ঠেকেছে। অচিরাৎ আপনার অর্থলাভ হবে, কাঁপুনিতে আটকাবে না। যা বললাম নিশ্চিন্ত থাকুন, জ্যোতির্ব্বিদ হালদারের কথা মিথ্যা হয় না। এ পর্য্যন্ত হয়নি!"

মাখন বিশ্বাসের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "বাঁচালেন মশাই! আপনার কথা শুনে ভরসা হচ্ছে। কথা যদি ফলে সকলের আগে আপনার সঙ্গে দেখা করব।"—বলিয়া দুটি টাকা ফরাসের উপর ননী হালদারের সম্মুখে রাখিয়া মাখন বিশ্বাস দ্বিতীয়বার নমস্কার করিয়া স্মিতমুখে বাহির হইয়া গেলেন।

ননী হালদারের সম্মুখে লজ্জায় নিজের করতলের দিকে মাখন বিশ্বাস ভালো করিয়া চাহিতে পারেন নাই, পথে আসিয়া ঊর্ধ্বরেখাটি একবার দেখিয়া লইলেন; স্পষ্ট-রেখা একেবারে সোজা উপরে উঠিয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ তাঁহার বুকে দারুণ বল হইল; ট্রাম আসিতেছিল, মাখন বিশ্বাস হাঁকিলেন, "এই বাঁধকে।"

ট্রামের ফাষ্ট ক্লাশে উঠিয়া মাখন বিশ্বাস নিজের এই সাহসে নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কোন দিন তিনি ডাকিয়া ট্রাম থামান নাই, বরাবর ছাতি তুলিয়া দাঁড়াইতেন, কোনো ট্রাম থামিত, কোনো ট্রাম থামিত না। আজ ডাকিয়া ট্রাম থামাইলেন অথচ বুক কাঁপিল না, নিশ্চিত শুভ-লক্ষণ। ঊর্ধ্বরেখার ফল ফলিতেছে।

হোটেলে পৌঁছিয়াই মাখন বিশ্বাস হুকুম করিলেন, "ঝি গরম জল ক'রে দাও শীগ্‌গির।"

ঝি প্রত্যহের মত আপত্তি জানাইয়া কহিল, "এত বেলায় হবে না বাপু।"

"হবে না। হতেই হবে। ঠাকুরকে বলগে, না পারে চায়ের দোকান থেকে নিয়ে আসুক। রোজ রোজ চালাকি চলবে না!"

ঝি মাখনবাবুর এরূপ মূর্ত্তি আর পূর্ব্বে দেখে নাই। আশ্চর্য্য হইয়া ঠাকুরকে বাবুর হুকুম শুনাইতে চলিয়া গেল।

স্নান করিবার সময় করতল সাবানে পরিষ্কার করিয়া মাখন বিশ্বাস দেখিলেন যে, ঊর্ধ্বরেখা আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

বৈকালে দিবা-নিদ্রা সারিয়া কেবল মাখনবাবু বাহির হইলেন, এমন সময় বাগান-বাড়ীর মালিক আসিয়া উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু ক'রে উঠতে পারলেন, না অন্য দালাল—"

মাখন বিশ্বাসের মেজাজ এই কথা শুনিয়া হঠাৎ আজ রুক্ষ হইয়া গেল, কহিলেন, "সে যা ইচ্ছা করতে পারেন। তবে বাড়ী বেচবার ইচ্ছে থাকলে আসবেন একবার সন্ধ্যার পর, দেখব।"

বাড়ীর মালিক এক গাল হাসিয়া কহিলেন, "তা'হলে কিছু করেছেন বলুন! আপনার মুখ দেখে—"

"সে পরে শুনবেন মশাই, এখন বেরোচ্ছি, কথা বলবার সময় নেই।"—বলিয়া মাখনবাবু ট্রামের সন্ধানে চলিলেন।

মহারাজ সম্পৎ রায়ের দেউড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাখনবাবু একবার বুকে হাত দিলেন, বুক কাঁপিতেছে না। দক্ষিণ করতলও দেখিয়া লইলেন। মনে হইল ঊর্ধ্বরেখাটি যেন রাজবাড়ীর দেউড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর মহারাজ সম্পৎ রায়ের দোতলায় গিয়া উঠিয়াছে। দেউড়ী দিয়া ঢুকিয়া ড্রয়িং-রুমে গিয়া মাখনবাবু চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। সেক্রেটারী বলদেও প্রসাদ ঘরের কোণে টাইপরাইটারের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মহারাজের লেডী টাইপিস্টকে সম্ভবতঃ কোনও উপদেশ দিতেছিলেন, বিরক্ত হইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "কেয়া মাঙ্গতা ?"

উত্তর দিবার পূর্ব্বে মাখনবাবু প্রথমে একবার বুকে হাত দিলেন। তারপর দক্ষিণ করতল দেখিয়া লইলেন, সব ঠিক আছে। কহিলেন, "মহারাজের সঙ্গে দেখা করব।"

"আপনার কি কাজ আছে ?"

"কাজ আছে, তাঁকে বলব।"

বলদেও প্রসাদ চাপরাশীকে কহিলেন, "কার্ড ভেজো।"

অনতিবিলম্বে মাখন বিশ্বাসের কার্ড চলিয়া গেল। মাখনবাবু টেবিলের নীচে করতল প্রসারিত করিয়া মাতার মত স্নেহসিক্তদৃষ্টিতে ঊর্ধ্বরেখাটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

মহারাজের 'সেলাম' আসিল। চাপরাশীর সহিত উপরে উঠিয়া দূর হইতে মাখনবাবু একবার মহারাজকে দেখিয়া লইলেন। তাঁহার গোঁফ সেক্রেটারীর গোঁফ অপেক্ষাও জমকালো, তবু বুক কাঁপিতেছে না, ইহা স্পষ্ট মাখনবাবু অনুভব করিলেন, মহারাজকে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মাখন বিশ্বাসের বুক একটু কাঁপিল, তখনই একবার চট্ করিয়া করতল দেখিয়া লইলেন, ঊর্ধ্বরেখা একেবারে কম্পনরেখাকে ভেদ করিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ননী হালদারের একটি কথা কানের মধ্যে ঢাক পিটাইতে লাগিল, "ননী হালদারের কথা মিথ্যা হয় না।"

মাখনবাবু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া মহারাজকে নমস্কার করিলেন।

মহারাজ কহিলেন, "আপনি হচ্ছেন বাবু মাখনলাল বিশোয়াস, হাউস্-এজেন্ট্ ?"

"আজ্ঞে হাঁ মহারাজ !"

"বাড়ী হোবে খোঁজে ? বাগান-বাড়ী ? গ্যারেজ, আস্তাবল, লিচির বাগান, তালাও ?"

"আছে মহারাজ ! হুকুম হ'লে দেখাতে পারি।"

"হামি দেখব। চেয়ার লিন্, বসুন।" মহারাজ কক্ষান্তরে গেলেন।

বস্তুতঃ মহারাজ সম্পৎ রায়ের বাগান-বাড়ীর আশু প্রয়োজন ছিল। সিমলায় বড়লাটের নিকট এসেম্বলীর সদস্য পদের জন্য প্রার্থনা জানাইয়া

ফিরিবার সময় লক্ষ্ণৌ হইতে একটি উপসর্গ জুটাইয়া আনিয়াছিলেন। সেটির স্থান দিয়াছিলেন তাঁহার মাণিকতলার বাগান-বাড়ীতে। সংবাদটি সন্ধ্যাকালেই অন্দরে গেল, এবং পরদিন প্রভাতে মহারাজ শুনিলেন যে, মাণিকতলার বাগান-বাড়ীতে অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য মহাদেওজী স্বপ্নে মহারাণীর নিকট বিশেষ জিদ্ করিয়াছেন। অতএব অবিলম্বে বাগান-বাড়ী গঙ্গাজল দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার ও পবিত্র করিয়া দিতে হইবে। এত স্থান থাকিতে সহসা মাণিকতলার বাগান-বাড়ীর উপর শিবঠাকুরের লোভ কেন হইল, মহারাজ তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বিপদ গণিয়া সেক্রেটারীকে তলব করিলেন; সেক্রেটারী দুই-একটি বাগান-বাড়ীর মালিকের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিলেন, দাম ঠিক হইল, কিন্তু তাঁহার কমিশনে বনিল না; কাজেই সেক্রেটারী নূতন বাড়ী খোঁজ করিতে লাগিলেন এবং লোক অনবরত আসিতে লাগিল। এই নিদারুণ সংকটকালে মাখন বিশ্বাসের সহিত মহারাজ সম্পৎ রায়ের দেখা হইল।

সেই রাত্রেই বাগান-বাড়ীর মালিকের সহিত মহারাজের শেষ কথা-বার্ত্তা হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাকালে বাড়ীওয়ালার জমাদার তৃতীয় বার তাগিদ করিয়া যাইবার পর যখন ননী হালদার ঊর্দ্ধে চাহিয়া কড়িকাঠ গণিতেছিল, তখন মাখন বিশ্বাস ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "অভ্রান্ত আপনার গণনা! বুকের কাঁপুনি মোটেই নেই, সম্ভবতঃ ঊর্দ্ধরেখা কম্পন-রেখা ভেদ ক'রে উঠে পড়েছে।"

ননী হালদার একটু বিমর্ষ-হাস্যে কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাঁহাকে বাধা দিয়া মাখন বিশ্বাস কহিলেন, "ঊর্দ্ধরেখার প্রথম ফল ফলেছে, তার যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা এই রইল!"—বলিয়া একশো টাকার পাঁচখানা নোট ফরাসের উপর রাখিয়া মাখন বিশ্বাস বাহিরে মহারাজ সম্পৎ রায়ের মোটরে গিয়া উঠিয়াই হাঁকিলেন, "ভবানীপুর!"

বৃহৎ জ্যোতির্বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের সাইনবোর্ডের উল্টা পিঠে ন্যাশনাল্ হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসীর বিজ্ঞাপন লিখিতে দিয়া এবং বহিগুলি প্যাক করিয়া সেই রাত্রেই ঘর-ভাড়া করিতে ননী হালদার দ্বারভাঙ্গা যাত্রা করিলেন।

ট্যারা

বছর ষোল আগেকার কথা। তেতাল্লিশ নম্বরের কলেজ মেস। সারা-রাত্রি অভিনয়দর্শনে রক্তচক্ষু রামহরিবাবু সকালবেলায় ডাকের চিঠিখানা খুলিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হুর্‌রে!"

পাশের ঘরে দিগম্বরবাবু মোক্তারী পরীক্ষার নোট মুখস্থ করিতেছিলেন, ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যাপার?

'সুখবর হে, সুখবর! গৃহিণী—"

"খাওয়াও তাহ'লে! ছেলে হ'য়েছে?"

রামহরিবাবু আর একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "পুত্র নয় হে, কন্যা। তবু খাওয়াব, ছেলেমেয়ের কোনো তফাৎ নেই আমার কাছে। মিছির!"

মিছির ঠাকুর আসিল এবং হুকুম পাইয়া মোড়ের সন্দেশের দোকানে চলিয়া গেল।

আধ-ঘণ্টার পর মেসসুদ্ধ লোক নবজাতার কল্যাণ-কামনা করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে নিজ নিজ কামরায় প্রস্থান করিলেন। রামহরিবাবু তখন চিঠিখানা একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিলেন—মেয়ের রং ফর্সা, তবে একটু ট্যারা।"

রামহরিবাবু শ্যামা মন্দির গলির স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচারিণী সভার সদস্য ছিলেন—এ সংবাদে দমিলেন না—হাসিয়া কহিলেন, "তা হোক! গুণে সব ঢাকবে। লেখা-পড়া গান-বাজনাতে এমন তালিম ক'রে তুলব মেয়েকে—" ভাবিতে ভাবিতে উঠিয়া বৌবাজারের একটি বাদ্যযন্ত্রের দোকানে ছোট সেতারের কত দাম পড়িতে পারে সেটা সুদ্ধ তখনই জানিয়া আসিলেন।

(২)

স্ত্রীশিক্ষা প্রচার ছাড়া আর একটি লক্ষ্য রামহরিবাবুর ছিল, সেটা নিতান্ত ব্যক্তিগত। আইন পাস করিয়া হাইকোর্টে ওকালতী করিবেন। কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় বার-তিনেক বি-এ ফেল করিয়া স্বগ্রাম তেঁতুলিয়া হাই-স্কুলে থার্ডমাষ্টারীতে ভর্তি হইলেন। মাসিক বেতন ত্রিশ টাকার সিকি পরিমাণ কন্যার শিক্ষার জন্য ব্যয়-বরাদ্দ করিলেন, কিন্তু রামহরিবাবুকে আদর্শভ্রষ্ট করিতে পারিলেন না। প্রথম প্রথম রঙীন ছবির বই, ক্রমে ক্রমে ছবি আঁকিবার সরঞ্জাম ও একটি ছোট সেতার সমস্তই কন্যাকে যোগাইলেন।

গৃহিণী রুখিয়া কহিলেন, "ও ছাইপাঁশগুলো দিয়ে হবে কি? তার চেয়ে—"

রামহরিবাবু কহিলেন, "সে ভাবনা আমার আছে।"

গৃহিণী অতঃপর আর কিছু কহিলেন না।

বারো বৎসর বয়সের বীণা সেতার বাজায়; রামহরিবাবু চক্ষু মুদিয়া শোনেন, আর গৃহিণী রন্ধনশালায় ডাল সিদ্ধ করিতে বসিয়া কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আতঙ্কিত হইতে থাকেন। ভাবিতে ভাবিতেই বীণার বয়স তেরোর কোঠায় গিয়া পৌঁছিল। গৃহিণী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার মাতামহের শ্বশুর বংশ পুরুষানুক্রমে পণ্ডিত, সে ছোঁয়াচ গৃহিণীরও লাগিয়াছিল; একদিন স্পষ্টই রামহরিবাবুকে কহিলেন, "এইবার মেয়ে পার করবার ব্যবস্থা কর। আমি বেঁচে থাকতে আমার বাপ-ঠাকুর্দা নরকে পচবে!"

রামহরিবাবু শুদ্ধ কহিলেন, "সে হবে।" কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা দেখা গেল না।

গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রামহরিবাবুকে অনেক কহিয়া দিনকয়েক ছুটি লওয়াইয়া পাত্রের সন্ধানে পাঠাইলেন।

রামহরিবাবু সতেরো জায়গা ঘুরিয়া বাড়ী আসিয়া পাত্রমণ্ডলীর নাম-ধাম গাঁই-গোত্র ও সেই সঙ্গে কন্যা-গ্রহণের পারিশ্রমিকের অঙ্ক সমস্ত এক তালিকাভুক্ত করিয়া গৃহিণীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "যা হয় কর।"

গৃহিণী মেয়ে দেখার দিন স্থির করিয়া পত্র লিখিতে বসিলেন।

মঙ্গলহাটীর ভট্‌চাজ বাড়ী হইতে পাত্রের মাতুল আসিয়া কন্যার বিশেষ প্রশংসা করিয়া জলযোগান্তে ফিরিয়া গেলেন; বাড়ী গিয়া মেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পত্র দিবেন। শিবতলার রায়-বাড়ীর লোক মেয়ে দেখিয়া গেল। পাকা কথা হইল না। বাঁশকুড়ুলের চৌধুরী-বাড়ী হইতে পাত্র স্বয়ং বন্ধুবান্ধবসহ দেখিতে আসিল; বাজনা শুনিয়া মৃদুস্বরে একটু বাহবাও দিয়া গেল। রামহরিবাবু গোপনে পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজী তা হ'লে—"

ছেলেটি বিনয়ী। মাথা নীচু করিয়া কহিল, "আজ্ঞে মা সব আপনাকে লিখবেন। আমি ফিরে গিয়েই তাঁকে বলব।"

এইরূপে রামহরিবাবু কিছুদিনের মত উৎপাত হইতে রক্ষা পাইলেন। এদিকে গৃহিণী দিনকয়েক তাঁহার ভবিষ্য-জামাতৃবর্গের অভিভাবকগণের পত্রের প্রতীক্ষা করিয়া তাহার পর জোড়া পোস্টকার্ড লেখা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে জবাব আসিতে লাগিল। মঙ্গলহাটীর পাত্রের পিতার অসুখ, শিবতলার পাত্রের পরীক্ষার বৎসর ইত্যাদি। বাঁশকুড়ুল হইতে যে পত্রখানি আসিল সেটা একটু স্পষ্ট। পাত্রের মাতা লিখিয়াছেন, কন্যাটি ট্যারা—ছেলের পছন্দ হয় নাই।

পত্র পাইয়া গৃহিণী ক্ষেপিয়া উঠিলেন; চিঠিখানা হাতে করিয়া যেখানে রামহরিবাবু বসিয়া বীণার সেতার বাজনা শুনিতেছিলেন, সেখানে গিয়াই

উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "কেমন হ'ল তো! গুণে সব ঢাকবে না। দেখ।" —বলিয়া রামহরিবাবুর নাকের ডগায় চিঠিখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কন্যার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "যে রূপের ছিরি, তার আবার গান-বাজনা। যা ঘুঁটে দিগে যা!"

বীণা সেতার রাখিয়া নীরবে উঠিয়া গেল।

ইহার পর পিতা ও মাতার কি কথাবার্ত্তা হইল তাহা বীণা শুনিতে পাইল না, কিন্তু সমস্ত দিন ধরিয়া মাতা অবিরত বলিতে লাগিলেন, "আহা রূপ! চোখ নয় ত নাটার বিচি!"

মাতা দ্বিপ্রহরে ঘুমাইতেছিলেন, সেই অবসরে বীণা আরশী লইয়া বসিল। এতদিন চোখে পড়ে নাই, আজ দেখিল বাস্তবিকই ডান চোখটা অত্যন্ত ট্যারা। নিজের মুখ আরশীতে দেখিতে নিজেরই লজ্জা করিতে লাগিল। নানা রকম আরশী ধরিয়া দেখিল; কোনো দিক হইতেই মুখখানিকে সুশ্রী দেখা গেল না। তখন আরশী ফেলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বেচারী বসিয়া রহিল। সেইদিন হইতেই বীণার বয়স যেন সহসা বাড়িয়া গেল। পিতা স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন ডাকিলেন, তখন সে তাড়াতাড়ি জলের ঘটী লইয়া আসিল বটে, কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। রামহরিবাবু কন্যার ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন। কথা কহিলেন না। এদিকে গৃহিণীর পিতৃপুরুষকে নরকের দিকে আরও কয়েক পা অগ্রসর করাইয়া দিয়া আরও দু'টি বৎসর চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে বীণার প্রকৃতিতে একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সে মুখ নীচু করিয়া কথা বলা আরম্ভ করিল। বাধ্য হইয়া কখনও মুখ তুলিতে গেলে চোখের পাতা আপনা হইতেই মুদিয়া আসে—পাছে কেহ ট্যারা চোখটি দেখিয়া ফেলে! রামহরিবাবুর অবসর ছিল না; ছুটি হইলেই গৃহিণীর তাগিদে সম্ভব-অসম্ভব পাত্রের সন্ধানে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেন। ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই স্কুলের কাজ। সাহস করিয়া আর বীণার বাজনা শুনিতেও চাহিতেন না। সেতারের ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীও ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেন। বীণাও সেতার ফেলিয়া উঠিয়া যাইত। মাঝে মাঝে সম্ভাবিত কোনও পাত্র আসিলে সেদিন আর বীণার লাঞ্ছনার অবধি থাকিত না। তাহার চোখের সহিত নাটার বিচি হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় গোলাকার বস্তুর তুলনা চলিতে থাকিত এবং কোনও মতে বিদায় হইয়া গেলেই যে পিতামাতার পিতৃপুরুষ নরক হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, তাহাও বীণা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিত।

সেদিন গৃহিণীর মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ ছিল। প্রভাতে নূতন একটি পাত্রের অভিভাবক মেয়ে দেখিয়া যাইবার সময় স্পষ্ট ভাষায় মেয়ে না-পছন্দ করিয়া গিয়াছেন। হেতু মেয়েটি ট্যারা। রীতি অনুযায়ী বীণার লাঞ্ছনার

অবধি রহিল না। সমস্ত দিন না খাইয়া বীণা বিছানায় পড়িয়া রহিল; রামহরিবাবু স্কুল হইতে ফিরিয়া নিতান্ত উদাসীনভাবে দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। এদিকে গৃহিণীর কণ্ঠস্বর ক্রমেই বাড়িতেছিল। ঠিক এমনি সময়ে অঙ্গনে নূতন একটি লোকের আবির্ভাব হইল: আগন্তুককে দেখিয়াই গৃহিণীর স্বর অকস্মাৎ খাদে নামিয়া আসিল. তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'এস বাবা, এস! কতদিন দেখিনি তোমাকে, ভাল ছিলে তো?"

আগন্তুক গৃহিণীর পায়ের ধূলা লইয়া কহিল. "এক রকম ছিলাম মাসীমা. আপনারা আছেন কেমন? মাষ্টার-মশাই কোথা?'

রামহরিবাবু গলার আওয়াজ পাইয়া উঠিয়া বসিলেন. "কে. সুকুমার! এস, বস এইখানটায়। তাই ভাবছিলাম গরমের ছুটিটা গেল. এলে না। সহরে গিয়ে ভুলেই গেলে বুঝি আমাদের?"

সুকুমার বাবরী একটু ঝাঁকাইয়া কহিল. "ভুলতে পারি আপনাদের মাষ্টার-মশাই। যে স্নেহ-মমতা পেয়েছি আপনাদের কাছে. তা কি ভুলবার। বীণা কই? আছে কেমন সে?"

রামহরিবাবু না ডাকিতেই বীণা ধীরে ধীরে আসিয়া সুকুমারকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। রামহরিবাবু নানা বিষয়ে কন্যাকে শিক্ষা দিতেছিলেন. সুকুমার জানিত।

কুশল প্রশ্নের পর সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি শিখছ বীণা?"

বীণা মৃদুস্বরে কহিল. "সেতার শিখছি—"

সুকুমার উৎসাহিত হইয়া কহিল. "দুর্ভাগা দেশ! ঘরে ঘরে যদি তোমার মত বীণা জন্মাতো তবে—"

কথাগুলি বীণার বড় মিষ্ট লাগিল। সমস্ত দিন তিরস্কার শোনার পর সুকুমারের এই স্নিগ্ধ কথা কয়টি শুনিয়া তাহার চোখে জল আসিল। সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। কিছুকাল নানা কথার পর সুকুমার উঠিয়া গেল এবং যাইবার সময় বীণাকে উদ্দেশ করিয়া কহিয়া গেল যে, কাল বৈকালে সে সেতার শুনিতে আসিবে।

৩

পাশের গ্রামের তালুকদারের একমাত্র পুত্র সুকুমার। যখন তেঁতুলিয়া স্কুলে পড়িত, তখন রামহরিবাবুর বাড়ীতে সে একরূপ প্রত্যহের অতিথি ছিল। তাহার পর পাশ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিলেই সে রামহরিবাবুর সহিত দেখা করিয়া যাইত।

গত বৎসর দেশে আসে নাই; দেশের ঘুমন্ত 'অন্তরলক্ষ্মী'কে জাগাইবার জন্য জনকয়েক বন্ধু মিলিয়া 'জাগ্রৎ যৌবন-সমিতি' নামে একটি

সমিতি গড়িয়াছিল ; তাহারই কাজে সে ব্যস্ত ছিল। এই সমিতিরই স্থানীয় একটি শাখা স্থাপনের উদ্দেশ্যেই সম্প্রতি দেশে আসিয়াছে।

পরদিন যথাসময়ে সুকুমার আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বগলে 'জাগ্রৎ যৌবন সমিতি'র একগাদা ছাপা ইস্তাহার। সুকুমার বসিতেই রামহরিবাবু নিজের দুঃখ-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, প্রসঙ্গের মূল-বিষয় বীণার বিবাহ। বিবাহের প্রসঙ্গ, সেইসঙ্গে রামহরিবাবুর মুখে কন্যার গুণ-ব্যাখ্যান শুনিতেই বীণার মা আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "রূপেই যে সব গুণ খেয়েছে! তুমি ত বাবা কলকাতায় থাক, একটা যেমন-তেমন দেখে-শুনে মেয়েটাকে পার করে দাও।"

সুকুমার কহিল, "সে কি মাসী-মা! যেমন-তেমন ছেলে কি হবে? তবে ওর যোগ্য ছেলে আমি দেখব, আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

গৃহিণী চলিয়া গেলেন, যাইবার সময় কহিয়া গেলেন, "ওর যোগ্য ছেলে ত্রিভুবনে জন্মায়নি। অমন ডানাকাটা পরী—"

রামহরিবাবু কহিলেন, "শুনছ! গঞ্জনা শুনে শুনে মেয়েটা একেবারে মুষড়ে গেল! এখন লজ্জায় কারোও সামনে বেরোতেই চায় না। তুমি একটু ডেকে—"

"আচ্ছা, তা করব। বীণা কই?"—সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল।

রামহরিবাবু ডাকিলেন, বীণা তাহার পড়ার ঘরে বসিয়া আহ্বানেরই অপেক্ষা করিতেছিল, ধীরে ধীরে একখানা বই হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

রামহরিবাবু কহিলেন, "সুকুমারকে একটু বাজনা শুনিয়ে দে।"

বাজনা শুনিয়া সুকুমার অবাক হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "বাজনা কে শিখাল বীণা?"

বীণা মুখ না তুলিয়াই বলিল, "নিজেই শিখেছি।"

রামহরিবাবু কহিলেন, "মাষ্টার রাখবার পয়সা কোথায় বাবা? তা নইলে ইচ্ছা ছিল মেয়েটাকে ইংরাজী আর সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সব চলতি ভাষা একটু একটু শেখাই। তা জান তো উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে—"

সুকুমার কহিল, "আমি বাজনা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি মাষ্টারমশাই! ভাবছি শুধু শিক্ষার সুযোগ থাকলে বীণা কি হ'তে পারত।"

কথা শুনিয়া বীণা তাহার পড়ার ঘরে ঢুকিল। সুকুমার একবার অপাঙ্গে তরুণীর দিকে চাহিয়া হতভাগ্য দেশের মুক্তির জন্য বীণার ন্যায় নারীর সাহায্য কতখানি প্রয়োজন, তাহা পল্লবিত-ভাষায় উচ্ছ্বাসের সহিত কহিয়া গেল।

রামহরিবাবু শুনিয়া সুকুমারের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "দীর্ঘজীবি হও বাবা, দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।"

পড়ার ঘরে দরজার আড়ালে বীণা দাঁড়াইয়া ছিল ; সুকুমারের কথাগুলিতে সে যেন এক নূতন জগতের আহ্বান শুনিল, তাহার সমস্ত মন আনন্দে ও ভরসায় সজীব হইয়া উঠিল।

বীণাকে দেশ-বিদেশের নারী-প্রগতির কাহিনী শুনাইতে রামহরিবাবু সুকুমারকে বলিয়াছিলেন। সুকুমার প্রত্যহ নিয়মিত আসিত এবং তাহার সমিতির উদ্দেশ্য, নারী পুরুষের অধিকার প্রভৃতি জটিল বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া বীণার অন্তরলক্ষ্মীকে জাগাইবার চেষ্টা করিত। বীণা কতক বুঝিত, কতক বুঝিত না ; যে-কথা বুঝিত না তাহাও তাহার ভাল লাগিত। সুকুমারের কথা শোনা নেশার মত ক্রমে ক্রমে তাহাকে পাইয়া বসিল। সেদিন কি কারণে সুকুমারের আসিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল, বীণার কিছু ভাল লাগিতেছিল না। এমন সময় সুকুমার আসিয়া উপস্থিত হইল।

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এত দেরি হ'ল কেন ?" কথার সুরে অভিমান প্রচ্ছন্ন ছিল, সুকুমার বুঝিল।

বীণার চিবুক ধরিয়া কহিল, "আমি না আসলে কষ্ট হয় তোমার বীণা ?"

বীণা মুখ না তুলিয়াই বলিল, "হ্যাঁ।"

সুকুমার মৃদু হাসিল, তাহার পরে বীণার দুই কাঁধের ওপর হাত রাখিয়া কহিল, "আর আমি দেরি ক'রে আসব না বীণা ; কিন্তু তোমাকে আমার একটা কথা রাখতে হবে, বল রাখবে ?"

বীণা কহিল, "রাখব। কি কথা ?"

সুকুমার কহিল. "আমাকে 'তুমি' ব'লে ডাকতে হবে, 'আপনি' বলতে পারবে না।"

বীণা সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "সে আমি পারব না, আমার লজ্জা করবে।"

কিন্তু বীণার লজ্জা বেশীক্ষণ রহিল না, সুকুমার সেইদিনই বীণাকে 'তুমি' বলাইয়া ছাড়িল।

সেদিন বীণার মনে হইল সুকুমার বড় আপনার হইয়া গিয়াছে। পড়ার ঘরে বসিয়া সুকুমারের মূর্তি মনে মনে চিন্তা করিয়া ক্রমাগতই বীণা তাহাকে 'তুমি' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে কখন বীণা ঘুমাইয়া পড়িল. স্বপ্নে দেখিল, সুকুমার তাহার হাত ধরিয়া এক নূতন দেশে লইয়া চলিয়াছে।

ক্রমে সুকুমারের ছুটি ফুরাইল. বিদায় লইতে আসিয়া দেখিল, বীণা কাঁদিতেছে।

"কাঁদছ কেন বীণা ?" সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল।

"তুমি চলে যাচ্ছ যে !" বীণা অতি মৃদুস্বরে কহিল।

"সামনের ছুটিতেই আবার আসব বীণা, তুমি কেঁদো না।"—বলিয়া সুকুমার রুমাল বাহির করিয়া বীণার চোখের জল মুছাইয়া দিল।

বীণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুকুমারের ডান হাতখানি দুই হাতে মুঠা করিয়া ধরিয়া কহিল, "আমাকে ঘৃণা করবে না বল।"

সুকুমার আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "ঘৃণা কেন তোমাকে করব বীণা? কি করেছ তুমি?"

বীণা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মুখ নীচু করিয়াই কহিল, "আমি যে ট্যারা, আমাকে—" বলিয়াই বীণা আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

সুকুমারের ওষ্ঠপ্রান্তে কৌতুকের মৃদু-হাস্য খেলিয়া গেল, পর মুহূর্তেই বীণার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া সে কহিল, "তুমি ট্যারা বলেই তো আরও বেশী করে তোমায় ভাল লাগে বীণা!"

কথা শুনিয়া বীণার মুখে হাসি দেখা দিল। সে উঠিয়া সুকুমারকে প্রণাম করিল।

যাইবার সময়ে গৃহিণী সুকুমারকে একটি পাত্র দেখিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। রামহরিবাবু সুকুমারের সম্মুখেই কহিলেন, "তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না, সুকুমার যখন কথা দিয়েছে, তখন কাজ করবেই। ওরা অসাধ্য-সাধন করতে পারে।"

(৪)

সুকুমার চলিয়া যাইবার পর হইতেই বীণা যেন একটা স্বতন্ত্র মানুষে রূপান্তরিত হইয়া গেল। পূর্বে মায়ের ভৎর্সনা শুনিয়া পিতার কাছে মাঝে মাঝে সে নালিশ করিত, আজকাল গালাগালি শুনিলে পড়ার ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করে।

জবাব না পাইলে গৃহিণীর বকুনী ভাল জমিত না। ক্রমাগত বকিতে না পারিলে উত্তেজনায় তাঁহার মাথা ধরিত, কাজেই একদিন বীণার অকারণ ঔদাসীন্যে বিরক্ত হইয়া তিনি রামহরিবাবুকে বলিলেন, "ওগো শুনছ? মেয়ের যে আর একটা গুণ বাড়ল। ছিল ট্যারা, হ'ল বোবা। গালাগাল দিলেও কথা বলে না আর।"

রামহরিবাবু বীণার এ আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, হেতুও প্রায় অনুমান করিয়াছিলেন; সেই সঙ্গে কয়েক দিন হইতে কন্যার একটি চমৎকার দাম্পত্য-জীবনের চিত্র তাঁহার মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল; তিনি গৃহিণীর অভিযোগের উত্তরে মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "মেয়ে বড় হ'য়েছে, এখন আর রূপের খোঁটা দিও না। তোমার অদৃষ্টে ভাল জামাই আছে, ব'লে দিচ্ছি।"

গৃহিণীর হঠাৎ রামহরিবাবুর কথা কয়টি কেন যেন অত্যন্ত ভাল লাগিল, বলিলেন, "তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।"

রামহরিবাবু আশ্চর্য্য হইলেন, গত তিন বৎসর মধ্যে গৃহিণীর মুখে এমন মধুর কথা তিনি শোনেন নাই; নিবন্ত কলিকাটি হুঁকার মাথায় বসাইয়া তিনি প্রাণপণে ক্রমাগত টানিতে লাগিলেন।

সুকুমার নিজের নাম ও ঠিকানা লেখা কয়েকখানা খাম রাখিয়া গিয়াছিল, আদেশ ছিল, বীণা যেন সপ্তাহে দু'খানি করিয়া চিঠি লেখে।

কয়েক দিন তুচ্ছ খুঁটিনাটি লইয়া কোনমতে দিন কাটাইয়া সেদিন বীণা সুকুমারকে চিঠি লিখিতে বসিল।

ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সমস্ত প্রাতঃকাল ধরিয়া বীণা চিঠি লিখিল এবং চিঠিখানা ডাকে পাঠাইয়া বীণার মন অনেকটা লঘু হইয়া গেল।

(৫)

টেবিলের উপরে বড় আয়না রাখিয়া সুকুমার মুখে 'স্নো' মাখিতেছিল। তাহার চৌকীতে বসিয়া তাহাদের সমিতির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নৃপেন দত্ত একখানি বৃহদাকার ডিক্সনারী বাজাইয়া গজল গাহিতেছিল। এই সময় দারোয়ান ডাকের চিঠি আনিয়া উপস্থিত করিল।

নৃপেন চিঠির উপরে চোখ বুলাইয়া কহিল "এ কি হে সুকুমার, তোমারই হাতের লেখা ঠিকানা দেখছি যে।"

কাহার চিঠি সুকুমার বুঝিল। তাড়াতাড়ি 'স্নো'র শিশিটা টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া হাত বাড়াইল।

নৃপেন চিঠিখানা মুঠা করিয়া ধরিয়া কহিল, "কার চিঠি আগে বল!"

সুকুমার কহিল, "দাও আগে পড়ে নি, তারপর দেখাব।"

বলা বাহুল্য, চিঠিখানি বীণার। সুদীর্ঘ পত্র। সুকুমার একবার চিঠিখানা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া মুখে 'স্নো' মাখিতে মাখিতে বলিল, "তুমি একবার ভাল ক'রে জোরে পড় নৃপেন, আমি শুনছি!"

নৃপেন পড়িল।

বীণা লিখিয়াছে—

"তুমি চলিয়া গিয়াছ, আমার কিছু ভালো লাগিতেছে না। লেখাপড়া করিতে ইচ্ছা করে না, তুমি রাগ করিবে বলিয়া জোর করিয়া পড়িতে বসি।

যে পথ দিয়া তুমি আসিতে, সেই পথের দিকে জানলা দিয়া চাহিয়া থাকি, তুমি শীঘ্র আসিবে। না আসিলে লেখাপড়া সমস্ত ভুলিয়া যাইব, ইত্যাদি।"

এই কথা-কয়টিই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বীণা পাঁচ পাতা চিঠি লিখিয়াছে।

নৃপেন চিঠি পড়িয়া কহিল, "খুব গেঁথেছ যা হোক! কে ইনি?"

সুকুমার তোয়ালে দিয়া মুখ ঘষিতে ঘষিতে কহিল, "সে খবর এখন শুনো না। চিঠিটা দাও দেখি, চট্‌পট্‌ একটা জবাব লিখে দিই।"

"শেষটা কি হয় একবার জানিয়ো ভাই।"—বলিয়া চিঠি রাখিয়া নৃপেন সুকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

সুকুমারের চিঠি পাঠাইবার পর হইতে কেবলই বীণার মনে হইয়াছে যাহা লিখিবার ছিল তাহা লেখা হয় নাই। নিজের এই ত্রুটিতে ক্রমাগতই সে লজ্জিত হইতেছিল। ভাবিতেছিল, সুকুমার হয়ত রাগ করিবে এবং চিঠির জবাবই দিবে না, কিন্তু যথারীতি জবাব আসিল। ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া বার-বার বীণা চিঠিখানা পড়িল। উৎসবের বাঁশীর সুরের মত চিঠির কথাগুলি তাহার কানের মধ্যে সমস্ত দিন ঝঙ্কার দিতে লাগিল।

চিঠিতে অনেক কথাই ছিল: প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সুকুমারের মন উদাস হইয়া যায়; পড়িতে বসিলে একজনের স্নিগ্ধ-আঁখি বহির পাতায় ভাসিয়া ওঠে, তাহারই হাতের সেলাই রুমালখানা বুকপকেটে নীরব-গুঞ্জরণে গান গাহিতে থাকে। সুকুমারের এই প্রকার মারাত্মক অবস্থার বর্ণনায় চিঠিখানার আদ্যোপান্ত পূর্ণ ছিল, শেষের দিকে গুটিকয়েক উপদেশও ছিল।

সন্ধ্যায় চিঠিখানা বাক্সে তুলিয়া রাখিবার পূর্বে তাহার উপরে মাথা রাখিয়া বীণা আপন-মনে বলিল, "আশীর্বাদ কর, আমি যেন তোমার উপযুক্ত হতে পারি।"

রামহরিবাবুর সেদিনকার কথা গৃহিণীর মনে ছিল; এ পর্যন্ত কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা তিনি করেন নাই। কাজেই স্বামীর তাম্রকূট-সেবন ও কন্যার সঙ্গীত-চর্চা একপ্রকার অব্যাহতই চলিতেছিল, কিন্তু সহসা সেদিন তিনি আবার সেই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিলেন। সুকুমারের বীণার নিকট চিঠি লেখা, রামহরিবাবু তাহা জানিতেন। কহিলেন, "সুকুমার ঠিক করবে বলে গেছে। দেখ তো—"

গৃহিণী অবিশ্বাসের সুরে কহিলেন, "হ্যাঁ, তার আবার সেকথা মনে আছে! বড়মানুষের ছেলে—গরীবের কথা ভাবতে দায় পড়েছে তার।"

বীণা দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল, মায়ের কথা শুনিয়া মৃদু হাসিল।

রামহরিবাবু চশমা জোড়া মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "দেখ তো আর মাসখানেক, সে তো সামনের ছুটিতেই আসছে, বোঝা-পড়া তার সঙ্গেই কোরো।"—বলিয়াই পরম নিশ্চিন্ত মনে পুনরায় তামাক টানিতে আরম্ভ করিলেন।

সুকুমার পাত্র স্থির করিয়া দিবে এ সম্বন্ধে গৃহিণীর সন্দেহমাত্র ছিল না, সে শীঘ্রই আসিতেছে শুনিয়া তিনি খুশী হইয়া চলিয়া গেলেন।

বড়দিনের ছুটিতে সুকুমারের আসিবার কথা। পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন সংবলিত একখানি পকেট-পঞ্জিকা জোগাড় করিয়া বীণা—প্রত্যহ

বড়দিনের তারিখ দেখিত। দিনগুলি অতি মন্থর-গতিতে কাটিতেছিল। ক্রমে বড়দিন আসিল। সেই সঙ্গে সুকুমার আসিল। সন্ধ্যায় সুকুমারের সহিত বীণার সাক্ষাৎ হইল।

সুকুমারের বুকে মুখ রাখিয়া বীণা কহিল, "তুমি বাবাকে বোলো, আমি কলকাতায় পড়ব। তোমাকে না দেখে থাকতে পারব না।"

সুকুমার কহিল, "তোমার বাবার যদি মত না হয় ?"

বীণা মুখ তুলিয়া কহিল, "আমাকে জোর ক'রে নিয়ে যেয়ো।"

সুকুমার মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা আগে ইস্কুল ঠিক করি, তারপর জিজ্ঞেস করব।"

গৃহিণী প্রত্যহই সঙ্কল্প করেন, বীণার পাত্রের কথা সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কিন্তু অবকাশ হয় না। বিশেষ রামহরিবাবু পত্নীকে বলিয়াছিলেন, সুকুমার নিজে বীণার বিবাহের প্রসঙ্গ না তুলিলে তিনি যেন সুকুমারকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেন। দিনকয়েক গৃহিণী স্বামীর আদেশ অতি কষ্টে পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতা যাত্রার পূর্বদিন যখন সুকুমার তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গেল, গৃহিণীর আর ধৈর্য্য রহিল না। সুকুমার কবে ফিরিবে সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই তিনি বীণার বিবাহের প্রসঙ্গ পাড়িলেন।

সুকুমার কহিল, "তার এত তাড়াতাড়ি কিসের মাসী-মা! লেখাপড়া শিখুক!"

গৃহিণী কহিলেন, "তাড়াতাড়ি কিসের বলিসনে বাছা, আমার বিয়ে হয়েছিল আট বছরে—"

এ কথা সুকুমার পূর্বেও শুনিয়াছে, জানিত গৃহিণীর নিজের বিবাহের কাহিনী অন্ততঃ ঘণ্টাখানেকের পূর্বে শেষ হইবে না। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া সুকুমার কহিল, "পাত্র এক রকম দেখেই রেখেছি মাসী-মা, ব্যস্ত হবেন না। সামনের পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই ঠিক করব।"—বলিয়া সে আঙ্গিনায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

গৃহিণী ঘরের মধ্যে হইতেই কহিলেন, "পাস-ফাশে কাজ নেই বাবা, যেমন-তেমন একটা দেখে-শুনে—"

সুকুমার যাইতে যাইতে জবাব দিল, "বীণাকে যদি ফেলে দিতেই হয় মাসী-মা, তবে না হয় আমাকেই—দেবেন।" বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল। কথা কয়টি সুকুমার খেয়ালের মুখেই কহিয়া গেল এবং কি কহিল পথে যাইতে তাহা চিন্তাও করিল না। অথচ এই কথায় রামহরিবাবুর ক্ষুদ্র গৃহস্থালী তুমুল আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

গৃহিণী ব্যঞ্জনের কড়াইটা ধুপ করিয়া নামাইয়া খুন্তি হাতে করিয়াই রামহরিবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হ্যাঁগা! সুকুমার যেন কি ব'লে গেল!"

রামহরিবাবু সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না, গলাটা অত্যন্ত ধরিয়া আসিয়াছিল, বার-দুই কাসিয়া কহিলেন, "শুনতে তো পেলে! আমি আর—"

গৃহিণী খুন্তিখানা রামহরিবাবুর গালে ঠেকাইয়া আদর করিয়া কহিলেন, "বলই না শুনি, আমার যে গা কেমন-কেমন করছে।"

রামহরিবাবু বলিলেন, "বললে যে মেয়ে ফেলে দিতে হ'লে তাকেই দিতে। এখন যাও জল আন, মুখটা তো এঁটো করে দিয়েছ।"

গৃহিণী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

বীণা সুকুমারের কথা শুনিয়া আশ্চর্য হয় নাই। বিধাতার চোখে সে যে সুকুমারেরই স্ত্রী একথা সুকুমারের মুখেই সে সহস্রবার শুনিয়াছে, কিন্তু সকলের সম্মুখে সুকুমার এই কথা কহিয়া গেল দেখিয়া তাহার আর লজ্জার পরিসীমা রহিল না। সে-রাত্রে আর সে কাহারও সম্মুখে বাহির হইল না, খাইতে ডাকিলেও উঠিল না।

রামহরিবাবু কহিলেন, "থাক্ ডেকো না— লজ্জা পেয়েছে!"

সেদিন রাত্রে মৃদুগুঞ্জনে স্বামী-স্ত্রীর পরামর্শ চলিল এবং দিন-দুই পর একদিন পাঁজি দেখিয়া রামহরিবাবু সুকুমারের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথার পর সুকুমারের বিবাহের কথা পাড়িতেই তাহার পিতা ব্রজদুলালবাবু কহিলেন, "ছেলের বিয়েতে আমার কোনো হাত নেই। ছেলের মত হ'লেই হ'ল। জানেন ত আজকালকার ছেলে।"

কথা শুনিয়া রামহরিবাবু আশ্বস্ত হইলেন এবং অনেক বিনীত অনুরোধ সহকারে সুকুমারের পিতাকে কন্যা দেখিবার নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। ব্রজদুলালবাবু মুখে বলিলেন না, রামহরিবাবু চলিয়া গেলে অন্তঃপুরে যাইয়া সুকুমারের মাতাকে সমস্ত কহিতেই তিনি দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিলেন, "ওমা! সে কি কথা! রামহরি মাষ্টারের মেয়ের সঙ্গে।" তাঁহার আর কথা যোগাইল না।

ব্রজদুলালবাবুর সাংসারিক অভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রখর ছিল। রামহরিবাবুর পরিবারের সহিত সুকুমারের হৃদ্যতা ছিল একথা তিনি জানিতেন। সুকুমারের মাতাকেও তাহা জানাইয়া দিলেন। সুকুমারের মাতা সকল কথাগুলি শুনিয়া পাত্রী দেখিতে আপত্তি করিতে পারিলেন না। কিন্তু সমস্ত দিন মুখ ভার করিয়া রহিলেন।

বীণা নিবিষ্ট হইয়া সুকুমারকে একখানি পত্র লিখিতেছিল; মাতা আসিয়া কহিলেন, "লেখাপড়া থাক্ না আজ, সাবান মেখে স্নান করে নে। তোকে দেখতে আসবে।"

কিছুদিন হইতে বীণা নির্ভয়ে মায়ের সহিত কথা বলিত। চিঠির কাগজখানি উল্টাইয়া রাখিয়া কহিল, "আমাকে কি কেউ কোনো দিন দেখেনি মা, যে নতুন করে দেখতে আসবে?"

কথার ঝোঁকটা কাহার উপর গিয়া পড়িল, গৃহিণী তাহা বুঝিলেন; বীণাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া কহিলেন, "নে মা, আজ এই একটা দিন ছাড়া আর তোকে বলব না, ওঠ্! বাপেরও তো পছন্দ চাই—"

বীণা গর্ গর্ করিতে করিতে উঠিয়া গেল।

বাহিরের ঘরে ব্রজদুলালবাবু সুকুমারের মাতুলের সঙ্গে বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। বীণা ধীরে ধীরে আসিয়া উভয়কে প্রণাম করিল। ইতিপূর্বে কাহারও সম্মুখে আসিতে এত ভয় তাহার কোনো দিন হয় নাই। কেবলই মনে হইতেছিল যদি পছন্দ না হয়। এতদিন পরে আবার ট্যারা-চোখটা সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সচেতন হইয়া পড়িল। সুকুমারের পিতা তীক্ষ্ন-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ছিলেন, তাহাও সে দেখিয়াছিল, ডান-চোখের তারাটিকে ঠিক চোখের মাঝখানে আনিবার জন্য সে ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিল এবং এই অসম্ভব প্রয়াসে তাহার সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ব্রজদুলালবাবু বীণার অবস্থা বুঝিলেন, কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া একটা মৃদু আশীর্বচনের সঙ্গে তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন।

বীণা চলিয়া গেলে রামহরিবাবুর সহিত সুকুমারের মাতুলের যে কথাবার্তা হইল তাহাতে তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহারা মেয়ে দেখানো নিয়ম রক্ষা করিতে আসিয়াছেন মাত্র—বিবাহ-বিষয়ে ছেলের মতই চরম এবং তাহাকে শীঘ্রই লেখা হইবে। ঘরের পিছনে বীণা দাঁড়াইয়া শুনিল এবং এই কথায় তাহার বুকের দুর্ভাবনার বোঝা নামিয়া গেল।

সেদিন দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত লিখিয়া বীণা অসমাপ্ত চিঠিখানা শেষ করিল। সুকুমারের পিতা আসিয়া যে তাহাকে দেখিয়া গিয়াছেন, সে-কথার উল্লেখ করিতেও ভুলিল না।

(৬)

সেদিন সুকুমারের অবকাশ আদৌ ছিল না। সন্ধ্যায় তাহাদের সমিতিতে বক্তৃতা দিবার কথা ছিল সুকুমার তাহাই লিখিতেছিল এবং নৃপেন দত্ত ষ্টোভ ধরাইতেছিল। এই সময়ে ডাকের চিঠি আসিল। বীণার চিঠিখানা খুলিয়া সুকুমার পড়িতে বসিল। সমস্তই পুরাতন কথা। সেই ভাল না-লাগা, দিবারাত্রি অস্বস্তিবোধ—প্রতি সন্ধ্যায় চোখের জল ফেলা—সুকুমার পাতাগুলি একবার উল্টাইয়া গেল। চিঠির শেষের দিকে একটা কথা ছিল, পড়িয়া সে একটু আশ্চর্য্য হইল, বীণা লিখিয়াছে, "শ্বশুর আমাকে দেখিয়া গিয়াছেন।" সেই সঙ্গেই আর একছত্রে লেখা আছে, "বলিয়াছেন তোমার মতেই তাঁহাদের মত।"

চিঠিখানা ফেলিয়া রাখিয়া দ্বিতীয় পত্র পড়িতেই সুকুমারের মাথা খারাপ

হইবার উপক্রম হইল। চিঠিখানা তাহার মায়ের। সে-চিঠিতে রামহরিবাবুর সহিত তাহার পিতার সাক্ষাতের কথা এবং রামহরিবাবুর অনুরোধে তাঁহার কন্যাকে দেখার বিশদ-বিবরণ লেখা ছিল। তৃতীয় পত্র রামহরিবাবুর। তিনি লিখিয়াছেন যে, সুকুমারের কথাতে ভরসা পাইয়া তিনি ব্রজদুলালবাবুকে কন্যা দেখাইয়াছেন। যে মাসে তাহার পড়াশুনার বিঘ্ন না হয় সেই মাসেই শুভকর্ম সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা। সুকুমারের পত্র পাইলেই ইত্যাদি। এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই সুকুমার তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল 'ননসেন্স'।

নৃপেন দত্তের হাত হইতে ডিমের প্লেট পড়িয়া গেল, সে কহিয়া উঠিল, "ব্যাপার কিহে সুকুমার!"

কতকগুলি ইংরেজী ভাষায় গালাগালি বকিতে বকিতে সুকুমার চিঠি তিনখানা মুঠা করিয়া নৃপেন দত্তের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

নৃপেন ধীরভাবে চিঠিগুলি পড়িয়া কহিল, "এতদূর এগিয়েছ যখন—"

সুকুমার রুখিয়া উঠিল, কহিল, "কি বলছ বিয়ে করব!"

নৃপেন মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, "অগত্যা! তা নইলে গায়ে কাদা মাখলে কেন, বল?"

সুকুমার রুক্ষস্বরে কহিল, "দোষ কার? ফড়িং আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পাখনা পুড়িয়েছে, দোষ কি আগুনের? বেশ বলচ? তুমি আমার হ'য়ে মাকে চিঠি লিখে দাও আমি বলে যাচ্ছি।"

নৃপেন দত্ত কহিল, "ও-সব ক'রো না সুকুমার! তার চেয়ে 'অশ্বত্থামা হত ইতি' ক'রে একটা চিঠি লিখে পশ্চিমে বেরিয়ে পড়। আস্তে আস্তে বেচারী সব ভুলে যাবে।"

সুকুমার কহিল, "তুমি জান না তাকে, হয়ত বাপের সঙ্গে এসেই পড়বে। সে এক কেলেঙ্কারী! মুখ দেখাতে পারব না! তার চেয়ে যা বলছি তা-ই কর। ছেঁড়া নেকড়ার আগুন নিবিয়ে দাও। আজকের মিটিংটাই মাটি হ'ল দেখছি!"—বলিয়া সুকুমার চিঠির কাগজ বাহির করিল।

নৃপেন নিজ নামে সুকুমারের পরামর্শ মত সুকুমারের মায়ের কাছে পত্র লিখিল। বর্তমানে বিবাহের বিরুদ্ধে নানারূপ যুক্তি—শেষে রামহরিবাবুর কন্যাকে বিবাহ করিতে আপত্তির বিচিত্র কারণ দেখাইয়া সে চিঠি শেষ করিল। মেয়েটি যে অত্যন্ত ট্যারা এ কথাটিও নৃপেনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুকুমার লিখাইয়া দিল। চিঠিখানা নিজ হাতে ডাকে পাঠাইয়া সুকুমার মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "বাঁচলাম হে! বড়ই ঘোরালো হয়ে উঠেছিল!"

নৃপেন দত্তের চিঠি পড়িয়া সুকুমারের মাতা ব্রজদুলালবাবুকে সগর্বে কহিলেন, "দেখলে তো! তেমন ছেলেই গর্ভে ধরিনি। দাও পাঠিয়ে মাষ্টারের বাড়ী।"

ব্রজদুলাল বাধা দিয়া কহিলেন, "ছিঃ, তার চেয়ে লোক দিয়ে বলে পাঠাও এখন বিয়েতে ছেলের মত নেই।"

সুকুমারের মাতা কহিলেন, "উঁহু, মাষ্টারের মেয়ে ছেলেকে তাহ'লে 'গুণ' করবে।"—বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন এবং নৃপেন দত্তের চিঠিখানা ক্ষান্ত দাসীর হাতে প্রাতঃকালেই যথাস্থানে রওনা হইয়া গেল।

বীণা সুকুমারের জন্য একটা বালিশের ওয়াড় সেলাই করিয়া তাহাতে একজোড়া গোলাপ ফুল তুলিতেছিল। এমন সময় মায়ের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল তাহার মাতা মাটিতে মাথা খুঁড়িতেছেন, আর চীৎকার করিতেছেন, "ওরে আমার পোড়া কপাল!" দাওয়ায় শুষ্কমুখে রামহরিবাবু একটি খুঁটি ধরিয়া বসিয়া আছেন আর ক্ষান্ত দাসী একখানা চিঠি হাতে করিয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সুকুমারের অমঙ্গল আশংকা করিয়া বীণা ছুটিয়া আসিয়া মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া শঙ্কা-বিহ্বলস্বরে কহিল, 'কি মা!"

গৃহিণী বীণাকে দূর করিয়া ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, "দূর হ! কালা-মুখী! দূর হ! মুখ দেখাসনি আর! দেখগে যা চিঠিতে কি লিখেছে!"

বীণা ক্ষান্ত দাসীর হাত হইতে চিঠিখানা লইয়া চলিয়া গেল।

বেলা তখন দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে, তখনও বীণা কাঠের পুতুলের মত নৃপেন দত্তের চিঠিখানা হাতে করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার যে কি হইয়াছে তাহা সে ভাবিতেও পারিতেছিল না! গত কয়েক মাসের বড়-ছোট সকল ঘটনা, সুকুমারের প্রত্যেকটা কথা মনের মধ্যে আবর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছিল। সকল কথার মধ্যে একটি কথাই বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছিল, সুকুমার বলিয়াছিল—"ট্যারা বলেই তোমাকে আরও বেশী ভাল লাগে!"

সুকুমার আজ লিখিয়াছে সে ট্যারা! ভাবিতে ভাবিতে দেয়ালে টাঙানো সুকুমারের ছবিখানার দিকে তাহার চোখ পড়িল; ভাবিল সুকুমারের সম্মুখের উঁচু দাঁত দু'টি তো তাহার চোখে কোনো দিন কুশ্রী লাগে নাই। কেবলই মনে হইয়াছে দাঁত দু'টি উঁচু না হইলে যেন মোটেই মানাইত না, কিন্তু তাহার ট্যারা চোখটি সুকুমারের চোখে বিশ্রী লাগিল কি করিয়া!

"নাও, হয়েছে! খুব ঢলিয়েছ এখন দু'টো গিলে নাও!" বলিয়া গৃহিণী ঘরে ঢুকিলেন। ঘরে ঢুকিয়া বীণার মুখের দিকে চাহিয়া গৃহিণী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর কন্যার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বীণা মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যাকালে রামহরিবাবু ফিরিয়া অতি শুষ্কস্বরে বীণাকে ডাকিলেন, সে সাড়া দিল না। খাইবার জন্য গৃহিণী ডাকিলেন, মাথাধরার অছিলায় সে বিছানায় পড়িয়া রহিল।

রামহরিবাবু শুধু কহিলেন, "ওকে আর আজ ডেকো না।"

রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জাগিয়া বীণা সুকুমারের চিঠিগুলি পড়িল, তারপর সুকুমারের ছবিখানার দিকে চিঠিগুলি আগাইয়া ধরিয়া কহিল, "এ-সব তাহ'লে মিছে কথা! আমি শুধু ট্যারা!"

ট্যারা! ট্যারা! কথাটি মনে করিতেই মাথার মধ্যে তাহার কেমন ওলট-পালট হইয়া গেল। মনে হইল চোখটার সঙ্গে যেন সমস্ত দেহের কোনও সম্পর্ক নাই; ভাবিতে ভাবিতে টেবিলের উপর হইতে কখন বীণা পেন্সিল-কাটা ছুরিখানা তুলিয়া লইল।

আর্তনাদ শুনিয়া রামহরিবাবু ও তাঁহার পশ্চাৎ গৃহিণী ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, বীণার সমস্ত মুখখানা ভাসাইয়া রক্তের স্রোত বহিতেছে আর ছুরিখানা ডান চোখের মধ্যে আমূল বিদ্ধ হইয়া আছে।

সংবাদটি যথারীতি সুকুমারের নিকট গিয়া পেঁছিল, তবে অন্য ধরণে। তাহার মাতা লিখিয়াছেন, 'ছুরির খোঁচা লাগিয়া রামহরি মাষ্টারের মেয়ের ডান-চোখটা একেবারে কাণা হইয়া গিয়াছে।"

সুকুমার দাড়ি কামানো বন্ধ রাখিয়া সংবাদপত্রপাঠে রত নৃপেন দত্তের দিকে চিঠিখানা ফেলিয়া দিয়া কহিল, "দেখ্‌লি নৃপেন, ভাগ্যিস—"

ত্রিলোচন কবিরাজ

আর কোনও শব্দ কানে আসিতেছিল না, শুধু পায়ের খড়ম জোড়ার সঙ্গে ফুটপাথ ঘর্ষণের ফলে অবিশ্রাম নানা ছন্দে খটাস্ খটাস্ ধ্বনি উঠিতেছিল, তাহাই শুনিতে শুনিতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চলিতেছিলাম। সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ মনে হইতেছিল। সকালে 'জেন্টস্ রেস্তোরাঁ ডি ল্যুক্স'-এ এক পয়সার এক কাপ চায়ের সঙ্গে তিন দিনকার বাসি রুটির একখানা পোড়া টোষ্ট খাইয়াছিলাম, ক্রমাগত তাহারই ঢেকুর উঠিতেছিল। সমস্ত দিন বাড়ী ফিরিব না সঙ্কল্প লইয়া বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু কোথায় দিন কাটাইব স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। পরিচিত দুই একটি বন্ধুর বাড়ী কাছেই ছিল, যাইতে পারিতাম, কিন্তু মনে মনে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলের উপরই কেমন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, কাহারও কাছে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। দুই একটি ঝি বাজার লইয়া পাশ দিয়া চলিয়া গেল, ফিরিয়াও চাহিলাম না। প্রতি মুহূর্ত্তেই মন উত্তরোত্তর সংসারে বীতরাগ

হইয়া উঠিতেছিল। সমস্ত জগৎটাই যদি কেওড়াতলা অথবা কাশীমিত্রের ঘাট হইয়া যাইত তাহাতেও কোন আপত্তি ছিল না।

সহসা পথের ধারের একটি ঘরের মধ্যে পুরুষের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। জানালা দিয়া দেখি অনেকগুলি লোক কেহ সরবে কাঁদিতেছে কেহ রুমালে চোখ মুছিতেছে। কেহ মরিয়াছে মনে হইল, কিন্তু বাড়ীর সম্মুখে খাটিয়া দেখিলাম না; উপরে চাহিলাম—দেখিলাম বাড়ীখানার প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা সাইনবোর্ড, তাহাতে সোনালি অক্ষরে লেখা 'প্রেমার্ত্তিহরণ ঔষধালয়', তাহার নীচে লেখা—শ্রীত্রিলোচন কবিরাজ। ঔষধালয় ও কবিরাজ উভয়কেই নূতন মনে হইল, কাজেই কৌতূহলী হইয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু অচিরাৎ বুঝিলাম ভুল করিয়াছি, কবিরাজ এবং ঔষধালয় কোনটিই নূতন নহে, যেহেতু সাইন বোর্ডের সোনালি অক্ষরে কালো দাগ পড়িয়াছে এবং সদরের যে ঘরে রুদ্যমান জনগণকে দেখিলাম তাহারই পাশে একটা বড় হল ঘর, তাহার আসবাব পত্রও অতি পুরাতন এবং ফরাসের একশ'-একটি স্থানে কালি এবং তেলের দাগ; ক্যাশ-বাক্সের সম্মুখে যে লোকটি বসিয়া ছিলেন তিনিও অতি প্রাচীন। বুঝিলাম এইটি কবিরাজ মহাশয়ের ডিসপেনসারী। ক্যাশবাক্স রক্ষক ভদ্রলোকটি আমাকে আগ্রহের সঙ্গে দেখিতেছিলেন, সহসা ডাকিলেন, "আসুন, ভিতরে আসুন!"

ভিতরে ঢুকিয়া ফরাসে বসিলাম। দেয়ালে একখানি প্রকাণ্ড আকারের মদনভস্মের অয়েল পেণ্টিং ছিল, সেইখানি দেখিতেছি এমন সময় ভদ্রলোকটি কহিলেন, "জানেন তো বাড়ীতে ব্যবস্থা নিলে দর্শনী আট টাকা?"

কহিলাম, "কিসের দর্শনী?"

"কবরেজ মশায়ের। ব্যাধি অবশ্য আপনার তিনদিনেই নির্মূল হবে। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।"

বিরক্ত হইয়া কহিলাম, "এই কথা বলবার জন্যে ডেকেছেন বুঝি? ব্যাধি আমার নেই।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "অবশ্য আছে। এই ব্যাধি নেই এমন পুরুষ এবং নারী জগতে নেই মশাই, রাজা রাজড়া থেকে—"

কথা সমাপ্ত হইতে দিলাম না, বিদ্রূপ করিয়া কহিলাম, "আপনি অন্ত-র্যামী দেখছি!"

বৃদ্ধ নির্বিকার ভাবে কহিলেন, "প্রায়। এই তেষট্টি বছর বয়স হ'ল মশাই, আঠার বছর থেকে কবরেজ মশায়ের কম্পাউণ্ডারী করছি। প্রত্যহ গড়পড়তায় তিন শ' রুগীকে ওষুধ দেই। বর্ষা আর বসন্তে রুগী হয় দুনো। ত্রিশটি ছেলে মোড়ক বেঁধে অবকাশ পায় না। নিজে দেখছি তো কবরেজ মশায়ের ওষুধ নইলে কারো চলে না। আর আপনি কিনা—"

একটু সম্ভ্রম হইল, কহিলাম, "কি ব্যাধির কথা বলছেন জানলে—"

বৃদ্ধ কহিলেন "সাইনবোর্ড দেখেন নি? যাবতীয় প্রণয়-ঘটিত ব্যাধির চিকিৎসা এখানে ওষুধ এবং মুষ্টিযোগ সহযোগে করা হয়। দর্শনী আট টাকা, ওষুধ বিনামূল্যে। এর চেয়ে সুবিধে পাবেন কোথাও?"

শিরোঘূর্ণন, হৃৎকম্প প্রভৃতি প্রণয়ঘটিত অনেক প্রকার ব্যাধির নাম ও তাহার বহুবিধ পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন বড় বড় মাসিক ও সংবাদপত্রে আবাল্য দেখিয়া আসিতেছি, এ পর্য্যন্ত তাহার প্রয়োজন হয় নাই। আর আজ—

বৃদ্ধ কহিলেন, "ভাবছেন? ভাবছেন বুঝি কোনও ব্যাধি নেই আপনার? কবরেজ মশায়ের সঙ্গে চোখাচোখি হ'লেই বুঝতে পারবেন ব্যাধি আছে কি না। আপনার আর বয়েস কি মশাই. আমি শ্রীবলরাম রসনিধি, পাঁচ পাঁচটি স্ত্রীকে নিমতলার ঘাটে পার করেছি, এই তেষট্টি বছর বয়েস, এখনও আমাকে মাঝে মাঝে কবরেজ মশায়ের কাছে ব্যবস্থা নিতে হয়।"

প্রতিবাদ করিলাম না, কিন্তু মনে হইল হয় তো ব্যাধি আমার কোথাও আছে। গৃহিণীর সহিত ঝগড়া করিয়া আসা অবধি মাথাটা টন্ টন্ করিতেছিল, ভাবিলাম হয় তো এটাও প্রণয়ঘটিত কোনও ব্যাধি হইবে, কিছু জিজ্ঞাসা করিব এমন সময় রসনিধি মহাশয় সসম্ভ্রমে কহিলেন, "ওই কবরেজ মশাই আসছেন!"

পরক্ষণেই হুঁকা হাতে ত্রিলোচন কবিরাজ মহাশয় মোহমুদ্গর আবৃত্তি করিতে করিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। বয়স সত্তর পার হইয়া গিয়াছে, মাথার সম্মুখের দিকে চুলের উৎপাত নাই, পিছনে কয়েক গুচ্ছ শুভ্র কেশ, তাহাতে একটি ধুতুরা ফুল। কবিরাজ মহাশয়ের ললাটে একটি যাত্রার দলের মহাদেবের ধরণে ললাটনেত্র আঁকা, তাহার মধ্যে একটি রক্তচন্দনের অক্ষিতারকা। ফরাসে বসিয়াই কবিরাজ মহাশয় আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কেন জানি না, আমি চোখ বুজিলাম।

কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "ভয় নাই, আরোগ্য হবে।" পরে হুঁকায় টান দিয়া কহিলেন, "রোগীগণকে উপস্থিত কর মাধাই!"

কবিরাজ মহাশয়ের আহ্বান শুনিয়া গুটিকয়েক অল্প বয়সের শিক্ষার্থী ডিসপেনসারীতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কবিরাজ মহাশয়কে প্রণাম করিয়া রোগীদের বসিবার ঘরে চলিয়া গেল। আমি ফরাস ছাড়িয়া একটি টুলের উপর গিয়া বসিয়া সতৃষ্ণনেত্রে রোগীদের ঘরের দরজার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

রোগীদের ঘর হইতে নানারূপ গুঞ্জন দীর্ঘশ্বাস অস্ফুট স্ফুট রোদন শুনিতে পাইলাম। তাহার পরই কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্রদের কাঁধে ভর দিয়া রোগীরা আসিতে সুরু করিল। একি! প্রায় যে সকলেই আমার পরিচিত। রসনিধি মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা দেখিতেছি মিথ্যা

নহে। রাজনৈতিক নেতা হইতে আরম্ভ করিয়া মাসিকপত্র সম্পাদক পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ ব্যক্তিই কবিরাজ মহাশয়ের নিকট চিকিৎসার্থ আসিয়াছেন। একটা বিশেষত্ব এই দেখিলাম যে, সকলেই কাঁদিতেছেন, কিন্তু কেহ কাহারও দিকে চাহিতেছেন না। অতি বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া দশ বৎসরের বালক পর্য্যন্ত রোগ দেখাইতে আসিয়াছে। একটা প্রশ্ন মনে জাগিল, উঠিয়া রসনিধি মহাশয়ের কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কহিলেন, "হাঁ মেয়েরাও আছেন, তবে তাঁরা দোতলায়। এঁদের ব্যবস্থার পর তাঁদের ব্যবস্থা হবে।"

কবিরাজ মহাশয় হাঁকিলেন, "অগ্রে অল্প বয়স্কগণকে উপস্থিত কর।" এক সঙ্গে পাঁচ সাতটি স্কুলের ছেলে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া ফরাসে বসিল। কবিরাজ মহাশয় গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "পরীক্ষায় ফেল করিয়াছ?"

সকলেই সমস্বরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে উত্তর দিল, "হুঁ।"

কবিরাজ মহাশয় আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। রসনিধির দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "প্রাতে মোহমুদ্গর গুড়িকা একমাত্রা, পথ্য উপবাস।" ব্যবস্থাপত্র লইয়া ছেলে কয়টি দর্শনী দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

এইবার বয়স্ক রোগীরা আসিতে সুরু করিলেন। প্রথমে যিনি আসিলেন তাঁহাকে চিনিতাম না। তিনি কবিরাজ মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

কবিরাজ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "পেশা কি?"

ভদ্রলোক কাঁদিতে কাঁদিতেই কহিলেন, "পত্রিকা সম্পাদক।"

"হুঁ! কবিতা ছাপা হয়?"

"আজ্ঞে তা'তেই তো—"

"হুঁ! লেখিকার কাছে পত্রলিখন কার্য্য করা হইয়াছে?"

"আজ্ঞে। তাঁর জবাব পেয়েই তো—" বলিয়াই ভদ্রলোক আবার কাঁদিয়া উঠিলেন।

আমি কবিরাজ মহাশয়ের অভ্রান্ত নির্দ্দেশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। কবিরাজ মহাশয় হাত বাড়াইয়া রোগীর নাড়ী দেখিলেন, তাহার পর কহিলেন, "ব্যবস্থা—প্রাতে ও সন্ধ্যায় অশ্রুভৈরব বটি, মধ্যাহ্নে স্বল্প প্রণয়ান্তক।" তাহার পর রোগীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "পত্রিকা সম্পাদন ত্যাগ কর।"

এই সময় ক্ষীণ একটি আর্ত্তনাদ শুনিলাম, পরক্ষণেই মাধাই আসিয়া জানাইল যে দ্বিতলে একটি রোগিণীর মূর্চ্ছা হইতেছে। ত্রিলোচন কবিরাজ উঠিলেন এবং এক টিপ নস্য নাসারন্ধ্রে টিপিতে টিপিতে দ্বিতলে চলিয়া গেলেন, এই অবসরে আমি রসনিধি মহাশয়ের নিকটে গিয়া বসিয়া কহিলাম, "যদি কিছু মনে না করেন—"

রসনিধি কহিলেন, "আদৌ মনে করব না, প্রশ্ন করুন।"

ত্রিলোচন কবিরাজের জীবন-কাহিনী জানিবার জন্য দুর্নিবার আগ্রহ হইতেছিল, কহিলাম, "কবিরাজ মহাশয়কে অনেক দিন থেকেই জানেন আপনি। তাঁর সম্বন্ধে—"

রসনিধি কহিলেন, "ত্রিলোচন কবরেজের কথা জানেন না আপনি? আচ্ছা সংক্ষেপে শুনুন তবে। পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। কবরেজ মশায় পড়তেন সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, আমরা পড়তাম মুগ্ধবোধ। অকস্মাৎ একদিন গ্রামের রজকনন্দিনী ধৈর্য্যময়ী ত্রিলোচন কবরেজের নামে অভিযোগ করল যে, তিনি তার অঙ্গ স্পর্শ করেছেন। অধ্যাপক মহাশয় চতুষ্পাঠী থেকে তাঁকে বিদায় দিলেন। ত্রিলোচন কবরেজ সেই থেকে সংসার ত্যাগ করেন। তারপর এ দেশ সে দেশ ঘুরে দেখলেন যে জগতে প্রেমব্যাধিই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। তখন জীবহিতের জন্য এই ব্যাধির ওষুধ খুঁজতে তিনি গেলেন হিমালয়। সেখানে সিদ্ধবাবা মদনমথনজীর নিকট দীক্ষা নেন, তিনিই তাঁর প্রেমব্যাধি আরাম করেন। তারপর গুরুর আদেশে তিনি লোকহিত সাধনের জন্য গুরুদত্ত ওষুধপত্তর নিয়ে সংসারে আসেন এবং এই ডিসপেনসারী খোলেন। তাঁর ছাত্রেরা কেউ বিবাহ করতে পারে না; তবে আমার পৈতৃক বৃত্তি বলে আমার সম্বন্ধে তাঁর অন্য ব্যবস্থা ছিল। তা তাঁর কৃপাতেই হোক আর ভাগ্যবলেই হোক পাঁচ পাঁচটার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি। গুরু হে তুমিই সত্য।"—বলিয়া রসনিধি হাতযোড় করিয়া উদ্দেশে নমস্কার করিলেন। এই সময় কবিরাজ মহাশয় আবার আসিয়া ফরাসে বসিলেন। এইবার আমিও ভক্তিভরে কবিরাজ মহাশয়ের পদধূলি লইলাম। কবিরাজ মহাশয় মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

রোগীরা তখনও কাঁদিতেছিল। ত্রিলোচন কবিরাজ হাঁকিলেন, "চুপ!" ক্রন্দনধ্বনি থামিয়া গেল, শুধু ফোঁস-ফোঁসানি শোনা যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় রোগী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বয়স বছর পঁচিশ, গায়ে একটা রঙ্গীন পাঞ্জাবী, চোখ কাঁদিয়া কাঁদিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে, মাথার চুল রুক্ষ। ফরাসে বসিয়াই ভদ্রলোক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ত্রিলোচন কবিরাজের খোলা নস্যদানী হইতে খানিকটা নস্য ফরাসে উড়িয়া পড়িল, কবিরাজ মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিলেন। তাহার পর রোগীর নাড়ী দেখিয়া কহিলেন, "রোগের বিবরণ বর্ণনা কর।"

কেমন করিয়া পাশের বাড়ীর ছাতে শাড়ী শুকাইতে দেখিয়া তাঁহার রোগের প্রথম সূত্রপাত হয় এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে অনিদ্রা অরুচি দীর্ঘনিশ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়, ভদ্রলোক তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শেষে গত সন্ধ্যায় শাড়ীর অধিকারিণী তাঁহার মাথায় ছাত হইতে একঝুড়ি তরকারীর খোসা ফেলিয়া দেওয়াতে অনেকগুলি নূতন উপসর্গের সৃষ্টি

হইয়াছে। কবিতা রচনা করিবার প্রবৃত্তি তাহার অন্যতম। এই পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া পকেট হইতে একটি কলার খোসা কবিরাজ মহাশয়কে দেখাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রোগী পুনরায় কহিলেন, "তাঁর স্মৃতিচিহ্ন রেখেছি আমি—খোসা নয়, এ ফুল।"

কবিরাজ মহাশয় তাঁহার হাত হইতে খোসা লইয়া পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর সেটা ফেলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "হুঁ! জঞ্জাল প্রক্ষেপকারিণীর বয়স কত?"

রোগী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ষোলো—ষোলো! Sweet—"

ত্রিলোচন কবিরাজ ধমক দিয়া কহিলেন, "চুপ! ব্যবস্থা—কিশোরী-কালানল প্রাতে, সন্ধ্যায় দীর্ঘশ্বাসারি ঘৃত, বুকে মালিশ। যাও দক্ষিণের বাতায়নে একটি স্থূল যবনিকা প্রলম্বিত কর গে।"

ইহার পর ক্রমাগত রোগীরা আসিতে লাগিলেন, একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম যে, সকলেই অসঙ্কোচে সকলের সম্মুখে রোগের গূঢ় নিদান উদ্ঘাটন করিতেছেন। লজ্জার লেশমাত্র কাহারও নাই। বৃদ্ধ অনুকূল চক্রবর্ত্তীকে চিনিতাম। চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীর সহিত বনিবনা না হওয়াতে তিনি সম্প্রতি বিশ্বম্ভর পাকড়াশীর প্রৌঢ়া পত্নীকে দেখিয়া রোগগ্রস্ত হইয়াছেন এবং এদিকে পাকড়াশী মহাশয় অনুকূলবাবুর চতুর্থ পক্ষের সহধর্ম্মিণীকে কাশীবাস করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন—সঙ্কল্পের ফলে তাঁহার অরুচি শিবঃশূল ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিয়াছে। উভয়ের রোগের এই পারিবারিক গোপন নিদানের কথা উভয়ে পরস্পরের সম্মুখেই বর্ণনা করিয়া গেলেন, বলিতে বাধিল না। দেখিয়া ত্রিলোচন কবিরাজের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি আমার ভক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

রোগী ক্রমাগত আসিতেছে, ব্যবস্থা লইতেছে, বিরাম নাই। এদিকে বেলা বাড়িয়া উঠিল দেখিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় ঝড়ের মত একজন ঘরে প্রবেশ করিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"প্রাণ যায়—প্রাণ যায়!"

আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। 'বস্তুবিকা'র অন্যতম সদস্য রাতুল রাহা! সহসা রাতুল রাহা হরিকুমারের স্বপ্নরাজ্য হইতে বাস্তব সহরে আসিলেন কি করিয়া? ঘর শুদ্ধ সমস্ত লোক নিস্তব্ধ। যে সকল রোগীরা ক্ষণকাল পূর্ব্বেও ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন তাঁহারাও নবাগত রোগীর অবস্থা দেখিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলেন। ত্রিলোচন কবিরাজ রাতুল রাহার দিকে একবার চাহিলেন—তাহার পর উঠিয়া আলমারী হইতে বেল-কাঠের ষ্টেথস্কোপটি বাহির করিয়া রাতুল রাহার বুকে লাগাইলেন, রোগী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ব্যথা! ব্যথা! বুক আর নেই—ঝাঁঝরা হয়ে গেছে কবরেজ মশাই।"

ত্রিলোচন কবিরাজ ধমক দিলেন, রোগী চুপ করিলেন। নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "হুঁ! রোগ জটিল।"

রাতুল রাহা হতাশ হইয়া কহিলেন, "সারবে কি? না ফাঁদে বন্ধ হ'য়ে—"

ত্রিলোচন কবিরাজ আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "ভয় নাই। অবস্থা বল।"

রোগী কহিলেন, "অবস্থা নেই আর। হৃদয়ের নাভিশ্বাস উঠেছে।"

ত্রিলোচন কবিরাজ চক্ষু মুদিয়া কহিলেন, "হুঁ। বল।"

রাতুল রাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন, "প্রেম আমার বুকে নীড় বেঁধে-ছিল—সেই ছোটবেলা থেকে। সেই নীড়ে হাজারো প্রেমপাখী ডিম ফুটে বেরিয়েছে। তারা জগৎ ঘুরে সবাই এখন হৃদয়-খাঁচায় আসতে চায়। কিন্তু ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই!"—বলিয়া রাতুল রাহা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

ত্রিলোচন কবিরাজ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "স্পষ্ট করে বল।"

রাতুল রাহা যাহা বলিলেন তাহার ভাবার্থ এই যে, একাদিক্রমে উনিশটি কুমারীকে তিনি প্রেম নিবেদন করিয়াছিলেন। পরে নিবেদিতাগণের অভি-ভাবক এবং অভিভাবিকারা সন্ধান পাইয়া রাহা মহাশয়কে 'বাস্তবিকা' হইতে কুমারীগণের প্রেমার্ঘ্য গ্রহণ করিবার জন্য ধরিয়া আনিয়াছেন; ফলে তাঁহার ইহলৌকিক জনক জননী শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ঘটক বলিতেছেন যে, রাহা মহাশয়ের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ এক বৎসরে একান্নটি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং যথোপযুক্ত মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন! শুনিয়া পুরোহিত ঠাকুরেরা অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন এবং পঞ্জিকা দেখিয়া একটা আসন্ন সুতহিবুক যোগের সন্ধান করিতেছেন। ত্রিলোচন কবিরাজ খানিকক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন "রোগ জটিল। রীতিমত চিকিৎসা আবশ্যক।" তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ব্যবস্থা বলিতে লাগিলেন, "প্রাতে বৃহৎ প্রেমাঙ্কুশ-লোহ পূর্ণমাত্রা ও পুরোহিত-নিসূদন রস অর্দ্ধবটি; মধ্যাহ্নে বিবাহ-বিদ্রাবণ রস ও সন্ধ্যায় ঘটকাশনি ও খট্টাঙ্গাবলেহ। পথ্য প্রথম তিন দিবস লঙ্ঘন পরে অবস্থা মত।"

ব্যবস্থা মত ঔষধ লইয়া যখন রাহা মহাশয় বাহির হইয়া যাইতেছিলেন তখন হরিকুমারের বর্তমান সংবাদ জানিবার অভিপ্রায়ে আমিও উঠিলাম। ত্রিলোচন কবিরাজ পিছন হইতে ডাকিলেন, "অপেক্ষা কর।"

ফিরিলাম। কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "তোমাকে আমার একটু প্রয়োজন আছে।"

বসিয়া রহিলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সমস্ত রোগী বিদায় হইয়া গেল। তখন ত্রিলোচন কবিরাজ কহিলেন, "তোমাকে এই প্রথম দেখিলাম কিন্তু তোমার প্রতি আমার কিঞ্চিৎ মমতার সঞ্চার হইয়াছে, যেহেতু দেখিতেছি এই ব্যাধি তোমাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। কিন্তু দেখিলে তো বিদ্বান

বুদ্ধিমান খ্যাতিমান ধনী দরিদ্র কেহই এই নিদারুণ প্রেমব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পান নাই। আমি যদি তোমাদের শহরে চিকিৎসালয় খুলিয়া না বসিতাম তাহা হইলে কি হইত ভাবিতে পারিতেছি না। প্রথম যৌবনে এই ব্যাধি আমাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, গুরুদীক্ষা লইয়া উদ্ধার পাইয়াছি কিন্তু এখনও আমার মাঝে মাঝে তোমাদের নূতন নূতন উপন্যাস ও কবিতার বই পড়িয়া আবার দুই একটি উপসর্গ দেখা দিতেছে। কাজেই গ্রন্থপাঠ একরূপ বর্জন করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার প্রাণান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও এই দারুণ সংক্রামক ব্যাধি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তোমরা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছ বলিয়াই বোধ হয় এত শীঘ্র রোগগ্রস্ত হও। পূর্বে যেখানে কণ্ঠাশ্লেষ ব্যতীত রোগোৎপত্তি হইত না সেখানে এখন একটি কটাক্ষই দেখিতেছি যথেষ্ট—তাবৎ স্কুল কলেজ এবং তোমাদের মধ্যে শাড়ীর আঁচল ও চাবির গুচ্ছ পর্য্যন্ত রোগবীজাণু ছড়াইতেছে। ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ পদশব্দ শুনিয়াই তোমরা মূর্চ্ছা যাইবে।"

লজ্জায় লাল হইয়া উঠিলাম। পকেটে পয়সা না থাকিলে এখনও গৃহিণীর আসিবার শব্দ শুনিলে মূর্চ্ছার উপক্রম হয় তাহা আর বলিতে পারিলাম না।

ত্রিলোচন কবিরাজ কহিলেন, "তুমি অদ্য যাও। তুমি রোগগ্রস্ত হও নাই সুখের কথা, কিন্তু এ ব্যাধিসঙ্কুল নগরে যেখানে মেয়েস্কুলের গাড়ী হইতে বায়োস্কোপের ছবি পর্য্যন্ত এই দারুণ রোগের বীজাণু বহন করিতেছে সেখানে রোগগ্রস্ত হইতে বেশী সময় লাগে না। সাবধানের বিনাশ নাই, কাজেই প্রতিষেধক মদনমর্দন বটি ও কটাক্ষারি অঞ্জন লইয়া যাও। সপ্তাহে একটি করিয়া বড়ি শীতল জল সহ সেবন করিবে ও প্রত্যহ চক্ষে কটাক্ষারি অঞ্জন একবার করিয়া লাগাইবে। আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না, রোগিণীরা অপেক্ষা করিতেছেন।"

আমি প্রণাম করিলাম। কবিরাজ মহাশয় পুনরায় মোহমুদ্গর আবৃত্তি করিতে করিতে দোতলায় চলিয়া গেলেন।

বাহির হইয়া প্রথমেই দ্রুতপদে কাশীমিত্রের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইয়া গঙ্গাজল অনুপানে ত্রিলোচন কবিরাজের একটি বটি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলাম। সেবনের সঙ্গে সঙ্গে নারীজন সংক্রান্ত সর্বপ্রকার চিন্তা তিরোহিত হইল. গৃহিণীর কথাও ভুলিয়া গেলাম, মনে হইতে লাগিল জগতে আমি একাকী—আমার কেহ নাই, কেহ নাই কেহ নাই।

সম্মুখে দুর্গতিনাশিনী গঙ্গা খল খল করিয়া হাসিতে হাসিতে বহিয়া যাইতে লাগিলেন।*

* এই রচনা প্রেসে দিবার পরই আমরা বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। আমাদের বুড়া কম্পোজিটার হইতে আরম্ভ করিয়া দপ্তরীর নয় বৎসরের ছেলেটি পর্য্যন্ত ত্রিলোচন কবিরাজের ঠিকানা জানিবার জন্য বার বার বিরক্ত করিতে লাগিল। এমন কি প্রসিদ্ধ মুষ্টিবীর অবলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক ও সংবাদপত্রতাত্ত্বিক বৈকুণ্ঠ চাটুয্যে, সেলটিক-সভ্যতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী গবেষক বারিদবরণ চৌধুরী, সংবাদপত্র-সেবক ঔপন্যাসিক উৎফুল্ল দত্ত, প্রসিদ্ধ পাঁচালী-গায়ক সুবর্ণবণিককুলতিলক ভবভূতি লাহা পর্য্যন্ত পত্র লিখিলেন। রচনায় ঠিকানা না থাকাতে—অবস্থা বুঝিয়া আমরা শ্রীযুক্ত দিবাকর শর্ম্মার নিকট পত্র লিখি। তিনি উত্তরে জানাইয়াছেন—

"গৃহিণী কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সমস্ত জগতের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া অভুক্ত অবস্থায় বাড়ী হইতে বাহির হই। শেষে ক্লান্ত হইয়া গয়লামাসীর খোলার ঘরের বারান্দায় চাদর বিছাইয়া শুইয়া পড়ি। নিদ্রিত অবস্থায় ত্রিলোচন কবিরাজকে স্বপ্নে দেখি এবং বাড়ীতে ফিরিয়াই স্বপ্নবৃত্তান্ত লিখিয়া ফেলি। রচনাটি তাহাই। তবে ভরসা আছে স্বপ্ন ফলিবে—যেহেতু ত্রয়োদশীর দিন স্বপ্ন দেখিয়াছি। এই কথা বলিয়া আপনার বন্ধুদিগকে ভরসা দিবেন। ইতিমধ্যে পারিবারিক তাড়নার ফলে যদি পুনরায় স্বপ্ন দেখি তবে ত্রিলোচন কবিরাজকে তাঁহার পার্থিব ঠিকানাটি জিজ্ঞাসা করিব। ইতি—শ্রীদিবাকর শর্ম্মা।"

সম্পাদক, শঃ. চিঃ.

অল-ষ্টার ট্রাজেডি

"তাহ'লে কি বলতে চান পোলানেগ্রী সতী নয়?"

এই কথা বলিয়াই মুক্ত দ্বারপথে চটক আসিয়া বৈঠকখানায় ঢুকিল।

সভাস্থ সকলে চমকিয়া উঠিলেন। সর্ব্বেশ্বর ঘোষের চশমা চক্ষু হইতে নাকের ডগায় নামিয়া আসিল। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বেও তারস্বরে চীৎকার করিতেছিলেন তাঁহারা নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

চটক প্রশ্নটি পুনর্বার উচ্চারণ করিয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইল।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই। কয়েক দিন হইতে বাড়ীর দেয়ালে এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভে দেখিতে দেখিতে বিজ্ঞাপন-বিহ্বল হইয়া পাড়ার প্রবীণেরা মাথায় চাদর ঢাকা দিয়া ও নবীনেরা সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে গত রাত্রে 'মডেল সিনেমা'য় নগ্ন ও অর্দ্ধনগ্ন রূপসীদের ছায়াচিত্রে নৃত্য দেখিতে গিয়াছিলেন। আজ সকালে সর্ব্বেশ্বরবাবুর বৈঠকখানায় গত রাত্রির চিত্রাভি-

নয়ের সমালোচনা হইতেছিল। আলোচনা ক্রমে চিত্র হইতে চিত্রনটীগণের বয়স, রূপ, উপার্জ্জন এবং চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতে লাগিল, কাল রাত্রে যাঁহারা বেশী করিয়া করতালি দিয়াছিলেন আজ তাঁহারাই অভিনেত্রীদের নির্লজ্জতায় উষ্মা এবং সতীত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছিলেন। পথ দিয়া চটক যাইতেছিল, মিনিটখানেক স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিল, তাহার পর সর্বেশ্বর ঘোষের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া—তার পর পাঠকেরা জানেন।

সভাস্থ সকলের সন্ত্রস্ত হওয়ার হেতু ছিল। ৺চক্রপাণি চাকীর পুত্র চটক চাকী; পাড়ার সকলের চেয়ে পণ্ডিত, বি, এ পাশ এবং সকলের চেয়ে ধনী—এ পাড়ার বারো আনা বাড়ীর মালিক। অবিবাহিত। মঞ্চনাট্য ও ছায়ানাট্য সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান। পিতা সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া আজ পর্য্যন্ত ফিলম্ কোম্পানী খুলিতে পারে নাই। কিন্তু না খুলিলেও প্রত্যহ বায়স্কোপ দেখিত এবং হলিউডের প্রত্যেক অভিনেত্রীর কাছে চিঠি লিখিত। তেতলার পড়ার ঘরে বড় বড় আয়না টাঙ্গাইয়া ভ্যালেণ্টিনো এবং নোভারের মুখভঙ্গী আয়ত্ত করিত এবং ঘরের কর্ত্রী এক মাসতুত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীর কাছে তাহার আয়ত্ত বিদ্যার পরীক্ষা দিত। একদিন একখানা ছবি পর পর তিনবার দেখিয়া বাড়ী আসিয়া চটক দরজায় খিল দিল এবং রুডল্‌ফের নেত্রভঙ্গিমার অনুকরণ করিয়া ফেলিল। তাহার পর রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া ডাকিল, "বৌদিদি ?"

বৌদিদি খুন্তি হাতে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। চটক কহিল, "আজ এক মহাপরীক্ষার দিন। বিশেষ ক'রে তোমার পক্ষে। আমি তোমার দিকে চাইব—তোমার মনে যে ভাব হয় সত্যি বলবে আমাকে—বল।"

বৌদি কহিলেন, হ্যাঁ, বলব।"

"তবে স্থির হ'য়ে দাঁড়াও!"—বলিয়া ওষ্ঠপ্রান্ত কুঞ্চিত করিয়া মদির-স্তিমিত নেত্রে চটক তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিল, "কি ? বুকের মধ্যে কুরু কুরু করছে না ?"

বৌদি মুখে কাপড় দিয়া কহিলেন, "না ভাই, হাসি পাচ্ছে।"

চটক মুষড়িয়া গেল। সেই দিন হইতে সে বাঙ্গালী নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইল এবং প্রতিজ্ঞা করিল বিবাহ করিবে না। করিলেও ভারতবর্ষের নারীকে নহে। কিন্তু ওদিকে অন্তরায় ছিল—৺চক্রপাণি চাকীর উইলের সর্ত্তের মধ্যে প্রধান সর্ত্ত ছিল—ছেলে ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণ করিলে সেবায়েৎ পদ হইতে অপসৃত হইবে, কাজেই চটক মনে মনে হলিউডের প্রায় সকল অভি-নেত্রীকেই বিবাহ করিয়া ফেলিল এবং তাহার মানসবধূদের ফটোগ্রাফে 'চক্রপাণি নিবাসের' একতলার বারান্দা হইতে তেতলার চিলেকোঠার দেয়াল পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিল। তাহার এক শিষ্য ছিল সোমেন। সেও চটকের সহিত বহুকাল ভাবের আদানপ্রদান করিবার ফলে নিজের বাড়ীখানিকে

হলিউড করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন কি হইতে কি হইল! দেখা গেল যে, সোমেন টোপর মাথায় দিয়া মোটরে চাপিয়া একটা বাঙ্গালী মেয়েকে বিবাহ করিতে চলিয়াছে। চটক চটিয়া গেল, সোমেন নিজের পৈতৃক বাড়ীতে বাস করিত বলিয়া বাড়ীভাড়া দানো করিতে পারিল না, তবে তাহার ইচ্ছার কথা সর্বত্র প্রকাশ করিয়া দিল। আসল ভয়ের কারণ ছিল ইহাই, কাজেই চটকের প্রশ্নের জবাব দিবার ইচ্ছা কাহারো থাকিলেও সর্বেশ্বর ঘোষের বৈঠকখানাস্থ কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। কেবল একটি ভদ্রলোক একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। নাম ব্যোমকেশবাবু। গত দুই বৎসর হইতে নিজের জন্য একটা সুপাত্রীর সন্ধান করিতেছিলেন এবং বৎসরের তিন শ' ষাট দিন পাত্রীর অভিভাবকদের বাড়ীতে লুচি ও ক্ষীরের সদ্ব্যবহার করিয়া ফিরিতেছিলেন। গত তিন দিন হইতে সর্বেশ্বর-বাবুর বাড়ীতে অতিথি হইয়া রহিয়াছেন। সকলের মত চটককে দেখিয়া তাঁহারও একটু সম্ভ্রমের উদয় হইয়াছিল, কিন্তু সেটা বেশীক্ষণ রহিল না। অন্য কেহ চটকের প্রশ্নের জবাব দিল না দেখিয়া তিনি কথা কহিলেন। চটকের দম্ভ দেখিয়া তাঁহার রাগ হইল। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই চটক জবাব দিল; মিনিট দুয়ের মধ্যে উত্তর প্রত্যুত্তর উদারা হইতে তারায় চড়িল এবং সতী এবং সতীধর্ম সম্বন্ধে বিরাট তর্কযুদ্ধের আরম্ভ হইল। নূরজাহান বড় সতী কিংবা ক্যাথেরিন বড় সতী তাহার সিদ্ধান্ত হইবার পূর্বেই প্রথমে একখানি চুড়ি-পরা সুডৌল হাত, তাহার পর এক গোছা কোঁকড়ানো চুল, তাহার পরে একখানি সুন্দর মুখ বৈঠকখানার পিছনের দরজার ফাঁকে দেখা গেল, এবং শব্দ হইল, "বাবা! আমার টেণ্ট—"

চটক তর্কে ক্ষান্ত দিয়া তরুণীর দিকে চাহিয়াই মুখ নীচু করিল, চোখের ভঙ্গী কাহার মত করিবে সহসা তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। ব্যোমকেশবাবুর তর্কের খেই হারাইয়া গেল, তিনি অনাবশ্যক ভাবে নাক চুলকাইতে লাগিলেন। সর্বেশ্বরবাবু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "হ্যাঁ। এই আমরা সবাই যাচ্ছি মা!" তারপর চটকের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মেয়েটার বি, এ, এগ্‌জামিন কিনা—"

চটক গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে কহিল, "যে অপরাধ করেছি আজ, তার জন্য ক্ষমা করবেন" বলিয়া বাষ্টার কীটনের মত করুণ দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে চাহিল, কিন্তু দরজা তখন বন্ধ হইয়া গেছে।

(২)

সন্ধ্যায় সিনেমা যাইবার পথে গলি ঘুরিয়া অকারণেই চটক একবার সর্বেশ্বরবাবুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; দরজা বন্ধ। উপরে

চাহিয়া দেখিল বারান্দার এক কোণে ব্যোমকেশবাবুর মুখ। অকারণেই ঝাঁ করিয়া বাড়ীর বন্ধ ও খোলা জানলা-দরজাগুলির উপর একবার চটক চোখ বুলাইয়া গেল। ব্যোমকেশবাবুর পরিচয় ইতিপূর্বেই সে লইয়াছিল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কহিয়া গেল, 'লোফার!"

রাত্রে খাইতে বসিয়া নানা কথার মাঝে ফস্ করিয়া চটক কহিল, "আজ একটা মেয়ে দেখলাম!"

বৌদি প্রত্যহের মতই কহিলেন, 'কে? ম্যাডাম ফ্যারারা?" ক্রমাগত শুনিতে শুনিতে অনেকগুলি নাম বৌদির মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।

চটক কহিল, 'না। বাঙ্গালী।"

বৌদি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া খুশী হইলেন, "রূপসী বুঝি?"

"এমন রূপ নয় যে চোখে কুলের কাঁটার মত বিঁধে থাকবে, তবু রূপসী। যাক্—" বলিয়া সে আহার শেষ করিয়া উঠিল।

বৌদি চট্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘট্কী পাঠাব?"

চটক ঘাড় হইতে মাথাটাকে ইঞ্চি তিনেক কাৎ করিয়া কহিল, "ঘট্কী! উঁহু! তত দূরে যেতে হবে না।

বৌদি আর অগ্রসর হইলেন না, তবে বুঝিলেন যে, দেবরের বাঙ্গালী মেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা পুনরায় গজাইতেছে।

পরদিন প্রাতঃকালে আবার অকারণে চটক সর্বেশ্বরবাবুর বৈঠকখানার জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল, শুনিল গান হইতেছে। হারমোনিয়ামের আওয়াজে গলার স্বর কাহার বোঝা গেল না; তবে প্রভাতী গজলের সুর বড় ভালো লাগিল, চটক নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল—

বাগিচার নাচদুয়ারে আয় নেচে রে বুলবুলিয়া।
তপনের চুম লেগেছে ঘুম ভেগেছে ফুল গুলিয়া;
আঙ্গিনার কল্‌তলাতে কমল-হাতে মাজ্‌ছে হাঁড়ি
হা রে হা রূপগরবী সৈরভী ঝি চুল খুলিয়া:
বাহিরে সজনে-শাখে ডাকছে কাকে কাক-বধূটি
'হাঁসের ডিম' যাচ্ছে হেঁকে পথের বাঁকে ফজলু মিঞা।

গান শেষ হইতেই 'সর্বেশ্বরবাবু আছেন কি?' বলিয়াই চটক বৈঠকখানায় ঢুকিল, দেখিল ফরাসে ব্যোমকেশবাবু, তাঁহার সামনে হারমোনিয়াম, পাশে একখানি রেকাবে খানকয়েক বেগুনী ও এক পেয়ালা চা। চটকের যেন সহসা মনে হইল সে শত্রুপুরীতে প্রবেশ করিয়াছে; অভ্যাসমত পকেটে হাত দিল কিন্তু পিস্তলের পরিবর্তে উঠিল একটা লাল-নীল পেন্সিল। সেইটিকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ব্যোমকেশবাবুর দিকে চাহিয়া সে গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "আছেন আপনি আজও—" ব্যোমকেশবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া তিন পা

পিছাইয়া গেলেন ; চায়ের পেয়ালা উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। চটক ফরাসে শায়িত চায়ের পেয়ালার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, 'ভাল ক'রে বসিয়ে রাখুন।"

ব্যোমকেশবাবুর অকস্মাৎ পশ্চাদ্গমনে ধুপ্‌ধাপ শব্দ হইয়াছিল, বোধ হয় শব্দটি ভিতরে পৌঁছিয়াছিল। কালিকার মতই পিছনের দরজা খুলিয়া গেল এবং তিনিই প্রবেশ করিলেন। এক চক্ষু বিস্তৃত, অপর চক্ষু স্তিমিত করিয়া চটক চাহিল : তরুণী কহিল, "বাবা বাড়ী নেই—"

চটকের হাতের পেন্সিল কাঁপিয়া গেল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, "বসব তা হ'লে—"

তরুণী পুনরায় কহিল, "আমার এগ্‌জামিন—"

চটকের চোখে আগুন জ্বলিল, মনে মনে কহিল, ব্যোমকেশের বেলায় চা আর বেগুনী, আর আমার বেলায় এগ্‌জামিন! মুখে কহিল, "আচ্ছা—"

তরুণী চলিয়া গেল।

চটক ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া কহিল, "আর কত দিন থাকবেন ?"

ব্যোমকেশবাবু আর এক পা পিছাইয়া গেলেন, কহিলেন, "ঘোষমশাই যেতে বললেই—"

চটক আর দাঁড়াইল না।

সেদিন রাত্রে জোয়ান ক্রফোর্ডের ছবিখানার দিকে চাহিয়া চটক দেখিল যে, ছবিখানার মুখখানি যেন অনেকটা সর্বেশ্বর ঘোষের মেয়ের মত হইয়া গিয়াছে। চটক বাতি নিবাইয়া দিল।

(৩)

পরদিন প্রাতে ব্যোমকেশবাবু অমলাকে কহিলেন, "আমাকে যেতে হচ্ছে।"

অমলা কহিল, "বেশ যাবেন। বাবাকে বলুন।"

সর্বেশ্বরবাবুকে পূর্বেও ব্যোমকেশবাবু বলিয়াছেন, পাত্রী পছন্দ হইয়াছে তাহাও জানাইয়াছেন। সর্বেশ্বরবাবু আহ্লাদিত হইয়া কন্যার নিকট অনুমতি লইতে অনুমতি দিয়াছেন।

ব্যোমকেশবাবু কহিলেন, "আমি যেতাম না, কিন্তু—"

অমলা Hamletখানা উল্টাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু কি ?"

"চটকবাবু আমাকে পছন্দ করেন না।" বলিয়াই ব্যোমকেশবাবু একটি নিশ্বাস ফেলিলেন।

"চটকবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি? মনিব?" অমলা জিজ্ঞাসা করিল।

"না, তবে আপনাদের বন্ধু তো বটে।"

অমলা রাগিয়া গেল, "আমাদের বন্ধু কেউ নেই। থাকুন আপনি। আমি দেখব।"

ব্যোমকেশবাবু খুশী হইয়া বৈঠকখানায় বসিয়া ঘরের দরজায় খিল আঁটিয়া দিলেন।

আধঘণ্টা পর দরজার কাছে চটকের আওয়াজ শোনা গেল, "সর্বেশ্বর-বাবু আছেন?"

ব্যোমকেশবাবু দরজার খিলের দিকে একবার চাহিয়া কহিলেন, "না, নেই। অমলার এগ্‌জামিন—"

বাহিরে একটা অর্দ্ধস্ফুট আক্রোশ-বাণী শোনা গেল, তাহার পরেই প্রশ্ন, "আপনি আছেন আজও?"

ব্যোমকেশবাবু পিছনের দরজার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অমলা দরজার পাশেই পড়িতেছে; সদম্ভে কহিলেন, "হ্যাঁ, আছি।"

"বাইরে আসবেন?"

"না।" বলিয়াই হারমোনিয়াম খুলিয়া তান ধরিলেন—

বাগিচার নাচদুয়ারে—

তাহার পরই হারমোনিয়াম বন্ধ করিয়া দরজায় কান লাগাইলেন—বাহিরে কোন শব্দ নাই।

পাত্রের তো পছন্দ হইয়াছে, এখন আসল কাজ নির্ভর করিতেছে পাত্রীর পছন্দের উপর। ব্যোমকেশবাবু পাত্রীর দিকে বার বার চাহিতে লাগিলেন, মুখে প্রণয় কিংবা লজ্জা কিছুর চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না।

মোগল থিয়েটারে 'হ্যামলেট' ছবি দেখানো হইতেছে। সর্বেশ্বরবাবু যাইতে পারিলেন না। অগত্যা ব্যোমকেশবাবু অমলার শেক্সপীয়ারের নোট বহিখানা বগলে করিয়া তাহার পিছনে পিছনে গিয়া ট্রামে চড়িলেন।

Interval-এর সময় কে যেন ব্যোমকেশবাবুর কাঁধে হাত দিল। ব্যোমকেশবাবু চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, চটক!

চটক কহিল, "বাইরে আসুন!"

ব্যোমকেশ অমলার খাতাখানা মুঠা করিয়া ধরিয়া কহিল, "এখানেই বলুন।"

"সে এখানে বলবার কথা নয়।"—বলিয়া চটক ব্যোমকেশবাবুর হাত ধরিয়া টান দিল।

অমলা কহিল, "যান না বাইরে !"

অগত্যা ব্যোমকেশবাবু বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চটক কহিল, "আর একটু দূরে ওই চামড়ার গুদামের পিছনে।" মন্ত্রচালিতের মত ব্যোমকেশবাবু চটকের পিছনে পিছনে চলিলেন।

চটক বাঁ হাতের Oxford Edition Shakespeare-খানা ডান হাতে লইয়া কহিল, "শোন ব্যোমকেশ ! এ সংসারে অমলার দুই প্রণয়ীর স্থান নেই। হয় তুমি থাকবে, নইলে আমি। এই অন্ধকার রাত্রি, এই নির্জন গলির মোড়—পাহারাওয়ালা নেই। তোমার সঙ্গে ডুয়েল লড়ব। যে জিতবে অমলা তার।"

ব্যোমকেশবাবু কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "আমি পারব না !"

"পারতে হবে তোমাকে কাপুরুষ ! দাঁড়াও গলির ওধারে। তোমার হাতে ওই খাতা, আর আমার হাতে এই শেক্সপীয়ার ! এই দুই পিস্তল, ছোঁড় গুলি ! এক দুই তিন !" বোঁ করিয়া গলির দু'ধার হইতে বহি ছুটিল, কিন্তু লক্ষ্যে পোঁছিবার পূর্বেই চলন্ত একটি সাইকেলের সমুখের চাকায় দুই অস্ত্রই ঠেকিয়া গেল ; আরোহী সাইকেল থামাইয়া নামিয়া পড়িলেন। ব্যোমকেশবাবু গলির উত্তর দিকে ভোঁ করিয়া ও চটক দক্ষিণ মুখে ক্লাইভ বুকের ধরণে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া দৌড় দিল। সাইকেলের আরোহী একবার চাহিয়া দেখিলেন কোথাও পুলিশ নাই, অগত্যা নিমেষমধ্যে বহি দু'খানি কুড়াইয়া লইয়া গলির পূর্ব দিকের রাস্তা দিয়া সাইকেল চালাইয়া দিলেন।

(৪)

প্রকৃতপক্ষে ইহা গল্প নহে, উপন্যাস। কাজেই পাঠক-পাঠিকা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, অমলার কি হইল ?

কিছু হইল না, অমলা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া চা তৈয়ারী করিয়া পান করিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যোমকেশবাবু কোথায় ?"

কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

পরদিন প্রাতে দেখা গেল, ব্যোমকেশবাবুর আহার্য্য লুচী তেমনই ঢাকা রহিয়াছে। ব্যোমকেশ নাই। অমলা কহিল, "আমার খাতা ?"

সর্বেশ্বরবাবু কহিলেন, "দেখিনি। ব্যোমকেশ দিয়ে যায়নি ?"

অমলা কহিল, "আমার এগ্‌জামিন—যাও বাবা চটকবাবুর বাড়ীতে, সেখানে ব্যোমকেশবাবু আছেন হয় তো।"

সর্বেশ্বরবাবু চলিলেন। কিন্তু চটক শয্যাগত। গালি দিয়া ছুটিবার

সময় বিড়ির দোকানওয়ালা তাহাকে চোর বলিয়া তাড়া করিয়াছিল, সে ডগ্‌ল্যাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের অনুকরণে লাফ দিয়া চলন্ত রিকসাতে উঠিতে গিয়া চার্লি চ্যাপলিনের ভঙ্গীতে উল্টাইয়া পড়িয়া চোট খাইয়াছে। সে কথা সর্বেশ্বরবাবু জানিলেন না, শুধু শুনিলেন ব্যোমকেশবাবু সেখানে নাই। খাতাও নাই।

শুনিয়া অমলা কাঁদিয়া ফেলিল, ব্যোমকেশবাবুর জন্য নহে, খাতার জন্য। কাল তাহার টেষ্ট।

এমন সময় বাহিরে কড়া বাজিয়া উঠিল। সর্বেশ্বরবাবু দরজা খুলিয়া দিলেন। একটি ভদ্রলোক বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া কহিলেন, 'মিস্ অমলা ঘোষ এখানে—?"

অমলা আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল "আমি।"

ভদ্রলোক কহিলেন, "এই আপনার খাতা। কাল কুড়িয়ে পেয়েছি।"

অমলা হাসিয়া কহিল, "বাঁচালেন আপনি। আমি খাতা না পেয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম। কোথায় পেলেন ?"

আগন্তুক বীরেশ দাস হাসিয়া কহিলেন "সে কথা নাই-ই শুনলেন। আপনার খাতার সঙ্গে এটাও নিন—আমার নিজের নোট, ষ্টীফেন সাহেবের—কাজে লাগবে।"

অমলা কহিল, "ধন্যবাদ ? চা খান।"

চা খাওয়া হইল।

অধ্যাপক বীরেশবাবুর সে দিন প্রথম ঘণ্টায় ক্লাশ করা হইল না।

চটকের গায়ের ব্যথা সারিয়াছে। আবার অকারণে সেদিন সে সর্বেশ্বর-বাবুর বৈঠকখানার জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল—দেখিয়া এণ্টোনিও-মরেণোর মত ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল—অধ্যাপক বীরেশ দাসের বড় বেশী কাছাকাছি বসিয়া অমলা শেক্সপীয়ার পড়িতেছে। ধিক্ !

বাড়ীতে ফিরিবার পথে দেখিল যে ব্যোমকেশবাবু চানাচুর খাইতে খাইতে চলিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া চটক কহিল, "এবার !"

গলায় চানাচুর আটকাইয়া গেল ; একটু কাশিয়া গলা সাফ করিয়া ব্যোমকেশবাবু কহিলেন "অমলার বাড়ীতে আর যাইনি তো !"

চটক সে কথা কানে শুনিল না, কহিল, "এখন ?"

"মদন বড়ালের লেনে যাচ্ছি—সেখানে একটা পাত্রী আছে।"—বলিয়া এক লম্ফে ব্যোমকেশবাবু দণ্ডায়মান বাসখানিতে গিয়া উঠিলেন।

চটক চলন্ত বাসখানির দিকে রোনাল্ড কোল্‌ম্যানের মত বিদ্রূপ ভঙ্গীতে চাহিয়া কহিল, "কাউয়ার্ড !"

চটকের ভাবদীক্ষিত যে ভদ্রটির উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি তাহার একটু সবিস্তার-পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অতি সংক্ষেপে এবং অবলীলাক্রমে লিখিয়া যাইতেছি, গল্পও হইতে পারে, উপন্যাসও হইতে পারে, ইতিহাস হওয়াও বিচিত্র নহে।

সোমেন সমাদ্দার। য়ুনিভার্সিটির পঞ্চম বার্ষিক ইংরেজী শ্রেণীর ছাত্র। 'জীবনাঙ্ক সঙ্ঘে'র প্রেসিডেণ্ট। সঙ্ঘের নির্দ্ধারণ ছিল যে, সমস্ত জীবনটাই একটা প্রকাণ্ড নাটক; প্রতি দিবস তাহার নব নব দৃশ্যপট, মানব মানবী প্রত্যেকেই নট নটী। আহারে বিহারে সর্ব্ববিষয়ে এই নাটকীয় অনুভূতির উপলব্ধিই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। চটক ছিল এই সঙ্ঘের পেট্রন, কিছু টাকাও দিয়াছিল; কিন্তু সোমেন সহসা সঙ্ঘের নীতিবহির্ভূত একটা গর্হিত কাজ করিয়া ফেলিল। 'জীবনাঙ্ক সঙ্ঘের' জীবনান্ত হইল, বন্ধুবিচ্ছেদ হইল, ভবিষ্যতে সোমেনের এই দুষ্কর্ম্মের ফল ফলিলে কি হইবে কে জানে? যাহা হইবার হইবে, এখন তাহার জন্য চিন্তা করিয়া লাভ নাই। যাহা বলিতেছিলাম—

চটকের ভাবদীক্ষিত শিষ্য ও বন্ধু সোমেন। থার্ডক্লাশ হইতে চটকের সঙ্গে রীতিমত থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখিয়া ফিরিতেছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছে বিবাহ আদৌ করিবে না, হলিউডের কোনও রূপসী আসিয়া পাণি প্রার্থনা করিলেও—না। সোমেনের দিদিমা ও বৌদিদি উভয়েই বাবা তারকনাথের মানৎ করিয়াছিলেন কিন্তু সোমেনের মতের পরিবর্ত্তন হইল না। তবে একবার দিদিমা জোর করিয়াই তাহাকে পাত্রী দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তাহার ফল ভাল হয় নাই।

ব্যাপারটা এইরূপ। শিবরাত্রির রাত্রে চন্দ্রশেখর অভিনয় দেখিয়া সোমেন বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিল, বারান্দায় শৈলি ঝি—ভাল নাম শৈবলিনী—অঘোরে ঘুমাইতেছে। নিদ্রিতা শৈলি ঝিকে দেখিয়া সোমেন প্রতাপের ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িল; রেলিং-এ ভর দিয়া ডান হাত তুলিয়া সে কহিয়া উঠিল, "এ কি সেই শৈবলিনী? বাল্যকালে যার সঙ্গে—শৈবলিনী—শৈ—" শৈলি-ঝি হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। দিদিমা শিবমন্ত্র ভুলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। বৌদিদি কাঁদিয়া কাটিয়া সোমেনের মাথায় জল ঢালিলেন। পরদিন বৌদিদি ও দিদিমা আসিয়া উভয়ে যুক্তি করিয়া উপবাস করিয়া রহিলেন, বাধ্য হইয়া সোমেন পাল-পাড়ার বিশ্বাসদের বাড়ী ক'নে দেখিতে গেল। তলে তলে বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। ক'নে সাজিয়া গুজিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই সোমেন তাহার বাঁ হাতখানি মুঠা করিয়া ধরিয়া কহিল,

"—ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি
পতিযোগ্য নহি বরাঙ্গনে !"

ক'নেটি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, বেদনায় অথবা লজ্জায় জানি না। ক'নের দাদা অবিনাশ হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল কিন্তু ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট সোমেন সমাদ্দারের গায়ে সেকেণ্ড ইয়ারের ফেল করা ছেলে হাত দিতে সাহস করিল না। সোমেন সহসা দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া ট্রাম ধরিল এবং বাড়ীতে আসিয়া বৌদি এবং দিদিমাকে শাসাইল যে ইহার পর এ বাড়ীতে যদি কেহ তাহার বিবাহ সম্বন্ধে আলাপ করে তাহা হইলে সে খালধারের নিষ্ক্রিয়ানন্দ মঠে গিয়া সন্ন্যাস লইবে।

দিদিমা বত্রিশ পাটী দাঁতের অবশিষ্ট সম্মুখের দু'টি দাঁত দিয়া জিভ কাটিয়া কহিলেন, "ষাট্ ! ষাট্ ! ও কথা বলিসনে মাণিক !"

সোমেন পড়ার ঘরের দরজা সশব্দে বন্ধ করিয়া কহিল, "বলব ! সহস্রবার বলব ! আকাশের চন্দ্রতারা সাক্ষী ! স্বর্গে মন্দাকিনী সাক্ষী— '

আর শোনা গেল না, জানালাটিও বন্ধ হইয়া গেল, রান্নাঘরে বসিয়া বৌদিদি 'দুর্গেশনন্দিনী'র খোলা পাতার উপর মুখ রাখিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইহার পর হইতেই বাড়ীতে সোমেনের বিবাহপ্রসঙ্গ একেবারে বিবর্জ্জিত হইল, ভূমিকা এই পর্য্যন্ত।

(২)

এখন কাহিনীর পালা।

সেদিন আষাঢ়ের প্রথম দিবস। নবমেঘভারে আচ্ছন্ন নীল আকাশ যেন একটি তরুণীর সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া একখানি গাঢ়নীল শাড়ীর অঞ্চল। বিদ্যুৎ চমকাইতেছে যেন সেই অঞ্চলে খচিত মণিমালা। আকাশে মেঘের গর্জ্জন, নীচে ট্রামের ঘর্ঘর আর গলির মোড়ে মোড়ে গরম চানাচুরওয়ালার অশ্রান্ত চীৎকার। সোমেন এক ঠোঙ্গা চানাচুর লইয়া বাসে উঠিল। দশটার বাস। পরিপূর্ণ যাত্রী-সমারোহ। পিছনের বেঞ্চির এককোণে একটু স্থান করিয়া লইয়া সোমেন বসিল। বাস চলিতে চলিতে থামিয়া গেল। হাতে বহি আর খাতা লইয়া উঠিল এক অষ্টাদশী। গাড়ীশুদ্ধ সমস্ত যাত্রীই একবার ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিয়া লইল, শুধু সোমেন দেখিল নির্ব্বিকারভাবে। গাড়ী চলিল। মেয়েটি একবার চাহিয়া সোমেনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া লোলুপ দৃষ্টিতে সোমেনের পাশের বহির গাদার দিকে চাহিল। বহিগুলি তুলিয়া লইলে তন্বীর স্থান হয় কিন্তু অত কাছাকাছি ! ঘৃণায় সোমেনের সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। সে বহি লইয়া উঠিয়া গাড়ীর দেয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইল এবং তরুণী অবলীলাক্রমে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "থ্যাঙ্ক্স ! কোথা যাচ্ছেন ?"

সোমেন হাতের বইগুলিকে নির্দ্দয়ভাবে টিপিয়া ধরিয়া কহিল, "চুলোয়।"

তরুণী কহিল, "সেটা বুঝি দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ ?"

সোমেন তেমনি নির্ব্বিকারভাবে কহিল, "হ্যাঁ।"

তরুণী কহিল, "চলুন, আমিও যাচ্ছি।"

সোমেন কহিল, "থ্যাঙ্কস্ !"

দু'জনেই এক ক্লাশে পড়ে, মুখ দেখাদেখি ছিল, আলাপ হইল এই প্রথম। কমলাও ফার্ষ্ট ক্লাশ তবে সোমেনের দুই ধাপ নীচে। সোমেনের সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা তাহার বরাবরই ছিল, পড়াশুনার সুবিধা হইবে বলিয়া। কিন্তু সোমেনের রীতি-প্রকৃতির কথা শুনিয়া কাছে ঘেঁসে নাই। দৈবক্রমে পরিচয় হওয়াতে সে খুসী হইল। সোমেনকেও চিনিয়া ফেলিল।

বাস হইতে নামিয়া হন্‌হন্ করিয়া সোমেন তেতলায় উঠিল, উঠিয়াই দেখিল দরজার কাছে কমলা দাঁড়াইয়া। সে লিফ্‌টে উঠিয়াছে। সোমেনকে দেখিয়াই সে চানাচুরের ঠোঙ্গাটি আগাইয়া দিয়া কহিল, "নিন্ ! বাসে ফেলে এসেছিলেন।"

এই অসঙ্গত ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা দেখিয়া সোমেন রাগিয়া গেল, কহিল, "চাইনে। টিফিন করবেন।"

কমলা কহিল, "থ্যাঙ্কস্ !"

আরও মিনিট পাঁচেক পরের কথা। সোমেন নিবিষ্ট মনে কি লিখিতেছিল, কমলা পিছন হইতে আসিয়া কহিল, "আপনার পেন্সিলটা ?"

সোমেন একবার চাহিল, তারপর মনে মনে দাঁত খিঁচাইয়া পকেট হইতে একটা পয়সা বাহির করিয়া ডেস্কের উপর রাখিয়া কহিল "কিনে নিন গে।"

কমলা পয়সাটা তুলিয়া লইয়া কহিল, "থ্যাঙ্কস্।"

তারপর বেলা চারটে। সোমেন লাইব্রেরীতে বসিয়া Apologiaর একটি নূতন সংস্করণ হইতে নোট করিতেছিল, কমলা আসিয়া খোলা বহিখানার উপর একটা পয়সা ফেলিয়া দিয়া কহিল, "চানাচুরের পয়সাটা।"

বহির উপর এক ঘুসি মারিয়া সোমেন দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কহিল, "ড্যা—" তারপর সম্মুখে অকস্মাৎ জয়গোপালবাবুকে দেখিয়া কহিল, "অ্যাঙক্‌স্।"

কমলা পিছন হইতে মৃদুস্বরে কহিল, "ড্যাঙ্কস্ !" এবং ঈষৎ হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

সোমেনের সম্মুখের বহিখানার ইংরাজী অক্ষরগুলি ফারসীর মত জড়াইয়া যাইতে লাগিল। সেদিন আর নোট লেখা হইল না।

সন্ধ্যাকালে দিদিমার সহিত বৌদিদি ছাদে আসিয়া দেখিলেন যে, সোমেন কারারুদ্ধ জগৎসিংহের মত পাদচারণা করিতেছে ও বলিতেছে—

"কমলা, এঁটেকলা, কানমলা—হুঁ ! হুঁ !" লেখক বুঝিলেন যে এই

অস্থিরতার হেতু ছন্দ না মিলিবার দরুণ, দিদিমা বুঝিলেন যে তাঁহার নাতির কমলালেবু খাইবার সাধ হইয়াছে, বৌদিদি বুঝিলেন যে কমলা কাহারও নাম। দিদিমা ও বৌদিদি কোনও কথা না কহিয়া নিঃশব্দে নামিয়া গেলেন, কিন্তু আমি লেখক বাধ্য হইয়া কাহিনী-সমাপ্তির জন্য অশরীরী অবস্থায় সোমেনের সহিত রহিয়া গেলাম এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দেখিলাম যে জগতের যাবতীয় অভব্য অমেধ্য '-লা' সংযুক্ত শব্দের সহিত কমলার নাম সংযুক্ত করিয়া দিব্য একটি কবিতার সৃষ্টি হইল এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া ইজিচেয়ারে শুইয়া সোমেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

(৩)

পরদিন। প্রোফেসার আসিবার দেরী ছিল। কমলা আর তাহার সহাধ্যায়িনীরা যে বেঞ্চিটাতে বসে, সোমেন আপনার অজ্ঞাতসারেই ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে বারবার সেইদিকে চাহিতেছিল, এমন সময় ডানদিক হইতে প্রশ্ন আসিল, "আজ মেজাজ কেমন আছে সোমেনবাবু?"

সোমেন চাহিয়া দেখিল, কমলা। ঘরভরা ছেলে, চটিয়া উঠিতে পারিল না। কাল সন্ধ্যায় রচিত কবিতার কাগজখানি দিয়া কহিল "এটা আপনার। নিয়ে যান।"

কমলা চলিয়া গেল। যাইবার সময় কহিয়া গেল, "ঢ্যাংকস্!" সোমেন মনে মনে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

কমলা পরিহাসের উপযুক্ত জবাব পাইয়াছে এই সান্ত্বনা লইয়া সেদিন বায়স্কোপ দেখিয়া সোমেন ফিরিল। ফিরিতেই বৌদিদি চিঠি দিলেন—প্রকাণ্ড একখানি খাম। সোমেন তেতলায় গিয়া চিঠি খুলিল, লেখা আছে—"ঢ্যাংকস্ ফর ইওর কম্প্লিমেণ্টস্! কিন্তু দুঃখ যে আমি ছবি আঁকতে জানি কিন্তু কবিতা লিখতে পারিনে, কাজেই—ইতি

কমলা"

মোটা চৌকা আর্টপেপারে লেখা কয়টি কথা পড়িয়া সোমেন চিঠি উল্টাইল, দেখিল একখানি ছবি অবিকল সোমেনের চেহারা, হাতে বই আর মাথায় চানাচুরের ঠোঙ্গা, নীচে লেখা, চানাচুর সমাদ্দার। নির্লজ্জ নারী! হাতের কাছে পাইলে চুলের মুঠা ধরিয়া এমনি করিয়া দুই ঘুষি লাগাইয়া দেয়! সোমেন ঘুষি চালাইতে লাগিল। কাহার চিঠি খোঁজ লইতে আসিয়া জানালা দিয়া বৌদিদি দেখিতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "ওকি ঠাকুরপো! কাকে ঘুষি মারছ?"

উদ্যত ঘুষিটাকে পকেটে লুকাইয়া সোমেন কহিল, "বিরক্ত কোরো না! এক্সারসাইজ কচ্ছি।"

বৌদিদি কহিলেন, "ডাম্বেল কোথায় ?"

পকেট হইতে হাত বাহির করিয়া মুঠা পাকাইয়া সোমেন কহিল, "ডাম্বেলে হবে না, এখন মুগুর !"

সোমেনের চোখ দেখিয়া বৌদিদির ভয় হইল, তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন। সোমেন আবার ছবিখানি দেখিল, দেখিল যে এ ছবির কাছে কবিতাটা কিছুই নয়। যেন পিনের আঁচড়ের বদলে ছুরীর খোঁচা।

এমন সময় দিদিমা বাহির হইতে কহিলেন, "দাদা, আয় তোকে একটু ত্রিফলার জল খাইয়ে দিই।"

সোমেন তীব্র স্বরে কহিল, "তিনফলাতে হবে না দিদিমা, চৌদ্দফলা চাই।" ত্রিফলার বদলে চৌদ্দফলা পাওয়া যায় কি না জানিবার জন্য দিদিমা তাড়াতাড়ি আসিয়া শৈলি ঝিকে কৃষ্ণধন কবিরাজের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

(৪)

ত্রিফলার জল খাইয়াও সেদিন রাত্রে সোমেনের ঘুম হইল না। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কমলার ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিশোধ দেওয়ার উপায় ভাবিতে লাগিল। কবিতাটিতে আর চলিবে না, কমলার একখানি ফটোগ্রাফ পাইলে কোনও আর্টিষ্টকে দিয়া একখানি কার্টুন আঁকা যায়, ভালই হয় কিন্তু ফটোগ্রাফ চাওয়া যায় না, সব ফাঁস হইয়া যাইবে ! তবে—

উদ্ভাবনের পূর্ব্বেই ভোর হইয়া গেল। কখনও অ্যাটালাণ্টা, কখনও কমলা, কখনও মিলটন—বিচিত্র বস্তুতে ধাক্কা খাইতে খাইতে মন অবশ হইয়া পড়িতেছিল, তখন দশটা বাজিল। ট্রামে চাপিয়া একরশি পথ গিয়াছে এমন সময় আর একটি তরুণীর সহিত কমলা ট্রামে উঠিল। সোমেন গম্ভীরমুখে বহিগুলি গুছাইয়া নামিবার উপক্রম করিতেছে, কমলা কহিল, "কোথা যাচ্ছেন ?"

সোমেন কহিল, "চানাচুর কিনতে।"

কমলা মুচকি হাসিয়া কহিল, "আনবেন চাট্টি আমার জন্যে—ড্যাঙ্কস্ !" সঙ্গের সহাধ্যায়িনী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সোমেন চোখ লাল করিয়া নামিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পর কমলার ডেস্কে চানাচুরের একটি ঠোঙ্গা পেঁছিল, কমলা খুলিয়া দেখিল তাহার মধ্যে চানাচুরের পরিবর্ত্তে কলার খোসা, সে হাসিল। দূর হইতে সোমেন দেখিল, কমলা চটিল না। আঘাতটা লাগিল না দেখিয়া সে একেবারে মুষড়িয়া গেল। ছুটির পর সোমেন গোলদীঘির মোড়ে দাঁড়াইয়া বাসের প্রতীক্ষা করিতেছিল। পিছনে কখন স-সঙ্গিনী কমলা আসিয়া দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল তাহা লক্ষ্য করে নাই। বাসে উঠিয়া বসিয়াছে; তখন কমলার সহিত চোখাচোখি হইল। কমলা

সপ্রতিভভাবে কহিল, "আপনার খাবার আমাকে পাঠিয়েছেন সোমেনবাবু—তার জন্য থ্যাঙ্কস্ !" সোমেন মুখ ফিরাইল. ইচ্ছা হইল মেয়েটাকে দাঁত নখ দিয়া কামড়াইয়া আঁচড়াইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে !

পরদিন সোমেন কলেজের সময়ের একঘণ্টা আগে বাহির হইল এবং ছুটির আগেই ফিরিল। কলেজে অবশ্য অজ্ঞাতসারে দু-একবার কমলার দিকে চাহিয়াছিল গম্ভীরমুখে, কমলাও চাহিয়াছিল. কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে কৌতুক আর বিদ্রূপ। এইরূপে প্রায় দিন পনেরো কাটিল। কথাবার্ত্তা না হইলেও তখন প্রতিশোধ লইবার কল্পনা সোমেনের মগজে বাসা বাঁধিয়াছিল। একটা তুচ্ছ নারী তাহাকে পরাজিত করিয়া স্বচ্ছন্দে তাহারই চক্ষের সম্মুখে বিচরণ করিতে থাকিবে, এ অসহ্য ! বৌদিদিকে সমস্ত ঘটনা বলিলে তিনি অবশ্যই প্রতিশোধের একটা সদুপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতে পারিবেন এ বিশ্বাস তাহার ছিল, কিন্তু এক নারীকে জব্দ করিবার জন্য অপর নারীর সাহায্য লইতে কিছুতেই মন সরিতেছিল না। শেষে হঠাৎ প্রতিশোধ লইবার এক মহা সুযোগ উপস্থিত হইল।

প্রতিশোধ না লইলেও আর চলিতেছিল না। একে তো প্রত্যহ কমলার সেই অসহ্য কৌতুক-হাস্য, তাহার পর একসঙ্গে বাসে আসিবার ভয়ে ক্রমাগত ক্লাস কামাই করিতে হইতেছে। যেমন করিয়া হোক চিরকালের মত কমলাকে জব্দ করিতেই হইবে। সেদিন সুযোগও জুটিয়া গেল।

পথের মোড়ে আসিতেই সোমেন দেখিল. ক্লাসের আর দুটি ছাত্রীর সহিত কমলা এক ট্যাক্সিতে উঠিয়া হাঁকিল, "বোটানিক্যাল গার্ডেন !"

সোমেন মিনিটখানেক ধরিয়া কি ভাবিয়া লইল, তাহার পর চলন্ত একখানি ট্যাক্সি থামাইয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িয়া হাঁকিল, "বোটানিক্যাল গার্ডেন !"

বোটানিক্যাল গার্ডেন। কাল সায়াহ্ন। সঙ্গিনীরা গাছপালা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিতেছিল, একটা বেঞ্চে হেলান দিয় কমলা বসিয়া ছিল। জনপ্রাণী নাই। সোমেন ঝোপ হইতে ঝোপান্তরের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল, কমলার সম্মুখে আসিয়াই কহিল, "খাবেন চানাচুর ?"

কমলা চমকিয়া উঠিল, তেমন করিয়া হাসিতে পারিল না, তবু অভ্যাসবশে কহিয়া উঠিল, "থ্যাঙ্কস্ ! দিন—"

সোমেন রক্তচক্ষু হইয়া কমলার ডান হাতখানি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া কহিল, "ইচ্ছে করে, চুলের মুঠি ধ'রে—"

বলিয়াই সে নিজেই চমকাইয়া উঠিল, দেখিল যে কমলার চুলের গোছা আপনা-আপনিই যেন তাহার বুকের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। কমলা নিস্পন্দ।

হতভম্ব হইয়া ধপ করিয়া সোমেন বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। এই সময় কমলা চোখে আঁচল দিল। সোমেন দেখিল, কমলা কাঁদিতেছে। হাতের মুঠা খুলিয়া শশব্যস্তে কহিল, "হাতে লেগেছে ?"

কমলা হাত না সরাইয়া কহিল, "না।"

সোমেন কিছুই বুঝিল না, কহিল "তবে—"

কমলা চোখ হইতে আঁচল না খুলিয়াই কহিল, "ছবিটা ছিঁড়ে ফেলে দেবেন—আর ক্ষমা—"

সোমেনের কথা যোগাইল না। নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। সহসা দূরে হাসির শব্দ শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল। দেখিল কমলারই দুই সঙ্গিনী হাসিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে কহিল, "হাত মচ্‌কে গেছে—টিন্‌চার আইয়োডিনের পটি একটা—" বলিয়া কমলাকে দেখাইয়া দিয়া সে অন্তর্হিত হইয়া গেল। দূর হইতে একবার চাহিয়া দেখিল যে, মুখ নীচু করিয়া কমলা দাঁড়াইয়া আছে।

তেতলার ঘরে ঢুকিয়াই সোমেন দেখিল যে বৌদিদি কমলার আঁকা সেই ছবিখানা দেখিতেছেন আর হাসিতেছেন। সোমেন কহিল, "বৌদিদি! সর্ব্বনাশ করেছি।"

বৌদিদি চমকাইয়া উঠিলেন, কহিলেন "কি ?"

সোমেন বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, "নারী-নির্য্যাতন।"

বৌদিদি সভয়ে কহিলেন, "নাটক রাখ ঠাকুরপো! বড্ড ভয় করে আমার !"

সোমেন চোখ বুজিয়া কহিল,—"শুনবে তবে ? শোন, সোমেন নামে একটি ছেলে ছিল"—তাহার পর এই কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি।

বৌদিদি সমস্ত শুনিয়া কহিলেন, "আগে যদি বলতে ঠাকুরপো, তাহ'লে ছবি পাবার পর দিনই আমি পাল্‌টা জবাব দিয়ে দিতাম। তুমি থাক, আমি তাকে জব্দ করে দিচ্ছি।"

পরদিন সোমেন ঠিক দশটায় কলেজে গেল, কমলাকে দেখিল না। তাহার সঙ্গিনী দুইটি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিল, হাত তুলিয়া নমস্কারও করিল। পরদিনও কমলা আসিল না।

ইতিমধ্যে স্ত্রীর তার পাইয়া সোমেনের দাদা ছাপরা হইতে আসিলেন: চিঠির ঠিকানা দেখিয়া ইতিপূর্ব্বেই বৌদিদি ও দিদিমা কমলার বাড়ী ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। ফলে একদিন কমলার মামা ও সোমেনের দাদার সহিত ঘণ্টাখানেক পথে কথাবার্ত্তা—উভয়ে উভয়ের বাড়ীতেই আসিয়াছিলেন।

পরে একদিন কমলার সহিত কলেজে সোমেনের দেখা হইল। কমলা হঠাৎ আঁচলটি মাথায় টানিতে গেল, কিন্তু আঁচল ব্রোচে আটকান ছিল বলিয়া

পারিল না, অগত্যা মুখ নীচু করিয়া অত্যন্ত নিরীহ প্রাণীর মত বসিয়া রহিল আর সোমেন নীরবে পেন্সিল কাটিতে লাগিল।

শেষে একটা সামান্য নারীকে জব্দ করিবার জন্য একদিন সন্ধ্যাকালে ট্যাক্সিতে চাপিয়া দুর্য্যোধন বেশে সোমেন কমলার মামা হারাণ মজুমদারের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল।

জোয়ার

....

সে বয়সে কাক ডাকিলেও কোকিল বলিয়া ভ্রম হয় সেই দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সে বেচারামবাবু লবঙ্গমঞ্জরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তখন ভবিষ্যৎ কেহই বিচার করেন নাই, বর, বধূ এবং তাঁহার আত্মীয় পরিজনের দৃষ্টি বর্ত্তমানেই একান্ত ভাবে নিবদ্ধ ছিল। বেচারামবাবু দেখিয়াছিলেন এক জোড়া পটল-চেরা চক্ষু, মুক্তার নোলক ও তাম্বুলচর্ব্বণে ঈষৎ আরক্ত দুই পাটি দুগ্ধধবল দন্ত। বধূ দেখিয়াছিলেন ঘৃতছানাসেবনে নধরায়িত দেহ, স্ফীতগণ্ড একটি নবীন জলধরশ্যামল দেবমূর্ত্তি। লবঙ্গমঞ্জরীর মাতা দেখিয়াছিলেন একটি গোবেচারী ধরণের বালক, চাহিয়া খাইতে জানে না এবং তাঁহার পিতা দেখিয়াছিলেন বেচারামবাবুর পিতা কেনারামবাবুর কলিকাতার তিনখানা ভাড়াটিয়া বাড়ী এবং সুন্দরবনের তিন শত বিঘা আবাদী জমি। বিবাহ সাড়ম্বরেই হইয়াছিল—সেদিনের কথা মনে হইলেই আজও বেচারামবাবু গ্রামোফোনে দম এবং তাহাতে পিলু রাগিণীর সানাইয়ের রেকর্ড জুড়িয়া দিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতেন ও লবঙ্গমঞ্জরী ভাঁড়ার-ঘরের বারান্দায় বসিয়া বেগুন কাটিতে আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিতেন।

নদীর জোয়ারের জল শুখাইয়াছে আর তার দুই তীরে ভগ্ন ইষ্টকের পঞ্জর প্রকট করিয়া জরাজীর্ণ ঘাটের সোপানগুলি ক্রমে ক্রমে জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু এমন কেন হইল?

তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই কাহিনীর প্রসঙ্গে অনাবশ্যক। তথাপি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আভাস দিলে এই পার্থিব নশ্বর জগতের নশ্বরতর প্রেম-মরীচিকা সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাগণ সচেতন হইয়া সাবধান হইতে পারিবেন সেই জন্যই বলিতেছি।

ফুলশয্যার রাত্রি হইতেই আরম্ভ করা যাক। জ্যোৎস্না রাত্রি। বাড়ীর আঙিনায় নিমগাছটিতে একটি রাত্রিচর পেচক পক্ষি-ভাষায় তাহার সখীর নাম ধরিয়া চীৎকার করিতেছিল। বেচারামবাবুর পিসীমাতা বারান্দায় দাঁড়াইয়া

'দূর দূর' বলিয়া তাহাকে তাড়াইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, ছাতের চিলেকোঠায় ফুলের বিছানায় শুইয়া পিঠ চুলকাইতে চুলকাইতে বেচারামবাবু নববধূর আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সিঁড়িতে চাপাহাসি, সতর্ক পদশব্দ ও চাবির গোছার ঝনৎকার শোনা যাইতেছিল, ক্রমে সমস্ত শব্দ ক্ষান্ত হইল এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যে দরজার পাশে কাহার চুড়ির টুং টুং শোনা গেল এবং তাহার পরই হাতে একটা বেলফুলের মালা লইয়া নববধূ লবঙ্গমঞ্জরী কক্ষে প্রবেশ করিলেন, চক্ষের পলকে বেচারামবাবু নিদ্রিত হইয়া নাসিকা গর্জন আরম্ভ করিলেন। বধূ লবঙ্গমঞ্জরী দেখিল স্বামী ঘুমাইতেছেন, তৎক্ষণাৎ সে বাতি নিবাইয়া দিল। বেচারামবাবু শশব্যস্তে কহিলেন—"ওকি, বাতি নিবিয়ে দিলে যে!"

লবঙ্গমঞ্জরী কহিল—"তুমি যে ঘুমুচ্ছ!"

বেচারামবাবু বিপদে পড়িয়া কহিলেন—"ঘুম নয়, তন্দ্রা। বাতি জেবলে দাও, তোমাকে দেখি একটু!"

লবঙ্গমঞ্জরীর বয়স তখন সতেরো বৎসর, ল্যাম্বস, টেলস্ ফ্রম সেক্সপীয়ার পড়িয়া শেষ করিয়াছে, একটু হাসিয়া কহিল, "কি দেখবে আবার? দিন-ভোর-তো জানালা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলে!"

বেচারামবাবু কহিলেন—'আবার দেখব!"

"দ্যাখো"—বলিয়া লবঙ্গমঞ্জরী সুইচ টিপিল এবং সেই দীপালোকিত কক্ষে পুষ্প-শয্যায় বসিয়া উভয়ে উভয়কে জানাইল যে জগতে আর কিছু না থাকিলেও তাহারা দুই জন দুই জনকে ভালবাসিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। গৃহ না থাকিলে বনে গিয়া এবং অন্ন না থাকিলে ফল মূল খাইয়া জীবন ধারণ করিবে, তোয়ালে না থাকিলে কেশরাশি দিয়া লবঙ্গমঞ্জরী বেচারামের পা মুছাইবে এবং আলতার অভাব হইলে বেচারাম নিজের বুকের রক্ত দিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর পেলব চরণ রাঙাইবে: কেবলমাত্র এম-এ পরীক্ষাটা পাশ করা আবশ্যক নতুবা পিতা গালাগালি দিবেন। লবঙ্গমঞ্জরীও জানাইলে যে বেচারামকে দান করিয়াই তাহার নারীজীবন সার্থক হইয়াছে এখন একমাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিতে পারিলেই জীবনের কোনও সাধ আর অপূর্ণ থাকিবে না।

কিন্তু যেমন গাছের সব আম পাকে না তেমনি জীবনের সকল সাধ পূর্ণ হয় না। বেচারাম ও লবঙ্গমঞ্জরীর সাধেও ভগবান বাদ সাধিলেন। ঠিক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পনেরো দিন পূর্ব্বে বেচারামের পিসীমাতা ঠাকুরাণী ভ্রাতুষ্পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে নরলোক ত্যাগ করিলেন। পিতৃ-গৃহে জিওমেট্রির প্রবলেম কষিতে কষিতে এই সংবাদ পাইয়া লবঙ্গমঞ্জরী কাঁদিয়া উঠিল। পরদিন তাহার শ্বশুর কেনারামবাবু স্বয়ং তাহাকে লইতে আসিলেন। লবঙ্গমঞ্জরী কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার বইগুলি

বাক্সে গুছাইয়া তুলিয়া পিস্‌শাশুড়ীর শূন্য স্থান অধিকার করিতে পতিগৃহে যাত্রা করিল। শ্রাদ্ধান্তে ব্রাহ্মণ-ভোজন, তৎপর দিবস কাঙ্গালী বিদায় এবং শেষ দিন কুটুম্বিনীগণের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ সমাপ্ত করিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর মনে পড়িল যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা সে বৎসরের মত শেষ হইয়া গিয়াছে। ঘরে গিয়া চেয়ারে বসিয়া সে কাঁদিতে লাগিল, পিছন হইতে বেচারামবাবু আসিয়া অতিরিক্ত আগ্রহে চেয়ারশুদ্ধ লবঙ্গমঞ্জরীকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন,—"কেঁদোনা তুমি, আমি তোমাকে নিজে পড়িয়ে আসছে বছর নিশ্চয় পাশ করাব।"

লবঙ্গমঞ্জরী চোখের জল মুছিয়া কহিলেন, "এবার আমি স্কলারসিপ পেতাম যে!"

বেচারাম কহিলেন, 'আসছে বছর মেডেল পাবে!"

স্বামীর প্রেমে মুগ্ধ লইয়া লবঙ্গমঞ্জরী তখনকার মত পরীক্ষার কথা ভুলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য পাঠের নানারূপ প্রতিবন্ধকতা বশতঃ বেচারামবাবুও পাশ করিতে পারিলেন না।

পরীক্ষার খবর যেদিন বাহির হইল, সেদিন বেচারামবাবু পিতার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া রিক্সা চাপিয়া বাগবাজারে লবঙ্গমঞ্জরীর পিতৃ-গৃহে গমন করিলেন লবঙ্গমঞ্জরী তখন রেলিং ভর দিয়া দাঁড়াইয়া পাশের বাড়ীর বাতায়ন লক্ষ্য করিয়া কাহাকে যেন কি বলিতেছিলেন, স্বামীর পদশব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ফল বেরিয়েছে?"

বেচারামবাবু কহিলেন, "ফেল করেছি।"

লবঙ্গমঞ্জরীর মুখ শুকাইয়া গেল! কহিলেন "যে বিপদ আপদ গেল। তা নইলে তোমার মত ছেলে—"

বেচারামবাবু কহিলেন, "সেজন্যে নয়। তুমি পরীক্ষে দিতে পারলে না আর আমি তোমার অভিন্নহৃদয় স্বামী হ'য়ে কেমন ক'রে পাশ করব? সেই জন্যে—"

লবঙ্গমঞ্জরী স্বামীর অপূর্ব্ব পত্নীপ্রেমে আবিষ্ট হইলেন এবং চকিত দৃষ্টিতে একবার পাশের সমস্তগুলি বাড়ীর ছাত দেখিয়া লইয়া বেচারামবাবুর বুকে মুখ লুকাইলেন। তাহার পর ছাতে বসিয়া দুইজনে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবার উভয়কেই পাশ করিতে হইবে। তাহার জন্য যদি কালীঘাটে তিন জোড়া পাঁঠা দিতে হয় তাহাও স্বীকার। লবঙ্গমঞ্জরী তাঁহার মাসিক হাত-খরচের টাকা হইতে জমাইয়া সে পাঁঠা কিনিয়া দিবেন।

পরীক্ষার খবর শুনিয়া কেনারামবাবু পুত্রকে কিছু বলিলেন না, পুত্রবধূকে ডাকিয়া কহিলেন, "তুমি একটু শাসনে রেখো বৌমা! তেতলার চিলেকোঠায় ও পড়বে আর তুমি দোতলার বারান্দায় ব'সে কাজকর্ম্ম সব

দেখবে আর পাহারা দেবে, বুঝলে ?" লবঙ্গমঞ্জরী দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া হাস্য রোধ করিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

অতএব বেচারামবাবুকে গৃহস্থ হইয়াও সন্ন্যাসী সাজিতে হইল। তিনি তেতলার চিলেকোঠা ঘরে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অধ্যয়নে ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু স্বভাবদোষ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। এক পাতা পড়িয়াই সিঁড়ির দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিতেন, "ওগো! শুনছ ?"

লবঙ্গমঞ্জরী দোতলা হইতে জবাব দিতেন—"শুনছি।"

"আমার পায়ের তলাটায় একটু সুড়্সুড়ি দিয়ে যাও তো, বড ঘুম পাচ্ছে।"

লবঙ্গমঞ্জরী কহিতেন,—"ঠাকুর কিন্তু বাড়ীতেই আছেন।"

পিতা বাড়ীতে আছেন শুনিয়াই বেচারামবাবুর নিদ্রার আবেশ ছুটিয়া যাইত. তিনি তারস্বরে আবার পড়িতে আরম্ভ করিতেন এবং দশ মিনিট পড়িয়াই আবার ডাকিতেন, "ওগো শুনছ, বাবা বেরিয়ে গেছেন ?"

স্বামীর নিকট বারবার মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ কাজেই লবঙ্গমঞ্জরী কহিতেন "হ্যাঁ, কেন ?"

"ছাদে একটা কাক বড্ড ডাকছে, তাড়িয়ে দিয়ে যাও তো লক্ষ্মী!"

বেচারামবাবুর লক্ষ্মী দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়াই কাল্পনিক কাকের উদ্দেশ্যে 'হুস্ হুস্' শব্দ করিতেন।

বেচারামবাবু খানিকক্ষণ কাণ পাতিয়া থাকিয়া আবার ডাকিতেন, "ওগো জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে যাওতো!"

লবঙ্গমঞ্জরী কহিতেন, "পারব না। হিষ্ট্রী পড়ছি এখন।"

বেচারামবাবু আর কথা কহিতেন না, বালিশ বুকে টানিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিতেন আর এদিকে লবঙ্গমঞ্জরী তাঁহার দক্ষিণ কর্ণ একতলায় কেনারামবাবুর বৈঠকখানার দিকে ও বাম কর্ণ বেচারামবাবুর তেতলার সিঁড়িঘরের দিকে উৎকর্ণ করিয়া দোতলার বারান্দায় বসিয়া সিপাহী বিদ্রোহের কারণাবলী কণ্ঠস্থ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেন। শেষে রাগিয়া 'ম্যাট্রিকুলেশন হিষ্ট্রী অফ্ ইণ্ডিয়া'খানা পানের বাটার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন ও একতলার সিঁড়িদরজার শিকল লাগাইয়া তেতলায় গিয়া উপস্থিত হইতেন। তারপর বেচারামবাবুর মাথায় হাত দিয়া কহিতেন—হ্যাঁগা, রাগ করলে ?"

বেচারামবাবু মুখ না তুলিয়া গাঢ়স্বরে কহিতেন—"যাও, যাও হিষ্ট্রী পড়—মরা মানুষের নাম মুখস্থ করগে!"

লবঙ্গমঞ্জরী বেচারামবাবুর ছোট বালিশটাতে নিজের মাথা রাখিবার একটু স্থান করিয়া লইয়া কহিতেন, "আর কোরব না। এই বারের মত মাফ কর!"

অগত্যা বেচারামবাবু ক্ষমা করিতেন এবং তাহার পর উভয়ের মধ্যে অর্দ্ধ প্রহর ধরিয়া যে কথাবার্ত্তা হইত তাহার সহিত ডক্‌ট্রিন অফ্ ল্যান্স্ অথবা

কেবাল মিনিষ্টির কোনও সম্পর্ক থাকিত না। কথা না ফুরাইতেই একতলায় সিঁড়ির শিকল ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিত, মৃদুকণ্ঠে আহ্বান আসিত—"বৌমা!" লবঙ্গমঞ্জরী তাড়াতাড়ি নামিয়া হাতের কাছে যাহা পাইতেন—সূঁচ সুতো, পানের বাটা অথবা তেলের বোতল, তাহা বামহাতে লইয়া শিকল খুলিতেন। কেনারামবাবু স্মিতমুখে প্রশ্ন করিতেন, "বেচু পড়ছে তো?" লবঙ্গমঞ্জরী কহিতেন, "হুঁ।"

কেনারামবাবু কহিতেন 'আচ্ছা' এইবার নেয়ে খেয়ে নিক্! বেশী পড়াও ভাল নয় আবার! যাও, ডেকে দাও গে।"

লবঙ্গমঞ্জরী বেচারামবাবুকে ডাকিয়া দিতেন। বেচারামবাবু ললাটের শিরা টিপিতে টিপিতে নামিয়া আসিতেন, কেনারামবাবু কহিতেন, "কপাল তো টন্‌টন্ করবেই। একসঙ্গে বেশী পড়তে মাথায় ঝাঁকানি লাগে। খানিকটা পড়বে আর খানিকটা ঘুরবে—ছাতে—"

বেচারামবাবু "আজ্ঞে আচ্ছা" বলিয়া স্নানের ঘরে প্রবেশ করিতেন।

মার্চ মাসে ম্যাট্রিকুলেশন, জুলাইতে এম-এ। হঠাৎ একদিন ডিসেম্বর মাসে মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ করিয়া লবঙ্গমঞ্জরী বেচারামবাবুকে কহিলেন—"এবারও পরীক্ষা দেওয়া হোল না!"

বেচারামবাবু মুষড়িয়া গিয়া কহিলেন, "দ্যাখো যদি কোনও মতে পার!"

লবঙ্গমঞ্জরী আঙ্গুলের কর গণিয়া কাঁদো কাঁদো হইয়া কহিলেন, "কোনমতেই হয় না আর!"

বেচারামবাবু শুষ্ক কহিলেন, "তাইতো!" তাহার পরই মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে পেন্সিল কিনিতে বাহির হইয়া গেলেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার কয়েকদিন লবঙ্গমঞ্জরীকে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকিতে হইল। পরীক্ষার দিন কয়েক পর একদিন বেচারামবাবু অত্যন্ত করুণা-মধুর স্বরে লবঙ্গমঞ্জরীকে কহিলেন, 'এবার পরীক্ষা দিলে তুমি নিশ্চয় মেডেল পেতে।'

লবঙ্গমঞ্জরী হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্রখণ্ডে বিজড়িত শিশুকন্যাটিকে বেচারামবাবুর দিকে তুলিয়া ধরিয়া তীক্ষ্নস্বরে কহিলেন, "এই যে মেডেল দিয়েছ!"

বেচারামবাবু অত্যন্ত অপরাধীর মত মাথা নীচু করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছুকাল আর পরীক্ষার প্রসঙ্গ হইল না। মাস ছয় পর একদিন বেচারামবাবু হাসিতে হাসিতে আসিয়া লবঙ্গমঞ্জরীকে বলিলেন, "আমি সেকেন ক্লাস পেয়েছি।"

লবঙ্গমঞ্জরী প্রথমে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, পরক্ষণেই তাঁহার পতিভক্তিতে আঘাত লাগিল, মনে হইল বেচারামবাবু প্রতারক, স্বার্থপর—লবঙ্গমঞ্জরীকে

নারীজন্ম সার্থক করিবার কাজে নিযুক্ত রাখিয়া নিজে স্বচ্ছন্দে পরীক্ষা দিয়া পাশ করিয়া গিয়াছেন !

লবঙ্গমঞ্জরীর প্রাণে সেই প্রথম ঈর্ষার আঁচড় লাগিল। পর বৎসর ট্রাম হইতে পড়িয়া ঠিক মার্চ্চমাসে কেনারামবাবু পঞ্চত্ব পাইলে লবঙ্গমঞ্জরীর প্রাণের এই আঁচড়টি সূক্ষ্মরেখা হইতে একটি দাগে পরিণত হইল। তৎপর বৎসর লবঙ্গমঞ্জরী ঠিক মার্চ্চ মাসেই পুনরায় প্রথম বৎসরের মত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। বেচারামবাবুর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পর দিবসেই শাশুড়ীর তত্ত্বাবধানে তদীয় কন্যাকে সমর্পণ করিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর ভয়ে পুরী যাত্রা করিলেন। চতুর্থ বৎসরে মার্চ্চ মাসে খুকীর ইনফ্লুয়েঞ্জা ও পঞ্চম বৎসরে ঠিক মার্চ্চ মাসেই আবার খোকার টায়ফয়েড হইল। এইরূপে লবঙ্গমঞ্জরীর বিবাহিত জীবনের চতুর্দ্দশ মার্চ্চ মাস কাটিয়াছে এবং প্রাণের সেই আঁচড়ের দাগটি ক্রমে ক্রমে একটি চৌদ্দ ইঞ্চি প্রস্থবিশিষ্ট অস্ত্রক্ষতে পরিণত হইয়াছে। লবঙ্গমঞ্জরীর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই তবে তাঁহার খুকী বই খাতা হ্যাণ্ডব্যাগে ভরিয়া প্রতিদিবস ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে যাতায়াত করিতেছে।

জীবন নদীর ভাটার টানে এমনই একটা দিনে আমাদের কাহিনীর ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল।

তখন বড়দিন। সিমলা, বোম্বাই, ওয়ালটেয়ার, দিল্লী, কাণপুর প্রভৃতি স্থান হইতে লবঙ্গমঞ্জরীর বাল্যসখীরা তাঁহাদের স্বামীদের বেতনের আয়তন অনুযায়ী কলেবর লইয়া কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় সে বৎসর নিখিল-ভারত-শিল্প-প্রদর্শনী। প্রথম শ্রেণীর সমস্ত হোটেল বারান্দায় স্থানাভাবের নোটিশ লটকাইয়া দিয়াছে ও কলিকাতার বাজারে মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ীর দাম টাম টাকায় দুই আনা হিসাবে চড়িয়া গিয়াছে।

উক্ত শিল্প-প্রদর্শনীতে একদিন সন্ধ্যাকালে লবঙ্গমঞ্জরী সকন্যা ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহারই সমানবয়সী একটি মহিলা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁ ভাই, তুমি লবঙ্গ না ?"

লবঙ্গমঞ্জরী আগন্তুকার পায়ের জরি-বসানো নাগরা ও পরণের পাশীশাড়ীর ঘাগরাবৎ ঢেউ দেখিয়া ভাবিলেন, বাইজী—পরক্ষণেই স্মৃতিগহ্বরে একটি আবছায়া মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সে অতীব শীর্ণকায়া এবং সম্মুখবর্ত্তিনী একেবারে বরনারী, কাজেই কি বলিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না।

আগন্তুকা হাসিয়া কহিলেন—"চিনতে পারলে না ভাই—আমি পঙ্কজ !"

লবঙ্গমঞ্জরী হাসিয়া কহিলেন, "যে মুটিয়ে গিয়েছ ভাই !"

পঙ্কজিনী কহিলেন, "উনিও তাই বলেন, কি করি বল দেখি ভাই ?"—

বলিরা পঙ্কজিনী দেবী একখানি বার বর্গগজ প্রমাণ ফুলদার রুমাল পাতিয়া তদুপরি তৃণ-শয্যায় উপবেশন করিলেন। সেখানে বসিয়াই উভয় সখীতে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পঙ্কজিনীর বেলফুল কমলিনী, কমলিনীর গঙ্গাজল নির্ঝরিণী, নির্ঝরিণীর দেখনহাসি পূজারিণী, পূজারিণীর ফাগ সুভাষিণী ইত্যাদি সখীত্বসূত্রে গ্রথিত অর্দ্ধডজন নারী একটি পুষ্পমালার মত লবঙ্গমঞ্জরীকে বেষ্টন করিলেন, তাঁহাদের স্বামীরা দূরে বটগাছের তলে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধনেত্রে গাছের ডালের সংখ্যা নির্ণয় করিতে করিতে সভাভঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধপ্রহর রাত্রে কলহাস্যধ্বনিসহ সভাসঙ্গ হইল। একমাত্র তিনিই কলিকাতাবাসিনী বলিয়া আগামী দিবস অপরাহ্নে তাঁহার গৃহে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া লবঙ্গমঞ্জরী বিদায় লইলেন।

পথে আসিতে আসিতে লবঙ্গমঞ্জরী আপনার অবস্থা একবার চিন্তা করিলেন, বুঝিলেন যে তিনি নিতান্তই অভাগিনী। সকলের স্বামীরা তাঁহাদের পত্নীকে সঙ্গে লইয়া প্রদর্শনী-ভ্রমণে আসিয়াছেন আর তাঁহার সঙ্গে আসিযাছে জগু কোচম্যান্, মহাদেও বরকন্দাজ আর মাধাই সহিস! লবঙ্গমঞ্জরীর মানসিক বিলাপ শেষ হইবার পূর্ব্বেই গাড়ী ফটকে প্রবেশ করিল। বেচারামবাবু অস্থির হইয়া তখন এঘর ওঘর করিতেছিলেন এবং ক্ষেমা ঝি কেন লবঙ্গমঞ্জরীর সঙ্গে যায় নাই, এইজন্য তাহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন। লবঙ্গমঞ্জরীকে দেখিয়া বেচারামবাবু সহর্ষে কহিলেন, "যা হোক্ এলে?"

লবঙ্গমঞ্জরী নিজের দুর্ভাগ্যের কথা তখনও ভুলিতে পারেন নাই, কহিলেন, 'না এলেই ভালো হ'ত!"

বেচারামবাবু সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না, খুকীকে ডাকিয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর মা টাকা নিয়ে যায়নি বুঝি, না?"

খুকী জানিনে' বলিয়া চলিয়া গেল। তখন বেচারামবাবু নীচে নামিলেন এবং সহিসকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে পথে ঘোড়া দুষ্টামী করে নাই। তবে সহসা লবঙ্গমঞ্জরীর এরূপ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণের কারণ কি? কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি আহার সমাপ্ত করিয়া বেচারাম শয়ন করিলেন। পরদিন লবঙ্গমঞ্জরীর রুদ্ররূপের হেতু বেচারামবাবুর চক্ষে প্রাতঃসূর্য্যের মতই প্রত্যক্ষ হইল।

বেচারামবাবু তখন আহারান্তে নিদ্রিত। অকস্মাৎ সিঁড়িতে অনেকগুলি পদশব্দ, চুড়ীকঙ্কণের ঝণৎকার, গরদের শাড়ীর খস্‌খসানি, কলহাস্য শুনিয়া তিনি চমকিত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। পরক্ষণেই, "এসো ভাই!" "মাইরি, কি মানিয়েছে!" "ওটা ক'ভরির?" "মজুরী কি নিলে?" "পান্নাখানা ক' রতি?" "আসতে দিলে তো? এই প্রকার বিচিত্র প্রশ্ন শুনিয়া বুঝিলেন যে লবঙ্গমঞ্জরীর কক্ষে সখী-সমাগম হইয়াছে। বাহিরে

যাইতে হইলে লবঙ্গমঞ্জরীর কক্ষ তিনখানির সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়—কিন্তু বেচারামবাবু গত পাঁচ দিন সময়াভাবে ক্ষৌর-কার্য্য করেন নাই, কাজেই কক্ষত্যাগ করিতে না পারিয়া বিছানায় মুদ্রিত নেত্রে শুইয়া পার্শ্বের কক্ষের স্বামীগৃহ, সন্তান এবং বিবাহতান্ত্রিক আলোচনা শুনিতে লাগিলেন।

শুনিতে শুনিতে বেচারামবাবু তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, সহসা লবঙ্গমঞ্জরীর উচ্চ কণ্ঠস্বরে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল. লবঙ্গমঞ্জরী কহিতেছেন, "তোদের স্বামী ঘরে মাষ্টার রেখে পড়িয়ে পাশ করিয়েছে—ভাগ্যি ভাল। আমার স্বামীর মত মানুষের হাতে পড়লে ফাষ্টর্-বুকেই শেষ হ'ত। আমি আবার পাশ দেব!"

বেচারামবাবুর আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগিল। রাগও হইল, কিন্তু ক্রোধের উদ্রেক হইলেই তিনি গ্রীক্ নীতি-উপদেষ্টার উপদেশ অনুসারে মনকে বিক্ষিপ্ত করিবার জন্য এক হইতে একশ পর্য্যন্ত গণিতেন, আজও সেই পন্থাই অবলম্বন করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে হাজার পর্য্যন্ত গণিয়াও ক্রোধের শান্তি হইল না, তখন ছাদে গিয়া পাদচারণা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, লবঙ্গমঞ্জরীর অতিথিরা যূথবদ্ধ হইয়া মোটর-আরোহণে প্রস্থান করিলেন, ছাদ হইতে রক্তনেত্র বেচারামবাবু তাহা দেখিলেন। তারপর ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলেন। লবঙ্গমঞ্জরী প্রশ্ন করিলেন, "দু'খানা লুচি মুখে দেবে?"

বেচারামবাবু কহিলেন, "না।" তারপর নীচে নামিয়া গিয়া একখানি চিঠি লিখিয়া ক্ষেমী ঝির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। লবঙ্গমঞ্জরী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পাঠ করিলেন—

"তুমি আমায় অপমান করিয়াছ। আমি তোমাকে মাষ্টার রাখিয়া পড়াইয়া পাশ করাই নাই এই কথা ভদ্রমহিলাদের নিকট রটাইয়াছ। কালই এই কথা তাঁহাদের স্বামীর নিকট এবং স্বামীদের মুখ হইতে তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবেরা শুনিবেন। প্রথমে কলিকাতা সহরে, তাহার পর দিল্লী, আগ্রা, দেরাদুন, সিমলা, কাণপুর, বোম্বাই, মাদ্রাজে এই অখ্যাতি প্রচার হইয়া যাইবে। লোকে মনে করিবে আমি স্ত্রীকে যন্ত্রণা দিই এবং তাঁহাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বর্ব্বর করিয়া রাখিয়াছি। এ ক্ষেত্রে আমি তোমার স্বামী হইবার উপযুক্ত নহি, কাজেই অদ্য হইতে আমি বৈঠকখানায় শুইব এবং নীচের ঘরেই আহারাদি করিব। ইতি শ্রীবেচারাম।"

লবঙ্গমঞ্জরীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, কহিলেন, "বেশ!"

আহারান্তে বৈঠকখানার ঘরে ছারপোকার দংশনে অতিষ্ঠ হইয়া বেচারামবাবু ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন এমন সময় ক্ষেমী ঝি একখানি পত্র লইয়া উপস্থিত হইল, বেচারামবাবু পড়িলেন।

"তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলাম। তোমার ছেলে

মেয়েদের খাওয়াইতে পরাইতে আমার জীবন ব্যর্থ হইল, আবার তুমিই রাগ করিতেছ ! আমি কল্য হইতে তোমার সংশ্রবে থাকিব না, অশান্ত ছেলে মেয়ে কেমন করিয়া সামলাও তাহা দেখিব। লোকে দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না। ইতি—লবঙ্গমঞ্জরী দেবী।"

প্রথমে বেচারামবাবুর মাথা ঘুরিয়া উঠিল কিন্তু তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া ক্ষেমী ঝিকে কহিলেন, "বেশ !"

সমস্ত রাত্রি নানা দুর্ভাবনা ও নিম্মর্ম ছারপোকা দংশনের ফলে গতনিদ্র হইয়া রাত্রিশেষে বেচারামবাবু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন—ঘুম ভাঙ্গিল ছোট খোকার চীৎকারে। সে আসিয়া বেচারামবাবুর হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "খিদে পেয়েছে বাবা !"

তন্দ্রাবিজড়িত নেত্র ঈষদুন্মীলিত করিয়া বেচারামবাবু কহিলেন,—"বিরক্ত কোরো না খোকা, তোমার মার কাছে যাও !"

খোকা কহিল—"মা যে নেই।" সর্পদষ্টবৎ চমকিত হইয়া বেচারামবাবু শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন, গত দিবসের যাবতীয় ঘটনা মনে পড়িল। তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠিয়া দেখিলেন দোতলা শূন্য—কেবল বড় খুকী ছবি আঁকিতেছে এবং বড় খোকা ও ছোট খুকী দুই জনে পিতার পরিত্যক্ত ছেঁড়া চটিগুলি সংগ্রহ করিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর রজত শুভ্র প্রশস্ত শয্যার উপর একটি ছিন্ন পাদুকার মনুমেণ্ট প্রস্তুত করিতেছে। বেচারামবাবুকে দেখিয়াই বড় খুকী কহিল,—"আজ আমার স্কুলের মাইনের দিন বাবা, টাকা দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিও। বার বার চাইতে পারব না।"

বেচারামবাবু প্রশ্ন করিলেন—"তোমার মা—"

বড় খুকী কহিল—"মা দিয়ে যায়নি, ব'লে গেল যে সব তোমার কাছ থেকে নিতে হবে। এই তোমার ভাঙ্গা বাক্সটার চাবি রেখে গেছে।"—বলিয়া একটা চাবি পিতার হাতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বেচারামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় গেছেন ?"

বড় খোকা কহিল, "বাগবাজার ! আর বলেছে তুমি যদি ও-মুখো হও—"

বড় খুকী তাহাকে ধমক্ দিয়া কহিল, "চুপ কর্ খোকা ! বাপের সঙ্গে বুঝি ও রকম ক'রে কথা কইতে হয় ? শোন বাবা, মা বলেছে যে যদি তুমি বাগবাজারের দিকে যাও তা হ'লে মা দুঃখিত হবেন, তারপর, কলকাতা ছেড়ে চলে যাবেন—কাশীও যেতে পারেন, কাটোয়ায়ও যেতে পারেন।"

ছোট খুকী কহিল—"মা বলেছে—যে সে আর আমাদের মা নয়, নতুন মা আসবে। হ্যাঁ বাবা, কবে আসবে ?"

বেচারামবাবু কহিলেন—"হুম্ ! আচ্ছা !"

তাহার পর একখানি চাদর গায়ে ফেলিয়া বাহির হইবার জন্য কেবল ঘরের

বাহির হইবেন এমন সময় বড় খোকা কহিল, "আমাদের খাবার আনিয়ে দাও বাবা! আমার কচুরী, ছোট খুকীর বার্লির বিস্কুট।"

বড় খুকী ও ছোট খোকা সমস্বরে কহিল—"আমাদের গরম বেগুনী।"

বেচারামবাবু একটু ভীত হইলেন তারপর কহিলেন—"ক্ষেমীকে ডাক!"

"সে তো নেই বাবা!" বড় খুকী কহিল।

"কোথায়?"

"সে আজ সকালে মার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে মার গাড়ীতেই চ'লে গেছে।"

বেচারামবাবু বুঝিলেন যে ষড়যন্ত্র। কহিলেন—"হুম্! বেশ দেখব! ঠাকুর?"

গণপতি ঠাকুর আসিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল যে সজিনার চচ্চড়িতে লঙ্কাবাটা দিতে হইবে কি না।

বেচারামবাবু কহিলেন, "না। তুমি খোকা খুকীদের খাবার আনিয়ে দাও।"

গণপতি কহিল—"এখন আবার কি খাবে বাবু! দশটা বাজে। একবার তো খেয়েছে!"

বেচারামবাবু বুভুক্ষু চতুষ্টয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিয়া কহিলেন—"খেয়েছিস?"

বড় খুকী কহিল—"অল্প।"

বেচারামবাবু কহিলেন—"এখন থাক্ তবে, বিকেলে বেশী ক'রে খাস্!"

সেদিন বেচারামবাবু গৃহস্থালীতে মনোযোগ দিলেন, সমস্ত গুছাইয়া খোকাখুকীদের আহারের নিয়ম ও পরিমাণ একখানি কাগজে লিখিয়া রান্নাঘরের দরজায় সাঁটিয়া দিলেন এবং ঠাকুর ও চাকরকে জানাইলেন যে সমস্ত কাজ নিয়মমত হওয়া চাই। মাইজী নাই বলিয়া চালাকী করা চলিবে না।

রাত্রে বেচারামবাবুর তন্দ্রাকর্ষণ হইবার উপক্রম হইতেছিল, ছোট খোকা আসিয়া কহিল—"বাবা আমার লাল জামাটা পরিয়ে দাও না—"

বেচারামবাবুর তন্দ্রা টুটিল—"রাত্রে কি হবে জামা?"

ছোট খোকা কহিল—"নইলে ঘুম পাচ্ছে না আমার!"

বেচারামবাবু হাঁকিলেন—"বড় খুকী!"

বড় খুকী জবাব দিল—"আমার বড্ড কাণ কট্ কট্ কচ্ছে বাবা!"

বেচারামবাবু কহিলেন—"আচ্ছা।"

প্রভাতে বৈঠকখানায় বসিতেই জগৎ কোচম্যান আসিয়া জানাইল ঘোড়া দানা খাইতেছে না।

বেচারামবাবু কহিলেন—"ডাক্তার দেখাও।"

জগৎ চলিয়া গেল এবং সন্ধ্যার সময় আসিয়া জানাইল যে ঘোড়া ছট্‌ফট্ করিতেছে।

বেচারামবাবু ধোপার কাপড় হিসাব করিতেছিলেন। নির্ব্বিকার চিত্তে হুকুম দিলেন, ঘোড়াটাকে পিঁজরা-পোলে পাঠাইয়া দেওয়া হোক্ !

দুপুরবেলা বেচারামবাবু ঘুমাইতেছিলেন, এমন সময় একটি কন্ষ্টেবল দুইহাতে ছোট খোকা ও ছোট খুকীর হাত ধরিয়া আনিয়া হাজির করিয়া জানাইল যে বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া দুই জন কাঁদিতে কাঁদিতে বাগবাজারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। বেচারামবাবু কন্ষ্টেবলকে একটি সিকি বখশিস্ দিয়া বিদায় করিলেন, কিন্তু বুঝিতে পারিলেন কলিকাতার গাড়ীঘোড়াসঙ্কুল সহরে এই সব অশান্ত ছেলেমেয়ে লইয়া বাস করা নিতান্ত বিপদজনক। তৎক্ষণাৎ বরকন্দাজ ডাকিয়া টাইম টেবিল কিনিতে হাওড়া ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন।

টাইম টেবিলের পাতা উলটাইয়া আইন কানুন দেখিয়া বেচারামবাবু মনে মনে কি স্থির করিলেন তাহা তিনিই জানেন। সন্ধ্যাকালে এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, এক ঝুড়ি কমলা লেবু ও হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসাবিজ্ঞান নামক একখানি বহির এগারো ভল্যুম কিনিয়া বাড়ীতে পেঁছিয়াই দেখিলেন দোতলায় হৈ চৈ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এক গামলা রসগোল্লা সম্মুখে লইয়া তাঁহার দুই খোকা ও দুই খুকী মহা সমারোহে ভোজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বেচারামবাবু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন এবং অতিরিক্ত রসগোল্লাভোজনে উদরাময় হইলে নক্স কিংবা পালসেটিলা দিতে হইবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় দাদার সহিত পাল্লা দিতে গিয়া ছোট খোকা এক সঙ্গে দুইটি রসগোল্লা গালে ফেলিয়া দিয়া চক্ষু কপালে তুলিল। বড় খুকী তাড়াতাড়ি চেঁচাইয়া উঠিল—"ওরে মরবি যে—বমি কর্!" ছোট খোকা সেই অবস্থাতেই মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াই চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। বড় খুকী কাঁদিয়া উঠিল এবং ঠিক সেই সময় ঘরের দরজার আড়াল হইতে ক্ষেমী ঝি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ছোট খোকাকে কোলে লইয়া তাহার মাথায় জল ঢালিয়া বাতাস করিতে বসিল। বেচারামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এখানে কেন?"

ক্ষেমী কহিল—"গিন্নিমা খোকাখুকীদের রসগোল্লা পাঠিয়েছিলেন। তাই—"

বেচারামবাবু কহিলেন—"হুম্! ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

রসগোল্লা ফিরাইয়া লইবার কথায় ছোট খোকা উঠিয়া বসিয়া কহিল—"উঁহু! ও আমার!"—বলিয়া আড়াই সের রসগোল্লার অবশিষ্ট তিনটি থপ্ করিয়া মুঠা করিয়া লইয়া সে একতলার সিঁড়ি ধরিল।

বেচারামবাবু আঙ্গুল তুলিয়া ক্ষেমী ঝিকে কহিলেন—"গামলাটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও!"

ক্ষেমী ঝি চলিয়া গেল।

সারারাত্রি ধরিয়া বেচারামবাবু নানাপ্রকার যুক্তিতর্কসমন্বিত চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে কলিকাতায় লবঙ্গমঞ্জরীর এবম্বিধ ঔদরিক অশান্ত সন্তানাদি লইয়া বাস করিলে আশু বিপৎপাত অবশ্যম্ভাবী। ভবিষ্যৎ চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে চার টুক্‌রা পেষ্টবোর্ডে তাঁহার চারিটি সন্তানের নাম পরিচয়সহ লিখিয়া দুই খোকা ও দুই খুকীর গলায় ঝুলাইয়া দিয়া বেচারামবাবু হাঁকিলেন—"মহাদেও, ট্যাক্সি নিয়ে এস।"

বড় খুকী জিজ্ঞাসা করিল—"গলায় টিকিট দিলে কেন বাবা?"

বেচারামবাবু কহিলেন—"বেড়াতে যাচ্ছি। পরে যদি কেউ হারিয়ে যাস্, তবে এই টিকিট দেখালে কলকাতায় এই বাড়ীতে পেঁছে দেবে। গাড়ীতে যদি কলিসন হয়, আর তাতে যদি আমি—বুঝলি, তবে তোদের গলায় এই টিকিট দেখে রেলের লোক তোদের খবর জানতে পারবে। বুঝলি?"

বড় খুকী বুদ্ধিমতী, সমস্তই বুঝিল। বেড়াইতে যাইবার আশায় অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া সে হাতের কাছে জামা-কাপড় যাহা পাইল গুছাইয়া লইল। বেচারামবাবু জগুর সাহায্যে ছয়খানা লেপ ও সাতখানা তোষকের একটা প্রকাণ্ড বিছানার বাণ্ডিল করিয়া স্বতন্ত্র ট্যাক্সিতে অন্যান্য দ্রব্যাদি সহ জগুকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া নিজের ঘরে কুলুপ দিয়া ও লবঙ্গমঞ্জরীর ঘরগুলি খোলা রাখিয়া মহাদেও বরকন্দাজের প্রতি গৃহরক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। তাহার পর সিদ্ধিদাতা গণেশের নাম জপিতে জপিতে ছেলেমেয়ের হাত ধরিয়া ট্যাক্সিতে গিয়া উঠিলেন।

বেচারামবাবু টিকিট কাটিয়াছিলেন মথুরার। কিন্তু বর্দ্ধমানে গাড়ী পেঁছিলেই হঠাৎ হাতের খবরের কাগজখানা মুঠা করিয়া কহিলেন—"বড় খুকী! তোরা সব নেমে পড়্।"

ছোট খোকা কহিল, "দাদা নাম্, বাবা সীতাভোগ খাওয়াবে!"

বড় খুকী কহিল—"নামবে কেন বাবা?"

বেচারামবাবু খবরের কাগজখানা বড় খুকীর গায়ে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—"দ্যাখ্ না পড়ে মথুরার কাছে কেবলই ইঁদুর মরছে—প্লেগে মরবি নাকি সবশুদ্ধ? নাম্ নাম্—"

ছোট খোকা পূর্ব্বেই নামিয়া সীতাভোগওয়ালাকে ডাকিতেছিল, বেচারামবাবু বাকী তিনটিকে সঙ্গে করিয়া নামিয়া পড়িলেন। প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ ভাবিয়া দেখিলেন যে স্বাস্থ্যকর স্থানের মধ্যে আছে উত্তরপাড়া—সেখানে গঙ্গার ধারে তাঁহার স্বর্গীয় পিতা কেনারামবাবুর বাগানবাড়ীও আছে। ভাবিতে ভাবিতে একখানি ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণ আসিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি এক সের সীতাভোগ কিনিয়া সেই গাড়ীতেই উঠিয়া বসিলেন এবং যথাকালে উত্তরপাড়ায় অবতরণ করিয়া জঙ্গলাকীর্ণ 'কেনারাম-উদ্যানে' স্থান গ্রহণ করিলেন।

জগৎ প্রভুভক্ত কোচম্যান। প্রভুর গাড়ী যখন ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগন্যাল ছাড়াইয়া গেল, তখন সে ট্যাক্সি চাপিয়া বাগবাজারে গিয়া প্রভুপত্নীকে জানাইল যে বাবু অদ্য প্রাতে পুত্রকন্যাসহ মথুরা যাত্রা করিয়াছেন। লবঙ্গমঞ্জরীর হাত হইতে প্রাতঃকালীন গরম সিঙ্গাড়ার ঠোঙ্গাটি পড়িয়া গেল। তিনি কথা কহিতে পারিলেন না, বিচিত্র দুর্ভাবনায় বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। মথুরার পাণ্ডারা নাকি ডাকাত এই কথা ছেলেবেলায় তাঁহার ঠাকুরমার নিকট শুনিয়াছিলেন। মনে হইতে লাগিল এতক্ষণ মারিয়া পাণ্ডারা খুকীর গলার হার, ছোটখুকীর কোমরপেটী সমস্ত কাড়িয়া লইয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে আতঙ্কে তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন—"তোরা কেন যাসনি সঙ্গে?"

জগৎ কহিল—"বাবু নিলে না কি করি? তা নইলে বুড়োকালে মথুরাজী দর্শন—"

লবঙ্গমঞ্জরীর মাতা আসিয়া সমস্ত শুনিয়া তাঁহার পুত্রকে কহিলেন—"তুই যা হরু। দস্যি ছেলেমেয়ে নিয়ে পথে ঘাটে একা মানুষ—"

হরুর দেশ ভ্রমণের দারুণ সখ ছিল,—পয়সার অভাবে কোথাও যাইতে পারে নাই বটে কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্ত রেলওয়ে কোম্পানীর টাইম টেবিল পড়িতে পড়িতে একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। মাতার প্রস্তাব শুনিয়াই সোৎসাহে কহিল—"এ তো অতি অবিশ্যি কথা—"

"ওদের সঙ্গে দেখা হ'লেই আমাকে একখানা তার ক'রে দিবি বুঝলি?" —বলিয়া লবঙ্গমঞ্জরী একশ টাকার একটা পুঁটুলী হরুর হাতে গুঁজিয়া দিলেন। হরু হাতে সুটকেস ঝুলাইয়া বাহির হইয়াই বাসে চড়িল।

এমন সময় পথের দরজার কাছে এক ভিখারী আসিয়া গান ধরিল—

আর তো ব্রজে যাবনা ভাই
যেতে প্রাণ আর নাহি চায়।
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে
তাই এসেছি মথুরায়।

শুনিয়া লবঙ্গমঞ্জরী শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন—"কি অলক্ষুণে গানরে বাপু! দূর করে দে জগৎ হতভাগাকে!" ভিখারী বিড়্‌-বিড়্‌ করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল, তথাপি কীর্ত্তনের শেষ চরণটি লবঙ্গমঞ্জরীর মনের মধ্যে ক্রমাগত হাতুড়ীর আঘাত করিতে লাগিল। শেষে অতিষ্ঠ হইয়া ক্ষেমী ঝিকে সঙ্গে লইয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে লবঙ্গমঞ্জরী ট্যাক্সিতে আরোহণে পতিগৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর দুশ্চিন্তা তিনগুণ বাড়িয়া গেল। দেখিলেন যে, বেচারামবাবু গরম ওভার-কোট লইয়া যান নাই। খোকা-খুকীদের চল্লিশ জোড়া পশমী মোজা ঘর ও বারান্দায় ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। লবঙ্গমঞ্জরী কাঁদিয়া ক্ষেমীকে কহিলেন—"কি শাস্তি

হ'ল আমার ক্ষেমী ! এই শীতের দিন গরম জামা মোজা সব ফেলে উনি চ'লে গেলেন !"

ক্ষেমী সান্ত্বনা দিয়া কহিল—"সে তুমি ভেবো না। সঙ্গে টাকা পয়সা আছে—কিনে নেবেন।"

লবঙ্গমঞ্জরী কহিলেন—"সে কি কলকাতার সহর ক্ষেমী যে পয়সা দিলেই জিনিষ মিলবে ? রাগ ক'রে কি ছাই খেয়েছি আমি !"—বলিয়াই লবঙ্গমঞ্জরী শয্যা গ্রহণ করিলেন—ক্ষেমী তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

উত্তরপাড়ার বাগান-বাড়ীর সম্মুখে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া বেচারামবাবু তাঁহার সংসারের কথা ভাবিতেছিলেন। দারুণ দুঃখময় বিশৃঙ্খল সংসার। প্রাণাধিকা পত্নী—যাঁহার সহিত কত গভীর রাত্রে দশ বৎসর পূর্ব্বে এই গঙ্গার এই ঘাটেই সাঁতার কাটিয়াছেন, সুরে সুর মিলাইয়া রবি ঠাকুরের প্রেমের গান গাহিয়াছেন—সে পত্নী বিমুখ ; বড় খুকী রাঁধিতে গেলেই ঘুমাইয়া পড়ে, বড় খোকা বাগানবাড়ীর মালী সহদেব গোয়ালার যন্ত্রপাতি সুবিধা পাইলেই গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দেয়—ছোট খোকার দুই আনা মূল্যের পাঁউরুটি ও পোয়াদেড়েক ঝোলাগুড় ব্যতীত প্রাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, ছোট খুকী জোনাকী দেখিলেই ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে। বাগানে মশা এবং কট্‌কটে ব্যাং সমানে সমস্ত রাত্রি শব্দ করে—সহদেব মালী তাহার গৃহবাসিনী প্রণয়িনীর নাম ধরিয়া ঘুমের ঘোরে উড়িয়া ভাষায় নিদারুণ চীৎকার করিতে থাকে—বেচারামবাবুর ঘুম ভাঙিয়া যায়। এই প্রকার বিচিত্র উৎপাত বেচারামবাবুকে মুহ্যমান করিয়া তুলিতেছিল। নিঃসঙ্গ জীবন কিছুতেই আর ভাল লাগিতেছে না। মনে হইল ষ্টীমারযোগে একবার তাঁহার সুন্দরবনের প্রজাদের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলে হয়তো অনেকটা শান্তি লাভ হইতে পারে। ভাবিয়া ভাবিয়া সঙ্কল্প অনেকটা স্থির করিয়া আনিতেছিলেন এমন সময় কে কহিল—"বেচুবাবু যে ! নমস্কার !"

বেচারামবাবু মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন—তালতলার বিপিন চৌধুরী। আগে শিয়ালদয় টিকেট কালেক্টার ছিলেন তারপর পুরাণো রিটার্ণ টিকিট বিক্রয় করিয়া চাকুরী হারাইয়া উত্তরপাড়ায় ভূষির আড়ত খুলিয়াছেন। পরিচয় ছিল—বেচারামবাবু কহিলেন—"হ্যাঁ।"

বিপিন কহিল—"বেশ। বেশ! অনেক কাল পরে দেখা হ'ল। বাগানে এসেছেন বুঝি ? সপরিবারে ?"

বেচারামবাবুর মুখ বিমর্ষ হইল, বলিলেন—"পরিবার নেই।"

বিপিন কহিল—"পরিবার নেই কি মশাই ? জানতুম না তো ! বড় দুঃখের কথা।"

বেচারাম দার্শনিকের মত গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—"দুঃখ আর

কি ? জগতে মিলন-বিরহ, দিন-রাত সবই তো আছে। সবই তে
সইতে হয় !"

বিপিন একটু দম লইয়া কহিল,—"তা' যদি মনে না করেন। আমার শালীর বয়স একুশ। রং আমার স্ত্রীর মত ফর্সা, চোখ অত টানা নয়, তবে এদিকে বুঝছেন—ভারী সুশ্রী, ডাগর। গরীব ব্রাহ্মণ। যদি অনুমতি করেন তা হলে—"

গঙ্গার দিকে চাহিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর সন্তরণ-চঞ্চল দেহের স্মৃতি বেচারামবাবুর অন্তরে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছিল। বিপিনের কথা তাঁহার কাণে গেল না, অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, "দেখব।"

বিপিন বাড়ীতে ফিরিয়াই প্রথমে তাহার স্ত্রী, তৎপর তাহার শাশুড়ী তাহার পর তাহার শ্বশুর মালগুদামের কেরাণী জলধরবাবুকে জানাইল যে সে বড় শীকার গাঁথিয়াছে। সেই সঙ্গে তাহার শ্যালিকা বৃন্দারাণীর থুৎনিতে চিমটি কাটিয়া দুই অক্ষরের একটা রসিকতা করিতেও ছাড়িল না। বেচারামের দ্বিতীয়পক্ষ হইলে কি হয়—তাহার অবস্থা ইত্যাদি বলিয়া বিপিন কন্যাভার-কাতর জলধরবাবুকে ও তাঁহার পত্নীর অন্তরাত্মাকে লোলুপ করিয়া তুলিল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিলেন না, তৎপর দিবস সূর্য্য উদিত হইবার পূর্ব্বেই জলধরবাবুর পত্নী স্বামীকে বেচারামবাবু সম্বন্ধে সাক্ষাৎ-সন্ধান আনিতে ভোরের গাড়ীতেই কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

কয়েক দিন হরুর টেলগ্রামের প্রতীক্ষায় পিওনের পথপানে চাহিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর দীপ্তি নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছিল। বেচারামবাবুর মথুরাযাত্রার দিবস হইতেই নিদ্রা ঘুচিয়াছে, হরুর টেলিগ্রাফ না পাইয়া আহারও ঘুচিল। তিনি কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন। সে দিনও দ্বিপ্রহরে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন, এমন সময় দরজার বাহিরে কে একজন ডাকিল—"এটা কি বেচারামবাবুর বাড়ী !"

লবঙ্গমঞ্জরী নিদ্রিতা ক্ষেমী ঝির চুল ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া বলিলেন—"ক্ষেমী দেখ্ তো টেলিগ্রাম এলো বুঝি—"

ক্ষেমী উঠিয়া একতলা ঘুরিয়া আসিয়া কহিল—"ভদ্দর লোক। বুড়ো।"

স্বামীর সংবাদ পাইবে ভাবিয়া লবঙ্গমঞ্জরী ক্ষেমীকে সঙ্গে করিয়া নীচে নামিলেন। ভদ্রলোককে বৈঠকখানায় বসাইয়া প্রশ্ন করিলেন—'কোত্থেকে আসছেন ?"

জলধরবাবু কহিলেন—"ওতোরপাড়া থেকে। এটা বেচারামবাবুর নিজ বাড়ী ? পৈতৃক ?"

লবঙ্গমঞ্জরী কহিলেন—"হুঁ।"

"পথ ভুলে কালিঘাট গিয়ে প'ড়েছিলুম, তা বেশ!'—বলিয়া জলধরবাবু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বহু পারিবারিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন যে বেচারামবাবুর হাতে পড়িলে তাঁহার আদরিণী কন্যা রাণীর হালে থাকিবে। যাইবার সময় অনুচ্চ স্বরে জলধরবাবু কহিলেন—"এখন প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!"

কথাটি লবঙ্গমঞ্জরীর কাণে গেল—কহিলেন—"কি বললেন?"

জলধরবাবু কহিলেন, "কি বলব আর মা, একটা বয়স্থা মেয়েকে নিয়ে বিপদে পড়েছি। আমার জামাই বিপিন—বেচারামের বন্ধু, বললে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ করবার ইচ্ছে।"

ক্ষেমী ঝি বিস্ময়ে হাঁ করিয়া ফেলিল। লবঙ্গঞ্জমরীর নিষ্প্রভ চক্ষুতে দীপ্তি ফিরিয়া আসিল—তিনি প্রশ্ন করিলেন—"তিনি কোথায়?"

"ওতোরপাড়াতেই আছেন—" বলিয়া শুভকর্ম্ম শেষ হইল ভাবিয়া কন্যার রাজরাণী হইবার সম্ভাবনায় উল্লসিত জলধরবাবু লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

বেচারামবাবু মথুরা যাইবার ভাণ করিয়া উত্তরপাড়ায় গিয়া গোপনে বিবাহ করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন! লবঙ্গমঞ্জরীর মগজে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। মনে হইল বেচারামবাবুই একটি মূর্ত্তিমান ষড়যন্ত্র! নানাপ্রকারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হইতে তাঁহাকে বিরত রাখিয়া আজ পর্যন্ত লবঙ্গমঞ্জরীর সহিত তিনি যতপ্রকার ব্যবহার করিয়াছেন সমস্তই ষড়যন্ত্রমূলক। কি করিবেন কিছুই লবঙ্গমঞ্জরী স্থির করিতে পারিলেন না। ক্ষেমী ঝি এই সময় কহিল—"ভেবে আর কি করবে মা এখনও সময় আছে। তোমাকে দেখলেই—"

"আমি তাঁকে চাইনে! আমার ছেলেমেয়ে নিয়েই সংসার! মহাদেও!"

হুকুম পাইয়া মহাদেও ট্যাক্সি লইয়া আসিল।

শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। বাগানবাড়ীর একতলায় ইজিচেয়ারে বালাপোষ গায়ে জড়াইয়া বেচারামবাবু বিবর্ণমুখে বসিয়া ছিলেন। সম্মুখের চেয়ারে বিপিন চৌধুরী বসিয়া কহিতেছিল—"এ কি রকম কথা মশাই, অনর্থক বুড়ো ভদ্রলোকের চৌদ্দ আনা গাড়ীভাড়া খসিয়ে এখন বলছেন—"

বেচারামবাবু কহিলেন—"ভুল শুনেছেন। আমি সে সব বলিনি।"

বিপিন কহিল—"ভুল শুনব আমি মশাই? ভুষির দালালী ক'রে খাই—কড়াক্রান্তির পাওনাগণ্ডা মনে থাকে, আর আমি শুনব ভুল! স্পষ্ট বলুন না, বিয়ে করবেন কি না?"

বেচারামবাবু মাথা টিপিয়া ধরিয়া কহিলেন,—"মশাই বিরক্ত করবেন না। আর ভাল লাগছে না। আমার স্ত্রী আছেন—বাপের বাড়ীতে। কাজেই

বলেছিলুম পরিবার নেই। আর তিনি না থাকলেও আমি বিয়ে করতাম না জানেন? তাঁকে ছাড়া অচেনা কাউকে বিয়ে করতে পারিনে—তাঁর সঙ্গে চোদ্দ বছরের পরিচয়—বুঝছেন?"

বিপিন কহিল,—"স্ত্রীলোক আবার অচেনা কি? একবার দেখেই তো নাড়ীনক্ষত্র চেনা যায়! দেখছি ফাঁকিবাজী আপনার! স্ত্রী একটা থাকল ত' হ'ল কি? আর একটা বিয়ে ক'রে এখানে রেখে যান—মাস মাস খোরাকীর টাকা দেবেন।"

বেচারামবাবু বিরত হইয়া কহিলেন—"বলছি যে মশাই মাথা টন্ টন্ করছে—কথা কইতে পারছিনে—"

এতক্ষণ দরজার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া লবঙ্গমঞ্জরী স্বামীর কথা শুনিতে শুনিতে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছিলেন। এইবার প্রবেশ করিয়া বিপিনের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বেচারামবাবু—"তুমি!" বলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াই ইজি-চেয়ারে পুনরায় শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিলেন! বিপিন অবস্থা বুঝিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল—চৌদ্দ আনা আদায় করিতে পারিল না। ক্ষেমী ঝির মুখে সংবাদ পাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে ভাতের থালা ফেলিয়া খোকাখুকু চতুষ্টয় আসিয়া রুদ্যমানা মাতাকে ঘিরিয়া ফেলিল। লবঙ্গমঞ্জরী কাঁদিতে কাঁদিতে সব ক'টিকে একসঙ্গে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ইজি-চেয়ারে শয়ান বেচারামবাবুর বিবর্ণ ওষ্ঠাধরের দিকে বারবার সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

দু'জনে চোখোচোখী হইল অনেকবারই! কিন্তু কথা কে আগে কহিবে তাহা স্থির হইল না। লুচী পরিবেষণের ফাঁকে—"আর দু'খানা দিই"—বলিয়া আলাপ আরম্ভ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে কিন্তু মানের হানি হইবে না ভাবিয়া লবঙ্গমঞ্জরী রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল পর লুচীর থালা হাতে লইয়া আসিয়া দেখিলেন, ইজি-চেয়ার শূন্য, বেচারাম নাই। আশঙ্কায় লবঙ্গমঞ্জরীর হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে লাগিল।

•

গঙ্গার ঘাটে বেচারামবাবু নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন। বাস্—কোনও উৎপাত নাই—সংসার এখন স্বচ্ছন্দে রসাতলে যাইতে পারে! ভাবিতেছিলেন, এমন সময় মৃদুপদক্ষেপে কে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে নীরবে বসিল। দেখিলেন লবঙ্গমঞ্জরী! তাঁহার দেহে বিদ্যুৎ স্ফুরণ হইল, তথাপি বেচারামবাবু নির্ব্বাক্। লবঙ্গমঞ্জরীর গায়ে সেমিজ ব্লাউজ ছিল না। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া তিনি পৌষের দারুণ শীতে কাঁপিতে লাগিলেন। বেচারামবাবু আড়চোখে অর্দ্ধাঙ্গিনীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বালাপোষখানি একটু উন্মোচন করিলেন এবং লবঙ্গমঞ্জরীর কম্পমান দেহখানি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট

হইল। তাহার পর তাঁহার বাম স্কন্ধে লবঙ্গমঞ্জরীর মস্তক ও দক্ষিণ স্কন্ধে লবঙ্গমঞ্জরীর দক্ষিণ বাহু অবাধে স্থানলাভ করিল।

গঙ্গায় তখন জোয়ার আসিয়াছে। জোয়ারের টানে নৌকা ভাসাইয়া জনকয়েক মাঝি পূর্ব্ববঙ্গের ভাটিয়ালের টানাসুরে কোরাস গাহিয়া চলিয়াছে—

দক্ষিণ হাওয়ায় নৌকার পাল ছিড়্যাচ্ছে
ওরে ও মাঝি খবরদার!
দণ্ডে দণ্ডে প্রেমের নদী হয় সাঁতার।

শুনিয়া তীরস্থ দুইটি নির্ব্বাক প্রাণী মৃদু হাস্য করিলেন। কথা ফুটিল। এক জন অশ্রুগদগদকণ্ঠে ডাকিলেন—

লবং!

অন্য জন ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে জবাব দিলেন—

বেচারা!

সংস্কারক

অদ্য হইতে

(ক) অনুন্নত জনসাধারণের সেবা আমার জীবনের লক্ষ্য হইবে।
(খ) তাহাদের সামাজিক উন্নতি বিধান আমার জীবনের মন্ত্র হইবে।
(গ) বিধবার দুঃখ মোচন আমার জীবনের ব্রত হইবে।

ভগবান আমার সহায় হউন!

দৃঢ়কণ্ঠে এই কথা কয়টি পাঠ করিয়া শ্রীমান অনাদিচরণ চক্রবর্ত্তী বি, এ, নাম সহি করিলেন। পিতা ৺শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী, সাং পদমী, জিলা যশোহর।

নাকের স্থূল ডগাটিতে চশমা নামাইয়া সমাজ সংস্কার সমিতির প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় কহিলেন, "যে ব্রত আজ নিলে এই ব্রতের উদ্‌যাপন যদি করতে পার তা হলেই জীবন সার্থক হবে। তুমি কবে যাচ্ছ?"

"আজই! আর বিলম্ব করব না। জাতির দুর্দ্দশা দেখে ধৈর্য্য রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েছে।"

"যাও। তোমার জীবন অন্য সকলের আদর্শ হোক।"—বলিয়া সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত অন্য পাঁচজন যুবকের দিকে চাহিলেন। অনাদি নমস্কার করিয়া বাহিরে আসিল তখন সমাজ সংস্কারের জন্য সহরে মুহুর্মুহু সভা সমিতির সৃষ্টি হইতেছে। এমনই একটি সভার কর্ম্মী

ও প্রচারকের পদ শ্রীমান অনাদিচরণ গ্রহণ করিল। গত কল্য গোলদীঘিতে সম্পাদক মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া তাহার মনে জাতির সেবার জন্য যে দারুণ আগ্রহ জাগিয়া উঠিয়াছিল আজ এই পদ গ্রহণে তাহার পরিণতি হইল।

মেসে ফিরিয়া অনাদি বন্ধুদের ডাকিয়া কহিল "আমি আমার জীবনের স্বপ্ন সফল করবার সুযোগ পেয়েছি, কর্ম্মের পথে চললাম। তোমরা সব পেছনে এস।"—এই বলিয়া অনাদি আজিকার সন্ধ্যার সকল ঘটনা বন্ধুদের কাছে বলিল।

সকলে একবাক্যে বলিল, "এ একটা কাজের মত কাজ, তুমি যাও।" দুই একজন আইনের পরীক্ষা শেষ হইলেই তাহার সঙ্গ লইবে এ ভরসাও দিল।

অনাদি চাকর হরিচরণকে ডাকিয়া চা আনিবার আদেশ দিল। হরিচরণ যখন সিঁড়ির অর্দ্ধেক নামিয়াছে তখন অনাদি কহিল, "মোড়ের দোকান থেকে চা এনো হরি।"

হরি কহিল "সে কি বাবু, সে যে মানুকে ধোপার দোকান!"

অনাদি দৃঢ়স্বরে কহিল, "পৃথিবীতে কেউ ধোপা নাপিত নেই হরি, সব সমান, একই স্থলে জলে—"

হরি সকল কথা শুনিল না, "আচ্ছা" বলিয়া নীচে নামিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "রাতে বাবু আমাকে 'চান' করালেন!"

চা যখন আসিয়া পৌঁছিল তখন এগারোজন বন্ধুর মধ্যে মাত্র তিনজন কক্ষে বর্ত্তমান ছিল। বাকী সকলে চা আনিবার অবকাশে উঠিয়া গিয়াছিলেন। কাজেই মাণিকের দোকানের চা চার পেয়ালা বাদে অবশিষ্ট নর্দ্দমায় গেল, ভাবাবিষ্ট অনাদি তাহা লক্ষ্য করিলেন।

(২)

ট্রেণ হইতে নামিয়া বেলা তিনটায় অনাদি ব্যাগ হাতে চারখণ্ডির ঘাটে আসিয়া পেঁছিল। সমস্ত রাত্রি নৌকায় কাটাইতে হইবে কাজেই বড় দেখিয়া একখানা পান্সি ভাড়া করিল। নৌকা যখন চারখণ্ডির খাটে আসিয়া পেঁছিল তখন প্রায় সন্ধ্যা, হারু মাঝি অনাদিকে ডাকিয়া কহিল, "বাবু রেতে কি ফলার করবেন—না দুটো আলু সিদ্ধ ভাত?"

অনাদি বিছানায় শুইয়া কহিল, "ভাতই খাব।"

"তবে দ্যান দেখি চার গণ্ডা পয়সা। বাজারটা ঘুরে আসি।"

পয়সা লইয়া হারু চলিয়া গেল। হারু চলিয়া গেলে মনাই মাঝির তামাকের কথা মনে হইল। অনাদিকে ডাকিয়া কহিল "বাবু কি তামাক খান?"

অনাদি কহিল, "সিগারেট খাই। আমার সঙ্গেই আছে।"

মনাই হাত বাড়াইয়া কহিল, "একটা ছিগরেট পেসাদ পাব বাবু?"

অনাদি একটা সিগারেট ফেলিয়া দিল। সিগারেট ধরাইয়া একটা টান দিয়া কাশিতে কাশিতে মনাই কহিল, "চড়ার উপর উনুন করে দেব বাবু?"

অনাদি কহিল, "চড়ার উপর কেন? তোমাদের উনুন নেই?"

মনাই কহিল, "এজ্ঞে আছে। তা আমরা হচ্ছি মাঝি।"

জাতি সম্বন্ধে আপনার মতামত প্রকাশের এই প্রথম অবসর অনাদি ত্যাগ করিতে পারিল না, কহিল, "মাঝি! তাতে দোষ কি? জাতে কেউ ছোট নয় ভাই। তোমরা ছোট বলে মনে কর, তাই তোমরা ছোট। তোমাদের এই ভুল ঘোচাতে আমি এসেছি। আমি নিজে ব্রাহ্মণ, তোমাদের হাঁড়িতে খেয়ে দেখাব যে মাঝির হাতে খেলে ব্রাহ্মণের জাত যায় না।"

মনাইয়ের চক্ষু কপালে উঠিল। সে আর কথা কহিতে পারিল না। কথাগুলি মনাইয়ের মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে বুঝিয়া অনাদি নীরব রহিয়া তাহাকে ভাবিবার অবসর দিল।

খানিক পরে হারু আসিয়া পেঁাছিল। আসিয়াই কহিল, "মাটির গামলাটা দে।"

মনাই কহিল, "ক্যান্?"

হারু বলিল, "কে আবার রাতের বেলায় হাঙ্গাম করবে? দে গামলা। চিঁড়ে কিনে আনছি সওয়া সের। জল দিয়ে রাখি।"

মনাই উঁকি দিয়া দেখিল, অনাদি চক্ষু বুজিয়া শুইয়া আছে; তখন সে হারুকে কহিল,—"ছুঁসুনে পান্সী, গামছা দিচ্ছি—আলগোছে নিয়ে চড়ায় রাখ্।"

হারু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"ক্যান্ রে?"

মনাই হারুর দিকে গলা বাড়াইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "বাবু খেরেস্তান!"

হারু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "জানুলি ক্যাম্‌নে? গলায় যে পৈতে।"

"ও মানুষ দেখানো। বাবু আমার উনুনে পাক করি খাতি চায়।"

এই কথা শুনিয়া হারুর আর অনাদির খৃষ্টানত্ব সম্বন্ধে সংশয় রহিল না। সে কহিল,—"দে গামলাটা আলগোছে আমার হাতের উপর।"

মনাই গামলা দিয়া অনাদিকে ডাকিল, অনাদির তন্দ্রা বোধ হইতেছিল, উঠিয়া কহিল, "উনুন ধরিয়েছ?"

হারু মহা বিপদে পড়িয়া গেল। খৃষ্টান ছুঁইলে উনুনের জাতি যায় এদিকে ব্রাহ্মণ ব্যবহার করিলেও মহাপাতক! একটু ভাবিয়া হারু কহিল, "এজ্ঞে বাবু, সে উনুনে কাজ চলে না, আমরা রাতের বেলায় ফলারের চিঁড়ে আনিছি।"

পাক করিয়া খাওয়া অনাদির কোনও জন্মে অভ্যাস ছিল না। চিঁড়ার কথা শুনিয়া কহিল, "আমারও চিঁড়েই আন তবে। রাতে আর রান্না-বান্নার হাঙ্গামে কাজ নেই।"

এই প্রকারে উনুনের জাতি বাঁচাইয়া হারু পুনরায় বাবুর চিঁড়া আনিবার জন্য চলিয়া গেল।

(৩)

পরদিন বেলা একপ্রহরের সময় পদমীর ঘাটে পান্সী লাগিল। অতি শৈশবে গ্রাম ছাড়িয়াছে তাহার পর সহরে বিশ বৎসর কাটাইয়া দিয়াছে। কাজেই গ্রামে তাহার পরিচিত কেহ ছিল না। মুঙ্গেরে শ্যামাচরণবাবুর গৃহে গ্রামবাসী যাঁহারা মধ্যে মধ্যে স্বাস্থ্যের অন্বেষণে তিন চারি মাসের জন্য অতিথি হইতেন তাঁহাদের নামও অনাদির অজ্ঞাত ছিল।

অনেক ভাবিয়া খোঁজ লইয়া সে নিজের বাড়ীতে গিয়াই উপস্থিত হইল। পথচারী দুই একজন লোক কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল। কাণাকাণিও করিতে লাগিল কিন্তু কেহই তাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ মোটা কম্বলে আবৃত এবং এই বেশটাকেই গ্রামের লোক ভয় করিত। কারণ অল্পদিন হইল প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ মহাশয় ইস্তাহার জারি করিয়া সকলকে জানাইয়া দিয়াছেন যে গান্ধীর চেলাদের সঙ্গে কোনওরূপ আলাপ আলোচনা করিতে সরকার বাহাদুরের নিষেধ আছে। গান্ধীর চেলাদের লক্ষণ সম্বন্ধে ইস্তাহারের নীচে এইরূপ লেখা ছিল।

(ক) তাহারা মাথায় সাদা টুপী পরিয়া থাকিবেক।

(খ) মোটা কাপড় পরিয়া থাকিবেক, মোটা কাপড়ে নির্ম্মিত কোর্ত্তা অথবা কম্বল গায়ে দিবেক।

(গ) হিন্দু হইলে 'বন্দেমাতরম্' ও মুসলমান হইলে 'আল্লাহো আকবর' বলিবেক।

(ঘ) তাহারা সভা করিয়া বক্তৃতা করিবেক এবং সকলের নিকট হইতে চারি আনা করিয়া পয়সা লইবেক।

সকল লক্ষণের সঙ্গে না হউক গান্ধীর চেলাদের একটি লক্ষণ অনাদির সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যমান ছিল, তাহা ছাড়া ইতিপূর্ব্বে গান্ধীর যে সকল চেলা গ্রামে মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছে তাহাদের চলিবার ভঙ্গীও ছিল এই রকম। যাহা হোক কোনমতে সন্ধান লইয়া অনাদিচরণ নিজ গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীর উঠানটি জঙ্গলাকীর্ণ। চকমিলান বাড়ীর দুইদিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ভগ্ন প্রাচীরের ইষ্টকগুলি প্রতিবেশীদের কাহারও পৈঠা কাহারও বা ঘাট বাঁধানোর কাজে লাগিয়াছিল। রান্নাঘরটির একখানি

চালাতে শত ছিদ্র টিনের আচ্ছাদন তখনও ছিল, অপর চালাখানির টিন নষ্ট হইয়া যায় দেখিয়া অনাদির এক জ্ঞাতি তাঁহার গোহাল ঘর তৈয়ারীর কাজে লাগাইয়া ছিলেন। বাগানের বেড়াটির শালের খুঁটিগুলির দুই একটি জরা-জীর্ণ অবস্থায় তখনও ছিল; কিন্তু কাঠের নকসা কাটা দাঁড়িগুলি রাখালদের গরু চরাইবার লাঠি ও বর্ষাকালে পড়শীদের জ্বালানী কাঠ রূপে ব্যবহৃত হইয়া বহু পূর্ব্বেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন থাকিয়া বাড়ীটার সংস্কার করিয়া যাইবার সংকল্প করিয়া সে একটা মরিচা ধরা তালা খুলিয়া দক্ষিণের ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার পর ঘর হইতে কোনও মতে একটা চৌকি বাহিরে টানিয়া সেখানে বসিয়া আধঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া খিড়কীর ঘাটে হাত মুখ ধুইতে বসিয়া গেল।

এই সময় পশ্চাৎ হইতে একজন প্রশ্ন করিল—"মশায়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

অনাদি মুখ ফিরাইয়া প্রশ্নকারীকে দেখিয়া লইল, তার পর কহিল, "কলকাতা থেকে।"

"নাম?"

"শ্রীঅনাদিচরণ চক্রবর্তী। পিতা ৺শ্যামাচরণ চক্রবর্তী।"

প্রশ্নকারী চর্ব্বিত দন্তকাষ্ঠটি ফেলিয়া কহিলেন, "ওঃ—তুমি আমার শ্যামাচরণদা'র ছেলে? দেশে ফিরেছ? ভাল! ভাল!"

আগন্তুককে অনাদি চিনিত না। কোনও আত্মীয় হইবেন ভাবিয়া সম্ভ্রমের সহিত কহিল, "আজ্ঞে হাঁ! এখন কিছু দিন এখানে থাকব!"

"বেশ আমরা আছি। কোন ভাবনা নেই—তবে সে রাম নেই সে অযোধ্যাও নেই। গাঁয়ের যাঁরা মাথা ছিলেন একে একে সকলেই গেছেন। এখন আছি আমি আর নটু খুড়ো। তা' আমাদেরও যাবার বয়স হ'য়ে এল। তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি রসিক ঘোষাল, একবার মুঙ্গেরে গিয়ে তোমাদের বাড়ীতে মাসখানেক ছিলাম, তখন তুমি ছোট।"—এই বলিয়া রসিক ঘোষাল অনাদির স্বর্গীয় পিতার আতিথেয়তা সম্বন্ধে অনেক কথা কহিলেন।

অনাদি স্নান করিয়া উঠিলে কহিলেন, "বাবাজী, বৈকালে বাড়ী থেকো, আমি আসব। গাঁয়ের হাব ভাব সব জানাব। এখানে থাকতে হলে খুব সামলে চলতে হবে।"

"আচ্ছা।" বলিয়া অনাদি গৃহে ফিরিল।

(৪)

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর জনকয়েক মজুর লাগাইয়া অনাদি গৃহ প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করাইয়া ফেলিল। গ্রামে নিম্নশ্রেণী কত ঘর আছে এবং মোট-

বিধবার সংখ্যা কত তাহার সংবাদ কৃষাণদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিল। অতঃপর কাজ আরম্ভ করিবার পালা। কি করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবে ভাবিতেছে এমন সময় রসিক ঘোষাল মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "এই যে বাবাজী, এক দিনেই বেশ গুছিয়ে নিয়েছ দেখছি।"

অনাদি তাঁহাকে বসিতে দিয়া কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, দিনকতক থাকতে হবে।"

"তা থাকবে বইকি? কিছু দিন না থাকলে সব ঠিক-ঠাক করে নিতে পারবে না। এই দেখ না, কি হয়েছে। ঐ যে শুপুরির গাছটি—ওটি ছিল তোমাদের সীমানায়, বেদখল করে খাচ্ছে নন্দ চক্কোত্তি। কিছু না শুধু এক নম্বর স্বত্বের মামলা করলেই বাছাধনকে বাপ বাপ করে বেড়া সরিয়ে নিতে হবে।"

অনাদি কথা কহিল না।

রসিক ঘোষাল কহিলেন, "তারপর পুকুরের ওপাড়ের বাঁশঝাড়টা, সেটার তো সবাই মালিক। যার বাঁশের দরকার, সেই আসে এই ঝাড়ে। ওদিকেও একটু দৃষ্টি দিতে হবে।"

অনাদি কহিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

রসিক ঘোষাল কহিলেন, "মামলা করতে কষ্ট নেই, দুটো টাকা ফেলে দিলে আমার ভাগ্নীজামাই সোমনাথ আছে বড় উকীলের মুহুরী, সব গুছিয়ে সেই করে নেবে। তদ্বির তদারক আমিই করব।"

অনাদি শুধু কহিল "বেশ।"

ইহার পরও রসিক ঘোষাল মহাশয়ের অনেক বক্তব্য ছিল কিন্তু গ্রামের অনেকগুলি ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্যামাচরণ চক্রবর্তী অগাধ বিত্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার অবিবাহিত পুত্র শ্রীমান অনাদিচরণ তিনটি পাশ দিয়া গ্রামে আসিয়াছে, অভিভাবক কেহ নাই; কাজেই এই পদটি নিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ ছিল। কেবল দুই একটি যুবক আসিয়াছিলেন অন্য উদ্দেশ্যে। তাঁহাদের গ্রামে যে 'পদমী ন্যাশনাল রিটিশ ড্রামাটিক ক্লাব' খোলা হইয়াছিল তাহার জন্য কিছু সরঞ্জাম অভাব পক্ষে কিঞ্চিৎ চাঁদা সংগ্রহ করা ছিল তাঁহাদের অভিপ্রায়। অনাদি সকলকে অভিবাদন করিয়া যথাসাধ্য আসন দিয়া কহিল, "আপনাদের সকলের সঙ্গে দেখা হয়ে বড় খুসী হলুম। অনেক দিন দেশছাড়া, পরিচয় ত হয়নি।"

তখন সকলেই আপন আপন পরিচয় দিয়া গেলেন। শ্যামাচরণের সহিত সকলেরই যে অতি গভীর বন্ধুত্ব ছিল অনাদি তাহা বুঝিতে পারিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অনাদি দেখিল, সে গ্রামে নির্ব্বান্ধব নহে। সমাগত সকলেই তাহার সহিত সম্পর্কিত। মামা, দাদা, কাকা, জ্যেঠা, মায় ভগ্নীপতি পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার আত্মীয়ের সন্ধান পাইয়া অনাদি অত্যন্ত খুসী হইল। প্রাথমিক পরিচয় হইয়া গেলে একজন প্রশ্ন করিলেন—

"ভায়া গান্ধীর চেলা নও তো ?"

প্রশ্নটির ভঙ্গী, প্রশ্নকারীর দৃষ্টি এবং যুগপৎ সমাগত আত্মীয়মণ্ডলীর কৌতূহলী অবস্থা দেখিয়া হঠাৎ অনাদির মনে হইল যে সত্য কথা বলাটা সুবুদ্ধির কাজ হইবে না ; এক পল্লীগ্রামে জনৈক কংগ্রেস-কর্ম্মীকে বিপদে পড়িতে হইয়াছিল তাহার বিবরণ সে অতি অল্পদিন হইল সংবাদপত্রে পড়িয়াছে। এখন সেই কথাটা মনে পড়িল, কহিল, "আজ্ঞে, না আমার কাজ অন্য ধরণের। আমি একটা বড় উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি।"

সকলেই এই বড় উদ্দেশ্যটা জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া উঠিল।

একজন বৃদ্ধ কহিল, "সেটা কি বাবাজী ?"

অনাদি কহিল, "পতিত জাতির উদ্ধার। এই দেখুন না এই গ্রামেই যে সব জেলে, ছুতোর, নমঃশূদ্র, বাগ্দীর বাস তারা কি অবস্থায় আছে ? এদের উদ্ধার করাই আমার উদ্দেশ্য। এদের জল ব্রাহ্মণকে ব্যবহার করে দেখাতে হবে এরাও মানুষ।"

শেষের কথাটায় উপস্থিত সকলেই একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা যে একখানি খবরের কাগজে পড়িয়াছিলেন একদল ম্লেচ্ছভাবাপন্ন শিক্ষিত হিন্দু যুবক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে ধ্বংস করিবার জন্য বক্তৃতা ও প্রচার করিতেছে সে কথাটা তাহা হইলে মিথ্যা নয়। কিন্তু কেহই সম্মুখে কোনও অভিমত প্রকাশ করিলেন না।

ইহার পরও অনাদি অনেক কথা বলিয়া গেল। সন্ধ্যা হইলে ভদ্রগণ একে একে প্রস্থান করিলেন, রহিলেন শুধু থিয়েটারের পাণ্ডা যুবক কয়টি। তাঁহারা সকলেই অনাদিকে সাহায্য করিবেন বলিয়া একটি টেবিল হার্ম্মোনিয়াম দানের প্রতিশ্রুতি লইয়া গেলেন।

পরদিন হইতে অনাদির সংস্কার চেষ্টা আরম্ভ হইল। প্রাতঃকালে ধীবর পল্লীর মাতব্বরগণকে ডাকিয়া সে সকলকে নিজের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিল। এই তিনটা পাশ করা দিগ্গজ বিদ্বানের সকল মন্তব্যই তাহারা স্বীকার করিয়া লইল। তাহার পর সূত্রধর পল্লী এবং সর্ব্বশেষে গ্রামের বাগ্দীদের মধ্যে প্রচার কার্য্য শেষ করিয়া সে সর্ব্বশ্রেণীর অবনত হিন্দুদিগের এক বিরাট সভা আহ্বান করিল।

ধীবর ও সূত্রধর পল্লীতে দুই একটি যুবক ছিল, তাহারা স্কুলের থার্ড ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়া মা সরস্বতীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া ঘরে বসিয়া ছিল। জাত-ব্যবসা করা ছিল তাহাদের পক্ষে আয়াসসাধ্য ও লজ্জাজনক ; অথচ সমাজের উন্নতি করিবার জন্য তাহাদের আগ্রহের অন্ত ছিল না। তাহারা রীতিমত নিজ নিজ সমাজের মুখপত্রগুলি পড়িত এবং তাহাদের প্রতি উচ্চবর্ণের ব্যবহার যে একান্ত অন্যায় ও বিদ্বেষমূলক এই কথা সময়ে অসময়ে আপন স্বজাতির পঞ্চায়েতের বৈঠকে প্রকাশ করিত। কিন্তু এ উপায়ে

স্বজাতির চৈতন্যের উদ্রেক এ পর্য্যন্ত তাহারা করিয়া উঠিতে পারে নাই। অনাদির অভিপ্রায় জানিয়া তাহারা তাহার অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সভায় বিভিন্ন গ্রাম হইতে আপন আপন সমাজের প্রতিনিধি উপস্থিত করিবার ভার তাহারাই লইল।

সভা হইবার দিন দশেক বিলম্ব ছিল। এ কয়টি দিন অন্য একটি কাজ করিবার ইচ্ছা করিয়া অনাদি তাহার থিয়েটার পার্টি'র সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া পাঠাইল। তাহারা আসিলে সকলের পরামর্শে স্থির হইল যে আগামী রবিবারে 'কীচক সংহার' নামক পঞ্চাঙ্ক নাটক অভিনয় করা হইবে। পৌরাণিক নাটকের কথা শুনিলে বিস্তর বিধবার সমাগম হইবে এবং অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে অনাদি বিধবাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা দিবে।

সংকল্প স্থির হইল এবং সেই সঙ্গে 'কীচক সংহার' নাটকের মহলা আরম্ভ হইয়া গেল। এই নাটকটির মহলা থিয়েটার পার্টি'র পূর্ব্বেই দেওয়া ছিল, কেবলমাত্র যে শয্যাটিতে বসিয়া কীচক দ্রৌপদীকে প্রেম সম্ভাষণ করিবেন সেই শয্যাটি তাহাদের জুটিতেছিল না। অনাদির ঘরে অনেকগুলি গিদ্দা বালিশ ও কার্পেট ছিল, সেইগুলি দেখিয়া কর্ম্মকর্ত্তাদের মনে বহুদিনের অভীপ্সিত এই নাটকটির অভিনয় করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

কয়দিন ধরিয়া সেন্সাসের সংক্ষিপ্তসার ও বিচিত্র সাময়িক পত্র হইতে বাঙ্গালার বিধবা ও পাত্রী অভাবে অবিবাহিত যুবকের সংখ্যা ও দেহ এবং মস্তিষ্কের উপর ক্রমাগত নিরামিষ ভোজনের ফল সম্বন্ধে বৈদেশিক স্বাস্থ্য ও সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতামত সংগ্রহ করিয়া সে একটি প্রকাণ্ড বক্তৃতা খাড়া করিল।

(৫)

সন্ধ্যায় থিয়েটার আরম্ভ হইবার কথা; কিন্তু তখনও হাট ভাঙ্গে নাই বলিয়া শ্রোতৃসমাগম আরম্ভ হইতে বিলম্ব হইল। রাত্রি এগারোটার সময় মহিলাদের নির্দ্দিষ্ট আসন ভর্ত্তি হইয়া গেল। পুরুষেরা পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন।

রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে বেহালা পিড়িং পিড়িং করিয়া গলা সাধিয়া রাগিণী আলাপের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এমন সময় করতালি ধ্বনিতে শ্রোতৃবর্গ সচকিত হইয়া উঠিলেন। অনাদি আসিয়া মঞ্চের উপর দাঁড়াইল। বক্তৃতা পাঠের সময় শ্রোতৃগণের মধ্যে মৃদুস্বরে যে সমালোচনা হইতেছিল অনাদি তাহাতে কাণ দেয় নাই। মাঝে মাঝে দুই চারিটা বয়াটে ছেলের 'অর্ডার' 'অর্ডার' চীৎকার শুনিতে পাইতেছিল মাত্র; কিন্তু ঘণ্টাখানেক পর বক্তৃতা যখন শেষ হইল, তখন অনাদি দেখিল সাজঘরে দারুণ গোলযোগ সুরু হইয়া

গিয়াছে। একজন ভদ্রলোক থিয়েটারের উদ্যোগী একটি যুবকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছিলেন, "যত সব নচ্ছার বয়াটের দল! ভদ্দর লোকের মেয়েদের ডেকে এনে অপমান করা!"

যুবক প্রত্যুত্তরে ততোধিক রূঢ় ভাষায় একটা জবাব দিল। ক্রমে ক্রমে আসন ছাড়িয়া আরও জন দুই শ্রোতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষেই অপূর্ব্ব চলিত ভাষায় উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতে লাগিল। এই সময়ে বক্তৃতার কাগজ বগলে করিয়া অনাদিচরণ আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র চারিদিক হইতে যে ধরণের বাক্যের স্রোত বহিতে সুরু করিল তাহাতে যে কোনও মানুষের ধৈর্য্য টলিতে পারিত কিন্তু সমাজ-সংস্কারক অনাদিচরণ টলিল না, কিন্তু সে বিস্মিত হইল। তাহার অপূর্ব্ব বক্তৃতাটির পরিণাম ফল এইরূপ হইবে সে তাহা ভাবিতে পারে নাই। ক্রমে একতরফা গালাগালি নিঃশেষ হইয়া গেল তথাপি অনাদি বলিবার মত একটি কথাও খুঁজিয়া পাইল না। এমন সময় একটি অতি কৃষ্ণবর্ণ বালক আসিয়া অনাদির হাত টানিয়া ধরিয়া কহিল, "ডাকছে তোমাকে—"

কে ডাকিতেছে তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া অনাদি বাহিরে আসিল। সভাগৃহের পিছনে একটি তেঁতুল গাছ অনেকখানি ছায়া বিস্তার করিয়াছিল। সেখানে অনাদির প্রতীক্ষায় যে স্ত্রীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া ছিল সে ভূমিষ্ঠ হইয়া অনাদিকে প্রণাম করিয়া কহিল—"পেরণাম বাবাঠাকুর! আমার একটা গতি ক'রে দিতে হবে।"

কি গতি করিতে হইবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া অনাদি কহিল, "আমার সাধ্যে হ'লে হবে।"

স্ত্রীলোকটি কহিল—"সে আপনার খুব সাধ্যি আছে বাবাঠাকুর। আমার আবাগী মেয়েটাকে তরাতে হবে। আট বছরে রাঁড়ী হ'য়ে সে এই উনিশে পড়েছে বাবাঠাকুর! খাওয়াতে আর পারিনে—যদি কেউ নেয় তবে—"

অনাদি সমস্ত কথা বুঝিয়া লইল। তাহার বক্তৃতাটি যে একেবারে নিষ্ফল হয় নাই দেখিয়া আনন্দও হইল। কহিল, "সে হবে। কাল আমার অবসর মত যেও সব ঠিক ক'রে দেব। তবে সে কি এখানে হবে? জানা ভাল ছেলে আছে যে বিধবা বিয়ে করতে চায়?"

স্ত্রীলোকটি কহিল, "এখানে বিয়ে কে করবে বাবাঠাকুর? ভট্‌চাজ ঠাকুর বলে বিধবা বিয়ে করে, হয় মুসলমান নয় খেরেস্তান। হিঁদুর মধ্যে করলে মহাপাতক।"

অনাদি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া তারপর কহিল, "যেও তুমি দেখব।"

স্ত্রীলোকটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

অনাদি ঘরে ফিরিল। ইতিমধ্যে সমাজরক্ষকদের ক্রোধ গিয়া পড়িল অভিনেতাদের উপর ; যে ছেলেটির উত্তরা সাজিবার কথা ছিল তাহার কর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক বক্সী মহাশয় লইয়া গেলেন ; অভিমন্যু তাহার মাতুলের রক্তচক্ষু দেখিয়া ইতিপূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল। কাজেই রাত দুইটায় থিয়েটার আরম্ভ হইয়া তিনটায় ভাঙ্গিয়া গেল।

(৬)

পরদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে অনাদিচরণের সংস্কার চেষ্টার প্রথম ফল ক্ষেমঙ্করীকে লইয়া গত রাত্রির সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়া উপস্থিত হইল, কথায় কথায় অনাদি তাহাদের সমস্ত অবস্থা জানিয়া লইল। মেয়েটি অল্প বয়সে বিধবা হইয়া এতদিন কাটাইয়াছে, এখন মায়ের ইচ্ছা তাহাকে সংসারী করে। অনাদি সমস্ত শুনিয়া কহিল, "আমি যেদিন ফিরব সেদিন তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে আমার সঙ্গে যাবে। এখন চুপচাপ থাক, গ্রামটা সুবিধের নয়। জানাজানি হলে কিছু করতে পারবে না।"

মাতা ও কন্যা চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে অনাদির চরগণ বিরাট জাতীয় সভার জন্য শ্রোতৃ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছিল। অনাদি এবার সংহিতা-সাগর মন্থন করিয়া শ্লোক উদ্ধার করিতে ব্যস্ত ছিল। ঊনবিংশ সংহিতাকারের সহিত পরিচয় সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে আদালতের এক চাপরাশী আসিয়া অনাদির হাতে একখানি সমন দিল। অনাদি দেখিল সাক্ষীর সমন। হঠাৎ সে কেমন করিয়া সাক্ষী হইল, তাহা সে বুঝিল না। সমনখানি হাতে করিয়া একেবারে ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। ঘোষাল মহাশয় আদ্যোপান্ত দেখিয়া কহিলেন, "এটা আর শক্ত কি ? বলবে যে এটা পোদ্দারের সীমানার মধ্যে নয়।"

"ওটা কি ?" অনাদি প্রশ্ন করিল।

ঘোষাল মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন যে, দীনু পোদ্দার একটা কাঁঠাল গাছের কাঁঠাল পাড়িতে যাওয়ায় বক্সীদের বড়বাবু আপত্তি করেন। তাহাতেই এই মামলার উৎপত্তি। বক্সী মহাশয় তাঁহাকে সাক্ষী মানিয়াছেন।

অনাদি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, "আমি এ-সবের কি জানি ? আর অনর্থক আমাকে হয়রাণ করা। আমি এদের ভাল করতে এসেছিলাম। এরা দেখছি—"

ঘোষাল কহিলেন, "হায়রাণ কিসের বাবাজী ? মহকুমা এখান থেকে ছ'ক্রোশ দূর বইত নয়। আর ভাল কথা আগেই শুনবে লোকে ? আগে দু'টো চারটে সাক্ষী দেও, দু'চার নম্বর মামলা কর। তবে ত গাঁয়ের লোক ভাবাবে তুমি গাঁয়ের একজন।"

অনাদি জবাব না দিয়া ফিরিয়া আসিল। থিয়েটারের বন্ধুগণ সমন দেখিয়া সত্য কথা কহিল। অনাদিকে সাক্ষী মানিয়া হায়রাণ করিবার যুক্তি সেদিন দক্ষিণপাড়ার চণ্ডীমণ্ডপে হইতেছিল। তাহা তাহাদের মধ্যে একজন স্বকর্ণে শুনিয়াছে। অনাদি শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল; কহিল, "আচ্ছা আগে জেলে ছুতোরগুলোকে একজোট করে দিই; তার পর বুঝব।"

মহা উৎসাহে অনাদি সংকল্পিত কাজে লাগিয়া গেল। ভদ্রলোক ব্যতীত আর সর্ব্বশ্রেণীর লোক অনাদির অনুগত হইয়া পড়িল। সভাস্থল প্রায় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। কাল মহাসভা হইবে, বিভিন্ন গ্রাম হইতে নৌকায় ও পদব্রজে লোক আসিতে সুরু করিল। অনাদি তাহার চরদের কর্ম্মতৎপরতায় বিস্মিত হইল। সে এতখানি আশা করে নাই। চরদের প্রধান সেই সূত্রধর যুবকটিকে ডাকিয়া সে কহিল, "তুমি খুব কাজের লোক। তুমি প্রচার কাজ চালাতে থাকবে; আমি কলকাতা থেকে মাস মাস তোমার খরচ পাঠাব।"

সে একগাল হাসিয়া কহিল—"এই লোকগুলোকে কেমন করে যে এনেছি তা জানেন বিশকরম। কেউ কি আসতে চায়? বলে, ওতে কি হবে? তারপর যেই বলেছি, কলকাতার এক পণ্ডিত ভাগবত পড়বেন, অমনি সবাই রাজী হল। এখন আপনি যা পারেন করে নেন।"

সামাজিক উন্নতির জন্য কেহ আসিতে চায় না, অথচ ভাগবত শুনিবার জন্য নিরাপত্তিতে সকলেই আসে শুনিয়া অনাদি আশ্চর্য্য হইল। সামাজিক উন্নতিটা যে কত বড় প্রয়োজন তাহা এবার ভালো করিয়া এই সব অজ্ঞ, মূর্খ, অসহায়দের বুঝাইতে হইবে, এই কথা মনে সে স্থির করিয়া রাখিল।

পরদিন অবনত জাতিদের বিরাট সভা বসিল। গ্রামের ভদ্রলোক সকলেই কৌতূহলী হইয়া সভা দেখিতে আসিয়াছিলেন। অনাদি সাজ পোষাক করিতে বাড়ী গিয়াছিল। এমন সময় গ্রামের পণ্ডিত মাধব ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই গ্রামের জেলেদের মণ্ডল নিতাইচাঁদ উঠিয়া আসিয়া গললগ্ন-অঞ্চল হইয়া প্রণাম করিল। পণ্ডিত মহাশয় বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "কি মণ্ডলের পো, বামুন হতে যাচ্ছ বুঝি?"

দাঁতে জিভ কাটিয়া নিতাইচাঁদ কহিল, "সর্ব্বনাশ! এ-সব কি কথা?"

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, "তবে এ-সব বেহ্মজ্ঞানী দলে মিশছ কেন?"

বেহ্মজ্ঞানী কথাটি শুনিয়া নিতাইচাঁদের মুখ শুকাইয়া গেল। কহিল, "আজ্ঞে বাবাঠাকুর, অপরাধ নিবেন না, ওই চ্যাংড়াগুলোর কাণ্ড সব।"—এই বলিয়া কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিয়া নিতাইচাঁদ আসিয়া বসিল।

আধ ঘণ্টার পর অনাদি আসিল। তাহার মাথায় সিল্কের গেরুয়া পাগড়ী, পরণে গেরুয়া আলখাল্লা, বুকের উপর লাল রঙের কাপড়ের ফুল

তাহার মধ্যে শাদা সুতার হরফে লেখা, "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।" তাহাকে দেখিয়া তাহার ভক্ত চরগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—"বন্দে মাতরম্"। এ শব্দটি সকলের বলা অভ্যাস ছিল না, কাজেই জনসঙ্গম নীরব হইয়া রহিল। তখন উৎসাহী সূত্রধর যুবকটি কহিল, "বল ভাই সব" কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে সমবেত জনমণ্ডলী সমস্বরে চীৎকার করিয়া কহিল "রাধাকৃষ্ণনামতে হরিধ্বনি বল, বল হরি হরি বোল।"

তখন অনাদি দিস্তাতিনেক কাগজ বাহির করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইতে লাগিল, উত্তেজনার মুখে কত কি বলিয়া গেল। অবনত জাতিদের উন্নতি করা দরকার, ব্রাহ্মণের জন্য জাতির এই অধোগতি, শাস্ত্রকারদের অবিচার ইত্যাদি। যাহারা ভাগবত শুনিতে আসিয়াছিল তাহারা ধৈর্য্য হারাইল। দুই একজন উঠিয়া গেল। অপর সকলে গল্প জুড়িয়া দিল। ঘণ্টা দুইয়ের পর বক্তৃতা সমাপ্ত করিয়া অনাদি চেয়ারে বসিয়া কহিল, "আমার যা বলবার বললাম, এখন উন্নতি করা তোমাদের হাত। উন্নতি হলে ছোট বড় মানলে চলবে না, জল-চল সকলের করতে হবে। এ বাধাটা দূর করতেই হবে।"

সভামধ্য হইতে একজন কহিল, "এজ্ঞে ভদ্দর বাবুরা বামুন ঠাকুরেরা যদি খান তবে আমরা খাব।"

তখন চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া অনাদি কহিল, "শোন ভাই সব, আমি ব্রাহ্মণ আমি যা করব তাই করবে?"

অনাদির অনুচরেরা সমস্বরে কহিল "হ্যাঁ।"

আয়োজন পূর্ব্বেই করা ছিল। অনাদি কহিল, "জল দাও লোচন।"

লোচন নামক বাগ্দী বালকটি উঠিয়া আসিয়া জলের ঘটি অনাদির হাতে দিল, অনাদি এক নিঃশ্বাসে জলটুকু নিঃশেষ করিয়া কহিল, "যে আমাকে জল দিল সে জেতে বাগ্দী, আমি পথ দেখালাম, এখন তোমরা এস।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে সভাস্থল রঙ্গস্থলে পরিণত হইল। পশ্চাৎ হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ম্লেচ্ছ, খৃষ্টান!" সভাস্থল হইতে অনেকগুলি কণ্ঠ সমস্বরে কহিল, "ফাঁকি দিয়ে জাত মারা! খেরেস্তান, বেহ্মজ্ঞানী।"

অনাদি তাহাদিগকে বুঝাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার মাথার মধ্যে তখন আগুনের হল্কা ছুটিতেছিল। সংকল্প ভঙ্গে হতাশ হইয়া একেবারে সে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার পর সভায় কি হইল জানিবার প্রবৃত্তি রহিল না। কিন্তু সন্ধ্যার সময় রক্তাক্ত কলেবরে বাগ্দী ছেলে লোচন আসিয়া সাশ্রুনেত্রে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল এবং অনাদিকে জল দিবার অপরাধে খড়ম, জুতা ও লাঠির দ্বারা যতগুলি শাস্তি সে পাইয়াছে তাহা দেখাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল। অনাদি তাহাকে পাঁচটি টাকা দিয়া বিদায় করিয়া তাহার পুঁথিপত্র গোছাইবার কাজে বসিল। তাহার এত পরিশ্রম

আয়োজন চেষ্টা, এমন উদার সংকল্প সমস্তই লোচন বাগ্দীর এক ঘটি জলে ভাসাইয়া দিয়া পরদিন অনাদি গ্রাম ত্যাগ করিল।

অনাদির পান্সী যখন পূবপাড়ার বাঁকে গিয়া পৌঁছিয়াছে তখন হঠাৎ কাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, একটি পুঁটুলি হাতে ক্ষেমঙ্করী ও তাহার মাতা দাঁড়াইয়া। ক্ষেমঙ্করীর মাতা কহিল, "আমাদের ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন বাবাঠাকুর!"

অনাদি কহিল, "এর পর বার এসে নিয়ে যাব।"

"আপনার কথায় সব মাটির দামে বেচে দিয়ে—"

মাতার কথায় বাধা দিয়া ক্ষেমঙ্করী কহিল,—"জানিস্‌নি মা, গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া,—এত দেখলি তবু শিক্ষা হল না?"

অনাদি এই কুৎসিত পরিহাসটি শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই পান্সীর ভিতর বসিয়া মাঝিকে বলিল, "ছাড় নৌকা।"

তীরের তীব্রস্বর কথা শুনিতে আর কাণ দিল না। নৌকা কিছু দূর অগ্রসর হইলে অনাদি বাহিরে আসিয়া মাঝিকে প্রশ্ন করিল, "ও মেয়েটিকে জান?"

মাঝি একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, "বাবু জানেন না? ও ভট্‌চাজ মহাশয়ের বেটি।"

অনাদি আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কি রকম?"

"ওর মা ভট্‌চাজ মশায়ের বাড়ীতে দাসী খাটত। জাতে বাগ্দী।"

অনাদি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনাদি আজকাল মাষ্টারি করে—তবে সমাজ সংস্কার করিবার ঝোঁক এখনও যায় নাই, এই জন্য প্রতি রবিবার গোলদীঘি নচেৎ হেদোর ধারে তাহাকে বক্তৃতা করিতে দেখা যায়।

প্রচারক অভাবে তাহাদের সমিতিটি উঠিয়া গিয়াছে।

একটি আধুনিক গল্প

সম্পাদক মহাশয় আসিয়া একটি বিনীত নমস্কার সহকারে কহিলেন, "একটা লেখা আবশ্যক।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "হেতু?"

"আমার পত্রিকার জন্য। দেরী করবার উপায় নেই, কাল থেকেই ছাপা সুরু হবে। একটা গল্প চাই, অভাবে একটা রস-রচনা, সেই সঙ্গে সম্ভব হ'লে একটা কবিতা, নিতান্ত না পারলে আপনার উপন্যাসখানির প্রথম

অংশ—দুটি পরিচ্ছেদ। তারপর মাসে মাসে দু,' তিন পরিচ্ছেদ ছেপে দেব। কপি দিন!" সম্পাদক মহাশয় চেয়ারে বসিয়াই কপি দেখিবার জন্য গায়ের চাদরে চশমা জোড়া মুছিতে লাগিলেন।

সভয়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলাম, "কাল হ'লে হয় না?"

সম্পাদক কহিলেন, "না। এক্ষুণি! বরং আমি বসছি, আপনি কিছু জলখাবার আর চা আনিয়ে নিন। আমি বৈঠকখানায় খবরের কাগজটা দেখিগে!"

সম্পাদক মহাশয় বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, ডাকিয়া কহিলাম, "এত তাড়াতাড়ি কি লিখব? কিছুই তো আসছে না মাথায়!"

সম্পাদক মহাশয় বারান্দা হইতে ধিকার দিলেন, "কি আপনারা! নকুলবাবু তিন ঘণ্টায় একটা গল্প লেখেন, মন্তুবাবু চার গল্প একসঙ্গে ফেঁদে নিয়ে চার প্রহরে চারটে শেষ করে ফেলেন, দাশু বোস বায়স্কোপ দেখে ফিরে এসেই—গল্প লিখতে কি লাগে? সেকেলে ধরণে লিখতে অবিশ্যি চার দিন লাগতে পারে কিন্তু আধুনিক গল্প লিখতে গোটা দুই চুরুট আর দু পেয়ালা চা শেষ করতে যে সময়টুকু দরকার তার চেয়ে বেশী সময় লাগে না।"

অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া কহিলাম, "প্লট?"

"প্লট কিসের? জগৎ জোড়াই তো প্লট ছড়িয়ে রয়েছে, আপনার সঙ্গে আমি কথা বলছি—প্লট! চাকর খাবার আনতে গিয়ে ময়রার সঙ্গে দস্তুরী নিয়ে মারামারি করছে—প্লট। আপনার মাথায় গল্প আসছে না—প্লট। গল্প মাথায় আসছে না এই নিয়েই ফেলুন না একটা গল্প লিখে। প্লট ভাবতেই যদি দিন গেল তবে গল্প লিখবেন কখন? গল্প মাথায় আসছে না—মাথা চুলকাচ্চেন—মন ভারাক্রান্ত, মাথা টন্ টন্ করছে—কাগজের উপর ছবি আঁকছেন—অত্যন্ত ব্যাকুল প্রত্যাশায় বিরহিণী বধূর মত ষ্টেশনের পথের দিকে চেয়ে—"

কহিলাম, "চুপ করুন!"

"ওঃ! তাই তো আপনার আবার স্ত্রীলোক-ঘটিত উপমায় আপত্তি! মনে ছিল না। Sorry। তবে লিখুন—কলেজের ছেলের মত ইংরেজী মাসের তেশরা তারিখে পৈত্রিক মনি অর্ডারের প্রত্যাশায় পথের দিকে চেয়ে—কী করুণ সে চাওয়া!"

এই সময় সম্পাদক মহাশয়ের চা এবং জল-খাবার আসিল। তিনি কহিলেন, "এই যে চা আর জল-খাবার, এই নিয়েই তো একটা ফর্ম্মা গল্প ফেঁদে দেওয়া যায়। এ যদি আপনার বাবুরাম না নিয়ে এসে, আসতো কোনও তন্বী গৌরাঙ্গী—"

বুঝিলাম সম্পাদকের মগজে মলয় বাতাস ঘূর্ণীবাত্যার সৃষ্টি করিয়াছে। কহিলাম—"ও সব কথা রাখুন! কোনও প্লট মাথায় থাকে ব'লে যান লিখে দিচ্ছি!"

"বললুম তো প্লট ক'রে নিন, যা ঘটছে সব প্লট। লিখে গেলেই হবে গল্প। আপনি তো ট্রামে আর বাসেই দিন কাটান; যে কোনও দিনের একটা ট্রিপের কথা লিখে গেলেই শেষে দেখবেন গল্পে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তাই হবে খাঁটি গল্প—স্বচ্ছ, সহজ।"

চট করিয়া মাথায় বিদ্যুতের মত একটা উপায় ঝলকিয়া উঠিল, কহিলাম—"বেশ, বাইরে বসুন। যে কোনও দিনের একটা ট্রিপের কাহিনী স্বচ্ছ সহজ সরল ক'রে—লিখে যাচ্ছি।"

সম্পাদক মহাশয় কথা কহিতে পারিলেন না। সিঙ্গাড়ার আভ্যন্তরীণ একটা আলুর খোসা দেশলাইয়ের কাঠির সাহায্যে দাঁতের ফাঁক হইতে বাহির করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন।

কবে কোথায় গিয়াছিলাম ভাবিতে লাগিলাম। কাল বাবু ঘাট পরশু 'শনিবারের চিঠি' 'আনন্দবাজার'—কোনও প্লট পাইতেছি না। বুধবারে? বুধবারে শ্যামবাজারে অকারণ যাত্রা। অকারণ যাত্রার কাহিনীটা লিখিলেই স্বচ্ছ সহজ যাহা কিছু একটা হইতে পারে। কাগজের প্যাড্ লইলাম। বৈঠকখানা হইতে সম্পাদক মহাশয় হাঁকিলেন, "আধুনিক ধরণের করবেন, আর ফর্ম্মা দেড়েকের বেশী না হয় যেন। আর একটু করুণ, একটু হাস্যরস—"

কহিলাম, "আচ্ছা। আপনি চুপ করুন। দরকার হয় আর এক পেয়ালা চা আনিয়ে নিন নইলে বায়স্কোপের বইয়ের ছবি দেখুন। আমি লেখা সুরু করছি। বুধবারের ট্রিপের কথাটাই লিখছি।"

লিখিলাম—

শ্যামবাজারের মোড়—রৌদ্রস্নাত ইন্দ্রলোকের মত দেখতে। বাড়ীতে ভালো লাগছিল না ব'লে বেরিয়েছিলুম, বাইরে ভালো লাগছে না ব'লে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে। লাল রংয়ের বাস একখানা ছোট! ভিতরে বোঝাই হ'য়ে গেছে, জন তেরো যাত্রী—নয় তেরো, নয় চোদ্দ, বসে তের জন, একজন এক কোণে দাঁড়িয়ে। ড্রাইভারের পাশে বসলুম। ভিতরের যাত্রীদের কথায় বুঝলুম সকলেই অত্যন্ত শোকার্ত্ত। একজন বললেন—"কিন্তু বড় অকস্মাৎ!"

দ্বিতীয়—আমি তো অত্যন্ত মর্ম্মাহত হ'য়ে পড়েছি। তাঁর সেই যে বইটা—"আলু পটোল"—

তৃতীয়—"আলু পটোল" নয় "ধূলিপটল"।—যাতে বিধবা বিনু কাৎলা মাছের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে—

চতুর্থ—কিন্তু কি আশ্চর্য্য কবিতা!

পঞ্চম—আর গান?

ষষ্ঠ—গল্প? কি চমৎকার করুণ—

সপ্তম—আর সেই একাঙ্ক নাটক দু'টো—

অষ্টম—কি অদ্ভূত চরিত্র মিনি বোসের—

নবম—আর তার বাবার—

দশম—বেঁচে থাকলে গজাননবাবু গলসওয়ার্দি'র মত—

একাদশ—বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য—

দ্বাদশ—ওঁর আছেন কে ?

ত্রয়োদশ—আছেন স্ত্রী। আর সে স্ত্রী কি স্ত্রী ? সরস্বতী, তাঁর ছোঁয়াচ লেগেই তো গজাননবাবুর প্রতিভার উন্মেষ—

প্রথম। কি রকম ?

দ্বিতীয়। জানেন আপনি ?

ত্রয়োদশ। জানিনে ? তাঁর বিয়েতে আত্মীয় স্বজন কেউ এলো না! তখন তিনি এসে বললেন, পাঁচুবাবু যেতে হবেই আপনাকে! তাঁর আগ্রহ...

তৃতীয়—তাঁর আগ্রহের কতক পরিচয় পেয়েছি আমি তাঁর ছেলের অন্নপ্রাশনে। আমার জ্বর, খাব না, বাড়ীতে শুয়ে আছি। সন্ধ্যাকালে দরজায় মটরের ভেঁপু বেজে উঠল। লেপের তল থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দেখি গজাননবাবু নিজেই এসে উপস্থিত।

চতুর্থ। অমন উদার মানুষ হয় না! মরবার আগের দিনও আমাকে বললেন যে, তাঁর শ্বশুরের শ্রাদ্ধে আমাকে দেখতে শুনতে হবে—

দ্বিতীয়—ছেলে শ্বশুরের কথা রাখুন না মশাই! স্ত্রীর কথা বলুন পাঁচুবাবু—কি রকম সরস্বতী ?

ত্রয়োদশ। অনেক কথা সে, শুনবেন ? আচ্ছা বিড়ি দিন একটা। থ্যাঙ্কস্। আমি তখন ম্যাকেঞ্জী লায়ালের ওখানে—Show room-এর—

দ্বিতীয়—তার সঙ্গে সম্পর্ক কি ?

ত্রয়োদশ। আছে শুনুন। নম্বর লাগাচ্ছি একদিন নীলামী কতকগুলো ফার্ণিচারে, এমন সময় একটি ভদ্রলোক এসে বললেন, মশাই আবলুসের Book Case হবে একটা ? ছিল। বললুম হবে। ভদ্রলোক দাম জানতে চাইলেন। বললুম, নীলাম ডেকে নিলে কত উঠবে জানিনে, এখন নিলে এক'শ। ভদ্রলোক Book Caseটা দেখলেন তার পর মিনিট পাঁচেক ধ'রে তাতে হাত বুলিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, পছন্দ খুবই হয়—কিন্তু টাকায় কুলোবে না। আমার বড় দুঃখ হল। বললুম, আচ্ছা টাকা যোগাড় করুন আপনি, ওটার ডাক আমি Stay করে রাখব'খন। ভদ্রলোক আমার দু'টি হাত ধ'রে বললেন, রাখবেন দাদা—ওটি নইলে আমার চলবে না।

দ্বিতীয়। Book Case-এর সঙ্গে স্ত্রীর সম্বন্ধ ?

ত্রয়োদশ। সমস্ত Case-এর সঙ্গেই স্ত্রীর সম্বন্ধ আছে নুটুবাবু, থামুন

বলছি ! পরদিন আবার তিনি এলেন, অনেকক্ষণ Book Caseটার গায়ে ঘুমন্ত নববধূর গায়ে নববর যেমন হাত বুলোয় তেমনি হাত বুলিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলে গেলেন। এমনি করে তিনটি দিন পর পর। একদিন আমি জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা, এরকম করেন কেন আপনি বলুন তো ? নাম কি আপনার ?

বললেন—গজানন চাটুয্যে। কেন এ রকম করি শুনবেন ? যাবেন আমার সঙ্গে ?

সে দিন হাতে কাজ ছিল না, বেরিয়ে পড়লুম। গরাণহাটায় গিয়ে উপস্থিত। বাড়ীখানা ভদ্রলোকের নয়। উপরে গেলুম। উঃ সে কি অদ্ভুত রূপ ! সতেরো আঠারো বছরের একটি মেয়ে বই পড়ছিল, তাড়াতাড়ি বইখানা ফেলে দিয়ে আমার সামনেই গজাননের গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে— "আজ এনেছ ?" গজানন মুখ নীচু ক'রে বললেন, "পারিনি।" মেয়েটা অমনি গজাননের কাছ থেকে স'রে এসে বিছানায় পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু করে দিলে।

গজানন চোখের জল মুছে আমাকে বললেন. 'দেখছেন ?' সব শুনলুম। মেয়েটা কীর্ত্তনওয়ালী বিধুমুখীর। গজানন মাষ্টার, বিনি পয়সায় পড়ান। উভয়ের গভীর প্রেম। মেয়েটির আবদার, একটা আবলুস কাঠের Book Case ! গজানন সেই জন্যেই ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছেন, আর সে কী ব্যাকুলতা !

দ্বিতীয়। সে ব্যাকুলতা থাক্, এখন তার পর বলুন—

ত্রয়োদশ। বললুম আমি, ভয় নেই আপনার, আমি ব্যবস্থা করে দেব। কাল আসবেন। পরদিন এলেন গজানন, মুখে তাঁর প্রত্যাশার দীপ্তি ! কী—

দ্বিতীয়।. আরে থাক্ মশাই—আসল কথাটা বলুন না।

ত্রয়োদশ—বলছি। টিকিট বদলে সাড়ে সাতাশ টাকায় Book Case দিয়ে দিলুম গজাননকে। গজানন আমার পায়ে হাত দিয়ে—

দ্বিতীয়। বামুনকে পায়ে হাত দিতে দিলেন আপনি ?

ত্রয়োদশ। কৃতজ্ঞতা স্রেফ্ কৃতজ্ঞতা ! তার কাছে জাতবিচার নেই। যাক্ Book Case নিয়ে গেলেন গজানন। সন্ধ্যায় গেলুম গরাণহাটায়। বরাবর উপরে উঠে দেখি Book Caseটার উপর মাথা রেখে মুখোমুখী গজানন আর সেই মেয়েটা—ইন্দুমুখী বসে, চোখে তাদের প্রগাঢ় প্রণয়ের নিগূঢ় ঘুম—

দ্বিতীয়। হ'ল কি বলুন না পাঁচুবাবু !

ত্রয়োদশ। যা হয় এবং হওয়া উচিত—গজানন চাটুয্যে আর ইন্দুমুখীর বিয়ে। আর কেউ গেল না, আমিই বরকর্ত্তা হ'য়ে গেলুম।

দ্বিতীয়। বিধুমুখীর মেয়ের সঙ্গে বে হ'।—তাহ'লে আবার শ্বশুরের শ্রাদ্ধের কথা বললেন যে হারুবাবু ?

চতুর্থ। মশাই, আপনার কাছে কিছু বলবার যো নেই—কেবল জেরা, কেবল জেরা !

মেয়ের বে হবার পরই বিধুমুখী 'কলা মন্দির' থিয়েটারের এ্যাক্টার গোবিন্দ মহান্তির সঙ্গে মালা চন্দন কল্লেন! সে গোবিন্দ মহান্তি মারা গেছেন আজ দিন সাতেক।

দ্বিতীয়। তার পর পাঁচুবাবু !

ত্রয়োদশ। তার পর থেকেই গজাননবাবুর লেখা বেরুতে সুরু করল—উঃ কি সে লেখা ! গল্প, কবিতা, উপন্যাস ! উপন্যাস, কবিতা, গল্প ! আর ইন্দুমুখী দিনরাত দেখছে প্রুফ্—আহার নেই, নিদ্রা নেই—সেই আবলুস কাঠের Book Caseটার সামনে ব'সে—

প্রথম। বৈঠকখানার দক্ষিণ দিকের কোণটায় যে Book Caseটা ?

দ্বিতীয়। না, মাঝখানে।

তৃতীয়। ঠিক মাঝখানে বলা যায় না—একটু কোণের দিকে—

ত্রয়োদশ। যেখানেই হোক, Book Caseটা থেকেই সব হ'ল—এই Book Case থেকেই মিলন, লেখা, সব কিছু—

এমন সময়ে একটি গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে মুখ ফেরালেম। দেখি, যিনি বাসের একটি কোণে জানালায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বলছেন—সবই বললেন আপনারা, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না। Book Caseটা থেকেই সব হ'ল, কারণ তারই নীচের একটা লুকানো ড্রয়ারে ছিল অনেকগুলো manuscript—গজাননবাবু ক্রমাগত নিজের নামে তাই ছেপে যেতে লাগলেন—

তেরোটি যাত্রী সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠলেন—বাজে কথা ! অপমান করছেন আপনি গজাননবাবুকে ! লায়ার !

ভদ্রলোকটি বিচলিত না হ'য়ে বললেন—না, কথা সত্যি।—গজাননবাবু নিজে বলেছেন আজ—

যাত্রীদল। ষ্টুপিড্ ! কাল মারা গেছেন তিনি—

ভদ্রলোকটি বললেন—যিনি মারা গেলেন তিনি গজানন গাঙ্গুলী—এটর্ণী, 'আয়ুর্বেদীয় মতে গো চিকিৎসা' যিনি লিখেছেন—

যাত্রীদল। কিছু জানেন না তা হ'লে আপনি !

ভদ্রলোকটি একটি মৃদুহাস্য সহকারে বললেন—জানি। যেহেতু গজাননবাবুর যে বইটাতে বিধবা বিনু কাৎলা মাছের দিকে চেয়ে আছে সেই বইটা আলু-পটোল কিংবা 'ধূলি পটল' নয়, তার নাম 'জটামুকুট', তিনি আবলুস কাঠের Book Case কোনোদিন চোখে দেখেন নি এবং গরাণহাটার

বিধুমুখী কীর্ত্তনওয়ালীর মেয়েকে বিয়ে করেন নি—বিয়ে করেছেন ভাটপাড়ার নরহরি শিরোমণির প্রথমা কন্যা দাক্ষায়ণীকে। তিনি শেয়ালদার মালগুদামে কাজ করেন এবং এখনই নেমে যাচ্ছেন। আমার নাম গজানন চাটুয্যে এবং আমি আপনাদের কাউকেই চিনিনে। নমস্কার! ভদ্রলোক নেমে চ'লে গেলেন।

যাত্রীদল সমস্বরে ব'লে উঠল—ধাপ্পাবাজ! আমরা সবাই—

আর কিছু শুনতে পেলাম না। নেমে প'ড়ে গজাননবাবুর পিছু নিলাম—আমার নূতন বইটা তাঁকে দেবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু লোকের ভিড়ে তাঁকে খুঁজে বের করতে পারলাম না।

শেষ

সম্পাদক মহাশয় আসিয়া কহিলেন, "হ'ল?"

লেখাটি দিলাম। পড়িয়া কহিলেন, "বড্ড বড় ক'রে ফেললেন। আধুনিক ধরণের হ'ল না!"

সঙ্কুচিত হইয়া কহিলাম—"আর কি রকম হবে তা'হলে?"

সম্পাদক কহিলেন, "Book Case কেনার পর লিখুন—দেখলুম Book Caseএর উপর মাথা রেখে মুখে মুখ লাগিয়ে পাশাপাশি ব'সে মরণাহত গজানন আর ইন্দুমুখী—পাওয়ার আনন্দে উভয়ে হার্টফেল করেছে—আর এই Book Case হ'ল তাদের কফিন! আর সেই থেকে আমি ম্যাকেঞ্জী লায়ালের কাজ ছেড়ে দিয়েছি!"

শেষ-পৃষ্ঠা

ঠিক মনে পড়িতেছে না তবে সেদিন বোধ হয় প্রাতঃকালে সদর দরজা খুলিয়াই প্রথমে পাশের বাড়ীর ভৃত্য গোপীবল্লভের মুখ দেখিয়াছিলাম, যেহেতু জানিতাম গোপীবল্লভ প্রেমিক,—সে প্রত্যহ রাত্রি বারোটার পর তাহার ডিউটির শেষ-কাজ প্রভুর পদতলে সুড়সুড়ি দিয়া ঘুম পাড়াইয়া গলির মোড়ে পোড়ো বাড়ীটার রোয়াকে বসিয়াই ভৈরবীতে গান ধরিত—

প্রেমের তরে পাগল হ'লাম আমি বৈরাগী

সম্ভবতঃ তাহাই হইবে, কারণ অনুরূপ কোনও হেতু না থাকিলে সে-দিনকার চারিটি প্রহরেই প্রেম সম্বন্ধীয় ব্যাপার লইয়া বিব্রত হইতে হইত না।

প্রথম প্রহরে বন্ধু যামিনীর পত্র পাইলাম—তাহার স্ত্রীকে দুই একদিনের মধ্যেই আনিতে হইবে, কেননা পৌষ মাসে যাত্রা নাই অথচ মাঘ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে সে পারে না। কপি ও মটরশুঁটির স্বাদ ততদিন খারাপ হইয়া যাইবে, তাহা ব্যতীত—যাক্ সে কথায় আবশ্যক নাই,—মোট কথা টাকা চাই।

স্ত্রীকে আনিবার খরচ অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকা তার করিয়া পাঠাইতে হইবে। প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর বুঝিয়া তাড়াতাড়ি নিজেই ডাকঘরের দিকে চলিলাম। মোড় ফিরিতেই এক রিক্‌সওয়ালার সহিত ধাক্কা লাগিল। বিনাবাক্যে ভূতলস্থ হইলাম। জুতার ফিতা ও পায়ের চামড়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ ছিঁড়িয়া গেল।

দ্বিপ্রহরে টেলিফোঁ যোগে 'দীপশিখা' পত্রিকার সম্পাদিকার আদেশ আসিল তাঁহার পত্রিকার জন্য একটি প্রেমের কবিতা দিতে হইবে। দক্ষিণের জানালা খুলিয়া দিয়া গুটিকয়েক ফুটন্ত ফুলের গাছের টব বারান্দায় সাজাইয়া সেই দিকে চাহিয়া কলম কামড়াইতে লাগিলাম। মন কিছুতেই রসস্থ হইল না। অনেকক্ষণ বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে রাগিয়া লিখিলাম—

জনম অবধি প্রেম সাথে যার অহি-নকুলের সখ্য,
তার কাছে খোঁজ প্রেমের কবিতা? ধর্ম্মতলায় মোক্ষ।

তৃতীয় চরণে লেখনী ক্ষেপ করিব এমন সময় আঙিনায় সশব্দ পদক্ষেপ, তাহার পরেই আহ্বান। বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখি পাড়ার 'ইয়ং মেন্‌স্ ক্ল্যাসিকো-রোম্যাণ্টিক ডিবেটিং ক্লাবে'র যুগল সেক্রেটারী কানাই ও শশধর। বসিতে বলিলেই বক্তৃতা শুনিতে হইবে ভয়ে বারান্দা হইতেই প্রশ্ন করিলাম—"অকস্মাৎ?"

কানাই কহিল, "জটিল সমস্যা। মীমাংসার জন্যে এসেছি।"

সপ্তাহে দুই তিনবার ইহাদের সমস্যা উপস্থিত হইত এবং তাহার অনিবার্য্য ফল স্বরূপ আমাকে নূতন করিয়া প্রতি সপ্তাহে হোম লাইব্রেরীর বহিগুলি গুছাইতে হইত—কাজেই সমস্যার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইলাম, সভয়ে প্রশ্ন করিলাম—"কি রকম সমস্যা—রাজনৈতিক?"

কানাই কহিল. "উঁহু, প্রেমনৈতিক।"

বাঁচিয়া গেলাম। প্রেম সম্বন্ধে আমি বিশেষজ্ঞ নই, এ বিষয়ে কোন গ্রন্থও আমার ছিল না। কাজেই সাহস করিয়া কহিলাম—"বেশ! বল।"

কানাই কহিল, "প্রেম আছে কি না? যদি থাকে তবে তাহার পাত্রাপাত্র আছে কি না? প্রেমের মেয়াদ কতদিন? অর্থাৎ—"

বুঝিলাম প্রশ্ন অনেক দূর গড়াইবে। কাজেই আবার বাধা দিয়া কহিলাম—"এর মধ্যে সমস্যা কোথায়? সোজা ভবকান্তদার ওখানে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস কর—"

কানাই কহিল, "দেখুন, কাল আমাদের ডিবেট—"

কহিলাম, "বেশ তো। প্রেম সম্বন্ধে ভবকান্তদার মত অথরিটি এ পাড়ায় নেই।"

কানাই কহিল, "সে কথা জানি, কিন্তু তিনি যে কথা বলেন না মোটেই!'

কহিলাম, "কথা আদায় করা শিখতে হয়। এখন যাও, সন্ধ্যার পর একসঙ্গে সেখানে গিয়ে বসা যাবে। প্রশ্নগুলো লিখে নিয়ে যেও।"

কানাই ও শশধর চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর শশধর আর কানাইকে সঙ্গে লইয়া ভবকান্তদার বাড়ীর বৈঠকখানার দরজায় দাঁড়াইয়া কড়া নাড়িলাম। আহ্বান আসিল, "এসো ভিতরে!"

ঘরে ঢুকিলাম। ভবকান্তদা একখানি ইজিচেয়ারে লম্বমান হইয়া সট্‌কার নল মুখে দিয়া ঝিমাইতেছিলেন, চোখ মেলিয়া আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "অকস্মাৎ?"

কহিলাম, "প্রয়োজন অকস্মাৎ উপস্থিত ব'লেই'

ভবকান্তদা সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, "বিশেষ জরুরী দরকার না হয় যদি, তবে বল বিনুদিকে ডাকি চা নিয়ে আসুক!'

কানাই ও শশধর সমস্বরে কহিল, "সে সব হাঙ্গামে কাজ নেই। আমরা গুটিকয়েক প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, জবাব নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।"

ভবকান্তদা আবার ইজিচেয়ারে লম্বমান হইয়া আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"এ সময়টা ঠিক প্রশ্নের জবাব দেবার মত নয়, স্বপ্ন দেখবার সময় এটা—"

আমি কহিলাম, "আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করতে বাধ্য হ'লাম এই জন্যে যে ছেলেদের কাল সভা—তাতে প্রেম সম্বন্ধে কতকগুলি জটিল তত্ত্বের আলোচনা হবে। কতকগুলি বিষয়ে আপনার অভিমত জানা দরকার কারণ—" বলিয়াই ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম।

ভবকান্তদা বলিলেন, "কারণ তোমাদের সকলেরই বিশ্বাস প্রেম সম্বন্ধে আমি একজন বিশেষজ্ঞ। আর শুধু তোমরা নও অনুকুল ঠাকুর্দা সুদ্ধ তাই বিশ্বাস করেন, সেদিন ঠানদির সঙ্গে ঝগড়া ক'রে—যাক্‌গে প্রশ্নগুলো কি বল শুনি।"

শশধর একখানি কাগজ তাঁহার হাতে তুলিয়া দিল। ভবকান্তদা পড়িয়া বলিলেন—"প্রশ্নগুলি একটুও জটিল নয়। কিন্তু তোমরা ছেলেমানুষ এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?"

শশধর কহিল, "তা নইলে ডিবেটিং ক্লাবটা উঠে যায়! একটা 'সবজেক্ট' তো চাই। পলিটিক্স্ করবার যো নেই—অর্ডিনান্স! লাঠি কুস্তি ছোরা ছুরি

খেলা অথবা সে সম্বন্ধে আলোচনা করা—সি-আই-ডি ! অস্পৃশ্যতা আর শাস্ত্র নিয়ে কথা কইতে গেলে সংস্কৃত জানা দরকার, কাজেই—"

ভবকান্তদা মুখের উপর কাগজখানি চাপিয়া অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় চুপ করিয়া ছিলেন, শশধরের কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কিন্তু আর কিছু করবার নেই ব'লে প্রেম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে—প্রেম জিনিষটা তো তত সহজ নয় ! এত বড় একটা সার্ব্বজনীন ব্যাপার—"

শশধর বাধা দিয়া কহিল, "একটু অপেক্ষা করুন আমরা নোট ক'রে নিচ্ছি। কানাই—"

কানাই নোট বুক বাহির করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভবকান্তদার মতে তা হ'লে কি—"

ভবকান্তদা কহিলেন, "প্রেম আছে। তবে তা একটি নেশা মাত্র। গাঁজা, আফিম, চরস প্রভৃতির একটা মোলায়েম ধরণের রকম-ফের। উক্ত বস্তুগুলির মত প্রেম সেবনেও মত্ততা জন্মে এবং ছ্যাকরা-গাড়ীর ঘোড়াকে উচ্চৈঃশ্রবা, বস্তির খোলার ঘরকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল এবং নর্দ্দমাকে মা ভাগীরথী ব'লে মনে হয়।"

বলিয়াই ভবকান্তদা পুনরায় ইজিচেয়ারে লম্বমান হইলেন। বুঝিলাম ভবকান্তদা আর কিছু বলিতে নারাজ। শশধর আমার মুখের দিকে হতাশ হইয়া চাহিল। তাঁহার কথার প্রতিবাদ না করিলে ভবকান্তদার নিকট হইতে কথা আদায় করা যায় না, তাহা জানিতাম, কাজেই শশধরের অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য কহিলাম, "বললেন ভবকান্তদা আমরাও শুনলাম কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছিনে।"

"বটে !"—বলিয়া ভবকান্তদা পুনরায় সোজা হইয়া কহিলেন, "তা হ'লে প্রেমের সঙ্গে পরিচয় হয়নি তোমার। পদার্থটার প্রথম আক্রমণ যে কি ভীষণ এবং তার অনিবার্য্য ফল—মত্ততা, যে কি পরিমাণ মারাত্মক তা যদি জানতে তা হ'লে ছেলেমানুষের মত আমার কথায় অবিশ্বাস করতে না ! তা হ'লে শুনবে ?"

অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল, কানাই ও শশধর সমস্বরে সাগ্রহে কহিয়া উঠিল, "বলুন।"

ভবকান্তদা কহিলেন, "ছেলেমানুষ তোমরা, শোনা উচিত নয়, তবু শোন। একটা 'থিওরি'র ভাষ্য হিসাবে শুনে যাও।"

তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আমাদের ওই সাত নম্বরের বাড়ীটা দেখেছ তো ? যার ছাতের প্রাচীর নেই, গলির শেষ বাড়ীটা ?"

সকলেই সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করিলাম। ভবকান্তদা কহিলেন, "বেশ ! শোন তবে, বছর বিশেক আগেকার কথা বলছি। বাবা আর মা উভয়েই তখন সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে ইস্তফা দিয়ে কাশীবাস করছেন, আমি একা কলকাতায়

ঠাকুর চাকর নিয়ে সংসার পেতে ব'সে আছি। তোমার প্রথম বৌদিদি আসি আসি করছেন, ফেল করবার ভয়ে যথাবিধি তাঁকে আনতে পাচ্ছিনে—বৈশাখ মাসের প্রতীক্ষায় আছি। ঠিক প্রতীক্ষা বলা চলে না—বিয়ে করবার ইচ্ছেও বড় ছিল না। ছাতের চিলেকোঠায় ব'সে 'অভিজ্ঞান—ম্যাক্‌বেথ' আর 'প্যারাডাইজ লষ্ট' নিয়ে দিন কাটাই, ওই রকম জীবনই অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে তখন, আর একটা নতুন লোক এসে খবরদারী করবে এ কল্পনাটা সহ্য করতে পাচ্ছিনে।

সেদিন সকালবেলা চাকর বাইরের ঘরে ডেকে নিয়ে এল। বাড়ীভাড়া করতে লোক এসেছে। বাড়ীটা খালি ছিল। বাইরের ঘরে চেয়ারে একটি ভদ্রলোক ব'সে ছিলেন—বাড়ীটা তাঁরই দরকার। জিজ্ঞাসা করলাম, "পরিবার নিয়ে থাকবেন না মেস ?"

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, "পরিবার বিশেষ নেই! আমি আমার ছোট বোন, আমরা—"

বাধা দিয়া বললাম, "কত দিন থাকবেন ?"

ভদ্রলোক বললেন, "বরাবরই থাকবার ইচ্ছে।"

বললাম—"ভাড়া ত্রিশ।"

ভদ্রলোক পকেট থেকে দশ টাকার তিনখানা নোট বের ক'রে টেবিলের উপর রেখে বললেন, "মণিমোহন চৌধুরীর নামে জমা ক রে নিন—পরশু আসব আমরা।"

"সাত নম্বরের বাড়ীর ভাড়াটেরা পরশু এলেন কি তিন দিন পরে এলেন সে খবর রাখিনি। একদিন ছাতে উঠে ঘুরে বেড়াচ্ছি অকস্মাৎ গানের আওয়াজ শুনে সাত নম্বরের ছাতের দিকে নজর পড়ল। তিন ফিট উঁচু ছাতের প্রাচীর—কিছু দেখতে পেলাম না, কিন্তু মনে হ'ল যে গান গাইছে সে স্ত্রীলোক এবং সুন্দরী।"

এবার আমি বাধা দিয়া কহিলাম, "হঠাৎ এরকম অনুমানের হেতু কি ভবকান্তদা ?"

ভবকান্তদা উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "মৃত্যুর কোনও হেতু নেই। শুনে যাও। সে রকম আশ্চর্য্য সুর আমি জীবনে শুনিনি, একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। ক্রমে গান শেষ হ'য়ে গেল কিন্তু নড়তে আমি পারলাম না, সাত নম্বরের ছাতের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলাম। মিনিট পাঁচেক পর দেখলাম একটি মাথা আর তাতে একরাশ কোঁক্‌ড়ানো চুল। তার কিছুক্ষণ পরেই মাথাটি মুখসুদ্ধ দেখলাম—সুরের মত রূপও তার আশ্চর্য্য। বর্ণনা করব না। মাথার মালিক পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে প্রাচীরের উপরে ঝুঁকে পড়ে আমাদের ছাতের দিকে চাইলেন—বেশী দূর তো

নয়, মাঝে কাঠাখানেক জমিতে নেপাল ধোপার খোলার ঘর দু'খানা ছিল—দু'জনে চোখোচোখী হ'ল।

আমি লজ্জায় মুখ ফেরালাম এবং আড়চোখে একবার দেখলাম—ও ছাতে লজ্জার বালাই নেই মোটে। তখন সাহস হ'ল, ছাতের ধারে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা নতুন এলে বুঝি? নাম কি তোমার?"

অতি স্নিগ্ধকণ্ঠে জবাব এল, "নলিনী।"

আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হ'ল না। কি যেন একটা ব'লে ঘরে এসে ম্যাকবেথ খুলে বসলাম; কিন্তু একছত্র পড়তে ইচ্ছে হ'ল না। কোঁকড়ানো চুলওয়ালা মাথা আর একখানি চমৎকার সুন্দর মুখ মনে পড়ে যেতে লাগল।"

এই সময় দেখিলাম কানাই মুচকি হাসিয়া শশধরকে চিমটি কাটিতেছে—ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে কানাইয়ের দিকে চাহিলাম। সে গম্ভীর হইয়া বসিল। ভবকান্তদা ইতিমধ্যে একটি চুরুটে অগ্নি সংযোগে ব্যস্ত ছিলেন। চুরুটে একটি টান দিয়া নাক দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন—

"পরিচয় হ'তে দেরী হ'ল না। পরদিন বিকেলে বৈঠকখানায় ব'সে আছি, দেখলাম 'সেলার সুট' পরে বছর ষোলো বয়সের একটি ছেলে বই হাতে ক'রে আসছে—সম্ভবতঃ স্কুল থেকে। জানালা দিয়ে দেখেই চমকে উঠলাম। মাথায় স্ট্রহ্যাট, চুল দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু মুখখানা অবিকল সেই নলিনীর মত। তাকে ডাকলাম। ঘরে এসে ঢুকতেই তাকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"তুমি আমাদের সাত নম্বরের বাড়ীতে থাক বুঝি?"

ছেলেটি বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলল, "হ্যাঁ। কেন বলুন তো?"

একটু হেসে বললাম—"ছাতে যিনি গান করেন তিনি"—প্রশ্নটা সমাপ্ত করতে লজ্জা হ'ল। ছেলেটিরও দেখলাম মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে. বললেন,—"দিদি। আমরা যমজ।"

একটু সাহস ক'রেই বললাম—"তোমার দিদিকে বোলো তাঁর গান আমার খুব ভাল লাগে।"

ছেলেটি মুখ নীচু ক'রে হেসে বলল—"আচ্ছা।"

গান শোনার পর গল্পগুজব, তারপর আমার প্রেম নিবেদন এবং নলিনীর কৌতুকহাস্য-সহকারে সে প্রেম গ্রহণ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ব্যাপার সপ্তাহখানেকের মধ্যে ঘটল। দুপুরবেলা নলিনীর সঙ্গে দেখা হ'ত না, সে বলেছিল তার কোন্ মাসী না কে আছেন, তিনি প্রাতে এসে রান্না-বান্না শেষ ক'রে সারা দুপুর বাড়ীতে কাটিয়ে সন্ধ্যায় চ'লে যান। কাজেই দুপুরবেলা সে ছাতে আসতে পারে না। এক সন্ধ্যাকাল ছাড়া আর দু'জনার দেখা হবার উপায় নেই। কাজেই প্রাতঃকাল থেকে আরম্ভ ক'রে সমস্ত দিনটা দীর্ঘকালের

রোগী যেমন অন্ন-পথ্যের দিনের জন্য প্রতীক্ষা করে—তেমনি ক'রে ব'সে থাকতাম। সে প্রতীক্ষার তীব্রতা যে কি এখন ব'লে তোমাদের বোঝাতে পারব তা মনে হচ্ছে না। সেই সমস্ত দুপুর চিলেকোঠায় শুয়ে আর-একবাড়ীর ছাতে পদশব্দ শোনবার জন্য কাণ পেতে থাকা—আর নেপাল ধোপার বেলগাছ থেকে বেল পড়লে তার শব্দে লাফিয়ে ওঠা তাও একদিন দু'দিন নয় পুরোপুরি পাঁচমাস ধ'রে, সে সব কথা ঠিক নিজে অনুভব না করলে বক্তৃতা ক'রে বোঝানো যাবে না।"

এই সময় শশধর একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। তাহাদের পাশের বাড়ীর ভাড়াটের পরিবারস্থ কাহারও কল্যাণে সে বার তিনেক বি-এ ফেল করিয়াছিল শুনিয়াছিলাম—বুঝিলাম শশধর কাহিল হইয়া পড়িয়াছে।

ভবকান্তদা তাঁহার প্রথম প্রেমের অনুভূতি এ-রকম রসঘন করিয়া পরিবেষণ করিতে থাকিলে বেচারীকে লইয়া বিপদে পড়িতে পারি ভাবিয়া কহিলাম,—"মিলনের আর কত বাকী ভবকান্তদা ?"

ভবকান্তদা কিন্তু চুরুটে একটি প্রবল টান দিয়া তাঁহার মুখাগ্নি উদ্দীপিত করিয়া কহিলেন,—"হচ্ছে। শোন, শুধু মৌখিক প্রেম নিবেদন এবং গ্রহণ ক'রে আমি খুসী হ'তে পারিনি। ভাল খাবার—ফলমূল মিষ্টি একা খাইনি কোনোদিন, আমার ভাগের বারো আনা রুমালে বেঁধে যথাস্থানে ফেলে দিয়েছি। নলিনীর দাদা বাড়ীভাড়ার টাকা দিয়েছেন ; নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে, তিনি পাছে সন্দেহ করেন, এই ভয়ে, নিয়েছি ; কিন্তু সন্ধ্যাকালে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে নলিনীদের ছাতে ফেলে দিয়ে বলেছি—"তোমার দাদা ভাড়ার টাকা দিয়েছেন, নাও, জমিও তুমি।"

নলিনী একটু থমকে দাঁড়িয়ে কি ভেবেছে আর কুড়িয়ে নিয়েছে। এমনি ক'রে মাস চারেক কাটবার পর শেষে একদিন—না থাক্!" কানাই ও শশধর হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। আমিও কহিলাম, "বাকীটা চুকিয়ে দিন একেবারে ভবকান্তদা।"

ভবকান্তদা অত্যন্ত করুণস্বরে কহিলেন, "বেশ! হঠাৎ একদিন ভোরে দরজায় হিন্দী ভাষায় চীৎকার শুনে দেখি গলিময় লালপাগড়ী,—নলিনীদের বাড়ীর ঠিক সামনে আধ ডজন সার্জেন্ট। নীচে নেমে এলাম। নলিনীদের বাড়ীর দরজায় তালা বন্ধ। ইনস্পেক্টার বললেন—"এটা আপনার বাড়ী ?"

বললাম—"হ্যাঁ। কেন ?"

"সার্চ্চ করব !"

"ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলাম না। আর তখন বছর উনিশ বয়স—পুলিশ দেখে ভয় একটু ছিলই, বললাম—"করুন।" এদিকে মনে

মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম—নলিনী যেন বাড়ীতে না থাকে! তালা ভেঙে ইনস্পেক্টার ঢুকলেন—বাড়ী খালি—কেউ নেই, শুধু কলতলায় একগণ্ডা ভাঙা হাঁড়ি পড়ে আছে।

ইনস্পেক্টার মুখ ফিরিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—"এরা গেল কোথায়?"

মুখ শুকিয়ে গেল, বললাম, "কারা?"

"নীরদ খাস্তগীর আর বিনোদ চৌধুরী?"

আশ্চর্য্য হ'য়ে বললাম—"তাদের তো চিনিনে।"

ইনস্পেক্টার তীব্রদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—"বাড়ী আপনার—"

বললাম—"আমাদের ভাড়াটের নাম ছিল মণিমোহন চৌধুরী।"

"ক'জন লোক ছিল এ বাড়ীতে?"

অনায়াসে মিথ্যা কথা ব'লে দিলাম—"একজন ভদ্রলোক মাত্র!"

তারপর গোয়েন্দা আপিসে যেতে হ'ল, আমাকে কিন্তু অনেক জেরা ক'রেও সাহেব নলিনীর কথা আমার মুখ থেকে বের করতে পারলেন না।"

কানাই কহিল—"সেই নীরদ খাস্তগীর তা হ'লে—?" শশধর তাহাকে ধমক দিয়া কহিল, "চুপ! আপনি বলুন ভবকান্তদা!"

ভবকান্তদা কহিতে আরম্ভ করিলেন,—"সমস্ত দিন যে সেদিন কি যন্ত্রণা ভোগ করলাম তা বলবার নয়! কোথায় গেল নলিনী ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি হঠাৎ দেখি সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে। চোখ মেলেই দেখি আমার চায়ের টেবিলের উপর একখানা মোটাখামের চিঠি। খুললাম—নলিনীর চিঠি। চিঠিখানা না প'ড়েই বুকে চেপে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আপন মনেই বললাম বাঁচালে ভগবান!

তারপর বাতি জ্বেলে চিঠি পড়তে আরম্ভ ক'রে দিলাম। বড় চৌকো কাগজের পাঁচ পৃষ্ঠা। প্রথম চার পৃষ্ঠা পড়তে পড়তে প্রায় পাঁচ সাতবার আমাকে চোখের জল মুছতে হ'ল—নলিনী তার প্রতি আমার স্নেহের যে পরিচয় পেয়েছে তারই একটি বর্ণনা দিয়ে বার দশেক আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে—চিঠিখানাকে দু' একবার—থাক্ গে! কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম—একি কখনও সম্ভব হ'তে পারে? নলিনী—ভাবতে আর পারলাম না—মাথা ঘুরে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেলাম।"

কানাই এবং শশধর সমস্বরে চীৎকার করে উঠল—"কি হ'ল শেষ-পৃষ্ঠায়?"

ভবকান্তদা কহিলেন, "মুখে বলতে পারব না। জীবনে কাজে লাগবে ব'লে চিঠির সে পাতাটা আমি রেখেছি—তোমরা প'ড়ে নাও।"—বলিয়া ভবকান্তদা টেবিলের টানা দেরাজ খুলিয়া ফ্রেমে বাঁধানো একখানি কাগজ বাহির করিয়া দিলেন। শশধর পড়িতে লাগিল—"কিন্তু একটা কথা আপনাকে না ব'লে পাচ্ছিনে। আপনার অগাধ স্নেহ দয়ার চক্ষেই পরিচয়

পেয়েছি—কাজেই আপনাকে একটু সতর্ক করা দরকার। আপনার বুদ্ধিটা বড় সরল—লোক চিনতে আপনি পারেন না। আমি আলিপুরের ডাকাতির ফেরারী আসামী, পিছনে অনবরত ফেউ ঘুরছে—নইলে নিজ মুখেই সব বলতাম! আমি পুরুষ মানুষ—যে ছেলেটাকে বই-হাতে আসতে দেখেছেন সে আমার যমজ ভাই নয়, সে আমিই। পুলিশের চোখ এড়াবার জন্য মেয়ে সেজে আমাকে বাড়ীতে থাকতে হ'ত—সকালে ফিরিঙ্গির ছেলে সেজে কন্‌ভেণ্টের ইস্কুলের দিকে যেতাম—কাজেই দুপুরে কোনদিন আমাকে দেখতে পান নি। আর কিছু ভাববার নেই। যদি বেঁচে থাকি কখনও দেখা হবে। তবে একটা কথা—সত্যি কথাই বলছি—আপনার যে মূর্ত্তি আমি দেখেছি তাতে মেয়ে হ'য়ে জন্মাতেও আমার আপত্তি ছিল না!"

শশধর চিঠি পড়িয়াই আর একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ট্র্যাজেডি!"

কানাই মুচকি হাসিয়া কহিল—"বেশ মজার কথা তো!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি করলেন তারপর?"

ভবকান্তদা কহিলেন—"যা করা উচিত অর্থাৎ যা না করলে চলত না তাই—বিবাহ। নলিনীকে ভুলবার জন্য। বাগবাজারের মুখুয্যেদের বাড়ীর বিধুমুখীর শরণ নিলাম! সে বেচারী বছরখানেক পর নিমতলার ঘাটে—আর সে তো জানই। তারপর বিধুমুখীকে ভুলবার জন্য ভবানীপুরের মালতীকে।"

কহিলাম—"কিন্তু যাই বলেন ভবকান্তদা, মালতী-বৌদির মরবার পর আপনার আর তিন নম্বর করা উচিত হয়নি!"

ভবকান্তদা কহিলেন—"উপায় ছিল না ভাই। বলেছি তো প্রেম একটা নেশা এবং বিবাহ একটা মুদ্রাদোষ,—একবার অভ্যাস হ'য়ে গেলে আর ছাড়াবার কোনোও উপায় নেই—উপায় নেই!"

বলিয়াই পিছনের খোলা দরজার দিকে চাহিয়া ভবকান্তদা তারস্বরে হাঁকিলেন, "গিন্নি! পেয়ালা চারেক চা!"

পরিশিষ্ট

মানময়ী গার্ল্‌স স্কুল

পাত্রপাত্রীগণ

দামোদর চৌধুরী	...	বাবলাহাটির জমিদার ও মানময়ী গার্লস্ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা
মানময়ী	...	তদীয় পত্নী
চপলা	...	কন্যা
মানস	...	বেকার গ্র্যাজুয়েট
নীহারিকা	...	বেকার নবীনা গ্র্যাজুয়েট
রাজেন্দ্র বাড়ুরী	...	মোক্তার। মানময়ী গার্লস্ স্কুলের সেক্রেটারী
হারানিধি	...	মানসের ভৃত্য

মিঃ ফার্নাণ্ডেজ, বাম্নী, খট্‌মট্ সিং, বৈকুণ্ঠ সরকার, রাজুর মা, ও প্রতিবেশিনী, বালক ও যুবকগণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে

[ল্যাম্প পোষ্টে একখানি বিজ্ঞাপন আঁটা, বি-এ পাশ মানসমোহন মুখোপাধ্যায়—বয়স চব্বিশ পঁচিশ বৎসর—বিজ্ঞাপনটি তাঁহার নোটবুকে নকল করিতেছিলেন। দুই একজন কৌতূহলী পথিক ঘাড় উঁচু করিয়া বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া গেল]

মানস। ভরসা নেই। তবু—(টুকিতে লাগিলেন) চোখ বুজে ঢিল ছুঁড়ি তো, লাগে লাগবে—না লাগলে পাঁচ পয়সা গেল! এর চেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে খতম করাই ছিল ভালো। তবু একটা কিছু পাওয়া যেত। পনেরো কুড়ি যা হয়। গ্র্যাজুয়েট শুনলেই বলে গ্র্যাজুয়েট পুষবার টাকা নেই! থাকবে কি করে? টাকা ত সব নোট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এত মাইনে এরা দেবে কোত্থেকে? চুরি ক'রে দিক ডাকাতি ক'রে দিক, আমার মাস গেলে পকেটে এলেই হ'ল। প্রথম মাসটা দেখে পর মাস থেকে নতুন নিয়মে পড়াব। একেবারে ভারতীয় পদ্ধতিতে।

[বৈকুণ্ঠ সরকারের প্রবেশ]

মানস। (নোটবুক দিয়া বিজ্ঞাপনটি আড়াল করিয়া ধরিয়া) কি চান মশাই আপনি?

বৈকুণ্ঠ। খাতা সরাও!

মানস। আপনার কি দরকার বলুন।

বৈকুণ্ঠ। বিজ্ঞাপনটা দরকার।

মানস। ওটা বাতের ওষুধের বিজ্ঞাপন নয়, আপনার কাজে লাগবে না।

বৈকুণ্ঠ। ভাল উৎপাত। খাতা সরাও না, আমাকে আবার তাগাদায় যেতে হবে। কর্ত্তার বুড়োকালে ধেড়ে রোগে ধরেছে—পয়সা বেশী হ'য়েছে কিনা। খাতাটা সরাও না!

মানস। কি পাশ আপনি?

বৈকুণ্ঠ। সে খোঁজে তোমার কি কাজ হে ছোকরা? সরাও বলছি—(মানসের নোটবুক টানিয়া সরাইয়া) এইটে সেঁটে দিই তারপর ভাল ক'রে লেখ। (কাগজটি আঁটিয়া দিলেন) কাল দিলেন এক বিজ্ঞাপন আবার আজ পাঠালেন এক চুট্‌কি! এখন সারা সহর ভর চুট্‌কি সেঁটে বেড়াই আর কি! (প্রস্থানোদ্যম)

মানস। মশাই দাঁড়ান! নমস্কার! আপনার মনিবের স্কুল বুঝি!

বৈকুণ্ঠ। স্কুল না বাপের পিণ্ড। বিয়ে করেছ?

মানস। আজ্ঞে না।

বৈকুণ্ঠ। তবে পিণ্ড গিলতে পারলে না, ঘরের বাছা ঘরে যাও!

(প্রস্থান)

মানস। ওরে বাবা, তাইতো! সত্যি দেখছি স্ত্রীভাগ্যে ধন। মুখের কাছে এসে ভাতের গ্রাস খসল। বিয়ে করলেও নাজেহাল, না করলেও—তবু টুকে নিই! (নকল করিতে লাগিলেন)

[নীহারিকা গাঙ্গুলী—ডায়োসেশনের নবীনা গ্র্যাজুয়েট, ম্লান মুখে হাতে ব্যাগ ঝুলাইয়া প্রবেশ করিলেন]

নীহা। দশ টাকার জন্যে রোজ তিন ক্রোশ! আর পারিনে! (মানসের পিছনে আসিয়া) ঘাড়টা একটু সরাবেন?

মানস। (মুখ না ফিরাইয়া) ঘাড় তো এখানে ব'সে থাকবার জন্যে আসেনি, একটু পরেই সরবে।

নীহা। ক্ষমা করবেন, ওটা কি Wanted?

মানস। (মুখ ফিরাইয়া) ওঃ, মাফ করবেন! আমি ভেবেছিলাম আর কেউ!

নীহা। ওটা কিসের—?

মানস। বিজ্ঞাপন একটা, শুনবেন? Wanted a tutor and tutoress both graduates on Rs. 100 and 120 respectively for my newly founded Girls' School.

নীহা। ঠিকানা?

মানস। এইরে সেরেছে! পার্ডন! আপনার স্বামীও কি গ্র্যাজুয়েট? বেকার?

নীহা। কেন বলুন তো?

মানস। লেজুড় আছে শুনেছেন? দেখুন, must be husband and wife, বাংলা করে বোঝাবো?

নীহা। না বুঝেছি, থ্যাঙ্কস্! (প্রস্থানোদ্যম)

মানস। ঠিকানাটা নিয়ে যান।

নীহা। দরকার নেই। (প্রস্থান)

মানস। এও বেকার! ব্লাউজের হাতায় আর পায়ের জুতোয় তালি পড়ছে! একটা স্বামী থাকলে—দি আইডিয়া! (উদ্দেশে) দেখুন! দাঁড়ান! শুনছেন! শুনুন—

[নীহারিকার পুনঃ প্রবেশ]

নীহা। কি হ'য়েছে ?

মানস। দুটো কথা জিজ্ঞাসা করব, কিছু মনে করবেন না তো ?

নীহা। আমার সময় নেই, ন'টায় ছাত্রী আছে।

মানস। অল্প কথায়—দুটো। আপনি গ্র্যাজুয়েট ?

নীহা। ডায়োসেশান থেকে—

মানস। যেখান থেকেই হোক। একটা কথা বলতে চাই। একটা কথা বলব, কোনও মৎলব আছে ভাববেন না। আমি গ্র্যাজুয়েট এবং গরীব—তবে ভদ্রলোক। আমার সঙ্গে পার্টনারসিপে—

নীহা। (হাতঘড়ি দেখিয়া) ন'টা প্রায় বাজে।

মানস। ন'টা দশটা যা ইচ্ছে বেজে যাক। আমার কথা মত আর টুইসনি করতে হবে না। আর কেউ জানবে না. আমি আর আপনি। আর আপনার বুড়ো বাপ মা ইচ্ছে করলে—

নীহা। বাপ মা নেই।

মানস। সে আরো ভাল। শুনুন, বলব ?

নীহা। বলুন।

মানস। দেখুন (কাশি) দেখুন (কাশি) যদি আপত্তি না থাকে—দেখুন—দু'জনে (থামিয়া) বলব ? ভাববেন না কিছু ?

নীহা। কি বলবেন, বলুন না।

মানস। সাহস হচ্ছে না। তবু—তা হ'লে শুনুন—আইডিয়াটা দেখুন একবার। আচ্ছা আগে জিজ্ঞাসা করি—এ চাকুরী হ'লে আপনার সুবিধে হয় ?

নীহা। তামাসা করবার জন্য ডাকলেন ?

মানস। মোটেই না। আপনার অবস্থা বুঝেছি, আমার অবস্থাও বুঝবেন। যদি দু'জনে পার্টনারসিপে—

নীহা। পার্টনারসিপে !

মানস। আরও স্পষ্ট ক'রে বলি তা হ'লে। এই ধরুন—বলব ?

নীহা। বলুন না দেরী হচ্ছে—

মানস। ধরুন চাকরীর খাতিরে আমি যেন আপনার স্বামী—রাগ করবেন না—পেটের দায়ে বলছি—আপনি স্ত্রী—এই রকম একটা অভিনয় করা যায় না ? সেটা—

নীহা। রাস্কেল !

মানস। যা খুসী বলতে পারেন কিন্তু সদর রাস্তা না হ'লে আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারতাম— (নীহারিকা বিনাবাক্যে প্রস্থান করিলেন)

কিছু না থাক, রিস্টওয়াচটা তো আছে—চলবে হপ্তাখানেক। কিন্তু বুঝে

দেখবেন—আইডিয়াটা! ফেলবার নয়। এই যে বুঝেছেন তা হ'লে?

[নীহারিকার পুনঃ প্রবেশ]

নীহা। না, সেজন্যে আসিনি। আপনাকে অন্যায় বলে ফেলেছি ক্ষমা করবেন! আর (একখানি কাগজের টুকরা দিয়া) ঠিকানা এই রইল। দরকার হ'লে বাড়ীতে খবর করবেন। ঘণ্টাখানেক পরে এই পথেই ফিরব আবার। নমস্কার। (প্রস্থান)

মানস। নাঃ সেজন্যে আসেন নি! সেক্সপীয়র পড়ে' হজম করলাম আর এই ছলনাময়ী নারীজাতিকে চিনিনে? কিন্তু আইডিয়া—বাস্তবিক কি চমৎকার আইডিয়া! ঠিক মনে হচ্ছে লেগে যাবে! আর কারো চোখে পড়বার আগেই—(বিজ্ঞাপন ছিঁড়িয়া) এখন সবগুলো গ্যাসপোষ্ট খুঁজতে হবে। সহরময় সেঁটেছে বোধ হয়! তাঁর কাছেও আবার যেতে হবে! (কাগজখানি দেখিয়া) একেবারে হোলী বাইবেল! সেণ্ট মেরিস হোষ্টেল, চার্চ্চ রোড! হোক—কিছুতেই অরুচি নেই। নাম ঠিক আছে—নীহারিকা সাজাহানুনেচ্ছা যে হয়নি—তাই বাপের ভাগ্যি। নাঃ! ঘণ্টাখানেক ধ'রে গ্যাসপোষ্টগুলো দেখে নিই—এইখানেই দেখা হবে, কে যাবে আবার দেড়ক্রোশ হেঁটে চার্চ্চ রোডে! ততক্ষণ বরং দরখাস্তটা টাইপ ক'রে রাখলে মন্দ হয় না—দেখি। (প্রস্থান)

[চিংড়িদীঘি পঙ্কোদ্ধার সমিতির সাহায্য কল্পে কয়েকজন বালক ও যুবকের খোল, করতাল ও হার্ম্মোনিয়ম সহযোগে গাহিতে গাহিতে প্রবেশ]

কানের কাছে যে গুনু গুনু করে পরম শত্রু জানিও তায়।
তাহারি কামড়ে প্রতি বৎসরে দশ লাখ মরে হায়রে হায়॥
এনোফিলিসের বিষে জর্জ্জর,
কাঁদে হাট মাঠ, কাঁদে বাড়ী ঘর।
বাঁশবন আর এঁদো পুকুরেতে ডেরা বেঁধে তারা বাড়িছে হায়॥
চিংড়ীদীঘির শুকাইছে জল,
সেথা মশকেরা করে কোলাহল;
তোমাদের কাছে চিংড়ী গাঁয়ের দীন অধিবাসী ভিক্ষা চায়।
কর বারিদান—বাঁচাও পরাণ নয় যাবে প্রাণ ম্যালেরিয়ায়॥

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

[যষ্টি হস্তে হারানিধির প্রবেশ]

হারা। এরা বেশ ফেঁদেছে! নতুন ধরনে! আর এ পুরানো ব্যবসা পোষায় না! সব বেটা চালাক ব'নে গেছে। দেবে তো একটা আধলা, তার আবার সাতপুরুষের খবর! কেন বাবা? দিবি দে, মুখ বুজে দে, না

দিবি ত কে বাবা তোর সিন্দুক ভাঙতে যাচ্ছে! কৈফিয়ৎ! কৈফিয়ৎ! তারপর আবার পাহারাওয়ালা বাবার খৈনির চাঁদা, জমাদার ঠাকুর্দার সেলাম, বাড়ীওয়ালী গুরুঠাকরুণের বখ্রা! সব দিয়ে থুয়ে টাকা পিছু বাঁচে তিন আনা। তার নিজেই বা কি খাই—পট্লিকেই বা কি দিই? তিনি আবার বাপের বাড়ী থেকে ভয় দেখাচ্ছেন নথ না দিলে ভেক নিয়ে বষ্টুমী হবেন! হ'গে না বষ্টুমী—যে রূপ—লোকে ভিক্ষে দেবে, না, নাথি দেবে। ভিক্ষে করা কি সোজা কথা রে মণি? এই দ্যাখ, না—অন্ধ নাচার হ'য়ে হাত পেতেছি অমনি তো ঝড়াক্সে এক সিকি। বৌনিটা এবেলা হ'য়েছে ভালই। (সিকিতে চুমা দিতে গিয়া) ওরে বাবা! একেবারে সীসের। গরীব অন্ধ নাচারকে ঠকিয়ে গেলে বাবা, পরকালে ভাল হবে না। ঐ যে আসছে একজন। (অন্ধের মত লাঠি ভর দিয়া গান) ভজ মন নন্দ ঘোষের নন্দনে—অন্ধ নাচার বাবা—এক পয়সা।

[মানসের প্রবেশ]

মানস। বেড়ে কারবার ফেঁদেছ তো বাপধন!

হারা। অন্ধ নাচার বাবা!

মানস। বাবা তুমি যদি অন্ধ হও তবে আমি এই শ্যামবাজার থেকে হেঁটে আসছি—আমিও খঞ্জ।

হারা। অন্ধ নাচার—

মানস। অন্ধ নাচার! এই না কি একটা নাকের ডগায় নিয়ে উল্টে দেখছিলে মাণিক!

হারা। দেখে ফেলেছে! দেখিনি বাবা শুঁকছিলাম।

মানস। কি শুঁকছিলে ধন? যাক্ তুমি অন্ধের পার্ট মন্দ কর না চাকরী করবে?

হারা। কানা মানুষ।

মানস। বটে! পদ্মআঁখি খোল তো বাপধন—দিনকানা কি রাতকানা একবার পরখ করি। চাকুরী করবে?

হারা। কি কাজ বাবা?

মানস। এখন যেমন কানা সেজেছ, তেমনি বোকা সেজে থাকতে হবে।

হারা। আমার বাপের নামই ছিল বক্কেশ্বর, সে আমি খুব পারব।

মানস। তবে এই ঠিকানা নাও—গিয়ে দেখা করবে বিকেলবেলা। (কাগজ দিয়া) আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে।

হারা। মাইনে?

মানস। তখন ঠিক হবে। (প্রস্থান)

হারা। দেখি না ব্যাপারটা, না পোষায় হাবড়া পুলের ধারে উড়ে ঠাকুর

হয়ে বসব। পাঁচসিকের ফুলের মালা কিনলে রোজ বারো গণ্ডা মারে কে? (প্রস্থান)

[কৃষ্ণবর্ণ সাহেব মিঃ ফার্ণাণ্ডেজের সহিত নীহারিকার প্রবেশ]

নীহা। সে হয় না মিঃ ফার্ণাণ্ডেজ!

ফার্ণা। না হয় টাকা ফেল! সাত দিন হোস্টেলে হেঁটে হেঁটে আজ পথে তোমাকে ধরেছি, সহজে ছাড়বো না!

নীহা। বলছি তো আগষ্টে দিয়ে দেব, দয়া ক'রে কটা দিন অপেক্ষা করুন!

ফার্ণা। আর চলবে না! ডিসেম্বরে টাকা নিয়েছ, কথা ছিল পরীক্ষার পর দেবে! পরীক্ষা গেল, পাশও হ'লে, এখন বলছ, আগষ্ট! তখন যদি ফিজ্‌টা ধার না দিতুম—পরীক্ষা দিতে কি ক'রে!

নীহা। আগষ্টে দেব, আপনি ঠিক জানবেন।

ফার্ণা। আগষ্টে না দাও, ইউ বিকাম মিসেস ফার্ণাণ্ডেজ কিংবা সিভিল জেল!

নীহা। মিঃ ফার্ণাণ্ডেজ!

ফার্ণা। নো—ও—ও—ও! নো—এক্‌স্‌পেচুলেশান্! যা ব'লেছি তাই করব! উঃ! তোমার জন্যে কি সাফারিংটাই সাফার করলাম আজ তিন বছর! মিসেস ডোরোথী কাদম্বিনী বিসোয়াসের অফার রিজেক্ট করেছি, মিসেস ছমিরণ আলেকজাণ্ডারের দিকে ফিরেও তাকাইনি। তোমাকে খুসী করবার জন্যে এই বয়সে গান শিখতে আরম্ভ করেছি—তুমি বলেছিলে গান ভালবাস। জবরদস্ত খাঁ কাবুলীর কাছ থেকে টাকায় চৌদ্দ পয়সা সুদ দিয়ে লোন নিয়ে পিয়ানো হায়ার ক'রেছি—আর সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ঘরে দোর দিয়ে ডো, রে, মি, ফা, সো, লা, টি, ডো করেছি। বেচারাম ডিক্রুজের কাছ থেকে তিনদিনের জন্যে তার বাইসিকেল চেয়ে এনে বন্ধক দিয়ে তোমার ফিয়ের টাকা দিয়েছি—এখন সে পথ দিয়ে যেতে পারিনি—আর ইউ ক্রুয়েল হার্টলেস স্টোন লাইক ওম্যান্ তুমি আমাকে—আমাকে—

নীহা। আমাকে ক্ষমা করবেন মিঃ ফার্ণাণ্ডেজ।

ফার্ণা। ক্ষমা নেই। ফার্ণাণ্ডেজের ডিক্সনারীতে ক্ষমা বলে কোনও কথাই নেই। তুমি আমার সমস্ত লাইফ হোপ ফেথ হ্যাপিনেশ যা কিছু ক্রুসিফাই করেছ। টাকা দেবে, নইলে যা বলেছি—হয় সিভিল অর মিলিটারী জেল নয় বুঝেছ—আই স্যাল হ্যাভ ইউ। (ফার্ণাণ্ডেজের প্রস্থান)

নীহা। কি অপমান! কি ভুলই করেছি! মাঝে শুধু একটি মাস সময়! কি করি? এর চেয়ে সে ভদ্রলোকের কথা শুনলেই ভালো ছিল!

অন্ততঃ লোকটা যে ভদ্র তাতে সন্দেহ নেই, আর আইডিয়াটাও ছিল চমৎকার ! বুদ্ধি খুব ! ঠিকানাটা চেয়ে নিলে ভালই করতুম দেখছি—এ চাকুরী হ'লে অন্ততঃ একমাস খেটেই ফার্ণাণ্ডেজের হাত থেকে বাঁচতুম তারপর—

[মানসের প্রবেশ]

মানস। নমস্কার, মিস গাঙ্গুলী।

নীহা। এই যে। নমস্কার মিষ্টার।

মানস। মুখার্জী। মানসমোহন মুখোপাধ্যায়।

নীহা। (স্বগত) বেশী গরজ দেখানো ঠিক নয়। (প্রকাশ্যে) দেখুন, আপনার আইডিয়াটা মন্দ নয়, কিন্তু মন কিছুতেই সাড়া দিচ্ছে না।

মানস। মনকে সব সময় বিশ্বাস করতে নেই মিস গাঙ্গুলী !

নীহা। আপনিও আমাকে চেনেন না, আমিও আপনাকে চিনিনে, এ অবস্থায়—

মানস। আমি আপনাকে একবার দেখেই চিনেছি। আমাকে না চিনলেও আমি ভদ্রলোক এ কথা মানেন তো ?

নীহা। মানি—কিন্তু তবু—দেখুন রাগ করবেন না, জীবনে অনেক দাগা পেয়ে—

মানস। আমার কাছ থেকে পাবেন না। দেখবেন গুড্ কণ্ডাক্ট সার্টিফিকেট ? (পকেটে হাত দিলেন)

নীহা। না থাক ! তবু সঙ্কোচ হয়—কাজটা নীচ অত্যন্ত—

মানস। সত্যিকার মিসেস ফার্ণাণ্ডেজ হবার চেয়ে মিথ্যে মিসেস মুখার্জী হওয়া নীচ কাজ ভাবছেন ?

নীহা। (চমকিত হইয়া) আপনি জানলেন কি ক'রে ?

মানস। বাঁদরটা যখন শাসাচ্ছিল তখন আমি ওই শিরীষ গাছটার আড়ালে—

নীহা। তা'হলে তো সবই শুনেছেন। সেই জন্যেই বিশেষ ক'রে —ইচ্ছা না থাকলেও আমি অন্ততঃ একমাসের জন্যেও—আপনার—আপনার—

মানস। বুঝেছি ! ব'লে আর লজ্জা দেবেন না। তবে প্রকৃতপক্ষে স্বামী হবেন আপনিই—কারণ আপনারই মাইনে হবে বেশী—একশো বিশ।

নীহা। তাহ'লে দরখাস্ত দিন, আমি সই দেব। কিন্তু—কিন্তু কি বলতে চাচ্ছি বুঝলেন ?

মানস। বুঝেছি। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন। এই চার্চের সম্মুখে শপথ করছি—

নীহা। চার্চ মানেন?

মানস। সব মানি। হিস্ট্রির পরীক্ষার দিন গীর্জা দর্গা আর কালী-বাড়ী সকলের কাছেই পাঁচ পয়সা মানৎ করেছিলাম। একশো সাতাশ মার্কের উত্তর লিখে পাশ করেছি। একটা—হয় গীর্জা, নয় দর্গা, নয় কালীবাড়ী নিশ্চয় জাগ্রত, নইলে পাশ কিছুতেই হতাম না।

নীহা। আপনাকে বন্ধু ব'লে স্বীকার করছি, দেখবেন—

মানস। ওই করিস্ চার্চ। প্রতিজ্ঞা করছি—কাগজে কলমে এবং চাকুরী বজায় রাখবার জন্য যতটুকু স্বামী হবার দরকার ততটুকু ছাড়া আমি—

নীহা। আর বলবেন না, লজ্জা পাব। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি।

মানস। তবে এই নিন দরখাস্ত, একেবারে টাইপ শেষ।

নীহা। একেবারে রেডী হ'য়ে এসেছেন, দেখছি!

মানস। নশ্বর মানব জন্ম মিস গাঙ্গুলী। একটা দিন যাচ্ছে—আর আয়, এক ডিগ্রী ক'রে নীচে নামছে। দেরী করা বোকামী। সই দিন।

নীহা। আপনি?

মানস। লেডীজ ফার্ষ্ট।—মুখার্জী—(নীহারিকা হাসিয়া সহি করিলেন) তৈরী হয়ে থাকবেন, এগুলি লাগবেই—একেবারে নির্ঘাত বুলেট। (প্রস্থান)

নীহা। ছিঃ ছিঃ। কি করলুম। (চারিদিক চাহিয়া) না, চলে গেলেন। লোভের মাথায়—ছিঃ! ছিঃ! ঠিকানাটাও চেয়ে নিইনি যে নিষেধ করব। (একটু ভাবিয়া) যাক্‌গে যা হ'বার হয়ে গেছে— একমাস বই ত' নয়। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

দামোদর চৌধুরীর বাড়ীর দরদালান

[মানময়ী দেবী, তিনজন প্রতিবেশিনী, বামী ও চপলা প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের পিছনে প্রথম একদল বালিকা শ্লেট এবং ধারাপাত বগলে মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে ও তৎপর একদল কিশোরী ছাত্রী বই হাতে প্রবেশ করিল]

মান। আজ তোমার মেয়েদের কিসের খেলা?

১মা প্র। কাপড় কাচা খেলা।

মান। আচ্ছা বল। আজ এখানেই ক্লাস হবে, স্কুলবাড়ী চুণকাম হচ্ছে। বসি আগে একটু (সকলে বসিলেন) এইবার বল—

প্রথম দল বালিকা—সমস্বরে ও অঙ্গভঙ্গী সহকারে

প্রথমেতে ঠাণ্ডাজলে ভিজায়ে রাখিবে।
তারপর পাৎলা ক'রে সাবান মাখিবে।

মান। স্বদেশী সাবান কিন্তু—

বালিকা। তারপরে রোদ্দুরেতে ফেলিয়া রাখিবে।
সাবান শুকায়ে গেলে তুলিয়া আনিবে।
তারপরে কোঁচায়ে নিয়ে পাটে আছড়াইবে।
পাট না থাকিলে একখানা পিঁড়ি পেতে নিবে।
তারপর টিপিয়া জল বাহির করিবে।
তারপর বাড়ীর উপর শুকাইতে দিবে।

মান। বেশ! পশমী কাপড় হ'লে?

বালিকা। পশমী কাপড় হ'লে সাবান না দিবে
করিয়া রীঠার জল তাতে ডুবাইবে।

মান। এরা বেশ শিখেছে। তারপর তোমার মেয়েরা, রাজুর মা?

চপলা। আজ আমাদের রান্নার খেলা—আমাদের আঁশের আর ওদের (কয়েকজনকে দেখাইয়া) নিরামিষ।

মানময়ী। আচ্ছা আগে নিরামিষ-রা এসো।

তিনটি কিশোরী—অঙ্গভঙ্গী সহকারে

গান

জগতে জন্মে যত তরকারী তার মাঝে সেরা ওল।
মাটির তলায় গজায় তাহারা কেহবা লম্বা কেহবা গোল।
বঁটি পেতে নিয়ে কাট ছাঁট ক'রে
সাবধান! হাতে রস নাহি ধরে—
রস লেগেছে কি অমনি মরেছ হাত ফুলে হবে ঢোল।

মানময়ী। হাতে তেল মাখাতে বললি নি যে রাজুর মা?

২য় প্র। ঘরে তেল না থাকে যদি—

মানময়ী। তাহ'লে তো রান্নাই হবে না। যাক্, বল বাছা—

কিশোরী। পাথর বাটিতে ভাল জল নিয়ে কুটিয়া থুইবে তাতে,
চাকা চাকা করে কাটিয়া লইবে যদি দিতে হয় ভাতে।
ডাল্‌না রাঁধিতে কড়াই চাপাও,
তাতিয়া উঠিলে তেল ছেড়ে দাও—

সম্বরা দিও কালজিরা আর দুটো তেজপাতা সাথে।
ঘৃতে দারুচিনি দিয়া ফুটাইলে হবে পরিপাটি ঝোল।

মান। নারকেল বাটা দিতে বললি নি যে রাজুর মা?

বামী। যে মাগ্‌গি, কাল কিনতে গেনু একজোড়া—বলে দু’ আনা।

মান। তুই চুপ কর্ বামী। নারকেল বাটা—

চপলা। আমি যে নারকেল ভালবাসিনে মা।

মান। তবে থাক্! ঘেমে যে নেয়ে উঠলাম, হাওয়া দে। (বামী পাখা লইল) এবার মাছ রান্না—এসো তোমরা।

চপলা ও জনকয়েক কিশোরী অঙ্গভঙ্গী সহকারে

গান

চিতল মাছে মেথির গুঁড়ো ইলিশ মাছে আদা
তুমি দিও না—দিও না।
জীরে ছাড়া চিংড়ি আর সর্ষে ছাড়া চাঁদা
তুমি খেও না—খেও না।
কপি দিয়ে রুইয়ের মাথা রাঁধতে যদি যাও
হাতার মাথায় একটুখানি লঙ্কাবাটা নাও
ধ’নে নিও, মৌরি নিও—এলাচ বাটা যেন
তুমি নিও না, নিও না।

মান। বেশ!

বামী। বেশ কি গা! দুটো পুঁই ডগা দিতে বললে না?

মান। তুই থাম্ বামী! ঐ যে উনি আসছেন—চাদর দিয়ে দে মাথায়।

চপলা। কেন মা মাথায় চাদর দেবে? বাবা তো বাবা হ’য়ে আসছে না, প্রেসিডেণ্ট হ’য়ে আসছে।

মান। আমাকে শেখাচ্ছিস?

[দামোদরবাবু ও তৎপশ্চাৎ এক গাদা চিঠি লইয়া রাজেন্দ্র বাড়রী প্রবেশ করিলেন। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

দামো। স্কুল শেষ হয়েছে?

মান। এই হোল।

দামো। তবে সব বাড়ী যাও! মাষ্টার আর মাষ্টারণীর জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। দু’ পাঁচ দিনেই—

মান। এলেই বাঁচি।

দামো। হুঁ। চেষ্টা করছি। বদনের ইস্কুলে ওরা মাইনে দিচ্ছে-

পঞ্চাশ আর পঞ্চান্ন। আর তোমার ইস্কুলের জন্য দেব একশ আর একশ বিশ। বাজার এমন চড়িয়ে দেব যে এক মানময়ী ইস্কুল ছাড়া আর কেউ মাষ্টার রাখতে পারবে না। কি বল রাজু?

রাজেন। যথার্থ।

মান। মাষ্টার মাষ্টারণী এলে এঁদের সব—(প্রতিবেশিনীদের দেখাইয়া)

দামো। ভর্ত্তি করে দেব। তুমিও পড়বে। বিদ্যের তো বয়স নেই। আর তা ছাড়া গোড়ায় পাকিয়ে না দিলে শেষে সব গরমিল হয়ে যাবে।

চপলা। দেখব মা! তুমি আগে পাশ কর কি, আমি পাশ করি!

রাজেন। (স্বগতঃ) কি তেজস্বিনী নারী!

মান। দ্যাখ্! আমি তোকে পেটে ধরেছি: আমার সঙ্গে—

দামো। আচ্ছা যাও যাও! সব বাড়ী যাও। আমাদের অফিসের কাজ আছে।

[দামোদর ও রাজেন্দ্র ব্যতীত সকলে প্রস্থান করিলেন]

দামো। দ্যাখো রাজু, তোমার মোক্তারী বুদ্ধি আমি বুঝিনে। স্বামী-স্ত্রী গ্র্যাজুয়েট কি পাওয়া যাবে?

রাজেন। অঢেল, অঢেল! যথার্থ আজকাল পথে ঘাটে ফিমেল আর মেল গ্র্যাজুয়েট ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যেবেলায় ধর্ম্মতলা দিয়ে যাবেন, দুই ফুটপাত ভর্ত্তি গ্র্যাজুয়েট। যত গাড়ী চাপা পড়ছে সব যথার্থ গ্র্যাজুয়েট। গ্র্যাজুয়েটের অভাব আছে?

দামো। তবে দরখাস্ত আসছে না কেন?

রাজেন। এই দেখুন না চিঠির বাণ্ডিল। সবই তো দরখাস্ত।

দামো। গ্র্যাজুয়েট স্বামী স্ত্রীর দরখাস্ত কই? মাঝ থেকে এক ফ্যাঁকড়া বের করে চার পাঁচ দিন দেরী ক'রে দিলে! এদিকে বদনের ইস্কুল মেয়েতে ভর্ত্তি হ'য়ে গেল। গ্র্যাজুয়েট না পেলে কাগজে বিজ্ঞাপনও দিতে পাচ্ছিনে। কাল দেখি বদন সরকার তার ইস্কুল এণ্ট্রান্স করবার জন্য দরখাস্তে তার পাড়ার লোকের সই নিচ্ছে। তার মেয়েটা বি, এ পাশ করেছে কিনা, বুকের ছাতি বেড়েছে—আমার চপলাকে যদি—

রাজেন। যথার্থ! তার পেছনে ভালো ক'রে লেগে থাকলে তিন বচ্ছরে ডবল বি, এ, হ'য়ে যাবে। একথা আমি সমস্বরে বলতে পারি।

দামো। বুঝলাম তো! কিন্তু গ্র্যাজুয়েট না পেলে যে হচ্ছে না!

রাজেন। আমার প্র্যাকটিশ না করতে হ'লে—

দামো। তুমি পারবে না, গ্র্যাজুয়েট ছাড়া হবে না। এতদিন তিনচার গণ্ডা গ্র্যাজুয়েট আমদানী হ'ত—তোমার খেয়াল হ'ল স্বামী স্ত্রী।

রাজেন। যুবতী নারীরা পড়বেন কিনা—

দামো। যুবতী নারীরা যুবক মাষ্টারের কাছে বেশী মনোযোগ দিয়ে পড়বে। বুড়ো মাষ্টারকে তো কেয়ারই করবে না।

রাজেন। সে তো যথার্থ। কিন্তু একটা স্ত্রী সঙ্গে থাকলে মাষ্টারের কি জানেন—

দামো। ভালো ছেলে হ'লে সেটা তো এখানেও—না হয় দু' হাজার খরচই করতাম। গাঁয়ে তো সুশ্রী মেয়ের কমতি নেই।

রাজেন। (স্বগতঃ) ওখানেই তো গোল !

দামো। চুপ ক'রে রইলে যে! আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে ! বদন সরকার নাকি বাস করেছে দু'খানা। যত মেয়ে ঝেঁটিয়ে নিয়ে ইস্কুল ভর্ত্তি করছে ! স্বামী-স্ত্রী গ্র্যাজুয়েট হেঁকেই তুমি ডোবালে আমাকে। ও-কি মিলবে ?

রাজেন্দ্র। যথার্থ মিলবে।

দামো। হুঁ ! মিলবে, যখন বদন সরকারের ইস্কুল হবে কলেজ, তার আগে নয়।

[খটমট সিং প্রবেশ করিল]

দামো। কেয়া ?

খট্‌মট্। চিট্‌ঠি হুজুর, সেগরটোরী বাবুকা।

[রাজেন চিঠি লইলেন—খট্‌মট্ সিং সেলাম করিয়া চলিয়া গেল]

দামো। কিসের চিঠি ?

রাজেন। (স্বগত) বয়স আমার চেয়েও কম তবে স্ত্রী আছে, সাহস পাবে না।

দামো। চিঠি কিসের ?

রাজেন। দরখাস্ত। (স্বগত) যদি স্ত্রীর চোখে ধুলো দিয়ে—

দামো। কি মুস্কিল, কার দরখাস্ত ?

রাজেন। গ্র্যাজুয়েট স্বামী-স্ত্রীর দরখাস্ত—

দামো। এ্যাঁ কই দেখি (চিঠি লইয়া) এখুনি জবাব লেখ—এখুনি—

রাজেন। বয়স বড় কম দেখছি।

দামো। ইস্কুলটা ডোবাবে রাজু। বয়স কম ! আমি চাই গ্র্যাজুয়েট —বয়স চাইনে। জবাব লেখ এখনি !

রাজেন। ভাল করে দেখুন আগে !

দামো। দেখেছি। না জবাব নয় একেবারে তার করে দাও—লেখ প্রেসিডেণ্ট ভেরী গ্ল্যাড, কাম অন্। কাম টু-ডে !

রাজেন। কাল—

দামো। এখুনি, এখুনি আজই আনতে হবে—বিকেলের গাড়ীতে এসে

পড়বে। আবার হয়তো বদনের ইস্কুল টেনে নেবে। তার ক'রে দাও। না, সেই সঙ্গে টোলগ্রামে গাড়ীভাড়াও পাঠিয়ে দাও—কি জানি যদি টাকা পয়সা না থাকে। যে দুর্বৎসর—

রাজেন। সে তো যথার্থ! বলুন, কিন্তু—

দামো। আবার কিন্তু, তুমিই ইস্কুলটা ডোবাবে দেখছি রাজু, একেবারে ডোবাবে! (উভয়ের প্রস্থান)

[মানময়ীর প্রবেশ]

মান। কই, উনি কোথায় গেলেন? আমি আর পারব না কিন্তু। দুপুরবেলা পা' ছড়িয়ে একটু বসতে পাইনে—ইস্কুল, ইস্কুল! কি সব ছোটলোকের মত রেষারেষি! আচ্ছা, করছে না হয় বদন সরকার ইস্কুল,—তোমাকে রাখেনি? বেশ! ঘরে এসে বসে, খাও দাও, কাজ কর্ম দ্যাখো—ফুরিয়ে গেল। এ কি! দিন নেই, রাত নেই ইস্কুল! ইস্কুল! পয়সা যাচ্ছে যাক্‌গে, কিন্তু দেহটা যে আধখানা করে ফেললেন!

[চপলার প্রবেশ]

চপলা। মা ডাকছিলে?

মান। না।

চপলা। মুখ গোঁজ ক'রে আছ যে মা! আজ বুঝি তোমার সেলায়ের ক্লাশ?

মান। বিড় বিড় করিস্‌নে চপল! ভাল লাগছে না বলছি।

চপলা। ভাল লাগছে না, ছুটি নাও—প্রেসিডেণ্ট তো ঘরের লোক।

মান। যা মুখে আসে তাই বলছিস চপল!

চপলা। বাঃ তুমিই তো বাবাকে বল ঘরের লোক! এই তোমাকে খেতে বললুম, তুমি বললে ঘরের লোকটা খায়নি।

মান। যা আমি বলব, তুইও তাই বলবি। হতভাগী!

চপলা। বকছ! বেশ বাবাকে বলে দিচ্ছি— (প্রস্থান)

মান। উনিই মেয়ের মাথাটা খেলেন! ষাট ষাট! বালাই! মাথা খাবেন কেন? নষ্ট করলেন মেয়েটাকে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে—তারপর ওই রাজু ছোঁড়াটা! কিছু যদি বলেছি মেয়েকে, অমনি মুখ কালো ক'রে বলে, মাসীমা কিছু বলবেন না। বলব না! একশ' বার বলব! কাল তরকারী কুটতে হাতখানা দুটুক্‌রো ক'রে ফেললে। রাতে ভয়ে আমার ঘুম হোলো না—আজ মাথাটা টন্‌টন্‌ করছে! বামীকে বললাম একটু তেল দিয়ে দিতে, সে যে সেই পুকুরে দাঁত মাজতে গেল, গেল তো গেলই। বুঝি কানাইয়ের মা'র সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসে আছে। জ্বলে মলাম এদের জন্যে!

[রাজেন্দ্র বাড়রীর প্রবেশ]

রাজেন্দ্র। চপ—কর্তা কোথায় মাসীমা ?

মান। দেখছিনে তো, কোথায় বা গেছেন।

রাজেন্দ্র। মাষ্টারের জন্যে যথার্থ ষ্টেশনে গিয়ে ব'সে নেই তো ?

মান। জানিনে, নায়েববাবুকে জিজ্ঞেস কর দেখি।

রাজেন্দ্র। ওঁর এক কি যথার্থ বাতিক হ'য়েছে—গ্র্যাজুয়েট মাষ্টার মাষ্টারণী নইলে—

মান। সে কথা তো ঠিকই রাজু। মানী লোক, তাঁর কেমন লাগছে বল দেখি। ঠাকুরের অন্ন খেয়ে মানুষ খোদন সরকার, তারই ছেলে বদন সরকার দুটো পেঁয়াজ-বেচা পয়সার দেমাকে ওঁকে বলে কিনা, ওসব ইস্কুল চালানো গেঁয়ো লোকের কর্ম নয়। উনি যা করছেন ভালই করছেন, ঠাকুরের ছেলের মতই কাজ করছেন। ঠাকুর একবার বদরতলার হাটে গিয়েছিলেন—একটা কাতলা-মাছের দর বলেছিলেন সাত সিকে। ন' সিকে দয়ে সেই মাছ বদরতলার জমিদারবাবুর ছোট ছেলে তুলে নিয়ে গেল। পরদিনই ঠাকুর এসে বাবলাহাটির হাট বসালেন—সে পনেরো ষোল বছরের কথা—চপল তখনও হয়নি। সে কি ধুমধাম! ছেলে যদি বাপের মত না হয় তবে তার না জন্মানোই ভাল!

রাজেন। যথার্থ সেইজন্যে আমিও তো মামলা মোকদ্দমা ছেড়ে ইস্কুল নিয়ে লেগে পড়েছি। দেখি—

মান। হ্যাঁ তোমরা দশজনে দ্যাখো বাপু, বুড়োর মান যাতে থাকে। বিয়ের সময় আশীর্বাদী যা পেয়েছিলাম সব সিন্ধুকে তোলা আছে। তাই দিয়ে আমি তিন মহলা ইস্কুলবাড়ী করে দেব। ওঁর বড় মুখ যেন ছোট না হয়।

রাজেন। যথার্থ দেখব মাসীমা, আমার কব্জীর রক্ত দিয়েও যদি—

মান। তাই কর বাছা, তাই কর।

[তেলের বাটি লইয়া বামীব প্রবেশ]

এত দেরী হ'ল কেন বামী ? আমাকে তোরা দশজনে পাগল না ক'রে ছাড়বিনি ?

বামী। দুটো পান্তা খেয়ে নিলুম, আমাকে আবার বঁটি কাটারী নিয়ে তো ইস্কুলে ছুটতে হবে। আজ আবার আমার কচুর শাক রাঁধার পড়া আছে।

মান। তাই তো, দে তবে তাড়াতাড়ি একটু মাখিয়ে দে—

(বামীর সহিত প্রস্থান)

[চপলার প্রবেশ]

চপলা। রাজুদা ? মা চলে গেছে ?

রাজেন। চপল !

চপলা। হ্যাঁ, আমি।

রাজেন। মাসীমাকে খুঁজছ ?

চপলা। বললুম তো।

রাজেন। ভাল ক'রে শুনিনি, আচ্ছা বলছি।

চপলা। মা চ'লে গেছে কিনা এইটুকু তো বলবেন, তার জন্যে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখছেন কেন ?

রাজেন। যথার্থ ! কিন্তু বড় মনোযন্ত্রণা দিলে চপল !

চপলা। যন্ত্রণা আমি দিলুম কি ক'রে ? যাক্‌গে—আপনার সঙ্গে দেখা হোলেই কেবল আপনার যন্ত্রণা হয়, আর কথাই কইব না।

রাজেন। তা বলছিনে, তা বলছিনে চপল। তুমি দাঁড়াও আর যন্ত্রণা বলব না। একটুখানি দাঁড়িয়ে যাও। কি জিজ্ঞেস কচ্ছিলে ?

চপলা। বাঃ রে ! ঐ তো বললুম, মা কি চ'লে গেছে ?

রাজেন। কোথায় ?

চপলা। যমের বাড়ী ! পারিনে মিছিমিছি কথা কইতে—(প্রস্থানোদ্যম ও ফিরিয়া) হ্যাঁ রাজুদা, গ্র্যাজুয়েট কাকে বলে ?

রাজেন। উঃ। গ্র্যাজুয়েট না হ'য়ে সমস্ত জীবন জর্জরিত হ'য়ে গেল।

চপলা। বললেন না ? আপনার কাছে জিজ্ঞেস করলে কোন কথার জবাব পাইনে। শুধু 'দাঁড়াও', 'শোন', 'একটুখানি'—

রাজেন। এইবার যথার্থ বলছি। গ্র্যাজুয়েট মানে এণ্ট্রেন্স পাশ ক'রে ভয়ে মোক্তারী পরীক্ষা না দিয়ে যারা বরাবর এল-এ আর বি-এ পাশ ক'রে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়—তারাই গ্র্যাজুয়েট।

চপলা। রাস্তায় ঘোরে কেন ?

রাজেন। পয়সা কড়ি না থাকলে যথার্থ আর কি করবে ?

চপলা। তবে বাবা গ্র্যাজুয়েট আনছেন কেন ?

রাজেন। কেন ? কেন ? কেন তা' বলব'খন।

চপলা। একটা কথাও সোজা ক'রে বলতে পারেন না। ঐ জন্যেই তো ভাল লাগে না আমার। (প্রস্থান)

রাজেন। উঃ গ্র্যাজুয়েট না হ'লে জীবনে যথার্থ শান্তি নেই। গ্র্যাজুয়েট হ'লে কি কথা ছিল আজ। ইয়া বুকের ছাতি ফুলিয়ে বলতে পারতাম, চপলাকে আমি চাই—

[দামোদর চৌধুরী প্রবেশ করিলেন]

দামো। ও কি করছ রাজু !

রাজেন। (চমকিত হইয়া) একটু ব্রীদিং একসারসাইজ করছিলাম—

দামো। ওসব এখন থাক্। স্থির হয়ে বোস। টেলিগ্রাম পেয়েছি—আসছেন। ইস্টিশানে গাড়ী পাঠিয়েছি—তাঁরা এলেন বলে। আচ্ছা ইস্টিশান কতদূর হবে রাজু?

রাজেন। প্রায় চার মাইল।

দামো। কখনও নয়। দু' মাইল। দু' মাইলের বেশী তো নয়ই। লোক্যালে আসবে তার করেছে। লোক্যাল তো চারটেয় এসে গিয়েছে—আসবার সময় হ'ল। হুঁ, ওই যে গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি। স্থির হ'য়ে বোস। খুব সমঝে উত্তর দেবে। আবার ইস্কুল ভাল নয় বলে পালিয়ে না যায়।

রাজেন। আপনি কেন যথার্থ ও-রকম ভয় করছেন।

দামো। সাবধানের বিনাশ নেই। (খট্মট্ সিং প্রবেশ করিয়া সেলাম করিল) আয়া?

খট্। জী হুজুর আয়া।

দামো। কাঁহা?

খট্। গাড়ীমে বৈঠা হ্যায়।

দামো। ভদ্রতা জান্‌তা নেই—চল, হামরা সাথ। (প্রস্থানোদ্যম)

রাজেন। আপনি কেন যাচ্ছেন, যথার্থ, আপনি প্রেসিডেন্ট!

দামো। প্রেসিডেন্টের বুঝি ভদ্রলোক হ'তে নেই? তুমিই ইস্কুলটা ডোবাবে রাজু! (খট্মট্ সিং সহ প্রস্থান)

রাজেন। আমি তো ইস্কুল ডোবাব না যথার্থ, এই ইস্কুলই আমাকে ডোবাবে! কি করব? যতদিন চপলা পড়বে ততদিন সেক্রেটারী থাকবই। তারপর যা হয় হবে।

[আগে দামোদর চৌধুরী, তৎপশ্চাৎ নীহারিকা, সর্ব্বপশ্চাতে মানস প্রবেশ করিলেন]

দামো। এই যে রাজু। এঁরা এলেন। ইনি হ'চ্ছেন আমাদের সেক্রেটারী—বাবু—

রাজেন। রাজেন্দ্রলাল বাড়রী, মুকটিয়ার ইন দি কোর্ট অফ হিজ অনার দি সাব্ ডিভিশ্যনাল অফিসার অফ বদরতলা—রেভিনিউ পাশ!

মানস। নমস্কার।

দামো। বসুন আপনারা। আপনি বসুন না, লক্ষ্মী—। আচ্ছা রাজু তুমি যাও তো এঁদের চাকরটা আছে দাঁড়িয়ে—তাকে সঙ্গে নিয়ে আমার নদীর ধারের বাগানবাড়ীটাতে জিনিসপত্তর—এঁদের সব—বুঝলে? (নীহারিকার প্রতি) আপনি একটুখানি বসুন। আপনি—চলুন ইস্কুলটা দেখিয়ে আনি একবার। (মানসের সহিত প্রস্থান)

রাজেন। (স্বগত) চপলার মত অত ফর্সা নয়। কিন্তু চোখ দুটো—

নীহা। (স্বগত) কি মানুষরে বাপু। কট্‌মট্‌ ক'রে চাইছে—

রাজেন। (স্বগত) ঘাড়ের উপর খোঁপাটা যথার্থ দুলছে কি চমৎকার!

নীহা। (স্বগত) ভালো জ্বালা তো দেখছি। ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে কি আবার। (প্রকাশ্যে) আপনি সেক্রেটারী বুঝি?

রাজেন। যথার্থ। নমস্কার।

নীহা। কতদিনের স্কুল?

রাজেন। ইচ্ছে অনেকদিনেরই ছিল, যথার্থ খোলা হয়েছে দু'মাস।

নীহা। মেয়ে ক'টি?

রাজেন। একত্রিশ, তবে দয়া ক'রে থাকেন যদি, তবে দু'মাসে একষট্টি হ'বার আশা আছে। চারপাশের গ্রামের লোক শুধু—ঐ ওঁরা আসছেন—আমি চললুম তাহ'লে আপনাদের বাড়ীটা যথার্থ পরিষ্কার ক'রে দিইগে।

(দ্রুত প্রস্থান)

[দামোদর চৌধুরী ও মানসের প্রবেশ]

মানস। সেইদিন থেকে বুঝি?

দামো। হ্যাঁ। সেই থেকে বদনের ইস্কুলের কমিটির কাজে ইস্তফা দিলাম। বাড়ীতে ফিরে এসেই গিন্নির নামে করলাম ইস্কুল। বদনও দেখাদেখি—তার মা বিন্দুবাসিনীর নাম পাল্‌টে দিয়ে তার স্ত্রী ক্ষীরোদা-সুন্দরীর নামে ইস্কুল করলে। শুনছি সেটা জোর চলছে! চলুক, ক'দিন চলে দেখি! এই জন্যেই তোমাকে—আপনাকে আনা—

মানস। আপনি আমাকে 'তুমি'ই বলবেন, আমার দাদামশায়ের নামও ছিল দামোদর।

দামো। বটে! বটে! গিন্নি বলেন এ নাম কি পচা, সেকেলে, কেউ রাখে না। এখন আসুন, শুনে যান।

মানস। হ্যাঁ, তারপর?

দামো। তারপর এই ইস্কুল আর কি? শুনলাম বদন একটা গ্র্যাজুয়েট রেখেছে। আমি আনলাম একজোড়া। হেঁ। হেঁ। একেবারে লক্ষ্মীনারায়ণ! (নীহারিকা মুখ ফিরাইলেন)

[মানময়ীর প্রবেশ]

মান। ওগো শুনছ—ওমা! (প্রস্থানোদ্যত)

দামো। আরে যাচ্ছ কোথায় গিন্নি! একজোড়া গ্র্যাজুয়েট—টাট্‌কা তাজা কর্ত্তা-গিন্নি গ্র্যাজুয়েট—এই তোমার মাষ্টার-মাষ্টারণী! আরে যেও না লজ্জা নেই। সম্পর্ক শুধ পাতানো হ'য়েছে—নাতী-ঠাকুর্দ্দা। নাৎ-বৌয়ের সঙ্গে একটু আলাপ কর। (নীহারিকা হাঁচিলেন)

মান। খোকা-খুকুরা আসেনি ? (নীহারিকা রুমালে চোখ মুছিলেন)

মান। আহা! ভগবান রাখেননি বুঝি !

মানস। না, কেবল সেদিন—

নীহা। ছিঃ! ছিঃ!

দামো। ছিঃ ছিঃ! কেন ভাই! আমাদের যখন বিয়ে হ'ল—আমার বয়স বারো আর ওঁর সাত—আমাকে দেখলেই গলা জড়িয়ে ধরতেন।

মান। কি যে বল—লজ্জা কচ্ছে না!

দামো। চুরিও করিনি ডাকাতিও করিনি যে লজ্জা করবে। এদের দেখে পুরানো কথা আরো বেশী করে মনে পড়ছে গিন্নি! এরা এখন তোমাদের ইস্কুলের বরাতে টিকে থাকে তবে তো হয়।

মানস। আপনার ইস্কুলের জন্য আমরা প্রাণপণ করব—

মান। কর্ত্তার বড় মুখ যেন ছোট না হয় দেখো ভাই! ওঁর বড় সাধের ইস্কুল। বড় দাগা পেয়ে—

দামো। আর বোলো না গিন্নি! তোমার মুখে ও-কথাগুলো শুনলেই আমার চোখে জল আসে। তুমি বরং বোনটিকে সঙ্গে করে ওঁদের বাড়ীতে নিয়ে যাও। ওঁদের আবার সংসার পাততে হবে।

(নীহারিকা মুখ ফিরাইলেন)

মান। তুমি মুখ ফেরালে কেন ? লজ্জা করছে বুঝি ? লেখাপড়া শিখলে লজ্জা-সরম এম্নি হয়—দেখাও তোমার মেয়েকে ডেকে! এসো বোন (চিবুক ধরিয়া) একি ? তোমার চোখে জল কেন ?

মানস। (স্বগত) এই রে ছিচকাঁদুনি সেরেছে! (প্রকাশ্যে) ওর চোখের কি জানেন একটা ব্যামো আছে! মাঝে মাঝে জল আসে, সেই সঙ্গে নাকের ডগাও কুঁচকে যায়।

দামো। বেশী প'ড়ে প'ড়ে হ'য়েছে আর কি। ভয় নেই আমি সহর থেকে ডাক্তার এনে দেখাব। দু'দিনে সেরে যাবে।

মান। যত্ন আত্তি করবার লোক নেই তাই! সধবা মানুষ, কপালটা একেবারে খাঁ খাঁ করছে। একটা সিঁদুর ফোঁটা কেউ দিয়ে দ্যায়নি, হায়রে কপাল! ওলো বামী! ও বামী!

নীহা। আমার মাথাটা বড় টন্ টন্ করছে। স্নান করব এখন।

মান। আচ্ছা এসো তবে—

মানস। না! না! আপনার কষ্ট করবার দরকার নেই! আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

দামো। দ্যাখো গিন্নী! দেখছ—

মান। তুমি দেখে শেখো! সেদিন খাজনা আদায় করতে গিয়ে পনেরো দিন কাটিয়ে এলে—তোমারই শেখা দরকার। (প্রস্থান)

দামো। কি পনেরো দিন ! মিছে কথা বোলো না। দাঁড়াও দাঁড়াও, পনেরো দিন বললে যে ? ন' দিন নয় ? চালাকী। (মানময়ীর পশ্চাদ্ধাবন)

নীহা। আমি পারব না মিণ্টার মুখার্জী, পরেব গাড়ীতেই যাতে—

মানস। সর্বনাশ ডেকে আনবেন না মিস গাঙ্গুলী। অনেকদূর এগিয়েছি—পা ফসকালেই একেবারে—

নীহা ! তা'হোক। কি সব উৎপাত ! এতো কিসের ? চোখের জল, সিঁদুরের ফোঁটা কি এ সব ? এতো সইতে পারব না, এ আমি ব'লে দিচ্ছি !

মানস। চুপ করুন। চুপ করুন। বুড়ে আসছে আবার।

[দামোদবেব প্রবেশ]

দামো। হাঃ হাঃ শুনছ মাষ্টার, গিন্নি বললেন তোমার কাছে নাকি ভালবাসা শিখতে হবে আমার।

মানস। তা বেশ প্রাইভেট পডবেন।

দামো। বাঃ বেশ বলেছ। বেশ বলেছ। দিদিমণির আবাব পড়া বন্ধ না হয়। হাঃ হাঃ। এসো। (অগ্রসব হইলেন)

নীহা। উঃ। হাতে তুলে ছাই খেয়েছি।

সকলেব প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[মানসেব বাসাবাড়ীব বাহিবেব ঘব। এক কোণে একটি অর্গ্যান। নীহাবিকা উত্তেজিত হইযা প্রবেশ কবিলেন]

নীহা। নাঃ, অতো আমি পারব না। জোর ক'রে আলতা পরানো, কপালে সিঁদুর দেওয়া, অতো সইবে না আমার। আমার সম্পর্ক ইস্কুলের সঙ্গে। দশটায় যাব—চারটেয় ফিরব। তা নয় প্রেসিডেণ্টের স্ত্রী, সেক্রেটারীর মা তাঁদের সঙ্গে গোলকধাম খেলা, ঘর-সংসারের কথা বলা ! তাও না হয় সয়, কিন্তু দিনের মধ্যে দশবার নাৎ-বৌ। নাৎ-বৌ। কি সব বিশ্রী অসভ্য কথা ! উঃ, এই দশটা দিন কেমন ক'রে কাটাচ্চি জানেন ভার্জিন মেরী। আর দিন কুড়ি কোনমতে—

[হারাধনের তান ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রবেশ]

হারু। ভজ মন নন্দ ঘোষের নন্দনে !

নীহা। আর এক যন্ত্রণা—দ্যাখো হারু—

হারু। গিন্নি-মা !

নীহা। আবার গিন্নি-মা! বলিনি তোমাকে যে গিন্নি-মা বোলো না।

হারু। তবে কি বলব?

নীহা। কি বলবে? বলবে মিস—মিসি বাবা। আবার যদি কখনও গিন্নি-মা বলবে তাহ'লে চাকুরী থাকবে না।

হারু। (স্বগত) হুঁ। চাকরী থাকবে না! বোকা সেজে ব'সে আছি ব'লে কিছু বুঝিনে বুঝি? এমন প্যাঁচ খেলব একদিন বুঝতে পারবেন মজাটা— (প্রস্থানোদ্যম)

নীহা। আর শোন।

হারু। বলুন।

নীহা। এ গান গাইতে পারবে না—নন্দ ঘোষের নন্দনে, চলবে না এখানে বুঝলে?

হারু। আমি যে টপ্পা জানিনে।

নীহা। টপ্পা নয়। গাইবে—মেরী মাতার নন্দনে—ভজ মন মেরী মাতার নন্দনে।

হারু। আজ্ঞে তা বেশ। ভজ মন মেরী মাতার নন্দনে—

[তান ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রস্থান]

নীহা। আলতা, সিঁদুর, নন্দ ঘোষ, সব মিলে একেবারে হিঁদু বানিয়ে ছাড়লে! কাল আবার উনি—মানসবাবু বলছিলেন যে পাঁউরুটি খাওয়া আর হবে না, তার বদলে লুচি—আজ পাঁউরুটি না আনলে কালই আমি ইস্তফা দেব। অত হিঁদুয়ানী সইবে না আমার।

[খাতা লইয়া চপলার প্রবেশ]

চপলা। টিচার মাসী?

নীহা। আবার মাসী বল কেন বার বার চপল? আজকাল ওসব কেউ বলে না, শুধু টিচার বোলো।

চপলা। মা যে বকে তাহ'লে!

নীহা। মা বড়, না টিচার বড়? আমি যা বলি তাই শুনবে।

চপলা। আচ্ছা, মার সামনে মাসী বলে আপনার সামনে শুধু টিচার বললে হয় না?

নীহা। তোমার মার সামনে যা খুসী বোলো আমার কানে না এলেই হোলো।

চপলা। বেশ। এইবার সেই গানটা একটু দেখিয়ে দিন।

নীহা। আচ্ছা বোস। (চপলা টেবল হার্মোনিয়ামের সম্মুখে বসিল)

মেঘনগরের অন্ধকারা—মেঘনগরের অন্ধকারা—

বুঝলে?

চপলা। পুরোপুরি গেয়ে দিন না! আমি সঙ্গে সঙ্গে শিখে নিই।
নীহা। আচ্ছা।

গীত

মেঘনগরের অন্ধকারা—
কোন রূপসী কাঁদছে বসি অঝোর-ঝরণ অশ্রুধারা।
আজি শাঙন দিনের ভরা গাঙের উছল বারি
সে কি আনছে বহি গগন হ'তে রোদন তারি,
আজি ঝাউবন যে হাহাশ্বাসে কাঁপছে পাতা
কদম তরু মর্ম্মরিয়া খুঁড়ছে মাথা
কদম তরু মর্ম্মরিয়া খুঁড়ছে মাথা পাগলপারা।
হায় অরূপা তোমার বেদন জগৎ মাঝে
আজি উঠলো ফুটে কতই রূপে কতই সাজে,
হোথা নীপের কেশর কেয়ার পরাগ পড়ছে ঝুরে
কবির বীণায় গান বেজেছে ব্যথার সুরে
কবির বীণায় গান বেজেছে ব্যথার সুরে ছন্দহারা

চপলা। আচ্ছা সুরটা কি?
নীহা। শুনে লাভ নেই। তুমি শুধু গলা সাধো। শুধু বাড়ী ব'সে খুব ভোরে ঘরে দরজা বন্ধ করে সারিগম করবে।
চপলা। খুব ভোরে?
নীহা। তাতে কি হ'ল?
চপলা। ভোর হ'লেই যে খিদে পায় আমার!
নীহা। তবে খেয়ে নিয়েই করবে।
চপলা। খেলেই আমার ঘুম পায় যে!
নীহা। তবে তো মুস্কিল। কিন্তু সারিগম সাধা না হ'লে গান তো ঠিক হবে না।
চপলা। তবে সন্ধ্যেবেলা এখানে নদীর ধারে ছোট্ট হার্মোনিয়মটি নিয়ে পা' ছড়িয়ে ব'সে—
নীহা। এ সব খেয়াল কোথেকে হ'ল তোমার?
চপলা। একটা বইতে পড়েছি—আমার বয়সী একটা মেয়ে এলোচুলে পা' ছড়িয়ে বসে নদীর ধারে—
নীহা। থাক্! ও সব বই আর প'ড়ো না।
চপলা। রাজুদা যে পড়তে দিলে?
নীহা। কে? রাজুদা? রাজেনবাবু—সেক্রেটারী?
চপলা। হ্যাঁ, বললে খুব ভাল ক'রে পড়।

নীহা। হুঁ! বুঝেছি! বইটা এনে দিও তো একবার। ভাল শিক্ষা দিচ্ছেন দেখছি!

[মানসের প্রবেশ]

মানস। কে গাইছিল মিস—মিস চপলা দেখছি যে! তুমি কতক্ষণ?

চপলা। একটা গান শিখতে এসেছিলুম।

মানস। শেখা হয়েছে?

চপলা। বাড়ী গিয়ে ঠিক করব, এখন দেখিয়ে নিলুম। (নীহারিকাকে নমস্কার করিয়া) যাই তবে—

মানস। তুমি তোমার বাবাকে বলবে আমি বিকেলের দিকে যাব—উনিও যাবেন।

চপলা। আচ্ছা। (প্রস্থান)

নীহা। আমি কিছুতেই যাব না। আমি যাব এ কথা কেন বললেন আপনি?

মানস। গেলে দোষ কি?

নীহা। জানেন না আপনি! গেলেই মাথায় আউন্স খানেক সিঁদুর, পায়ে আধ বোতল আলতা মেখে সং সাজতে হয়! তারপর গিন্নি যে সব নাম ধ'রে ডাকেন তা মুখে আনতেও লজ্জা করে আমার! পেটের দায়ে আপনার কথায় রাজী হ'য়ে এখন আমার প্রাণ যায়। কোন রকমে দিন কুড়ি কাটাতে পারলে বাঁচি। এ সব শুধু আপনার জন্যে—

মানস। রোজই আমাকে দুষছেন কেন? আমি কি করলাম বলুন তো?

নীহা। আপনিই সব করছেন। গোড়া থেকে এসেই দাদামশাই দিদিমা পাতিয়ে নিলেন—এখন আমায় নিয়ে টানাটানি।

মানস। একটু স'য়ে থাকুন মিস গাঙ্গুলী—সব স'য়ে যাবে। টাকা পেলে মানুষ পুত্রশোক ভুলে যায়। এক মাসের মাইনে যখন ক্যাসবাক্সে উঠবে তখন আর এসব কিছু মনে থাকবে না। বরং—

নীহা। মানের চেয়ে টাকা বড় নয়। আমার মত হোত আপনার, বুঝতেই—

মানস। এ আপনার inferiority complex! আপনি জানেন যে আপনি আমার—মানে আমার সঙ্গে আপনার সে সম্বন্ধ নয় তবু কেউ যদি সে কথা বলে অমনি আপনি চটে যান! কেন বলুন তো?

নীহা। মেয়েমানুষ হ'য়ে জন্মালে, কথাগুলো কেমন লাগে বুঝতে পারতেন। (বেগে প্রস্থান)

মানস। হুঁ! মেয়েমানুষ হ'য়ে জন্মালে! মেয়েমানুষেরই মান আছে, পুরুষের নেই! আমার স্ত্রী পরিচয়ে ওঁর মানের হানি হচ্ছে, আর

আমি যে ওঁর স্বামী সেজে ব'সে আছি, তাতে আমার পিতৃপুরুষ উদ্ধার হচ্ছেন। কিন্তু কোন্ দিন সব ফাঁস হ'য়ে যাবে দেখছি।

[গান গাহিতে গাহিতে হারুর প্রবেশ]

হারু। ভজ মন মেরী মাতার নন্দনে—

মানস। এই মেরী মাতার নন্দনে! এ গান কোথায় শিখলে যাদুমণি?

হারু। (হাসিয়া) মিসি বাবা শিখিয়েছেন।

মানস। মিসি বাবা!

হারু। গিন্নী-মা—

মানস। তোমার গিন্নী-মার মুণ্ডু! চাকরীটা আর রাখতে দিলে না দেখেছি! আবার যদি এ গান গাইবি তা হ'লে মাথা ভেঙ্গে দেব। (প্রস্থান)

হারু। হুঁ! হুঁ! সব বুঝি, সব বুঝি! কে কার মাথা ভাঙে দেখব—জাল টানব যখন, চিংড়ি, পুঁটি, কৈ, সব উঠে আসবে ডাঙায়—

[নীহারিকার প্রবেশ]

নীহা। একটু শক্তই বলা হ'য়েছে। ওঁর কি দোষ? বাস্তবিকই তো ওঁর কোন দোষ নেই। মিণ্টার মুখার্জ্জী—মিণ্টার—

[মানসের প্রবেশ]

মানস। ডাকছেন?

নীহা। দেখুন—

মানস। আর কিছু বলবেন না! আপনার অসুবিধে হচ্ছে সমস্তই আমি বুঝছি!

নীহা। আমি সে কথা বলছিনে।

মানস। নতুন আর কি বলবেন? কিন্তু একটি কাজ করবেন না। নিতান্ত দুঃসময়ে একটা আশ্রয় যখন পাওয়া গেছে তখন সেটাকে হারানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আপনি যা করছেন তাতে আর এক মাসও অপেক্ষা করতে হবে না দেখছি।

নীহা। (রাগিয়া) কি করছি আমি?

মানস! হারুকে যীশুর গান শিখিয়েছেন। হঠাৎ যদি বুড়োর কানে যায়—

নীহা। (উত্তেজিত স্বরে) কেন যীশুর গান শেখাব না? দিনরাত নন্দ ঘোষের নন্দন শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হ'য়ে গেল আমার! আপনারা আমাকে হিঁদু করতে চান নাকি? আলতা, সিঁদুর, নন্দ ঘোষের গান, পাঁউরুটির বদলে লুচি—সে রকম মতলব থাকলে আগে থাকতে বলুন!

মানস। আপনি আমাকে অপমান করছেন! যা খুসী করবেন

আপনি, শুধু যীশুর গান কেন, স্বচ্ছন্দে আপনি বাড়ীতে Salvation Armyর হেড্ কোয়ার্টার খুলে দিতে পারেন, আমি তার মধ্যে নেই। যা' হবার হোক্! (প্রস্থান)

নীহা। (নিস্তব্ধ থাকিয়া) দোষ আমারি। কি বলতে কি ব'লে ফেললুম। হাজার হোক্ ভদ্রলোক তো।

নেপথ্যে দামোদর। কই কর্তা-গিন্নী কোথায়?

নীহা। ঐ আবার! ছিঃ ছিঃ! বিষ খেয়ে মরতে ইচ্ছে করছে আমার! (প্রস্থান)

[ফ্যাটফাইল বগলে রাজেন প্রবেশ করিলেন]

রাজেন। অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়। যথার্থ মোক্তার না ষাঁড়ের গোবর। ঘুঁটে ছাড়া কোন কাজেই লাগে না। সেক্রেটারী হয়েছি সেক্রেটারীতেই শেষ হব! চপলাকেও শেষে গ্র্যাজুয়েটে পেয়েছে! সে আর কথাই কয় না। যা এঁচেছিলাম, যথার্থ দেখছি তাই হ'ল। বুড়োকে বললাম—বলুল, মাষ্টার লোক ভাল। বুড়ী বলে, মাষ্টারের মত মানুষ হয় না। নিজের যথার্থ স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে যে আর একজনের ভালবাসার—ইয়ে—ইয়ে—র উপর যথার্থ চোখ দ্যায় সে মানুষ? আর চপলাও এতখানি যথার্থ সহৃদয় তা জানতে পারিনি! কেবল ইস্কুল আর মাষ্টারের বাড়ী! আমাদের বাড়ীমুখো হয় না। নারকেলের নাড়ু আর ভালো লাগে না তার। মা ডাকলে বলে, গান শিখতে যাচ্ছি। গান শিখেই যথার্থ দেশ উচ্ছন্ন গেল, আবার সেই গান! যাও—চপলা, গান শেখ, কিন্তু জানবে রাজেন বাড়রী যদি প্রকৃত তোমাকে যথার্থ ভালবেসে থাকে, তবে তার প্রতিফল তোমাকে পেতেই হবে! আর তুমিও মনে রেখ মানস মাষ্টার, আমি যথার্থ যদি রাজেন মোক্তার হই, তবে পিনাল কোডের একধারায় তোমাকে ফেলবই ফেলব। চপলাকে নিতে তুমি পারবে না। প্র্যাক্‌টিশ বন্ধ করে এখানে পাহারা দেব তবু—

[দামোদরের প্রবেশ]

দামো। কি রাজু গালাগাল দিচ্ছ কাকে? এঁরা কই?

রাজেন। এই দেখুন না ফাইলটা বলেছি যথার্থ দিতে সকালবেলা—

দামো। যাক্‌গে সে সব কথা। দেখছ তো?

রাজেন। বলুন।

দামো। দ্যাখো, চোখ থাকলেই দেখতে পাবে।

রাজেন। বলুন যথার্থ—

দামো। দেখেছ তো গ্র্যাজুয়েটের হাতে পড়লে কি রকম অবস্থাটা হয়?

রাজেন। হুঁ। ইস্কুল—

দামো। শুধু হুঁ বললেগ? চেয়ার, টেবিল, আলমারী, বেঞ্চ কেমন ঝকঝকে ফিটফাট। ঠিক দশটার সময় মেয়েরা ইস্কুলে আসছে। আচ্ছা, আজ ক'জন ভর্তি হ'ল নতুন?

রাজেন। হ'য়েছে একরকম জনকয়েক—

দামো। জনকয়েক! জনকয়েক কি রাজু? তুমিই ডোবাবে ইস্কুলটা! এগারো জন নয়?

রাজেন। সে আর যথার্থ বেশী কি?

দামো। বেশী নয়? একত্রিশ থেকে দশদিনে তেষট্টি জন মেয়ে হ'ল, বেশী না? বদনের ইস্কুলে এখনও পঞ্চান্ন হয়নি। তোমার মোক্তারী বুদ্ধি বুঝিনে রাজু!

রাজেন। যথার্থ বুঝবেন—

দামো। তারপর হাঁ শোন, মাষ্টারের সঙ্গে গোপনে কথাটথা হয়েছে? টিঁকবে তো?

রাজেন। টিঁকবে না আবার! যথার্থ যাবে কোথায় বেটা—

দামো। বেটা!

রাজেন। এই—বেটা বদন সরকার! যথার্থ তাক লাগিয়ে দেব একেবারে।

দামো। তাই বল! হ্যাঁ তারপর মাষ্টার বলে কি, কেমন লাগছে এ জায়গা?

রাজেন। ভালো লাগতেই হবে। যথার্থ যতদিন—না দেখুন আমি ফাইলটা দেখিগে একটু—যথার্থ শরীরটা আজ ভাল নেই। (প্রস্থান)

দামো। রাজুর কি হয়েছে যেন? ওকে আর আটকে রাখব না,— পসার নষ্ট হবে।

[নীহারিকার প্রবেশ]

দামো। আরে এস নাৎ-বৌ! একা যে? তোমার তিনি কোথায়?

নীহা। (স্বগত) অসভ্য! (প্রকাশ্যে) এলুম একটা কথা জিজ্ঞেস করতে।

দামো। বেশ,—গোপনীয়?

নীহা। না, এমন গোপনীয় নয়।

দামো। তুমি সর্বনাশ করবে আমার নাৎ-বৌ। ভেবেছিলাম কথাটা গোপনীয় হবে, একটু মিষ্টি মিষ্টি—

নীহা। দেখুন ও-রকম করে বলবেন না, লজ্জা করে আমার।

দামো। করবে না! লজ্জা স্ত্রীলোকের অলংকার! যার গয়না নেই লজ্জায় সে সাত হাত ঘোমটা দ্যায়। বল।

নীহা। আমাকে দিন কয়েকের ছুটি দেবেন ?

দামো। ছুটি !

নীহা। আজ্ঞে আমাকে একবার কলকাতা যেতে হবে।

দামো। তুমি ছুটি নিলে—ইস্কুলটা চলবে না তো ভাই !

নীহা। মিষ্টার—হেডমাষ্টার থাকবেন।

দামো। মিষ্টার হেডমাষ্টার, তুমি ছাড়া কিছু নন নাৎ-বৌ। শক্তি ছাড়া শিব, হাকিম ছাড়া আদালত, আর স্ত্রী ছাড়া স্বামী,—সমান। আজ তুমি ছুটি নাও, কাল তোমার হেডমাষ্টার মিষ্টারের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করবে, পায়ে বাত হবে, মুখে ঘি রুচবে না, অন্ধকারে বিছানা হাতড়াতে হাতড়াতে—

নীহা। ছিঃ ছিঃ।

দামো। ছিঃ ছিঃ নয়, সত্যি কথা। আচ্ছা উনি আসছেন, জিজ্ঞেস কর—

[মানময়ীর প্রবেশ]

মান। কি জিজ্ঞেস করবে ?

দামো। আচ্ছা বলোত গিন্নী। একদিন তুমি রায়বাড়ীতে রাত্রে যাত্রা শুনতে গেছলে, আমি পাশা খেলে এসে তোমার বিছানা হাতড়াতে হাতড়াতে—

মান। হ্যাঁ, আমার বেরালটার গলা চেপে ধরেছিলে আর সে তোমাকে কামড়ে দিয়েছিল। তার পরদিন মিছি মিছি তুমি ঠাকরুণের কাছে লাগালে—আমি তোমাকে কামড়ে দিয়েছি। ঠাকরুণ আমাকে পেত্নীতে পেয়েছে বলে কেঁদেকেটে ওঝা পুরুত ডেকে বাড়ীশুদ্ধ তোলপাড় করলেন। মিথ্যেবাদী !

দামো। ঐ তো তোমার দোষ! সেই পঁচিশ বছর আগেকার কথা মনে ক'রে রেখেছ ? সে সব ভুলে যাও, এখন যে মহাবিপদ হ'ল আমার!

মান। কি হ'ল ?

দামো। নাৎ-বৌ ছুটি চাচ্ছেন। উনি গেলেই নাতির আমার—

মান। ইস্ গেলেই হ'ল ! (হাসিয়া) কাল বুঝি ঝগড়া হ'য়েছিল ?

নীহা। (স্বগত) মানমর্য্যাদা আর রইল না ! (রুমাল চক্ষে দিলেন)

মানময়ী। কাঁদছ কেন ভাই—ঘরকন্নায় ও-রকম হ'য়েই থাকে। আমি খুব ক'রে ব'কে দেব। এস। (নীহারিকাকে জড়াইয়া ধরিলেন)

[মানসের প্রবেশ]

মানস। (ভীতভাবে) কি হ'ল ওঁর ?

দামো। গরু মেরে জুতো দান ! কাল ব'কে স'কে আজ আদর দেখাতে এসেছ !

মানস। হুঁ বুঝেছি। তা এমন বিশেষ কিছু বলিনি তো।

দামো। না বিশেষ বলনি! ও-রকম করবে যদি আর তাহ'লে বলছি আমি ওকে দ্বিতীয়পক্ষ করে ফেলব! (নীহারিকার প্রস্থানোদ্যোম)

মানস। (মানময়ীকে) দিন ওঁকে ছেড়ে দিন, ওঁর মাঝে মাঝে অমন হয়।

দামো। উনি যে ছুটি চাইছেন!

মানস। (অবাক হইয়া) ছুটি!

দামো। হ্যাঁ গো মাষ্টার, ছুটি।

মানস। জানিনে তো!

দামো। জানবে কি ক'রে, তুমি তো ওর কেউ নও!

মানস। (স্বগত) সর্বনাশ! সব ব'লে দিয়েছে নাকি?

দামো। কি ভাবছ?

মান। ভাববে আর কি? যা ভাববার তাই ভাবছে, সবাই তো তোমার মত নয়, যে স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে প্রজা ঠ্যাঙানোর কথা ভাববে!

দামো। মিছে কথা! তা কখনও ভেবেছি? জিজ্ঞেস কর নায়েবকে, তুমি সেদিন শাশুড়ী ঠাকরুণের শ্রাদ্ধে গেলে, আমি সেরেস্তায় বসেছি কখনও? মন খারাপ হবে ব'লে শুধু গাঙ্গুলীদের দরদালানে ব'সে জগু ঠাকুরের সঙ্গে দাবা খেলিনি? কানাইয়ের মাকে জিজ্ঞেস কর, সে রোজ সেখান থেকে আমাকে ডেকে আনেনি? মিছিমিছি এদের সামনে—

মানস। আমি ওঁকে নিয়েই যাই। বুঝিয়ে সুঝিয়ে—

মান। সেই ভালো ভাই—এস (নীহারিকার হাত মানসের হাতে দিয়া) যার ধন তারে সাজে।

নীহা। আমি সব খুলে বলছি।

দামো। না—শুনব না। ও-সব অজাশ্রাদ্ধে লঘুক্রিয়া ও তোমরা দুজনেই বলাবলি কর। কেমন মজা, চাইবে আর ছুটি?

(নীহারিকার গালে তর্জনী স্পর্শ করিলেন)

নীহা। কি ও!

দামো। গিন্নী পালাই চল। নাৎ-বৌয়ের চোখ দেখছ—এখন আর তোমাকে আমাকে ভাল লাগবে না! (মানময়ীর হাত ধরিয়া প্রস্থান)

নীহা। আপনার পায়ে পড়ি মানসবাবু আমাকে রেহাই দিন, আমি আর পারব না! পারব না! (রুমালে মুখ ঢাকিয়া প্রস্থান)

মানস। বিশ বছরের ধিঙ্গি, তবু খুকীপনা গেল না। খৃষ্টানীটা মহা মুস্কিলে ফেললে দেখছি! বাংলাদেশে কি হিন্দুর মেয়ে বি, এ পাশ করে না! (প্রস্থান)

। রাজেনের পুনঃ প্রবেশ ।

রাজেন। নাঃ—যথার্থই চপলাই মেরে ফেলবে আমাকে! ঠিক দেখেছি ঐ ঘরটাতে ঢুকতে। চপলার জন্যেই আমি মরব! এ-বাড়ীতে ও এলেই যথার্থ বুকের মধ্যে এমন করে ওঠে—মামলা হেরেও কোনোদিন তেমন হয়নি। আর রোজ কি সন্ধ্যাবেলা যথার্থ ওৎ পেতে এই এঁদো ঘরে মশার কামড় সওয়া যায়? এত জামরুল, গোলাপজাম, নারকেলের নাড়ু, সব ভুলে গেল চপলা! কি করি? বুড়ো বলছে মহকুমায় যেতে—পসার নষ্ট হচ্ছে! ছল ক'রে যথার্থ আমাকে তাড়ানোর মৎলব—নিশ্চয় যুক্তি দিচ্ছে মাষ্টার! চপলাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জেরা করলাম কিন্তু পেটের কথা বের হ'ল না। দশ ধারার আসামীর চেয়েও শক্ত। এখানে করে কি সে? ওই আসছে চাকরটা, ওকে যথার্থ জিজ্ঞেস ক'রে দেখি।

। হারানিধির তান ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রবেশ ।

হারা। ভজ মন নন্দ ঘোষের নন্দনে—

রাজেন। ওহে, নাম যেন কি তোমার, যথার্থ শুনছ?

হারা। কে? সিক্রিটারিবাবু দেখছি। এই অন্ধকার ঘরে?

রাজেন। একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি বাপু! বাড়ীর ভেতর থেকে এলে নাকি? একটা যথার্থ খবর জানো?

হারা। সব খবরই জানি বাবু। ম'রে আছি, কথা কইতে পাচ্ছিনে।

রাজেন। যথার্থ মাষ্টার বাড়ীতে আছেন? অন্দরে?

হারা। হুঁ। বাড়ী ছাড়া যাবেন কোথা?

রাজেন। আছেন তা'হলে! আর যথার্থ আছেন কে কে?

হারা। (স্বগত) হুঁ, এদিকেও ডাল টগ্‌বগ্‌ ফুটছে দেখছি। আচ্ছা—

রাজেন। ভাবছ কি? আর কে কে আছেন বলতে পার?

হারা। কেন পারব না? কর্তা আছেন, দিদিমণি আছেন—

রাজেন। দিদিমণি? যথার্থ কে তিনি?

হারা। তিনি যথার্থ বড়বাড়ীর আহ্লাদী। ওই আপনাদের বুড়ো কর্তার বেটী।

রাজেন। চপলা!

হারা। হুঁ, তিনিই।

রাজেন। আহ্লাদী! বেশ যথার্থ বলেছ—আহ্লাদীই বটে! আর কেউ নেই—মাষ্টারণী?

হারা। তিনি বিছানা নিয়েছেন—আর ইংরিজি বকছেন।

রাজেন। দিদিমণি আর মাষ্টার কি করছে? যথার্থ বলতে পার?

হারা। (স্বগত) এবার শুম্ভ-নিশুম্ভের পালা হবে বুঝি! সামলে জবাব দিতে হবে। গরজ বড্ড বেশী—দেখি যদি কিছু খসে।

রাজেন। কি যথার্থ চুপ করে রইলে যে বাপু?

হারা। কেন ও-সব ঘরোয়া কথা জিজ্ঞেস কচ্ছেন? বড় মানুষের কথায় আমার কি কাজ? (প্রস্থানোদ্যম)

রাজেন। বল যথার্থ—(হাত ধরিয়া)

হারা। হাত টানাটানি করবেন না,—ভদ্দরলোক—

রাজেন। তুমি যদি সব খবর দাও—যথার্থ তাহ'লে—(পকেট হইতে টাকা বাহির করিলেন)

হারা। (টাকা লইয়া) ও দু' টাকায় পারব না। আর তা ছাড়া মনিব—(প্রস্থান)

রাজেন। তোমাদের মনিবেরই ভাল হবে বাপু—ওহে শোন যথার্থ—

(পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

একটি কক্ষ

প্রতিবেশিনীদ্বয় ও রাজুর মা

রাজুর মা। কি জানি বাপু লেখাপড়া শিখলে অমনি বুঝি হয়। সোয়ামী গালাগাল দিলেই বুঝি মাথা ধরে।

২য় প্র। গালাগাল তো গালাগাল, উনি ভাত রাঁধতে দেরী হ'লেই চুলের মুঠি ধ'রে মারতেন আমায়—আর সে কি মার! হাতের কাছে যা পেতেন—খুন্তি, হাতা, ছাতি, চণ্ডীর পুঁথি তাই দিয়ে ভরদুপুরবেলা—আমি বসে কাঁদতাম, তার পরেই আবার উঠে—পান্তাভাতের থালা নিয়ে বসতাম। গায়ে গতরে ব্যথাও হ'ত না।

রাজুর মা। এ কালে ভাই সবই আলাদা। বয়েস-কালে কত যে মারই খেয়েছি ভাই ওঁর হাতে। যদি রাগ ক'রে পড়ে থাকতাম তাহ'লে কি আর এ-সংসার থাকত, না, ছেলের কামাই খেতে পারতাম?

১মা প্র। কি জানি বাপু। দুটো কথা শুনেই যদি এত মান, তবে বিয়ে করা কেন? আইবুড়ো হ'য়ে খোসখেয়ালে থাকলেই হয়! সোয়ামী নয় কার্তিক মাস, সকাল বেলায় রোদ্দুর, সাঁঝের বেলায় শীত। কখনও বকবে সকবে কখনও আদর করবে, তা নইলে কি সোয়ামী?

রাজুর মা। সে কথা খুব সত্যি। শুধু আদর আর কদিন ভাল লাগে বল? রোজ মধু খেলে মধুতেও অরুচি ধরে।

[বামীর প্রবেশ]

বামী। অরুচি ব'লে অরুচি। এমন যে মাখনের মত গলে মাছ তারও গন্ধে বমি আসে, মাগো মা। না খেয়ে খেয়ে গতর কাঠ হ'য়ে গেল।

রাজুর মা। দ্যাখ্ বামী, মাষ্টারণীর হয়েছে কি লো?

বামী। কি জানি বাবা। দু'দিন তো পায়ে মোজা আর মাথায় গলাবন্ধের পাগ জড়িয়ে পড়ে রইলেন—মাথায় ব্যথা, খিদে নেই! আর এমন হাভাতে সোয়ামীও দেখিনি—রেলগাড়ীর উনুনে নিজে লুচি ভেজে নিয়ে গিয়ে দ্যায়—বেহায়া। ইস্তিরির আবার অত খোয়ার কিসের লা? এক যাবে আর হবে। সোয়ামী না গোলাম। হ'ত ক্যাবলার বাবার মত সোয়ামী—স্বর্গে গেছে সেখানে সুখে থাক। একদিন বলেছিনু রাঁধতে পারব না, কোমরটা কন্ কন্ করছে, হেঁই বলে এক নাথি—কোমরের ব্যথা উঠল বেহ্মচাঁদিতে। হ'ত অমন—

রাজুর মা। মাষ্টারণী আসবে না ইস্কুলে?

বামী। বললে, আসবে কাল। মাষ্টার আসবে ঘণ্টাখানেক পর। ধোয়াবে মোছাবে পুতুল সাজাবে—তারপর তো আসবে—ঝাঁটা মারি অমন ইস্তিরিকে—(প্রস্থানোদ্যম ও ফিরিয়া) কিন্তু কর্তাবাবু আসবে এক্ষুনি—

(প্রস্থান)

রাজুর মা। যে যার ঘরে গিয়ে বোসগে, কর্তা আসবে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

মানসের বাড়ীর অন্দর। ভিতরের বারান্দা। দুই প্রান্তে দুইটি কক্ষ দ্বারে পর্দ্দা। বারান্দায় একখানি বেতের ছোট গোল টেবিল—তাহার চারিধারে চেয়ার

[মানসের প্রবেশ]

মানস। আচ্ছা ভোগানটাই ভুগিয়েছে পেত্নীটা। এই দুটো দিন কাটল যেন ভাঙের নেশায়! কি গলগ্রহই জুটিয়েছি, বাপরে বাপ। কান্না—কেবল কান্না! জর্ডন নদীর জল আর নেই! হাতখানা লুচি ভাজতে গিয়ে পুড়িয়েছি। কি করি, উপায় তো নেই...বুড়োবুড়ি খাড়া পাহারা... স্বামীত্ব দেখাতে হবে তো? খৃষ্টানী কষ্ট দিয়েছে তবু তার বুদ্ধি আছে। ভেবেছিলাম ফাঁস করেই দেবে বুঝি সব, কিন্তু খুব সামলে গেছে। যাক আর দিন চোদ্দ কাটলেই দেব ছুটি...বলব বাপের বাড়ী গেছেন, তার পরেই সেখানে তাঁর নিউমোনিয়া হবে...তারপরেই হোলীঘোষ্ট!

শাস্ত্র-মতে তখন একটা গ্র্যাজুয়েট হিন্দুর মেয়ে নিয়ে এসে কায়েম হ'য়ে বসব, বুড়োবুড়ী টেরও পাবে না! কিন্তু...কিন্তু ওঁর যাবারই বা দরকার কি এত? যে রকম আছেন তেমনই তো থাকতে পারেন। একটু অসুবিধে—কর্তাগিন্নী নাৎ-বৌ নাৎবৌ বলেন, সেটা গায়ে না মাখলেও তো পারেন। এত সেণ্টিমেণ্ট্যাল হ'লে একালে চলে!

[হারানিধির প্রবেশ]

হারা। চায়ের জল দেব বাবু?

মানস। উনি কোথায়?

হারা। মিসিবাবা?

মানস। হ্যাঁ বাবা, তোমার মিসিবাবা, তোমার চৌদ্দপুরুষের গুরু-ঠাকরুণ কোথায় তিনি?

হারা। বাগানে ফুল তুলছেন।

মানস। না জ্বালালে দেখছি, নির্ঘাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা না করে আর ছাড়বে না! (প্রস্থান)

হারা। গুরুঠাকরুণ নয়তো কি! ওঁর দৌলতে আমার পটলির নথ হবে—চাই কি—

[খিড়কি দরজা দিয়া নীহারিকা একরাশ গাঁদা ফুল হাতে লইয়া প্রবেশ করিল]

নীহা। তোমার বাবু কোথায় হারু?

হারা। এই আপনাকে খুঁজতে গেলেন—বাগানের দিকে।

নীহা। ডেকে আন। (হারুর প্রস্থান) ভদ্রলোক আমার জন্যে সত্যিই কষ্ট পাচ্ছেন। তখন বুঝতে পারিনি যে অজ পাড়াগাঁর স্কুল, যত গেঁয়ো লোকের সঙ্গে কাজ করতে হবে। তা'হলে আসতুম না আমি, আর ওঁরও এত কষ্ট পেতে হ'ত না।

[মানসের প্রবেশ]

মানস। আমি আপনাকে খুঁজে এলাম। এত ঠাণ্ডায় বাগানে বেড়ানো ঠিক নয়!

নীহা। কিছু হবে না, মরব না সহজে! জানলা দিয়ে দেখলুম অজস্র ফুল, লোভ সামলাতে পারলুম না। যাক—আপনি তো খুব কষ্ট পেলেন দু'দিন! যথেষ্ট খেটেছেন আমার জন্য, ধন্যবাদ!

মানস। ধন্যবাদের কাজ কিছুই করিনি। কর্তব্য করেছি—আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে টেনে এনে বিদেশে বিপদে ফেলেছি আপনাকে। দায়িত্ব তো আমারই।

নীহা। বিপদ মনে করিনে, আপনার যা করবার আপনি করেছেন—অসম্মান করেন নি আমাকে কখনো কিন্তু এঁরা—বিশেষ ক'রে বুড়োবুড়ী আদর ক'রে আর ওই বিশ্রী নাম ধ'রে ডেকে ডেকে ক্ষেপিয়ে তুললে আমাকে! তার পর মাথায় ঘোমটা টানতে টানতে হেয়ারপিনে লেগে শাড়ী ছিঁড়ল তিনখানা।

মানস। আমি কিন্তু মোটেই বিরক্ত হইনে। মনে মনে হাসি আর ভাবি যে চমৎকার অভিনয় করছি।

নীহা। পুরুষে যা পারে, আমরা তা পারিনে। মেয়েদের পক্ষে এ রকম অভিনয় করা শক্ত—আর—আর—

মানস। লজ্জাও হয়। কিন্তু কি করবেন—ফার্ণাণ্ডেজের হাত থেকে উদ্ধার পাবার মত অবস্থা হ'লেই আপনার ছুটি।

নীহা। ওঁরা যদি ও-রকম না করেন আমার সঙ্গে, তাহ'লে আমি বরাবরই থাকতে পারি। আপনার উপর আমার—আমার—এতটুকু বিশ্বাস আছে যে আপনি অন্যায় কিছু করবেন না আমার।

মানস। আমি চার্চ্চের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করেছি, জানেন তো? আমার প্রতিজ্ঞা আমি রাখব—আপনার কোনও ক্ষতি হ'তে দেব না। আপনি চোখ কান বুজে কোনও রকমে আর দিনকয়েক কাটিয়ে দিন—এই জুলাই মাসটা। পয়লা আগষ্ট মাইনে নিয়ে ফার্ণাণ্ডেজের আশী টাকা ফেলে দিয়েই—ব্যস্। ফার্ণাণ্ডেজের সে কথাগুলো আপনার মনে আছে কি না জানিনে কিন্তু আমার কানে তা ইনজেক্সনের সূঁচের মত বিঁধছে। হাতের কাছে তাকে আজ যদি পাই—সে আপনাকে বলে কিনা মিসেস ফার্ণাণ্ডেজ হতে হবে!

নীহা। (ঈষৎ হাসিয়া) আপনার কি হিংসে—হ্যাঁ—

মানস। (চমকিত হইয়া) কি বললেন?

নীহা। কিছু না। শুনুন মানসবাবু, ফার্ণাণ্ডেজের ধার শোধ হওয়া পর্য্যন্ত আপনি যা বলছেন মানব, কিন্তু দোহাই আপনার, দেখবেন আপনি তারপর একদিনও যেন আমাকে এখানে থাকতে না হয়। বুড়োবুড়ীই আমার মাথা খারাপ ক'রে দিলে—সিঁদুর দিয়ে দিয়ে সিঁথিটা করকরে করে দিয়েছে, দুখানা 'ভিনোলিয়া' ঘষেও পায়ের আলতার দাগ তুলতে পারলুম না। আপনিই বলুন না অত কি সহ্য হয়? তারপর দেখা হ'লেই বুড়ো যা বলে তাতো শুনেছেন। কি যে মনে হয় সে সময়—গা শিরশির করে—হ্যাঁ গা বেগুনের দাম কত?

মানস। (আশ্চর্য্য হইয়া) বেগুন! বেগুন কি মিস—

নীহা। ঐ বুড়ো!

[দামোদর বারান্দার দ্বারপথে মৃদু হাস্য করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন]

নীহা। হ্যাঁ গা, বেগুনের দাম কত আজ?

দামো। শুনে ফেলেছি! সব শুনে ফেলেছি! (নীহারিকা ও মানস সভয় বিস্ময়ে চাহিল) বুড়োর কথা শুনলেই গা শির্ শির্ করে! হাঃ হাঃ নাৎ-বৌ। করবে না? গিন্নী বলেন যে আমার হাসি দেখলে এখনও তাঁর, আবার চেলী প'রে নাকি নতুন বৌ হ'তে সাধ যায়। আর তুমি তো শুনেছ মুখের কথা। গা শির্ শির্ করবে না? কেমন আছ নাৎ-বৌ আজ? ইস্কুলের পথে দেখতে এলাম একবার! কি কথা হচ্ছিল?

নীহা। (স্বগত) বাঁচলুম! (প্রকাশ্যে) ভালই। (মানসের প্রতি) কিন্তু হ্যাঁগা বললে না বেগুনের দাম কত?

মানস। বেগুন! তা বেগুন, পাঁচ আনা সের।

দামো। ঠকিয়েছে, নিশ্চয় ঠকিয়েছে! বেগুনের সের পাঁচ আনা, বাবুলাহাটিতে পাঁচ আনা সের বেগুন! নিশ্চয় সেই দেবু নাপিত বেটার দোকান থেকে এনেছ! আমার বাজারে, আমারই স্কুলের মাষ্টারকে ঠকাবে—পাঁচ আনা সের বেগুন! জুতিয়ে হাড় ভেঙে দেব আজ! দেখিয়ে দাও তো মাষ্টার কোন্ বেটা বেগুন বেচেছে তোমার কাছে—

(মানসের হাত ধরিলেন)

মানস। থাক্! থাক্! যৎসামান্য ব্যাপার—

দামো। যৎসামান্য নয় মাষ্টার। হাট শায়েস্তা করতে পারে না যে জমিদার, তার জমিদারী এক পুরুষে খতম! পাঁচ আনা সের বেগুন! জুতিয়ে হাড় ভেঙে দেব আজ—দামু চৌধুরীর জমিদারী মগের মুলুক পেয়েছে বেটা! (মানসের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া প্রস্থান)

নীহা। উঃ ভগবান! মানমর্য্যাদা আর রাখলে না! (টেবিলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন) না পারব না! পারব না! আজই চলে যাব। ছিঃ ছিঃ—(ক্রন্দন)

[মানসের পুনঃ প্রবেশ]

মানস। বাবা—বহু কষ্টে হাত ছাড়িয়েছি। সন্ধ্যাবেলা সেই বেগুনের দোকান দেখাতে হবে, বড্ড বাঁচিয়েছেন আজ আপনি—কি কাঁদছেন নাকি? আবার কি হ'ল!

নীহা। অনেক হ'য়েছে মানসবাবু! আর নীচে নামতে পারিনে—পারিনে। (প্রস্থান)

মানস। দেখুন! আবার কান্নাকাটি ক'রে অসুখটা—

(পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মানসের কক্ষ

ঝাঁটাহস্তে হারানিধি

হারা। নাঃ! হাভাতের বরাত কিনা, কাজেই ফল পাকবার আগেই খসল! ঠাকরুণ চলে যাচ্ছেন। মৎলবটা দেখছি আর হাসিল করতে পারলাম না! কথায় বলে ইস্তিরির চেয়ে ধন নাই। সেই ইস্তিরির সাধ হ'ল একটা নথ, তা দিতে পারলাম না আজ দু'বচ্ছরে! পটলি তো বোষ্টুমী হবেই! তিন কুড়ি টাকা খরচ ক'রে মাসী আমার পটলিকে ঘরে এনেছিল, টাকা তিন কুড়ি বেথায় গেল! যে রূপের দেমাক ও আর ঘরে থাকবে না কিছুতেই। এত ভজন সাধন করলাম...ভজ মন নন্দ ঘোষের নন্দনে!

[নীহারিকার প্রবেশ]

নীহা। আমার সে জাংবঙের জরিপাড় শাড়ীটা কোথায় হারু?

হারা। বদ্রী ধোপার বাড়ী।

নীহা। আননি?

হারা। কি ক'রে আনব? সে শাড়ী প'রে তার ইস্তির লাখপতিয়া কুটুমবাড়ী গেছে কাল!

নীহা। কে বললে?

হারা। আমার নিজ চোখে দেখলাম—বললাম, মিসিবাবার শাড়ী প'রে যাচ্ছিস্ কোথা? সে মুচ্কী হেসে চোখ ঘুরিয়ে—

নীহা। চুপ কর! ও-সব কি কথা? বদ্রীকে—না, তোমার বাবুকে ডাক একবার, দেখছি। (হারুর প্রস্থানোদ্যম) হ্যাঁ হারু! এ-ঘরে ঝাড়ু পড়ে না কত দিন? কি সব ক'রে রেখেছ! (টেবিলের কাছে গিয়া) কি এ-সব? নস্যিদানীতে শুপুরির কুচি, শুপুরির কৌটোয় সিগারেটের ছাই, এ্যাশ্‌ট্রেতে তেল? যার মাইনে খাচ্ছ তার কাজটা করতে পার না?

হারা। আমি কি করব? কাল বড় বাড়ীর মেয়ে এসে সব অম্‌নি ক'রে গুছিয়ে গেছে।

নীহা। বড় বাড়ীর মেয়ে। চপলা?

হারা। হুঁ।

নীহা। তার এ-ঘরে কি কাজ?

হারা। আপনাকে খুঁজতে—

নীহা। আমাকে খুঁজতে! আমি কি হারিয়ে গেছলুম? যাও, ডেকে আন তোমার বাবুকে। (হারুর প্রস্থান) কি বিশ্রী নোংরা ক'রে রেখেছে। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, মোটে সহবৎ নেই! তার কি কাজ এখানে?

[চপলার প্রবেশ]

এই যে। এখন কি?

চপলা। মা পাঠালে। এবেলা মা আপনাকে রাঁধতে বারণ ক'রে দিয়েছে। আমাদের বাড়ী রাত্রে আপনার আর মাষ্টারবাবুর নেমন্তন্ন।

নীহা। মাষ্টারবাবু বল কেন চপল! ভাল শোনায় না, মেসো বললেই পার!

চপলা। আপনাকে মাসী বলতে পারব না, তাঁকে মেসো বলব কি করে?

নীহা। ছেলেমেয়েকে যা বলা যায় না পুরুষকে তা বলা যায়। যাক্—

চপলা। তবে আপনি বাবাকে দাদাবাবু না ব'লে দামুবাবু বলেন যে?

নীহা। তর্ক কোরো না চপল! যা বলি তাই করবে। যাক্— আমি যাব, তবে বেশী সইবে না আমার।

চপলা। তা বলব—কাল সকালেও কিন্তু আপনার নেমন্তন্ন—

নীহা। সে জানি—ইস্কুলের মেয়েরা নেমন্তন্ন করেছে।

চপলা। আমি সে নেমন্তন্ন-কমিটির সেক্রেটারী হ'য়েছি।

নীহা। (হাসিয়া) কি খাওয়াবে?

চপলা। এই বচুর শাক এক, কুমড়োর ঘণ্ট দুই, ডুমুরের কাটলেট্ তিন, ছোলার ডালকারী চার—

নীহা। মেরে ফেলবে তা হ'লে দেখছি চপল! তার চেয়ে লুচি আর হালুয়া ক'রে—

চপলা। মাষ্টারবাবু—মেসো বললেন যে এতদিন ধ'রে যত রান্না শিখেছ কাল সবের পরীক্ষা হবে। যার রান্না ভাল হবে—তিনি তাকে মেডেল দেবেন! (জানালার দিকে লক্ষ্য করিয়া) ঐ যে তরু আর অরু কচুর শাক কাটতে যাচ্ছে—তরু—অরু— (প্রস্থান)

নীহা। হুঁ! যত রকম রান্না শিখেছে—বুঝি সবই। কিন্তু যাওয়া আটকাবে না তাতে। কিন্তু এ ভদ্রলোকের হবে কি? বাইরে এত বুদ্ধি কিন্তু ঘরে এমন হোপ্‌লেস। বিছানা নোংরা, জুতোয় কালি দেওয়া হয় না সাত বচ্ছর, জামার বোতাম নেই, দাড়ি কামানোর ক্ষুর দিয়ে পেন্সিল কাটা হয়েছে—আশ্চর্য্য লোক! এত ময়লা বিছানা দেখলে গা কিট্‌কিট্ করে আমার—(বিছানার চাদর ঝাড়িতে লাগিলেন)

[মানসের প্রবেশ]

মানস। ওকি করছেন!

নীহা। (চমকিত হইয়া) দেখছিলুম চাদরটা, আমার চাদরের সঙ্গে বদল ক'রে দিয়েছে কিনা!

মানস। ওটা আমার নয়, কাল ঐটে দিয়ে ফলের ঝুড়ি ঢেকে বুড়ো পাঠিয়েছিলেন, আমি বিছানায় পেতে নিয়েছি।

নীহা। ছিঃ ছিঃ। (চাদর টানিয়া ফেলিয়া দিলেন) আপনার মত নোংরা লোক

মানস। ঐ একটি ছাড়া আমার আর গুণ নেই মিস গাঙ্গুলী।

নীহা। সেটা বললে মিথ্যে বলা হয়, গুণ অনেক আছে—দিব্যি দাবার চাল দিতে জানেন আপনি।

মানস। দাবার চাল কি দেখলেন?

নীহা। ও কথার কথা বললুম। কাল আমার গাড়ী ক'টায়?

মানস। বিকেলের গাড়ী?

নীহা। না, সকালের গাড়ী।

মানস। সকালের গাড়ীতে যাবেন নাকি? সে গাড়ী বোধ হয়—

নীহা। বোধ হয় নয়, সকালের গাড়ী ঠিক বারোটায়। দশটায় রওনা হ'তে হবে আমাকে, কিন্তু যা ক'রে তুলেছেন আপনি—

মানস। কি ক'রেছি আবার!

নীহা। ইস্কুলে শুনেছি মেয়েরা খাওয়াবে আমাকে, তার মেনু শুনলুম আপনি করেছেন—

মানস। চ'লে যাচ্ছেন। মেয়েরা ভালবাসে আপনাকে—

নীহা। তাই কচুর শাক থেকে সুরু ক'রে যত বন জঙ্গল খাইয়ে এমন অবস্থা করবেন আমার যে, খেয়ে যাতে বিছানা ছেড়ে না উঠতে পারি—যাওয়াটা পন্ড হয়। এই কাজটুকুর জন্য মেডেল দেবেন আবার শুনলুম। মুখে বললেই তো—

মানস। আমাকে মাফ করুন মিস গাঙ্গুলী, সে রকম বুদ্ধি আমার মোটেই নেই। আমি জানি আপনি থাকবেন না—থাকতে পারতেন—কিন্তু থাকবেন না। কাজেই আর বৃথা ব'লে আপনাকে কষ্ট দেব না। তবে যখন যেখানে থাকেন মনে করবেন মাঝে মাঝে—

[পা টিপিয়া টিপিয়া পিছনের দরজার পর্দা সরাইয়া দামোদর প্রবেশ করিলেন]

নীহা। এ অভিজ্ঞতা জীবনে ভুলবার নয়—

দামো। বটে! (মানস ও নীহার চমকিয়া উঠিল)

মানস। হ্যাঁ, সে কথা ভুলো না! আর—আর—হীরু গয়লার দুধের হিসেব—বাড়ী চুণকাম—

নীহা। সে কিছু ভুলব না. হীরু গয়লার মাছের দাম—চুণো গলির বাড়ী ভাড়া—

দামো। হুঁ এ-সব কথা জীবনে ভুলবার নয়! এই সব কথা ব'লে বুঝি তোমাদের ছাড়াছাড়ি হয়? আমাদের কালে কি হ'ত জান?

মানস। ও আপনি এসেছেন যে!

দামো। ইস্ দেখতেই পাননি! ভারী প্রেম করতে শিখেছ মাষ্টার! হীরু গয়লার চুণের হিসেব—যাওয়ার সময়? সে-কাল অনেক ছিল ভাল, জান?

[মানময়ীর প্রবেশ]

মান। তুমি আবার এসেছ?

দামো। শোন গিন্নি মজা শোন. কাল নাৎ-বৌ যাবে. আজ নাতি আমার তাকে চুণী গয়লার বাড়ীর হিসেব বোঝাচ্ছে, আর আমাদের কালে কি হ'ত গিন্নী?

মান। যাও! পুরাণো কথা ভাল লাগে না আর!

দামো। আবার মিছে কথা! দাড়ি কামিয়ে স্নান ক'রে এলাম যখন, তখন তুমি আমার থুৎনিতে হাত দিয়ে কাল বললে—তোমায় দেখে পুরাণো কথা মনে পড়ছে আর আজ বলছ পুরাণো কথা ভাল লাগে না! তোমার হদিস পাওয়া দায়—

মান। যাও! একটা কথা তোমার পেটে থাকবার যো নেই!

দামো। কিন্তু দ্যাখো নাৎ-বৌ, আজ তোমাদের দু'জনকে দেখে কিন্তু আমার মনে রস জমছে না। মনে হচ্ছে তোমাদের মধ্যে কোন জায়গায় ফাঁক আছে। তা নইলে—কাল যাবে নাৎ-বৌ, আর আজ মাষ্টার বলে কিনা দুধওয়ালার চুণের হিসেব ভুলো না! উঁহু! দু'জোড়া চোখ একদম সাদা, একটুও ঘোলাটে হয়নি তো। উঁহু!

মানস। দেখুন, ঘর সংসারের কথা বলতে হয়—

দামো। আমাকে শেখাবে, তুমি মাষ্টার? ঘর সংসারের কথা এ-সময় মনে থাকে? উনি যখন সেকালে বাপের বাড়ী যেতেন তার সাতদিন আগে থেকে আমরা দু'জনে দু'জনের গলা ধরে ঘরে দোর দিয়ে ফুরসৎ পেলেই কাঁদতাম।

মান। মিছে কথা! আমি কখনো কাঁদিনি, তুমি চুল ধ'রে টেনে টেনে আমাকে কাঁদিয়েছ!

দামো। আবার মিছে কথা বলছ তুমি! তখন চুল ছিল তোমার? থুস্কীর জন্যে তোমার দিদিমা মাথা ন্যাড়া ক'রে দিয়েছিল না?

মান। এদের সামনে মাথা ন্যাড়ার কথা বোলো না বলছি! জামগাছ থেকে প'ড়ে যে দাঁত ভেঙেছিলে—

মানস। থাক, দিদিমা থাক্।

নীহা। (স্বগত) এরা আশ্চর্য্য—একটুকু লজ্জা নেই! (প্রকাশ্যে) আমাকে সুটকেশ গোছাতে হবে—যাই। (প্রস্থান)

মানস। চাবিটা কিন্তু ঐ ব্র্যাকেটের সঙ্গে লাল সুতো দিয়ে—ওই দক্ষিণের জানালার ধারের ব্র্যাকেটটায়— (পশ্চাৎ প্রস্থান)

দামো। কিন্তু গিন্নী আজ যেন আমার কেমন কেমন লাগছে, এদের আমাদের মত হয়নি।

মান। সকলের রীত্ তো এক রকম নয়।

দামো। না গিন্নী, দ্যাখো তাকিয়ে এইটে মাষ্টারের ঘর—বালিশটা ছোট—আলনায় শাড়ী নেই একখানাও—

মান। এতও তোমার চোখে পড়ে!

দামো। নাঃ এদের মনে কোথাও ফাঁক আছে।

মান। সবাই কি তোমার মত হবে নাকি? এস, চপলাকে পাঠিয়েছিলাম খাবার কথা বলতে। একবার নিজে বলে যাই—যে তোমার নাৎ-বৌয়ের মেজাজ!

দামো। চল, কিন্তু এদের মনের মিল না হ'লে ভবিষ্যতে ইস্কুলটা—
(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দামোদরের অন্দরমহলের বাগান। ঠাকুর চাকরের ব্যস্ত যাতায়াত। লুচি এবং বেগুনভাজার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে; নারিকেল কুণী হাতে লইয়া বাজুর মা প্রবেশ করিলেন।

বাজুর মা। গিন্নী ডাকলেন, এলাম। কিন্তু আমার আর ভাল লাগছে না এ-সব! রাজু আমার আজ ক'দিন মনমরা হয়ে আছে। নারকেলের নাড়ু দুটোও মুখে দিতে চায় না! আমি আবার কোন্ সুখে এখন নারকেলের পিঠে গড়ব! সব তো বুঝতে পারি, কিন্তু বড় মানুষের ঘর, কথা কইব কি ক'রে? গিন্নী এতো বোঝেন শুধু আমার ছেলের দুঃখু বোঝেন না।

[চপলার প্রবেশ]

চপলা। বাড়রী মাসী, মা কোথায়?

রাজুর মা। দেখিনি তো। হ্যাঁ চপল. রাজু যে ক'দিন থেকে বলছে তুই নাকি—তার সঙ্গে—কথা—ক'সনে ?

চপলা। বলব কখন মাসিমা? এই তো চার পাঁচ দিন কেবলই গোছগাছ করতে হচ্ছে। কাল আমাদের টীচার যাবেন, তাঁকে খাওয়াতে হবে—দশ রকম রান্না আছে! আমি নেমন্তন্ন কমিটির সেক্রেটারী।

রাজুর মা। তা বেশ, বাছা বেশ! তবে দু'টো কথা বলিস। ও তোর নাম করতে পাগল হয়। তুই ছেলেমানুষ ও-সব বুঝতে পারিসনে তো। (প্রস্থান)

চপলা। বুঝতে পারি, কিন্তু রাজুদা যেন কথা কইতে গেলেই কেমন আবোল তাবোল বকতে থাকে—ভালো লাগে না (প্রস্থান)

[রাজেনের প্রবেশ]

রাজেন। এ আমার যথার্থ এক নতুন মুস্কিল হ'ল। চপলাকে জন্মের মত হারালাম। মাষ্টারণী যথার্থ থাকলে তবু মাষ্টারের একটু ভয় থাকত, এখন একেবারে খোলা মাঠ। খাল কেটে একটা যথার্থ কুমীর এনে ঘরে ঢুকিয়েছি।

[হারুর প্রবেশ]

হারা। এ যে সিক্রিটারিবাবু। আমার বাবু কোথায় ?

রাজেন। তোমার বাবু কোথায় যথার্থ তা আমি কি জানি। আচ্ছা, তোমার গিন্নী-মা ক'দিন বাপের বাড়ী থাকবেন হারু ?

হারা। গলা নেই গান আর ক্ষেত নেই ধান! বাপ নেই তার বাপের বাড়ী! যত সব খৃষ্টানী কাণ্ড! দেখি বাবুকে খুঁজে—বাবা, বোকা সেজে আছি কথা কইনে!

রাজেন। যথার্থ কি হারু, কি হ'য়েছে ?

হারা। সে অনেক কথা—দু' টাকায় আর সে কথা হয় না। (প্রস্থান)

রাজেন। আমি যথার্থ দশ বিশ যা লাগে দিচ্ছি, শুনছ হারু শুনছ— (প্রস্থান)

[মানস ও নীহারিকা প্রবেশ করিলেন]

মানস। এই আজকের দিনটা একটু কষ্ট ক'রে থাকতে পারলেই কাল থেকে আপনি বাঁচলেন!

নীহা। হুঁ! এ জায়গাটা কিন্তু বেশ! কলকাতার মত অত গরম নয়!

মানস। আর এঁদের ব্যবহারও খুব ভাল।

নীহা। হ্যাঁ ভদ্রতা আছে, কিন্তু সব তাতেই একটু যেন বাড়াবাড়ি। তা নইলে—

মানস। দেখুন...গিন্নী আসছেন, আবার কি বলবেন আমার সামনে, শেষটা লজ্জা পাবেন আপনি। আমি যাই।

নীহা। নাঃ ও-সব কথা এক রকম গা-সওয়া হ'য়ে গেছে, আর একটা দিন বই তো নয়, এক রকম করে কেটে যাবেই।

মানস। নাঃ নাঃ কাজ নেই, গিন্নী যে রকম ক'রে হাসতে হাসতে আসছেন, আমার যেন—বুঝলেন আমি আসছি এক্ষুনি। (প্রস্থান)

নীহা। হঠাৎ ওঁর যেন একটা পরিবর্তন হয়েছে দেখছি! ফাঁক পেলেই আমাকে এড়িয়ে চলছেন।

[মানময়ীর প্রবেশ]

মান। তোমার কর্ত্তা পালালেন যে!

নীহা। (স্বগত) আজ চূড়ান্ত অভিনয় করব (প্রকাশ্যে) কি যেন একটা ভুলে রেখে এসেছেন, আনতে গেলেন।

মান। আজ ভাই একটু রাত হবে কিন্তু! বেশী রাত হ'লে এখানেই থেকে যাও।

নীহা। অত হাঙ্গামা ক'রে কি হবে? উনি আবার—

মান। উনি আবার কিছু তোমাকে বলবেন না, সে ব্যবস্থা করব'খন। তোমাকে মানিয়েছে কিন্তু আজ—

[দামোদরের প্রবেশ]

দামো। মানিয়েছে ব'লে মানিয়েছে। পটের পরী। যাবার আগে চোখটা ঝলসে দিয়ে যাচ্ছে আর কি? এ জ্বলুনি থামলে হয়!

মান। তোমার জ্বলুনি ইহকালে থামবে না। যতই বয়স হচ্ছে ততই—যাক্ (মৃদুস্বরে) এনেছ?

(দামোদর ইঙ্গিত করিয়া একটি ভেলভেটের বাক্স মানময়ীর হাতে দিলেন)

মান। এসো ভাই—(বাক্স হইতে মুক্তার সাতনর বাহির করিয়া নীহারিকার গলায় পরাইতে গিয়া) খালি হাতে ঘর থেকে লক্ষ্মী বিদেয় করতে নেই ভাই!

দামো। কী সব অলক্ষণে কথা বলছ গিন্নী? লক্ষ্মী বিদেয় কি? বল খালি হাতে নাৎ-বৌয়ের মুখ দেখতে নেই!

মান। মুখ দেখতে বাকী রেখেছ বড়! (নীহারিকার গলায় সাতনর পরাইয়া দিলেন)

নীহা। এ কি করলেন?

মান। তোমার নাৎ-বৌ থাকলে তুমিও এই করতে ভাই।

দামো। শোন গিন্নী, একটা কথা শোন। (মানময়ীর সহিত প্রস্থান)

নীহা। চরম হ'ল! আর নয়— (প্রস্থানোদ্যম)

[মানসের প্রবেশ]

মানস। কোথায় যাচ্ছেন!

নীহা। আপনার পায়ে পড়ি মানসবাবু (হার দেখাইয়া) এটা ফিরিয়ে নিতে বলুন। দড়ির ফাঁসের মত লাগছে—দম বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে আমার! (হার ছিঁড়িতে উদ্যত)

মানস। ছিঃ ছিঃ করছেন কি! এই একটা তো রাত? তখন বললেন যে আজ সব সহ্য করবেন আপনি, আর এইটুকুতেই—

নীহা। এইটুকু! এর মানে বুঝবেন না আপনি! বুঝবেন না!

মানস। না হয় কোন সময় বুঝিয়ে দেবেন! আপাততঃ আমার মুখ চেয়ে না হয় চুপ ক'রে থাকুন! আজকে মস্ত ফাঁড়া—আপনার কিছু হবে না, কিন্তু আমার সর্বনাশ! যদি আমার সর্বনাশ করবার ইচ্ছে হয় তবে—

নীহা। সে কথা আমি বলিনি তো! কিন্তু এ-সব কেন? বড্ড ছোট হ'য়ে যাচ্ছি আমি! (ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলেন)

মানস। নাঃ! আজকের কালরাত্রি প্রভাত হ'লে বাঁচি! দেখুন, ঐ বুড়ো-বুড়ী আসছে, ও-রকম মুখ কালো ক'রে ঘুরলে সব ধরা পড়ে যাবে। আমার কাছে আসুন, একটু হেসে কথা বলুন! আসবেন?

নীহা। আমার কান্না পাচ্ছে। ও-দিকে চলুন—

মানস। চলুন, যেখানে চুপ করে কাঁদতে পারেন এ-রকম একটা জায়গা খুঁজে দিই। (উভয়ের প্রস্থান)

] দামোদর ও মানময়ীর প্রবেশ]

মান। তা আমি পারব।

দামো। দ্যাখো তাতে ভগবান খুসী হবে, সংসারের মঙ্গল হবে। সকালবেলা মাষ্টারের বাড়ী থেকে ফেরা অবধি আমি ঐ কথাই ভাবছি। ঐ পুবের কোঠায় বুঝলে?

মান। ঘরে যদি গিন্নীবান্নি লোক থাকত তাহ'লে সে দেখে শুনে ব্যবস্থা করতে পারত। এরা একেবারে ছেলেমানুষ—সংসার বোঝে না কিছুই, খেয়াল মত চলছে—

দামো। হয় জিদ নয় অভিমান। ও-তো মজার জিনিস কিনা। একবার মাথায় ঢুকল তো ঢুকলই—মৃগীর ব্যায়রামের মত মাঝে মাঝে হবেই। আমি অনেক দিন মাষ্টারণীকে লক্ষ্য করেছি—মুখ দেখলেই মনে হয় কোথায় যেন একখানা পোড়া ঘা আছে—

মান। তাই মলম লাগাতে যাচ্চ? কাজ কি বাপু তোমার অত হাঙ্গামে?

দামো। গিন্নী বুঝছ না! স্বামীর সামনে স্ত্রী অমন মুখ ক'রে থাকবে এ আমি দেখতে পারিনে কোন কালে—জান তো রাজুর মাকে কেমন ক'রে—

মান। সে তো তুমি পারই। পরের বৌয়ের কষ্ট তুমি চিরকালই দেখে আসছ, শুধু—

দামো। পরের বৌয়ের কষ্ট দেখছি বুঝি? আর ঘরের—

(মানময়ীর গাল টিপিয়া ধরিলেন)

মান। ছাড়! ছাড়! রাজু আসছে!

[ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে রাজেনের প্রবেশ]

দামো। হ্যাঁ রাজু শুনছ। আমি শহরে গিয়েছিলাম। বদনের ইস্কুলের মাষ্টার যখন ছুটি নিয়েছিল তখন সেখানে খাওয়া দাওয়া হয়েছিল—অভিনন্দন—গান—সব হয়েছিল, আমার ইস্কুলে সব ডবল বন্দোবস্ত করতে হবে। আটখানা মেডেলের অর্ডার দিয়ে এসেছি—যাঁরা পড়ান সব্বাইকে মেডেল দেব। কাল যে সব মেয়েরা রান্না করবে তাদিকে একখান ক'রে শাড়ী, মাষ্টারণীকে লাল গরদ, দোক্তা রাখবার রুপোর কৌটো, ছেলের দুধ খাওয়ানোর সোনার ঝিনুক—এই সব উপহার দিতে হবে। সব জোগাড় ক'রে রেখেছি। এস সব দেখবে এস।

(মানময়ীর সহিত প্রস্থান)

রাজেন। যথার্থ বেশ ক'রেছেন। চলুন যাচ্ছি, কিন্তু হারু যেন যথার্থ কি একটা খবর দিতে চেয়ে কোন্ দিকে গেল? (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

স্বল্পালোকিত কক্ষ

নীহারিকা ও মানময়ী

মান। একটু দেরী হয়ে গেল ভাই, অনেক ক'রেও রাত বারোটার আগে হাঙ্গাম মেটাতে পারলাম না। তোমার কষ্ট হবে না তো?

নীহা। নাঃ কষ্ট কিসের! আর অল্প রাত আছে, এক ঘুমেই ফর্সা হয়ে যাবে। যান, আপনি আর দেরী করবেন না!

মান। সিঁড়ির নীচের হল ঘরেই বামী থাকবে। দরকার হ'লে তাকে ডেকো। এখন ঘুমোও। আমি মাষ্টারকে খবর পাঠিয়ে দেব—(মানময়ীর প্রস্থান)

নীহা। (হাতঘড়ি দেখিয়া) রাত প্রায় বারোটা। সে ভদ্রলোক বোধ হয় বাড়ী গিয়ে ব'সে আছেন। খবর না পেলে এই বৃষ্টি মাথায় ক'রে চ'লেই আসবেন হয় তো। তাঁরও আমার জন্যে শাস্তির শেষ নেই। কিন্তু কি করব? উপায় তো নেই—জীবনে আমার মত অবস্থা কোনো মেয়ের হ'য়েছে কিনা সন্দেহ! যাক্—রাত পোহালেই—(শয্যায় জানু পাতিয়া বসিয়া প্রার্থনা) হে প্রভু, পরম পিতা, জগতের ত্রাণকর্ত্তা, তুমি আমাকে অন্ধকার হইতে আলোক রাজ্যে লইয়া যাও। হে দয়াল যীশু, কাল চলিয়া যাইব, কিন্তু আমার হৃদয় যে আজ কিরূপ করিতেছে তাহা তুমি সর্বজ্ঞ—অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছ, আমার হৃদয়কে উদ্ধার কর। আমেন্!

[শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে মানসের প্রবেশ]

মানস। নাঃ এখানে থাকা আমার ভালো হ'ল না! আবার হয় তো তিনি বাড়ী গিয়ে জেগে ব'সে আছেন, এই ঝড় বাদলার রাত—একে তো অত্যন্ত নার্ভাস—তারপর ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে না ওঠেন। তবে দিদিমা যদি রাজেনবাবুর মাকে পাঠিয়ে দেন তবে ভাল হয়। অভিনয় করতে গিয়ে মহা দায়ে ঠেকেছি—এড়াতে পারছিনে। স্বামীর অভিনয় করতে যাওয়া দেখছি সাংঘাতিক ব্যাপার! আসল স্বামী না হ'লেও দায়িত্ব নিতেই হয়। বাতিটা মিট মিট করে জ্বলছে—বিছানা কোথায়? (বাতি উস্কাইলেন)

নীহা। কি! কে ও?

মানস। কে! আপনি?

নীহা। আপনি এ-ঘরে এসেছেন কেন?

মানস। আমি! আমি! দিদিমা বললেন বাড়ী গিয়ে কাজ নেই—

নীহা। তিনি বললেন ব'লে আপনি এই অবস্থায় আমার ঘরে এসে ঢুকলেন!

মানস। আমি সত্যিই জানতাম না বলছি—

নীহা। যান, আর দেরী করবেন না!

মানস। (দরজা টানিয়া) শিকল দিয়ে গেছে। শুনুন—ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন! বেরোবার কোনও উপায় দেখছিনে! আজ চরম পরীক্ষা মিস গাঙ্গুলী! বেরোবার যখন পথ নেই, তখন অগত্যা মনে ভাবতে থাকুন যে আমরা দু'জন প্যাসেঞ্জার—জানাশোনা নেই—লিলুয়ায় গাড়ী চেপে বেনারস যাচ্ছি। তেমনি ভাবে আপনি বিছানায় ঐ কোণে শুয়ে থাকুন, আমি দোরের পাশে বসে থাকি।

নীহা। সে আমি ভাবতে পারব না, আপনি যেমন করে হোক চলে যান—নইলে এক্ষুনি ফিট্ হয়ে পড়ব, কিছু ভাবতে পারছিনে আমি, মাথার ভেতর কেমন করছে!

মানস। আচ্ছা দেখি—(খোলা জানালার কাছে গিয়ে) নীচে একটা গাছ আছে। হাত কুড়ি নীচে! তা ঠিক পারব—

নীহা। কি করবেন কি?

মানস। ঐ যে পরিষ্কার মাটি আর ছায়া দেখা যাচ্ছে—বৃষ্টি হ'য়ে নরমও হ'য়েছে কিছু—

নীহা। কি দেখছেন কি ও-দিকে—

মানস। দেখছি হাইজাম্প চ্যাম্পিয়ন মানস মুখার্জী বেঁচে আছে কি না! (জানালা দিয়া লম্ফ প্রদান)

নীহা। সর্বনাশ—(আর্তনাদ করিয়া জানালার নিকট ছুটিয়া গেলেন)

[দরজা খুলিয়া মানময়ীর প্রবেশ]

মান। কি ভাই! কি হ'ল? মাষ্টার পালিয়েছে বুঝি! এই জানালা দিয়ে তাহ'লে—কি দস্যি ছেলে বাপু! তুমি কেঁদো না ভাই—কাল চ'লে যাও—তারপর এমন করব আমি তাকে যে তোমার পায়ে ধরে সেধে আনতে হবে। কিন্তু কি হয়েছিল? পালাল কেন?

(নীহারিকা নীরবে জানালা দিয়া চাহিয়া রহিলেন)

মান। কি দেখছ? চল, নীচে চল। কি দস্যি ছেলেরে বাপু!

(নীহারিকাকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

প্রভাত—মানময়ী গার্লস্ স্কুলের আঙিনা

মেয়েরা ব্যস্তভাবে যাতায়াত করিতেছিল

[চপলা ও মানস প্রবেশ করিলেন]

চপলা। তাহ'লে আমরাই পড়ব?

মানস। হাঁ তুমি পড়বে। বেশ সুর ভালো ক'রে পড়বে—কথা যেন জড়িয়ে না যায়।

চপলা। আপনি থাকবেন না কেন?

মানস। কাজ আছে—পোষ্টাফিস থেকে ওঁর মাইনের টাকা তুলতে হবে—তুমিই সব কোরো বুঝলে—ওঁরা ওই আসছেন বুঝি। (প্রস্থান)

চপলা। ওরে হার্মোনিয়ামটা ঠিক কর্—চেয়ার পেতে দে।

[ছাত্রীরা চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ পাতিয়া সভাস্থল সাজাইতে লাগিল—
দামোদরবাবু ও তাঁহার পশ্চাতে রাজেন প্রবেশ করিলেন]

দামো। কোনো কিছুর অভাব নেই তো?

রাজেন। আজ্ঞে যথার্থ কিছুর অভাব নেই !

দামো। দেখো যেন কোনও ত্রুটি না হয়। বদনের গাঁয়ের সেই চিনিবাসটা বাজারে মুড়ীর দোকান করে, তাকেও নেমন্তন্ন করেছি। এসে দেখে যাক্ মাষ্টার বিদেয় কেমন ক'রে করতে হয় ! ওই ওঁরা এসে পড়লেন।

চপলা। অরু, তরু, চাঁপা—কে কে গান গাইবি আয়—

[কয়েকটি মেয়ে আসিয়া সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইল—মানময়ী, নীহারিকা, রাজুর মা ও অন্যান্য প্রতিবেশিনীরা, তৎপশ্চাৎ গ্রামস্থ ভদ্রলোক ও সাধারণ দর্শকেরা প্রবেশ করিল। মানময়ী, নীহারিকা ও অন্যান্য প্রতিবেশিনীরা চেয়ারে উপবেশন করিলে দুইটি মেয়ে নীহারিকার গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিল। তাহার পর সমস্বরে গান আরম্ভ হইল—]

গান

সাথী হয়ে এসেছিলে হেথা শুভ সাধনায়
এখনি বিদায় দিতে বড় যে বাজিছে হায়।
দু'দিন ছিলে গো পাশে বেঁধে ছিলে স্নেহ-পাশে
স্নিগ্ধ করিলে প্রাণ স্নেহ-প্রেম করুণায়।
যত ভ্রম পরমাদ যত ত্রুটি অপরাধ
নিও না নিও না দেবী ! ভুলে যেও মমতায়।

নীহা। (মৃদুস্বরে) গান কে লিখেছে চপল ? বেশ গানখানা তো ?

চপলা। মাষ্টারমশাই লিখে দিয়েছেন।

নীহা। বুঝেছি ! (স্বগত) তাঁকে দেখছিনে ! শুনেছি ভালো আছেন—তবু—

দামো। এইবার তোমাদের আর কি কি আছে রাজু ? চট্‌পট্ শেষ ক'রে নাও।

চপলা। এবার আবৃত্তি হবে—এস অরু।

[অরু নাম্নী ছাত্রী আবৃত্তি করিতে লাগিল]

তুমি তো যাইতেছ চলিয়া !
আমরা তোমাকে বিদায় দিব বল তো কি বলিয়া ?
রান্না শিখালে বান্না শিখালে গান কত শিখাইলে,
চীন জাপানের দেশ সব ম্যাপে এঁকে দেখাইলে।
সাত দিনে ফার্ষ্ট বুক তুমি দিলে শেষ করি,
আমাদের কথা মনেতে রাখিও—তোমায় নমস্কার করি।

[সকলের করতালি]

দামো। তারপর কি আছে ?

রাজেন। দু'টো বক্তৃতা। যথার্থ আমার একটা আছে—আগে—

[অভিনন্দন পাঠ]

হেড্‌মিস্ট্রেস মহোদয়, হিজ অনার প্রোপ্রাইটর ও লেডী প্রোপ্রাইটর মহাশয়, আজ আমাদের শিক্ষিতা হেড্‌মিস্ট্রেসকে ছুটি দিতে কত কষ্ট হইতেছে তাহা কেমন করিয়া জানাইব ? হেড্‌মিস্ট্রেস মহাশয়ের কার্য্যে আমাদের ইস্কুল প্রায় এক মাসের মধ্যে ভীষণ উন্নতি করিয়াছে। তিনি ছুটি লইয়া বাপের বাড়ী যাইতেছেন। তিনি বাপের বাড়ী গিয়া যেন স্মরণ করেন যে আপনার নিজের জন যাঁহাদিগকে রাখিয়া যাইতেছেন, তিনি বেশী দিন দেরী করিলে তাঁহারা হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারেন। এই কথা বলিয়া সকাল সকাল তাঁহাকে ফিরিবার জন্য আমি অনুরোধ করিতেছি।

(করতালি) (রাজেনের প্রস্থান)

নীহা। ধন্যবাদ !

দামো। এবার ?

চপলা। আমি পড়ব।

[পাঠ]

আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি গ্রহণ করুন ! দেবি, কোন্ শুভ মুহূর্তে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল জানি না, আমরা ধন্য হইয়াছি। আপনার মর্য্যাদা রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু হয় তো পারি নাই। আমাদের অনিচ্ছাকৃত সে ত্রুটি মার্জনা করিবেন। আর সাক্ষাৎ হইবে কি না জানি না কিন্তু আপনার অপূর্ব স্নেহ-মমতার স্মৃতি চিরদিন আমাদের হৃদয়-বেদিকায় হোমাগ্নির মত রক্ষা করিব।

[করতালি]

নীহা। (স্বগত) কার লেখা তা' বুঝতে পারছি—

দামো। এইবার তুমি কিছু বল—

নীহা। আমি কি বলব ? (দাঁড়াইয়া) আপনারা ক্ষমা করবেন আমাকে। আমার কোনো কথা আসছে না—আমি থাকতে চেষ্টা করেছি—আমার দুর্বলতার জন্য পারলুম না—এখন এত কষ্ট হচ্ছে যে আপনাদের ছেড়ে যাবার কথা মনে হ'তেই আমার চোখে জল আসছে—আমাকে এত ভালোবেসেছেন আপনারা, আমি, তা আগে বুঝতে পারিনি—আমাকে ক্ষমা করুন ! (উপবেশন)

[করতালি ধ্বনি]

দামো। এইবার সভা ভঙ্গ হ'ল।

[পুনরায় সঙ্গীত আরম্ভ হইল, ক্রমে ক্রমে দর্শকেরা প্রস্থান করিতে লাগিলেন, নীহারিকা চোখে আঁচল দিয়া বসিয়া রহিলেন]

মান। তুমি বোস ভাই, আমরা একটু মেয়েদের কাজকর্ম দেখি।

(প্রতিবেশিনীগণসহ প্রস্থান)

চপলা। আপনি কাঁদছেন নাকি ?

নীহা। না। ভাল লাগছে না চপল ! হ্যাঁ, তোমার সে গান আর লেখাটা আমাকে দাও। সুর কে শেখালে তোমাকে ?

চপলা। মাষ্টারমশাই।

নীহা। কেন ? আমার কাছে শিখতে পারতে !

চপলা। তা হ'লে গান ভাল হয়নি বুঝি ?

নীহা। তা বলছিনে—আমার কাছে বললে না কেন ?

চপলা। মাষ্টারমশাই আপনাকে আগে দেখাতে বারণ করেছিলেন। যাই আমি,—ওই রাজুদা আসছে—কত রকম কথা বলবে আবার।

(চপলার প্রস্থান)

[রাজেনের প্রবেশ]

রাজেন। নমস্কার।

নীহা। নমস্কার। আপনি বেশ বলেছেন।

রাজেন। আরও যথার্থ বলতে পারতাম কিন্তু সভার মধ্যে বলতে পারলাম না। তাই আপনাকে বলব বলে—বলব যথার্থ ?

নীহা। বলুন না।

রাজেন। দেখুন ! না যথার্থ বলেই ফেলি ! আপনার যথার্থ এ সময় হেডমাষ্টারকে ফেলে যাওয়া ঠিক হ'চ্ছে না।

নীহা। সে কথা আমাকে বলছেন কেন ?

রাজেন। আপনি ছাড়া যথার্থ আপন তাঁর কে আছে ? এই ধরুন যে যতই ভালবাসা দেখাক আপনার মত কেউ নয়! আপনি ভালমানুষ যথার্থ ইয়ে চোখে দেখতে পান না—হেডমাষ্টার এ-দিকে—

নীহা। কি বলছেন আপনি ?

রাজেন। নাঃ এমন কিছু নয় যথার্থ। তবে এই কাগজখানা রইল, খেয়ে দেয়ে যথার্থ দেখবেন—আপনার নিতান্ত ভালমন্দের জন্যেই—

(একখানা কাগজ দিয়া প্রস্থান)

নীহা। (পাঠ করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন) কিন্তু আমার কাছে কেন এ সব ? চপলাকে ভালবাসেন তিনি, আমার কি—আমার কি তাতে ? কিন্তু কেন, কেন তিনি তা করবেন ? উঃ ! কি ভীষণ মানুষ ! অভিনয়—কেবল অভিনয় ! (প্রস্থানোদ্যম ও ফিরিয়া একটি ছাত্রীকে হাতছানি দিয়া ডাকিলেন)

শোন, আমি বাড়ী যাচ্ছি, কেউ ডাকলে বোল্লো আমার জ্বর, কিছু খাব না আমি। (প্রস্থান)

হারুর প্রবেশ]

হারু। মিসিবাবা তো আজ খসে পড়ল! নইলে মোটা হাতে দাঁও মারতে পারতাম!—যাহোক—যা হয়—সিক্রিটারিবাবুর বিশ টাকাই সই। পটুলির নথ আর শাড়ী তো হবে। তারপর না হয়—

[রাজেনের প্রবেশ]

রাজেন। যথার্থ হারু দেখছি! তোমাকে খুঁজে খুঁজে—

হারু। আমি আজই চলে যাব সিক্রিটারিবাবু। আমার পরিবারের অসুখ!

রাজেন। সে খবর যথার্থ এনেছ?

হারু। যথার্থ টাকা এনেছেন তো?

রাজেন। খবর যথার্থ যদি সত্যি না হয়?

হারু। যথার্থ টাকা ফিরিয়ে নেবেন। আর আমি কেষ্টভক্ত হ'য়ে বামুনের কাছে মিছে কথা কইব?

রাজেন। তা হ'লে চল যথার্থ আমার বাড়ীতে, টাকা দিচ্ছি।

(উভয়ের প্রস্থান)

[মানস প্রবেশ করিলেন]

মানস। বেড়াল পুষলেও তার উপর মমতা হয়, আর এ তো মানুষ! খেয়ালী ননীর পুতুল, একটুকুতেই গলে পড়েন! অনেক রকমে ভুগিয়েছেন আমাকে—কাল রাত্রে আর একটু হ'লেই ইটের পাঁজার উপর পড়েছিলাম আর
উপর রাগ করতে পারছিনে! অত্যন্ত ছেলেমানুষ—ভীতু —সংসারে নানা রকমের উৎপাতের মধ্যে পড়ে একেবারে সাত টুকরো হ'য়ে যাবে। যায় যাক্‌গে। মাইনেটা মিটিয়ে দি। কিন্তু যাওয়া ওঁর কিছুতে উচিত নয়। নাঃ! চলে যান তা নইলে আমি শুদ্ধ মারা যাব! যতই যাবার সময় এগিয়ে আসছে ততই যেতে দিতে ইচ্ছে করছে না—না এ অবস্থাটা ভাল নয়। (প্রস্থান)

অত্যন্ত চঞ্চলভাবে দামোদর চৌধুরী প্রবেশ করিলেন তৎপশ্চাৎ হারু ও রাজেন]

দামো। তোমার এ কথা বিশ্বাস হয় রাজু?

রাজেন। যথার্থ বেদবাক্যের মত বিশ্বাস হয়। আমি অনেক দিন থেকেই যথার্থ দেখছি—বাইরের লোক দেখলেই ওঁরা স্বামী-স্ত্রীর মত যথার্থ ভাব দেখান। আর ঘরের মধ্যে দু'জনে দু'জনের সঙ্গে দা-কুমড়ো!

দামো। কি জানি, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

হারু। হুঁ বাবু ঠিক। মাষ্টারণী খৃষ্টান, আর মাষ্টার হিন্দু!

দামো। ঠিক?

হারু। আমার নিজের চোখে দেখেছি বাবু—মাষ্টারণী খান পাঁউরুটি আর মাষ্টারবাবু খান লুচি।

দামো। খট্‌মট্‌ সিং!

[খট্‌মট্‌ সিং-এর প্রবেশ]

দামো। এই লোকটাকে নিয়ে যাও! এ তার মনিবের সঙ্গে বেইমানি ক'রেছে—তার জন্যে পনেরো ঘা জুতো লাগাও। তারপর দেউড়ীতে আটকে রাখ। আমি ঘুরে আসছি, তারপর ও যা বলেছে যদি ঠিক হয় তবে ওকে দশ টাকা দিয়ে বিদেয় করে দিও!

হারু। (সভয়ে) এ কি সিক্রিটিরিবাবু!

দামো। চোপ্‌ রও! পনেরো ঘা বুঝলে খট্‌মট্‌ সিং!

('জী হুজুর' বলিয়া খট্‌মট্‌ সিং হারুকে টানিয়া লইয়া গেল

রাজেন। (স্বগত) কিন্তু যথার্থ সত্যি যদি না হয় তবে আমার—

দামো। কি ভাবছ? শোন রাজু, তুমি মোক্তারী ছেড়ে কলেজে ঢোক —গ্র্যাজুয়েট হ'য়ে এস! বাইরের লোক দিয়ে ইস্কুল চলবে না।

[মানময়ীর প্রবেশ]

মান। হঠাৎ ডাকলে কেন আবার? মেয়েরা পেরে উঠছে না—কচুর শাক নুনে পুড়িয়েছে!

দামো। পুকুরে ফেলে দিক্‌গে সব! শুনেছ, রাজু বলছে যে মাষ্টার মাষ্টারণী স্বামী-স্ত্রী নয়। মাষ্টারণী খৃষ্টান, মাষ্টার হিন্দু!

মান। ওমা! সে কি কথা! আমার বিশ্বাস হয় না।

দামো। আমিও বিশ্বেস করিনে, কিন্তু শুনেছি যখন, তখন সন্ধান না ক'রে চুপ ক'রে বসে থাকতে পারিনে তো! ওরা নাকি বাইরে স্বামী-স্ত্রীর মত ভাব দেখায়, ভিতরে একজন আর একজনের সঙ্গে খায় না। এ-খায় লুচি ও-খায় পাঁউরুটি, বলছিল তাদের চাকর। চল যাই।

মানময়ী। চল। কিন্তু আমার তো বিশ্বেস হচ্ছে না—তা কেমন ক'রে হবে? মাষ্টার যখন জানালা দিয়ে লাফিয়ে নেমে গেল তখন ছুঁড়ীর সে কি কান্না! সারা রাতই ফুঁপিয়েছে! সে কি ক'রে হবে! বুঝছ, বুকে ও-জিনিস না থাকলে অমন করে কেউ ফোঁপায় না।

দামো। জানিনে সে সব! যাচাই করে দেখতে হবে। চল।

রাজেন। যথার্থ আমি—

দামো। তুমি তো যাবেই—চল খুব সাবধানে গিয়ে ওৎ পেতে দেখতে হবে কি করে ওরা, বুঝলে গিন্নী? (দামোদর, রাজেন ও মানময়ীর প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

মানসের বাড়ীর বাহিরের ঘর

টেবিলের ধারে চেয়ারে বসিয়া নীহারিকা

নীহা। অভিনয়! কেবল আমার সঙ্গেই অভিনয়! হৃদয়-বেদীর হোমাগ্নি, সব বাজে, ঝুটো! উঃ! আমি চলে গেলে যা ইচ্ছে তাই করতে পারতেন। আমাকে এ-রকম অপমান ক'রে কি লাভ হ'ল তাঁর? (টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া ফোঁপাইতে লাগিলেন)

[মানসের প্রবেশ]

মানস। এই কাঁদছে আবার! এই মানুষ একা একা সংসারে চলবে কি করে? দেখুন—

[নীহারিকা মুখ তুলিলেন আবার টেবিলের উপর মাথা রাখিলেন
মানস টেবিলের নিকটে আসিয়া—]

আপনার গাড়ীর সময় হ'য়ে এল কিন্তু। শুনছেন?

(নীহারিকা পূর্ব্ববৎ)

মানস। (নোটের তাড়া বাহির করিয়া) এই আপনার মাইনের টাকা এনেছি।

(নীহারিকা নোটের তাড়া মুঠা করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন)

নীহা। চাইনে। চাইনে আমি কিছু!

মানস। কি হ'ল আপনার? কি করেছি আবার!

নীহা। কিছু করেননি! যান চলে যান! শান্তিতে থাকতে দিন একটু! আপনার পায়ে পড়ি মানসবাবু এই বেলাটার মত আমাকে—

মানস। কি ব্যাপার! পাগলের মত কি বকছেন?

নীহা। পাগল! পাগল-করলে কে আমাকে! বুঝিনে কিছু আমি! চোখ নেই আমার? চপলা এসে ঘর গুছিয়ে যায়, চুরি ক'রে গান শেখে! আর আমার সঙ্গে অভিনয়—অভিনয় (কাঁদিতে লাগিলেন)

মানস। সব মিছে কথা।

নীহা। মিছে! দেখছিনে আমি, দু' দিন থেকে এড়িয়ে চলছেন আমাকে, কণ্টক বিদেয় করবার জন্য তাড়াতাড়ি সব আয়োজন হচ্ছে—

মানস। আপনিই তো যেতে চেয়েছেন মিস গাঙ্গুলী!

নীহা। যেতে না দিলে যেতে পারি আমি! কেন যাব—কেন—

(পুনরায় ক্রন্দন)

মানস। ও-রকম করে কাঁদবেন না, বড় লাগছে আমার! আপনি চলে যাচ্ছেন সে আমার পক্ষে কত মর্মান্তিক—

নীহা। আমি যাব না। কেন যাব? আমি যেতে পারব না, পারব না! (ক্রন্দন)

মানস। (নীহারিকার মাথায় হাত দিয়া)—এ-রকম করলে আমি শুদ্ধ কেঁদে ফেলব যে?

মুহূর্তে'র মধ্যে নীহারিকা উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও বিস্মিত মানসের বুকের উপর মুখ গুঁজিয়া কেবলই কহিতে লাগিলেন—

আমি যেতে পারব না—যেতে পারব না!

মানস এক হাত দিয়া নীহারিকাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া কহিলেন—

আমিও যেতে দেব না!—যেতে দেব না!

কেবলই নীহারিকার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন, দ্বারপ্রান্তে দামোদর, মানময়ী ও রাজেন উপস্থিত হইলেন

মানস। ছাড়, ছাড়। এই কর্তা-গিন্নী আসছেন—

নীহা। আসুন। কি হ'ল তাতে?

[দামোদর অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন]

বাঁচালে নাৎ-বৌ, বাঁচালে! কিন্তু দেখছি তুমিই ইস্কুলটা ডোবালে রাজু, একেবারে ডোবালে!

মান। (নীহারিকার চিবুকে হাত দিয়া) কি দিদিমণি গাড়ী ক'টায়?

নীহা। গাড়ী মিস্ ক'রে ফেলেছি দিদিমা। (প্রণাম)

রাজেন্দ্র। যথার্থ বাঁচিয়েছেন আমাকে! উঃ!

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন

যবনিকা পতন

সংযোজন

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের দু'টি গল্পের ইংরাজি অনুবাদ

THIRD CLASS

by Rabindra Nath Maitra

[translated from the original Bengali story থার্ডক্লাস by Professor Suniti Kumar Chatterji, M.A., D.LITT. (London)]
—*Modern Review*, May, 1928, pp. 569-71.

A railway coach, painted yellow. Bundles big and small tied in cloth, a score of dilapidated and soiled tin trunks, a dozen or ten baskets, some twenty canvas hand-bags, two dozen blankets, country-made and foreign, half a dozen tattered quilts of old cloth, cocoanut *hookahs* with earthen bowls for the tobacco galore, and small round metal or tin boxes for betel for chewing, and metal glasses for water. In the midst of all this shoes—pumps, Indian slippers, Derby shoes, Indian shoes with up-turned toes, and canvas shoes : shoes of Chinese make from Calcutta, strong slippers from Taltolah and from Thanthania, ornamental slippers from Cuttack and shoes from Agra—specimens old and new, all together.

Inside the carriage near the top there was a notice : "To seat 24." Just four benches and a half for twenty-four people. The half bench was in the possession of the orderly of the Collector Sahib. Within the benches between their empty spaces, were bugs by the million ; and on the benches, forty one people closely packed—men and women, boys, old men, children. Turbans, felt or cloth caps and embroidered caps ; loose robes of Mohammedan mendicants, ochre-dyed garments of Hindu jogis, loin cloths, *saris* of women, plain white *dhotis* without border, *dhotis* with borders of the *juice-ball* pattern and of the thick and thin line pattern, and trousers and tunics—a remarkable harmony of all these.

Smells, to be sure. The door of the water closet was tied up with a string ; there was no latch. Under one bench was a dead rat ; under another, some banana skins rotting for many a day. *Hookah* tobacco, Indian leaf-rolled cigarettes, cigarettes *hashish,* cocoanut oil and strongly smelling floral oils, dirty blankets and cloth quilts, the huge bundle of the not very clean Kabulee and the uncorked bottle of rum which the orderly of the Collector Sahib had. All these smells combined in one.

The stuffy heat of August, and with it was the noise of

the little children crying. Three or four passengers were trying all at the same time to lean out of the same window for a whiff of fresh air. In this situation a perspiring young woman was making a vain attempt within her discreet wimple to cool herself with a little breeze by carefully fanning herself with the hanging lappet of her *sari*. In a corner an old woman had drawn her feet up to her body and was sort of gasping in an excess of fever.

Ting Ting Ting and the screech of the Siren.

A station. "Cakes and pastries", "Betels and cigarettes." "Porter, come this way."

"Where do you want to get in by here? Can't you see it all full? Get along that way."

"I say, Mr. Guard"

"You damn..."

"I say, Ticket Babu, where can I get a seat?"

"Why don't you get inside this?"

"He won't let me."

"Won't he? Is the carriage his father's property? Come along, get inside quick. Hallo, Good morning Pedro!" and the Ticket Babu tripped along towards the Guard's compartment.

"Quick, Mahesh, get in quick, waving the flag!"

Jerk

"I say, my good man, so you must come inside?"

"Just for two stations, friend; do please move this big bundle of yours a bit; that's a good fellow. Ah, how hot it is!"

The screech of the Siren.

Jerk! Bang!

Hat on head, white coat and trousers, red of face, comes in the Flying checker. The young woman got frightened and moved away from him. The checker advanced two steps towards her, and stood almost touching her, and shouted out to the old man in front of him. "Out with your ticket."

"Yes, Sir."

"Now then, be quick about it—move off, you damn..."

The up-country boy who was sitting on the floor near his feet became frightened and fell down in trying to move away.

"Your ticket?"

"I could'nt get time to buy it, Sir. I shall go as far as Daspur"

"So you haven't got a ticket ? Now then, your money. Out with it quick !"

"Here it is Sir, just seven annas."

"That won't do, must pay a rupee."

The man took out four annas more from the knot in a corner of his towel and gave the sum to the checker. That was all he had.

"Must pay more"

"Where am I to get it from, Sir ? The ticket costs eight annas, and I have paid eleven annas—I have no more money."

"Eight annas for the fare, and eight fine."

"Do excuse me for this time, Sir."

"Very well, don't do it again I say, move off, I want to get out. You woman there ! He pushed the frightened young woman with his elbow and trod on the feet of the old woman, and was out of the compartment.

"Oh, Oh, I am killed", the pitiful cry of the old woman.

"Sahib, you took my fare, but where's my ticket ?"

"Don't howl", the Sahib entered another carriage.

"Baladpur Baladpur" shouted the station porter. Once more the same old cries and noises, and the same pitiful and eager attempt of the passengers to get inside the carriage ; and the queer Hindustani of the Station-master, and cries of abuse from the railway porters, and the noise and clamour as well as pitiful cries of the packed third class passengers. The Station master shouted, "Sound the bell, I say, there !"

"Do stop, my father, O Sahib, my father, do stop, do stop the train for a minute !" cried out an old woman with a small bundle in her hand and came near the train.

"Get away, old woman. It's started." The old woman said in tones of frantic prayer—"My poor Bipin won't live, my father : I came down this morning to the doctor's and here is his medicine that I am taking with me." And while she said this she was on the carriage, when the Ticket Babu held her and got her down. The train was in motion. The old woman threw her bundle down on the platform, and wailed out, "O my poor Bipin !" The rest of her words were lost in the noise of the train.

The train was running. I was wondering how long it would take for a re-acting of the Black Hole tragedy if all the windows were closed, when the train stopped. The thirsty

passengers shouted out together—"Water-man ! Hi Water-man !" and forthwith from fifty windows, on all sides came out a hundred and fifty empty *lotas*, glasses, cups and mugs.

"Hi, Water-man, this side."

The Water-man, dark of complexion, bare footed, with a cap on his head, came with a black bucket, and stood nearby, and said in a bullying manner—"This side, eh ? You would have water by just ordering it, hey ?" Then he said in an undertone—"Two pice for a *lota* full." Filling his left fist with coppers the water-man was going back with the empty bucket in his right hand, when the orderly of the Collector Sahib awoke from his doze, and bawled out, "Water-man, bring here water." The water-man turned his eyes red with anger ; but when he saw Mr. Orderly with his long beard and his fine turban, he put down on the ground his bucket and made a very low *salaam* and said, "Good morning, your honour ! Please wait a little, I'll go and get fresh water."

Feeling like a conquering hero, Mr. Orderly came back to his place and began to twirl his moustache.

The train was to have stopped for ten minutes : but twenty minutes passed, and still the train would not start. To escape the heat inside the train, I got down on the platform. A porter was coming.

"I say, can you tell me why the train is waiting so long."

"Don't know." The porter went away.

The Bengali Ticket-checker was coming.

"Mr. Checker, why this long wait for the train ?"

"The lady of Mr. Caddie is having her lunch."

"Mr. Caddie—who is he ?"

"What good your knowing ?"—he said in English. I understood that it would not help me if I knew that, and so I kept quiet.

The checker went away.

The soda water man was coming my way jingling his empty bottles.

"My good man, can you tell me who Mr. Caddie is ?"

"He is a jute-broker from Nilganj, travelling in the second class."

The lady of Mr. Caddie came and the station-master accompained her and saw her settled in her compartment. The

Eurasian guard asked the Station-master if everything was all right, and raised his flag, and the train started.

Suddenly, it struck my ears, that wail of the old woman —"For pity's sake, my father, do keep the train from going for an instant! Bipin my son, O my poor Bipin—"

THE STREET VENDOR
by Rabindra Nath Maitra

[translated from the original Bengali story নিধিরামের বেসাতি by Sibnarayan Ray]—*Hemisphere,* Vol. 8, No. 11,

When the spring harvest was over, Nidhiram would come to Calcutta, and with the first rains he would return to his village home. During the months in-between, I would daily find one-eyed Nidhiram Pathak with a little pink-coloured tin box on his head hawking Sindur, or Chinese vermilion. Invariably a crowd of naked urchins would collect behind him, and the dreamy silence of the summer afternoon in our little by-lane would be broken by their wild shouts of welcome. "Hello mouse, one-eyed mouse, dear one-eyed mouse." This gay little welcoming army would never fail him, year in, year out Nidhiram, however, never took offence at this mischievous reception. Instead I would see him trying to gratify his little friends with imitations of mouse-squeaks.

For twenty years it had gone on like this. Then one summer afternoon Nidhiram was surprised by a sudden suspension of the rules of the game. He came to a turn in the lane where some children had gathered, and raising his voice, shouted his hawker's cry. There was a stray response from two or three familiar voices, but it did not swell into the usual noise of welcome.

The crowd of children had gathered round some-one in the middle of the lane and were listening in respectful silence. Nidhiram drew nearer. The speaker was a little girl. With the folds of her sky-blue *sari* gathered tightly round her waist, she was forcefully telling her audience that the blind should not be called blind, nor the lame lame, and that if anyone said

so again, she, the speaker, would cut the offender out from the list of her friends and would never invite that person to the wedding of her doll. It was this threat of social ostracism that had silenced the children from responding to the familiar voice of the street vendor. After looking long and carefully at the speaker Nidhiram went out of the lane in silence, to resume his day's hawking.

As he was returning home in the late evening Nidhiram met the leader of the afternoon's assembly. She was standing at the turn of the lane in front of the Blue House. "You must have called a blind man blind in your previous birth, didn't you, vermilion-wallah ?" she asked Nidhiram straight, without waiting for any introduction. Nidhiram of course did not remember any of the anecdotes of his previous birth. But to make friends with this new acquaintance he readily acquiesced : "Yes, my Lakshmi."

"That's why you were born one-eyed this time", she explained. "Mother told me, you know." And suddenly she broke out into a breath-taking curse. "Jadu, Madhu, Nimku, Chotku—they are all going to be blind in the next life. Won't they ? Why do they plague you for your blindness ?"

Nidhiram bit his tongue with his teeth. "You shouldn't say such things, Lakshmi dear", he expostulated.

Lakshmi, however, flared up at this. "Why, I will say it a hundred times. Why do they call you blind, eh ?" And after a small pause, "You are a Brahmin—aren't you ?"

"Yes", said Nidhiram.

But there was suspicion in his questioner's eyes. "Show me your thread", she demanded. Nidhiram brought out the dirty twisted yarn from beneath his torn *mrejai* (shirt) for her inspection. "My daughter will be married tomorrow to Radhu's son", said the girl. "Will you be our priest ?"

Nidhiram immediately accepted the offer of priesthood.

"We are poor people", she hastened to add, "we won't be able to give you any *dakshina* (payment), see ?" And then with great seriousness : "With this one married—well, I shall be free. The other two have somehow been married. O dear, rearing children—isn't it terrible ?" Then, giving the doll-box to Nidhiram she said, "Ah poor darling. Doesn't she look dried and worn in this heat and sun ? Now I must keep her

in water, or when the neighbours come to see the bride, they will jeer and say 'How ugly!' "

Just then someone called from within the house: "Saru".

"O dear", she cried, "see? One can't even talk about one's children for a while." Nevertheless, she got up to go. Nidhiram returned the doll-box to her.

"I am going, Lakshmi dear", he said.

"I am not Lakshmi but Saraswati", the girl corrected him. "You call me Saraswati." Then she went into the house.

So it was that Nidhiram and Saraswati had their first meeting.

Nidhiram quickly found he had grown deeply fond of this garrulous child. Gradually, wooden toys, *lac* bangles and many other gay little items of presentation began to find their temporary shelter in the vermilion-box until they reached their proper destination in Saraswati's nursery. In the drab and monotonous daily routine of sale and purchase, these little conversations with the girl were for Nidhiram his only moments of happiness. At times he would spend hours discussing with Saraswati the joys and sorrows of her clay family. The vermilion-box would lie on his lap as he sat under the window of the Blue House listening to his friend's endless patter. He would sometimes remember that he might earn a few more coins if he went to hawk his wares in some other part of the city. But he could not overcome the temptation of listening to his charming young friend. And yet all that she said was absolutly meaningless, and it would never be of any use to Nidhiram except to give him these moments of happiness.

With the rains Nidhiram returned to his village.

That year there was an outbreak of epidemic in the village, and Nidhiram too fell ill. After more than six months of illness and convalescence he reappeared one afternoon in our lane with his pink tin box, and as he came to the door of the Blue House he raised his old vendor's cry: "Want vermi-ilion?" But no one came running downstairs to open the door to his call. As he shouted a second time a window opened and Saraswati appeared behind the bars.

"Did you remember your old fool of a son?" asked the vermilion vendor smiling broadly. Saraswati answered only with a nod. The old man was greatly surprised: Saraswati was no person to keep mum when asked a question.

"Are all your children keeping well ?" he enquired.

"I have made a present of them all to Radhu", said Saraswati.

After this Nidhiram could find no thread to carry on the conversation. He thought for a long time and then, after some hesitation, he ventured : "Will you come out just for a moment, mother ?"

Saru was silent, but her younger brother came out to enlighten the perplexed vendor. "Mother says Didi shall not go out any longer. She is too old for that, isn't she ?" Well, well, that was it. Nidhiram now noticed the change in Saraswati. He had not seen her for nearly a year. But the restless, garrulous child from whom he had parted a year back was very different from this grown-up girl. Nidhiram was now at a loss to decide on the language and threads of conversation that might suit his grown-up friend. After some hesitation he took out the little bundle of molasses-crystals that he had brought from home, and giving it to Saraswati through the window-bars he said, "This is from my village, Saru mother, take it.' He made one or two disconnected references to his family and then went away. The many-coloured wooden dolls that had been specially made by the village craftsman for this occasion found no opportunity to come out of the tin box and reach their proper destination.

The next day when Nidhiram came with his wares to stop by the window of the Blue House he found Saraswati reading in the downstairs room.

"What are you reading, Saru mother ?" he asked in a timid voice.

Saraswati saw Nidhiram and with a smile said, 'Kathamala." The next moment she said, "Mother was asking about the price of the molasses." Nidhiram was quite upset at this question. With a pale face he said, "Saru mother, tell grandmother the molasses were made at my own home, they cost me nothing."

"All right", answered Saraswati.

For the next two days Nidhiram did not come that way. On the third noon, as usual, he made his appearance at the window of the Blue House and called for his Saru mother. Saraswati raised her eyes from the slate. "Why didn't you come these two days ?" she asked. The vendor's face lit up with happiness. So his little mother had remembered him all right. Giving some mendacious explanation for his absence he

said in a low, watchful voice, "Saru mother, I have brought a book for you. Will you read it?" He then passed through the window a very cheap edition of the *Ramayana*.

"Are there any pictures in it?" asked Saraswati.

"O, lots of them", grinned Nidhiram. "Ram, Ravan, Hanuman, everyone has his picture. But then I can't read a word of it. You read the book first and then you will read it to me."

"Very well", said Saraswati, "but won't you come tomorrow?"

With a shining smile of happiness Nidhiram gave his promise and went away.

Saraswati would read out the *Ramayana* and Nidhiram, with the vermilion box on his lap, would sit by the window and listen to her. Neither the reader nor the listener was conscious of the partition of the wall between them. Suddenly one day that partition asserted its existence.

The reading had by that time reached the second canto of the epic. Nidhiram reached the Blue House one afternoon to find two gentlemen in the front room in place of Saraswati, sitting on a clean bed and smoking their hookah. "Want vermi-i-lion?" Nidhiram raised his vendor's cry. A window opened in the upper storey, Saraswati appeared and signalled with her right hand that there would be no reading that day. Nidhiram returned the way he had come. At the turn of the lane, Saraswati's friend Radhu informed Nidhiram that Saru was going to be married, and the relations of the bridegroom had come to see her. Saru's marriage! And after that the inevitable father-in-law's house. How far would that be? Nidhiram turned and stood gazing at the closed window of the upper storey of the Blue House and then went away with slow, unhappy steps.

For three or four days he stayed at home, sad and lonely, and then one day he reappeared in our by-lane with his little tin box and his usual cry.

That day there was wedding music in the Blue House. Nidhiram waited for a long time but no one appeared at the open window of the upper storey.

From the next day Nidhiram's voice was heard as usual in the lane, but when he came to the Blue House he was silent—his voice would be lost altogether.

One day, as usual, Nidhiram was silently passing by the Blue House when from a window a child shouted after him, "Vermilion-wallah, please wait, Didi is calling for you." There was a trembling in Nidhiram's heart. As he turned he found Saraswati standing at the front-room window. In a voice thick with happiness, Nidhiram cried out: "When did you come, Saru mother? I didn't know, or..."

"Today", said Saraswati. She was no longer talkative. Nidhiram, however, carried on a non-stop conversation, all by himself, for an hour or so. At last he said: "Bring your vermilion case, my darling. I have the finest quality vermilion for you."

That day Nidhiram went away after filling up Saraswati's vermilion case, her bottles of liquid *lac*, and giving her conch bangles and other little things that are used by Hindu women as their insignia of marriage.

During the rains that year Nidhiram did not go to his village home. It was on the autumn day when Saraswati went to her father-in-law's house that our vendor left for his village. Everyone, from his old wife to his youngest son, upbraided him for his absence during the rainy season: it had caused the family much economic loss. But neither the childings nor the loss seemed to perturb the old man.

The spring came again and there was the touch of new colour in the gold-mohur branches. Nidhiram returned to Calcutta.

He did not know if Saraswati had come back from her father-in-law's house. Standing before the Bule House he therefore raised his usual shout: "Want vermi-i-lion?" There was no response. Nidhiram went to the turn of the lane, but then, after thinking a little, he came back and shouted again, this time in a louder voice: "Want vermi-i-lion?"

Faint footsteps were heard from inside the house. Nidhiram waited at the window with great trepidation in his heart. The window opened. "Mother has asked you not to come this way again, vermilion-wallah", said Saraswati's younger brother.

Nidhiram went pale He must have unwittingly committed some great offence. "Why?" he faltered.

At that moment the door opened. Saraswati stood there. a sad, faded face. She had no ornaments on her, was all in

white.* Nidhiram was completely taken aback. Then he dropped his box of wares on the ground and sitting on the box stared vacantly, with bewildered eyes.

When the vendor regained his senses he felt his little box of vermilion grow as heavy as twenty maunds.

For seven days after this no one saw Nidhiram in that lane of ours. At last one day I heard the old familiar voice and opened my window. There he was. There was a big fruit basket on his head instead of the little tin box of vermilion. Bent double under its heavy weight, drenched in sweat, old Nidhiram Pathak was passing by the door of the Blue House, raising a new cry : "Want fruits, mother, want fruits, ripe fruits for you ?"

* In orthodox Hindu families widows can not wear ornaments or any colourful clothing. Vermilion is also strictly prohibited. Fish and meat are taboo, but fruits are permitted.